ISBN 984 70187 0009 3

হিটলার থেকে জিয়া । মিনা ফারাহ

চারুলিপি

বইটির মতামত লেখিকার নিজস্ব। এর সঙ্গে প্রকাশকের কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪/ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫/মে ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪১৫/আগস্ট ২০০৮

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০'র পক্ষে হুমায়ূন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টাস, ২৪ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত, বর্ণ বিন্যাসে : সমবায়

প্রচ্ছদ : আব্দুল হালিম

দাম : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984 70187 0009 3

Hitlar Thaka Jiya (An Investigatib Report on Jiyaur Rahaman) by **Mina Farha**
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : February 2008, Reprint : August 2008, Price Tk. 350.00 Only, $ 15

U.K. Distributor **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A. Distributor : **Muktadhara**, 37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor : **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

উৎসর্গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে–

ভূমিকা

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এ, ইয়াহিয়া, মুজিবের জন্য কবর খুঁড়েও বন্ধ করে দিলো। ৬ই জানুয়ারী ১৯৭১এ ভুট্টো বললো, শেখ! ফাঁসি নয় শেখ! আজ তুমি একজন মুক্ত মানুষ। ২০শে মার্চ ১৯৭৫এ খুনি রশিদ ও ফারুক যখন জিয়াকে জানালো বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রস্তাব, জিয়ার উত্তর, 'তোমরা করো। আমার সমর্থন থাকবে।' ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এ খুনের সংবাদ শুনে জিয়ার উত্তর, 'তাতে কী?' এই হচ্ছে, আসল জিয়ার চেহারা। যে কাজ ভুট্টো ইয়াহিয়া সাহস করেনি, জিয়া তা সম্পন্ন করেছে। সুতরাং আজ ইয়াহিয়ার পর আরেকটি পশু হত্যা করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলার মানুষ আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। কিন্তু কেন চায়? কেন কেউই বলছে না, যুদ্ধাপরাধীরা মুক্ত হলো কি করে? এই প্রথম প্রশ্নটিই কেউ করছে না। ১৯৭৫ এর ৩১শে ডিসেম্বরে জিয়াউর রহমানের নির্দেশে যদি গেজেট জারি করে যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তি দেয়া না হতো, বাংলার মাটিতে কি আজ এই বিচারের প্রশ্ন উঠতো? যুদ্ধাপরাধীরা কেউই জেলের তালা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেনি। সুতরাং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তি দিয়ে জিয়াউর রহমান যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে, তা যুদ্ধাপরাধের চেয়ে বড়ো অপরাধ। তার অপরাধ, পলাশীর উদাহরণ উৎরে গেছে।

আজ ঢাকার সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা জিয়া উদ্যানে যে কবরটি রয়েছে বিএনপি আমলে তার নির্মাণ ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা। আমার প্রশ্ন, জিয়ার নির্দেশে খুন হয়ে যাওয়া অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের কবর কোথায়? দেশের জনগণের ২৫০ কোটি টাকার কবরে শোয়া, প্রশ্নবোধক এক জিয়াউর রহমান কি একাই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো? আজ দেশের সেনাবাহিনীর কাছে আমার প্রশ্ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪ সেক্টর কমান্ডারের মৃতদেহ যে অবমাননার সঙ্গে জিয়াউর রহমান জাতির দৃষ্টি থেকে গায়েব করে দিলো, এ কি সেনাকোড? জিয়া তো মুক্তিযোদ্ধাই ছিলো না। আর সত্যিকারের ৪ সেক্টর কমান্ডারদেরকে শুধু খুনই নয়, খালেদ মোশাররফ, হুদা এবং হায়দারের দেহ ৪৮ ঘণ্টা মর্গে পরিচয়ে পোকামাকড় দিয়ে খাইয়ে, কুকুর বেড়ালের মতো মাটি চাপা দেয়া হলো যে কবরের কোন হদিস নেই। অথচ জিয়ার কবরের বিশালতা, সমগ্র দেশটাকে ম্লান করে দেয়। নিশ্চয়ই তারা সেক্টর কমান্ডার নয় বরং চোর-ডাকাত ছিলো। না হলে, সেনাবাহিনী কেন চুপ? একি তাদেরও জিজ্ঞাসা নয়? মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জিয়ার চরম অবমাননার দৃষ্টান্ত – খুন শেষে সেক্টর কমান্ডারদের লাশের লাঞ্ছনা।

যুদ্ধাপরাধীদের নিঃশর্ত ক্ষমা, বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যাকান্ড, ৪ সেক্টর কমান্ডারসহ সশস্ত্রবাহিনীতে গণহত্যার নায়ক জিয়া, তার অপরাধের দীর্ঘ তালিকার দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যে লোক মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদেরকে খুন করে, কি তার পরিচয়? যে লোক খেতাবপ্রাপ্তদের লাশের উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে কবর না দিয়ে পচিয়ে গলিয়ে পোকামাকড় দিয়ে খাওয়ায়– কি তার পরিচয়? সে কি '৭১ এর আইএসআই নয়?

২৫শে মার্চ রাতে সে কি জানে না সোয়াত জাহাজে ওগুলো কমলা না কামান? মাল্টা না মেশিনগান? আমি কি মূর্খ?

আমি এই আইএসআই জিয়ার নাম দেশের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উঠিয়ে নেয়ার আকুল আবেদন জানাচ্ছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে। সশস্ত্রবাহিনীতে '৭৭এর গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির অপরাধে তার মৃত্যু পরবর্তী বিচার দাবী করছি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মনোযোগ আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, তদন্ত করে দেখুন, আইএসআই এই জিয়াউর রহমান কখনো মুক্তিযোদ্ধা ছিলো কি-না? সাধারণ ডক শ্রমিকেরা যখন বুঝতে পেরে অস্ত্র খালাস না করে বিদ্রোহ করলো, জিয়াউর রহমান গেলো গণহত্যার জন্য আনা অস্ত্র খালাসের অভিসন্ধিতে।

সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তার দীর্ঘ এবং লম্বা অপরাধের তদন্ত করা। তাদের ভেতরে ঢুকে এই আইএসআই এজেন্ট '৭১-'৮১ পর্যন্ত অপরাধের কতো দীর্ঘ তালিকা রেখে গেছে? জিয়াউর রহমানের আইএসআই ব্যাকগ্রাউন্ড শনাক্ত করে, সেনাবাহিনীকে খুনির দায়মুক্ত করা থেকে তাদের গত্যন্তর নেই।

জিয়ার মৃতদেহটি পাকিস্তানে তার পারিবারিক গোরস্তানে পাঠিয়ে দিয়ে এখানে বীরমুক্তিযোদ্ধাদের পুনঃকবর দিয়ে ওয়ার মেমোরিয়াল এবং মিউজিয়াম গড়ে প্রজন্মের কাছে দায়মুক্ত হোক আমাদের সেনবাহিনী। একাজ অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্টর কমান্ডারের লাশ অবমাননা? সেনাবাহিনীকে অবমাননা? লাঞ্ছিত লাশগুলো– তাহের, খালেদ, হুদা, হায়দার এরা আপনাদের ভাই। আপনাদের ভাইয়ের খুনি, জিয়ার নাম, দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, সড়ক, দেয়াল থেকে তুলে নেয়ার আহ্বান জানাই। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যর্থতা জিয়া। যুদ্ধাপরাধীর চেয়ে বড়ো অপরাধ যারা অপরাধীকে মুক্তি দেয়। জিয়া ৩৪,০০০ যুদ্ধাপরাধীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে '৭১কে পতিত করেছে। কলঙ্কিত করেছে পুরো সেনাবাহিনীকে।

এই বইটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি– "জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা নয়–১৭৮টি কারণ।" দ্বিতীয় অংশটি– "সংবিধান সন্ত্রাসী জিয়া।" তৃতীয় অংশ– "বইয়ের কাঠগরায় জিয়া।"

জীবনে প্রচুর গণহত্যাকারী এবং স্বৈরাচারের কাহিনী আমি পাঠ করেছি। কিন্তু, একের মধ্যে এতো মহা-স্বৈরাচার চরিত্রের মহা-সন্নিবেশ, এই প্রথম। হিটলার, ইদি আমীন, পলপট, চাওচেস্কো, নরিয়েগা... জিয়া, একাই সব। দশ বছরে জিয়া কী না করেছে? '৭১-'৮১ অব্দি জিয়ার সকল কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রদ্রোহী। জিঘাংসাপূর্ণ। ক্ষমতার লাগামহীন – অত্যাচার।

শতশত ঘণ্টা ব্যয় করে আমার দীর্ঘ ২ বছরের গবেষণার ফসল এই বই। এই বই লেখার মাধ্যমে তার যে বীভৎস ষড়যন্ত্রকারীর মুখ আমি দেখতে পেয়েছি তার, প্রমাণ, আজকের ব্যর্থ বাংলাদেশ। দেশ স্বাধীন হয়েছিলো মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য। তারপর থেকে সকল ব্যর্থতার মূল এই মহা-স্বৈরাচার, যার প্রমাণ বইয়ের ২য় অংশে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে', ষড়যন্ত্রকারী জিয়ার ছদ্মবেশী প্রো-পাকিস্তানি চেহারা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ২৫শে মার্চ রাত ১১টায়, তার 'সোয়াত' জাহাজে গমনের লোমহর্ষক বর্ণনা এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের "আইএসআই" থিওরি– মিলে যায়। ব্যারিস্টারের কথায়, রশিদ-ফারুক এরা সব তল্পিবাহক। আসল "ক্লাইভ" আমরা ধরতে পারিনি। ১৭৫৭এর পর জিয়া, ১৯৭৫এর আরেক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মীরকাশিম। আর তার ক্লাইভই হলো, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের "আইএসআই" থিওরি।

জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা নয় প্রমাণ করতে এখন, ২৪শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ, ১৯৭১, একে একটি ফ্রেমে বন্দী করা যাক। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের শুরুতেই পাওয়া যাবে, ২৪শে মার্চ থেকে জিয়ার বিদ্রোহে আপত্তি এবং লেখককে যুদ্ধ থেকে সরে দাড়াবার সরাসরি পরামর্শদান। লেখকের সঙ্গে তার কথোপকথনের অংশ বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় বারবার দেয়া হয়েছে, মনে করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। পুনরাবৃত্তির কারণ, ন্যূনতম সাতবার না দেখলে, মনে থাকে না।

২৪শে মার্চ জিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবার পরামর্শ দেয় লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের লেখককে। একাধিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও জিয়া অনড়। তার কথা, "যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।"

২৫শে মার্চ – এই দিনেও জিয়া যুদ্ধে না গিয়ে, পূর্ব পরিকল্পনা মতে পাকিস্ত ানের ২০ বালুচকে আগেভাগে আক্রমণ না করে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে বিশাল গণহত্যা ঘটতে দেয়। নিজের সৈন্যগুলোকে নিষ্ক্রিয় রেখে বরং রাত ১১:৩০ মিনিটে দুই পাকিস্তানি জওয়ানকে সঙ্গে করে, "সোয়াত জাহাজে" যাওয়ার জন্য রওনা দিলো গণহত্যার জন্য বয়ে আনা পাকিস্তানের অস্ত্র খালাস করতে, যার সবই জিয়া জানতো। জিয়া, '৭০ থেকেই চট্টগামে, পাকিস্তানিদের পক্ষে কাজ করছিলো। অস্ত্র জাহাজের সব খবর তার জানা। ফলে, বাঙালিদের কাছে হাতে নাতে ধরা পরে প্রাণের ভয়ে, তাৎক্ষণিক যে বিদ্রোহের চাতুরি জিয়া করেছিলো,

সেটাই 'জিয়ার বিদ্রোহ' বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিএনপি-দের প্রোপাগান্ডা মেশিনে প্রচার করা হয়। তাৎক্ষণিক কিছু খুন করে বিদ্রোহের নামে, আত্মরক্ষা। না হলে, বাঙালি অফিসাররা ২৫শে মার্চ রাতেই এই বিশ্বাসঘাতক জিয়াকে খুন করতো- সোয়াতের পথে হাতেনাতে পাকড়াও করতে পেরে। রফিকুল ইসলাম, অনেকের মধ্যে একজন সাক্ষী। জিয়ার 'উই-রিভোল্ট' প্রবন্ধে একজন বেসামাল জিয়ার চরিত্র। বিদ্রোহের নামে দেশদ্রোহীতাকে ধামাচাপা। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া।

২৬শে মার্চ – নিজের ৮ম বেঙ্গল নিয়ে পলাতক। লেখকের পরামর্শ উপেক্ষা করে যুদ্ধ থেকে উধাও। লেখক যখন চট্টগ্রামে যুদ্ধরত, অপেক্ষা করছিলো জিয়ার সৈন্যরা এসে যোগ দেবে, পরে একাধিক সৈন্য ব্রিজের উপরে ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে এসে, যুদ্ধে যোগদান করে লেখককে তার প্রশ্নের উত্তরে জানায়, জিয়া তাদেরকে নিয়ে অন্য কোথাও চলেছে। বলেছে, চট্টগ্রামে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না। সুতরাং সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। জিয়া চলে যায় সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে কালুরঘাটে।

২৭শে মার্চ –সৈন্য নিয়ে পলাতক জিয়া তখন কালুরঘাট। সেখানেই তাকে জানানো হয়, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা। বেলাল মোহাম্মদের উদ্দেশ্য, সিভিলিয়ান ঘোষণা ঠিক আছে, কিন্তু একজন মেজর হলে তা সৈন্যদের জন্য ভালো। জিয়া ঘোষণাপত্র পাঠ করে এবং প্রথমেই সেখানে নিজেকে ঘোষণা করে বাংলাদেশের "রাষ্ট্রপতি।"

২৪-২৫-২৬-২৭ এই চারদিনের ফ্রেমে বন্দী জিয়া নিজেকে এক এক করে প্রমাণ করেছে, সে মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে একজন, আইএসআই।

প্রজন্ম এখন বহুবিস্তৃত। প্রায় ৩০ লক্ষ বাংলাদেশী বাইরে। বহুবছর শেষে, অনেকেই এখন মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানতে আগ্রহী। সুতরাং জিয়া বিমানবন্দরে নেমে আমি আমার প্রবাসী সন্তানকে কী বলবো? যদি সে জিজ্ঞেস করে, কে এই জিয়া, যার নামে বিমান বন্দর? আমি কি তাকে বলবো, জিয়া একজন গণহত্যাকারী! একজন মহা-স্বৈরাচার! বাংলার হিটলার! যার নামের সঙ্গে জাতিরজনকসহ বহু খুনের কলঙ্ক! বহু বিতর্ক! কেন বলবো না? আমাকে তো প্রজন্মের কাছে আমার নিজের দেশের সঠিক ইতিহাস বলতে হবে! সুতরাং তার প্রশ্নের জবাবে আমি নিশ্চয়ই বলবো, হিটলারের মতো জিয়াও একজন খুনি! যদি তখন সে জিজ্ঞেস করে– খুনির নামে কেন বিমানবন্দর?

এর উত্তর জানে কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালি এবং একটি বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক দল ও তার গডমাদার। সুতরাং এয়ারপোর্টে নেমে আমি এমন

একজনের নাম দেখতে চাই, যার নামের সঙ্গে জিয়ার কলঙ্ক নেই। যুদ্ধে যিনি শহীদ হয়েছেন। দেশের জন্য এতোবড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন যার নাম শোন-মাত্র শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসবে। এমন একজন, যে বীরশ্রেষ্ঠ কিংবা বীর।

জিয়া একজন ঠাণ্ডামাথার খুনি, তার নামে দেশের কোন প্রতিষ্ঠানই আইনসম্মত নয়। দুর্ভাগ্য যে, এদেশের সবটা জুড়ে আছে, জিয়া পরিবার। যেন শুধু জিয়া পরিবারের জন্য দেশ স্বাধীন করেছে জাতি। হ্যালো!

বিদেশে আমরা ওয়ার মেমোরিয়াল বা ওয়ার মিউজিয়াম দেখে অভ্যস্ত। সেখানে সারা বিশ্বের মানুষ এসে ভিড় জমায়। ওয়াশিংটনে কেনেডির কবরের শিখা অনির্বান দেখতে সারাবিশ্বের হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমায় প্রতিদিন। ছাত্র, ট্যুরিস্ট, স্কলার, গবেষক। আর আমাদের জিয়া উদ্যানের কবরটি, একাই একটি ১০০০ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ দখল করে রয়েছে। এই কবরটি সেখানে কেন, কি উদ্দেশ্যে, গরীব দেশের জন্য ১০০০ কোটি এই বিলাসিতায় জাতির কি উপকার হচ্ছে, জবাব নেই। এই ১০০০ কোটি টাকার জায়গাটি, এমন একটি গুরত্বপূর্ণ স্থানে, যেখানে সহজেই গড়ে উঠতে পারতো বাংলাদেশ ওয়ার মেমোরিয়াল কিংবা মুক্তিযুদ্ধ মিউজিয়াম। রাষ্ট্রের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গার জমি কেন খুনির কবরের জন্য বরাদ্দ, এর উত্তর অতি আবেগপূর্ণ জাতি, দিতে পারবে কী? তার খুনের হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। কারণ পুরো স্বাধীনতাই জিয়ার ভিকটিম।

'৮১তে এটা ছিলো, অতি আবেগের ফসল। একজন ভাঙা স্যুটকেস এবং ছেঁড়া লুঙ্গির দরবেশের প্রতি, এই জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি ছিলো, জাতীর ভুল।

আসলেই সে কি দরবেশ? নাকি এটা কিছু জিয়াবাদী চাটুকারের অন্য রকমের অভিসন্ধি! '৭৫এ পৌঁছে, এক অন্য বাংলাদেশ! '৭৫ পরবর্তী জিয়া, যার নামের সঙ্গে জড়িত সশস্ত্রবাহিনীতে '৭৭এর বিপুল গণহত্যা, ৪ সেক্টর কমান্ডার খুন, দেশে পাকিস্তানের চেয়ে দীর্ঘতম সামরিক শাসন, সংবিধান টেরোরিজম, মৌলবাদের পুনরুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানের প্রসিকিউটর এবং সরাসরি আইএসআইসহ যুদ্ধাপরাধীদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আইনের বৈধতা? গোলাম আজমের মতো পাকিস্তানবাদী ও মওদুদীবাদী নরপশুকে দেশে ফেরত এনে একটি দলের বহু বিতর্কিত প্রতিষ্ঠাতাকে রাষ্ট্রের ১০০০ কোটি টাকার জমির মধ্যে ২৫০ কোটি টাকার কবর খুঁড়ে রেখে– একটি গরীব দেশ এবং জাতির কি উপকার হলো? এটা বিবেকবান একটি ব্যক্তিও যদি থেকে থাকেন, তার কাছে আমার প্রশ্ন, প্লিজ! জবাব দিন! যে দেশের মানুষ, ক্ষুধার তাড়নায় সন্তান বিক্রি করে দেয়...। আর কিছু না হলে, এই জমি মুক্তিযোদ্ধা, হকার বা দিনমজুরদেরকে বরাদ্দ দিন। এতে তাদের কিছু উপকার হবে।

আমি যুক্তির সঙ্গে দাবী রাখছি, অবিলম্বে জিয়ার কবর সরিয়ে, এখানে বিশাল করে গড়ে তোলা হোক, আন্তর্জাতিক মানের একটি ট্যুরিস্ট এ্যাট্রাকশন, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষার মানুষ এসে, কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিরে যাবে '৭১এ। যেমন করে আমরা বারবার ফিরে যাই, কেনেডি, রেগ্যান, লিঙ্কন, আর্লিংটন, কোরিয়ান এবং ভিয়েতনাম ওয়ার মেমোরিয়ালে। ৩৬ বছর পর, একটি বিশালাকারের এবং আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ মেমোরিয়াল বা মিউজিয়াম, ঢাকার এই বিশাল বিখ্যাত জায়গায় কেন উঠবে না? রাষ্ট্রীয় সম্পদ এভাবে অপচয় বা অপব্যবহারের সুযোগ কোথায়? আমি বলতে এসেছি, জিয়া উদ্যানটি দেশের একটি অমিমাংসিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জমি। এই জায়গায় '৭১এর মিউজিয়াম উঠলে, সেটা হবে জাতির গৌরব এবং অসামান্য অর্জন। সারাবিশ্ব জানবে– বিশ্বের ২য় বৃহত্তম গণহত্যার সংবাদ। তাদের জন্য পাঠ্য হবে– বাংলাদেশের গণহত্যা। বিশ্বের কাছে আমাদের পরিচিতি বাড়বে যে, ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা বাঙালি কতো বড়ো একটা জাতি। বলবে, শ্বেতাঙ্গদের মতো, এরাও তাদের বীরদেরকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে জানে। না হলে, ৩৬ বছর পর, আন্তর্জাতিক কম্যুনিটি, ছাত্র এবং গবেষকদেরকে আমরা '৭১ সম্পর্কে কি দিলাম? সেনাবাহি-নীর কাছে জিজ্ঞাসা, আপনারাও বলুন! আপনারা অনেকেই দেখেছেন, ইউরোপ, আমেরিকার মিউজিয়ামগুলো। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে শহরে ঢোকার পর, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাস্তব দূরত্বে এই জায়গার জন্য একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান– ওয়ার মিউজিয়াম।

আমার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে এখানে আসবে রিসার্চার, স্কলার, ট্যুরিস্ট। আসবে প্রবাসী প্রজন্ম যারা ভবিষ্যতের পুরোধা, অগ্রযাত্রী। এই প্রয়াসকে বিশ্বের মানুষ অভিবাদন জানাবে।

জিয়ার কবর নয়, যেন '৭১এর ব্যর্থতার ১টি প্রতীক! '৭৫এর দানবশক্তি। তার কথা জাতিকে মনে করিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর এই '৭১–'৮১র পরাশক্তির কবর। আর শুধু এই একটি কবরের কারণেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ ভুলে যেতে বসেছি। শুধু বিতর্কিত এই একটি কবর, এতো বিশাল জায়গা জুড়ে জগদ্দলের মতো বসে আছে যেখানে সাধারণ মানুষ যায়, প্রেম করতে, চোরেরা যায় সামাল দিতে, ড্রাগ এডিকটরা সেখানে বসে ড্রাগের ব্যবসা করে। এই রাষ্ট্রীয় সম্পদটুকু হয়েছে, খুনি ও অস্ত্র ডিলারদের ভূ-স্বর্গ। অথচ ঢাকার বুকে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান জায়গাটি কিন্তু রিয়েল এস্টেটের প্রেক্ষাপটে এমন একটি অত্যন্ত মূল্যবান জমি যার সত্যিকারের মূল্যায়ন হয়তো একমাত্র বিশ্ববিখ্যাত নির্মাণ ব্যবসায়ী "ডোনাল্ড ট্রাম্পই" করতে পারবে। এখানে গড়ে উঠতে পারে, এমন একটি মিউজিয়াম এবং মিউজিয়ামজনিত দোকানপাট যেখান থেকে বছরে শতশত কোটি টাকা আয় হবে,

যা, পুনর্ব্যবহার করা যাবে, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন, ইত্যাদি কাজে। বিশ্বের শীর্ষ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের চোখে এই জায়গাটি হয়তো বেকার পড়ে আছে, যা, তারা হলে, ট্যুরিস্ট এ্যাট্রাকশন গড়ে দেখিয়ে দিতো। একটি খুনির কবরের বিলাসিতা– একটি অবিবেচক রাষ্ট্রের পরিচয়।

জিয়া উদ্যানের মাটির সঠিক মূল্য ধরার সাধ্য আমার নেই। তবে অনুমান করতে পারি যে, '৭১কে এখানে বিশাল করে তুলে ধরলে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিটিতে '৭১ যতো উঁচু হবে তার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। ট্যুরিস্টদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে '৭১। প্রজন্ম, স্কলার, রিসার্চাররা সারা বিশ্বে পৌঁছে দেবে বার্তা। '৭১ বাঁচাতে জিয়া উদ্যানটি এখন অমিমাংসিত। অবিলম্বে এখানে ওয়াশিংটনের "আর্লিংটন ন্যাশনাল মেমোরিয়ালের" অনুকরণে '৭১এর ওয়ার এবং মুক্তিযুদ্ধ ন্যাশনাল মেমোরিয়াল স্থাপনের দাবী জানাচ্ছি।

১৯৭৭এ সশস্ত্র বাহিনীতে বিশাল গণহত্যা এবং দেশে পাকিস্তানিদের চেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘতম সামরিক শাসনের জনক আইয়ুব ইয়াহিয়ার চেয়ে অধিক নরপশু এই জিয়াউর রহমানের কবর এবং তার নামে বিমানবন্দর, এই জাতীয় দু'টি প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে কলঙ্কমুক্ত করে, শুরু হোক– জাতীয় কলঙ্ক শুদ্ধি অভিযানের মঙ্গল যাত্রা। আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। জিয়ার নামে রাষ্ট্রের যেকোন বরাদ্দই– রাষ্ট্রহীনতা। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা খুনের রক্ত জিয়ার পেটে। জিয়া মুক্তিযোদ্ধা খেকো– বাঘ।

'৭১এ যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য, '৭৫এ আবার সে পরাধীন। ১৫ই আগষ্টে এবার বাংলার বুকে একসঙ্গে নেমে এসেছিলো জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্রীকারীরা। তিলে তিলে দুই পরাশক্তি মিলে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে প্রায় নির্মূল করে দিলো স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। '৭৫এর বাংলা নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলো হিটলারের কয়েকটি অনুগত দলের মতো পাকিস্তানপন্থী সব '৭১এর রাজাকার এবং আলবদরদের দল, যাদের অপর নাম– কোলাবরেটর। আর '৭৫এর পর, এদেরই বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো '৭১এর ঘাতকদালাল নির্মূল কমিটি, যাদের গণআদালত, বিএনপি'র গডমাদারের দেশদ্রোহীতার বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক মানের দৃষ্টান্ত। গণআদালত, যার উদ্দেশ্য '৭১এর ঘাতকদালাল সমন্বয়ে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা এবং বাংলার গোয়েবলসগোলামআজমের প্রতীকী বিচার এবং সে বিচার তারা সুসম্পন্ন করেছেন। "গোলামআজমগোয়েবলস" যার সম্পর্কে যথেষ্ট লেখার মতো শক্তি নিয়ে ঘৃণার সাগর আমি উৎরোতে পারবো না, যার আত্মজীবনী থেকে কিছু কথা সরাসরি ছাপিয়ে দিলাম, '৭১কে অস্বীকার করেছিলো যে গোলাম এবং '৭৮এ তাকেই দেশে ঢুকিয়েছিলো জিয়া, '৯৪তে

তাকে তার প্রো-পাকিস্তানি স্ত্রী খালেদা জিয়া নাগরিকত্ব ফেরত দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আমার জিজ্ঞাসা, এই বাংলাদেশ, কোন বাংলাদেশ? জিয়া পরিবার বাংলাদেশে বিশ্বাস করলে এসবের মানে কি?

এই জাতিকে আজ জিয়াহিটলারের বিরুদ্ধে হলোকস্ট থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এখন আন্দোলন হবে '৭৫এর ঘাতকদালালদের বিরুদ্ধে। '৭১এর যুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানি নাৎসী তাড়ানোর আন্দোলন। আর '৭৫এর ঘাতকদালাল, যারা জিয়ার নাৎসী বাহিনীর অনুগত। আর এই দলেরই প্রধান কোলাবরেটর জিয়াউর রহমান, যার সঙ্গে মওদুদী থেকে বোস্টার, সকলেরই যোগাযোগ। সে ছিলো সবখুনিদের কেন্দ্রবিন্দু। সকলের শেষ আশ্রয়স্থল। ইয়াহিয়া, ভুট্টো থেকে সর্বহারা গণবাহিনী, ফারুক-রশিদ, মোস্তাক-ওসমানী, মওদুদী-গোলাম, আব্দুল আলীম-মাওলানা মান্নান, আইএআই-সিআইএ...। জিয়ার বিএনপি হয়েছে হিটলারের ৬টি অঙ্গদলের সমন্বয়ে গঠিত নাৎসীদলের হুবহু। এরাই বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ গণহত্যার অর্জন, স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুঁজি করে চর্চা করেছে পাকসারজামিনপাকিস্তানবাদ। জিয়ার মন্ত্রীসভাতে ছিলো আম্রকানন, ছিলো জার্মানীর গণহত্যাকারী। প্রমাণের অভাব? '৭১এর আর্কাইভ থেকে "সংগ্রাম" পত্রিকার বোমসেল কি বাংলা নাৎসীদের সাক্ষী হতে যথেষ্ট নয়? এবং এতোসব সত্ত্বেও যারা জেনেশুনে দেশের বিরুদ্ধে এই মাত্রার বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই দেশদ্রোহী যার সামনে হিটলার পর্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে... জিয়া করেছে বিশ্বে যা অন্য কোন স্বৈরাচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরেই স্বাধীনতার পতন। জিয়া, আয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকে ফিরিয়ে এনেছিলো, আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য। তবু এই জাতি আয়ুব-ইয়াহিয়াকে ঘৃণা করে, জিয়াকে ঈশ্বর করেছে। জিয়াই সৃষ্টি করেছিলো এরশাদ। জিয়াকে হত্যা করেছে এরশাদ। মীরজাফর মারা গেছে কুষ্ঠ রোগে। হিটলার আত্মহত্যা করেছে ব্যাঙ্কারে। জিয়া এর কোনটাই নয়। সে পুরো জাতিকে হত্যা করে, একলা জীবিত। তার ১০০০ কোটি টাকার জিয়াতাজমহল গড়েছে গডমাদার খালেদা জিয়া। সম্রাট শাহজাহান এবার, বাংলাদেশে। তাদের দুই কলঙ্ক কোকেইন ও হেরোইন জিয়া, গডচাইল্ড, ৫৬০০০ বর্গমাইল জায়গা নিলাম করেছে হাওয়াভবনে বসে। জিয়া, ৫ম সংশোধনীর জন্ম দিয়ে, মাতৃ জড়ায়ুতে পৌঁছে দিয়েছে সন্তানের শিশ্ন।

সারা বিশ্ব যখন তাদের নিজস্ব যুদ্ধারাধীদের বিচারের দাবীতে সোচ্চার, বাংলাদেশ তখন যুদ্ধাপরাধীদের কেন বৈধ করেছে? আফ্রিকা যখন চার্লস টেলারকে বন্দী করেছে, বাংলাদেশ তখন '৭৭ এর গণহত্যাকারী জিয়াকে বলছে সংহতির বীর? ইহুদিরা যদি নাৎসীদেরকে ক্ষমা করে হিটলারকে জার্মানীর চ্যান্সেলর করার জন্য গেজেট জারি করে, জার্মানরা কি বলবে? কম্বোডিয়ানরা যদি পলপটকে বৈধ করতে সংবিধান

সংশোধন করে, জাতি কি বলবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কি বলবে বিন-লাদেন হোয়াইট হাউজে এলে? জিয়াতাজমহলের উদ্দেশ্য কি– মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেয়া? '৭১ নয়, '৭৫কে বিশাল করা? বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় উধাও করে, জিয়াকে বঙ্গবন্ধু বানানোর ঘৃণ্য অভিসন্ধি? আসুন এবার আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। এ পশু '৭১এর চেয়ে ভয়ঙ্কর।

জিয়াউর রহমান কেন মুক্তিযোদ্ধা নয়, এর প্রমাণ রাখতে স্বয়ং জিয়া কিছু বাকী না রাখলেও বাংলার স্বার্থপর মানুষ, পথভ্রষ্ট, অপ-রাজনীতি তাড়িত মানুষ, তারা খুনি জিয়ার সকল অপকর্ম চোখ বুজে এড়িয়ে গেছে। তাকে সৃষ্টি করেছে বহুদলীয় রাজনীতির প্রবক্তা। স্বাধীনতার ঘোষকের বিতর্ক। ফলে, এদেশের মানুষ ৩০ লক্ষ শহীদকে ভুলে গেছে। কারণ তারা শহীদদের খুনির পুনর্বাসনকারী জিয়ার সকল দুস্কৃতি মেনে নিয়েছে। কারণ তারা আইএসআই এবং সিআইএ রিক্রুট জিয়াকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছে। তারা নিজামীদেরকে গডমাদারের সঙ্গে, বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে সাভারকে ঘোষণা করেছে, রাজাকারদের জন্য সাভার গণটয়লেট। হ্যালো! বাংলার মানুষকে গডমাদার খালেদা বুঝিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জিয়ার ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধ করেছে।

বহুদল মানে কারা? যাদের নামের সঙ্গে '৭১এর অপরাধের স্বাক্ষর? জিয়াকে কেন্দ্র করে লেখা বইগুলো, যেখানে একাই ইতিহাসের মীরকাশিম এবং হিটলার চরিত্রের জিয়া, প্রমাণের অভাব নেই, জিয়া, এককভাবে, শতবর্ষের একমাত্র মহা-স্বৈরাচার, যে নাকি '৭১এর সকল যুদ্ধাপরাধীদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে, গেজেট জারি করে প্রমাণ করেছে তার সঙ্গে '৭৭এর অপশক্তি এবং মৌলবাদীদের কানেকশন। জিয়া, গোলাম আজমের মতো দেশদ্রোহীকে দেশে ঢুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে করেছে অস্বীকার। এই দৃষ্টান্ত একমাত্র জিয়াই স্থাপন করেছে যা নাৎসীদের বেলায় হলে, সমস্ত ইউরোপে আগুন জ্বলে যেতো। জিয়া পরোয়া করেনি কোন আদর্শ, সেন্টিমেন্ট, অশ্রু বা ধর্ষিতার যন্ত্রণা! জিয়া করেছে, যা মোস্তাক, মীরজাফর বা হিটলার পর্যন্ত করেনি। জিয়া বিষাক্ত ৫ম সংশোধনীকে আইনে প্রণয়ন করে, '৭১কে হত্যা করেছে। এই সংশোধনী, '৭১ এবং '৭৫এর সমষ্টিগত সকল অপরাধের দূর্গ। জিয়া, যুদ্ধাপরাধীদেরকে বৈধ করে, মুক্তিযুদ্ধের ফাঁসি দিয়েছে। যার কোন উত্তর আমরা প্রজন্মকে দিতে পারবো না। জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিসহ সংবিধান থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির খৎনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে দেশকে মুসলমানী দিয়েছে। জিয়া সশস্ত্র বাহিনীতে ১০,০০০ এর বেশি গণহত্যা করেছে। এরপরেও জিয়া, বীরউত্তম? তার বীরউত্তম কি বঙ্গবন্ধুর আত্মরক্ষা নয়? না হলে জিয়া কি তাকে '৭২এই খুন করে ফেলতো না? ১০ বছরে সামান্য মেজর থেকে সবগুলো পদ এবং পদবী সাবাড় করে দিলো জিয়া। সেনাবাহিনীর কাছে প্রশ্ন, আর কতো জিয়া? আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি।

আমাদের দেশের কেউ কেউ বলে মুক্তিযুদ্ধ ভুলে যান, কারণ এখন এসব অতীত। আমার প্রশ্ন জার্মানীরা কি হলোকস্ট ভুলে গেছে, কারণ এর বয়স ৬০? আপনার মায়ের বয়স ১০০ হলে সে কি পুরানো হয়ে যায়? জিয়া, অপরাধ রাজনীতির সিফিলিসে আক্রান্ত, পুরো দেশকে করেছে জিয়া-সিফিলিসের সংক্রামিত রোগি। যার ফলে বাংলার মানুষ আজ এই ধরনের কথা উচ্চারণ করতে সাহস পায়।

বিশ্বের ২য় বৃহত্তম গণহত্যার বিচার কেন হলো না, এমতাবস্থায় আজ আমাদের বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণহত্যা হলাকস্টের বিচার থেকে শিক্ষা নেয়া ছাড়া উপায় আছে? যে লোক, ২য় বৃহৎ গণহত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো, যার বাংলানাৎসীপার্টির মধ্যেই '৭১এর গণহত্যাকারীদের পুনর্বাসন, বাঙালি হত্যার বিচারের বিরুদ্ধে যে লোক ৫ম সংশোধনী এনে শহীদদের বিরুদ্ধে সকল আবর্জনাকে এমন পর্যায় তুলে আনতে পারে যখন, নিজামীর মতো আইকম্যানরা আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যায়! হায়! হায়! তারা মন্ত্রী হয়ে শহীদের খুনে রঞ্জিত পতাকা তুলে স্মৃতিসৌধে যায়। হায়! হায়! একজন মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকারকারী গডমাদার জিয়া, নিজামীকে পাশে রেখে, সাভারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেছে ১৩/১০/২০০১ সনে। এই খালেদা জিয়াই শহীদজননীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর মামলা করেছে ২৭শে মার্চ ১৯৯২। এই খালেদা জিয়াই ২১শে মার্চ ২০০২ সনে জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংক্রান্ত টাঙ্গানো আইন বাতিল এবং ছবি অপসারণের বিল পাশ করেছিলো। ঘোষণা করছে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙ্গানো– অপরাধ। করেছে বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের ঘোষণা ভিত্তিহীন। এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি আছে! আমাদের জাতির ঠিকানা সেইদিনই শেষ হয়ে গেছে।

যে লোক, যে দল, যার দল, বাংলা নাৎসীবাদকে বৈধ করতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ অবধি নানান অপরাধকে একপাত্রে সংমিশ্রণ করেছিলো, তাকে সমর্থন করা, তার দলে যোগ দেয়া মানেই, '৭১কে অস্বীকার। আমি প্রতিটি দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি, পশ্চিমের হলোকস্টের মতো '৭১কে আপনারা আন্ত র্জাতিক মর্যাদা দিন। আপনারা এই '৭৫এর ইয়াহিয়ার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। আপনাদেরই ভাই কতো মুক্তিযোদ্ধাকে সে, খুন করেছে! সাড়ে পাঁচ বছরে সে আরো কতো বধ্যভূমির সৃষ্টি করেছে! আনোয়ার কবিরের ডকুমেন্টারিতে সেই বধ্যভূমিগুলো দেখুন। জিয়া, ইয়াহিয়ার মতোই '৭৫এর বধ্যভূমির আর্কিটেক্ট। জিয়া, ইয়াহিয়ার চেয়ে দুর্ধষ। ইয়াহিয়া কবর খুড়েও বন্ধ করে দিলো। ভুট্টো দিলো ফাঁসির বদলে মুক্তি। ১৫ই আগস্টে জিয়া বললো, "রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছে তাতে কী"?

মনে রাখবেন, আপনারা যাকে বলেন মহান স্বাধীনতার ঘোষক, সেই লোক একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি। নির্বিচারে তার হাতে যেসব খুন হয়েছে, তার বীভৎস্য বিবরণ সহজেই পাওয়া যাবে- তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান ও ল্যাগেসি অব ব্লাড বই দুটিতে। জিয়া সম্পর্কে তার এক বন্ধুর বক্তব্য, "জিয়া একহাতে খেতে পারতো অন্যহাতে খুন।" দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড।] জিয়াভিকটিমদের পরিবার এখনো জীবিত, লুৎফা তাহের জীবিত, হাজার হাজার সেপাইদের পুত্র-কন্যা জীবিত। আমি '৭৭এর গণহত্যার ভিডিও দেখেছি। অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছি। শুধু একজন সাধারণ মানুষ খুন করলেই কি সে খুনি? সশস্ত্র বাহিনীতে এমন নিষ্ঠুর হত্যাকা , খুন নয়? খুনি নয়? হ্যালো! জেনারেল পিনোশের মাত্র ৩০০০ খুনের দায়ে বিচার হয়েছে। নরিয়েগাকে জীবন্ত অন্ধকূপে ফেলে দেয়া হয়েছে ৫০০০ মানুষ খুনের দায়ে। জিয়ার খুনের সংখ্যা ১০,০০০ বেশি। এছাড়াও গুপ্তহত্যা এবং অন্যান্য খুনের সংখ্যা আমার জানা নেই। খালেদা জিয়ার খুনের সংখ্যা ৩০ লক্ষ শহীদ এবং অসংখ্য বধ্যভূমি। এই দুই গডফাদার ও গডমাদার মিলে '৭১কে হত্যা করেছে। রাষ্ট্রের অর্থে গডমাদার গড়েছে '৭৫এর জিয়াতাজমহল। '৬৯ থেকে একজন রহস্য জিয়াউর রহমানের যে গুপ্ত চরিত্র আমি দেখেছি, ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। জিয়ার বহুমাত্রিক রূপ। ইতিহাসের অন্য কোন স্বৈরাচার একসঙ্গে এতো বহুমুখী অপরাধ করেনি। আমাদের দাবী সশস্ত্রবাহিনীতে তার হত্যাযজ্ঞের বিচার হতেই হবে। কর্নেল তাহের খুনের বিচার। খালেদ মোশাররফ ও অন্যান্যদেরও। জিয়া পরিবার, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে ফাঁসি দিয়ে দেশদ্রোহীদেরকে করেছে দেশপ্রেমিক। আমাদের মানুষেরা সব নষ্ট হয়ে গেছে। তারা প্রতিবাদহীন ও নীতিহীন হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীও জিয়া সিফিলিসে আক্রান্ত নাহলে, তাহের কেন রাষ্ট্রদ্রোহী? গোলাম কেন দেশপ্রেমিক? শহীদজননী কেন দেশদ্রোহীর কলঙ্ক মাথায় কবরে গেলো?

'৭১ এবং '৭৫ নিয়ে যতো বই লেখা হয়েছে, সেই বইগুলোকে পাঠ করা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের সামনে এখন '৭১এর চেয়ে বড়ো যুদ্ধ। বাংলাদেশ জুড়ে জিয়াবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে হেরে গেলে বংলাদেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাঙালি শেষ হয়ে যাবে। বাংলা হবে আফগান। সবাই হবে তালেবান। দেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম হবে। শরীয়া আইন চালু হবে। উন্মুক্ত মাঠে মানুষের কল্লা ছিন্ন করা হবে। নারীদেরকে বেত মারবে খোলা মাঠে। মানুষের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। নারীদের বেঁচে থাকার সব অধিকার শেষ হয়ে যাবে। জিয়াবাদ নাৎসীবাদের চেয়ে ভয়ংকর। জিয়াবাদ ইদি আমীনবাদের চেয়ে দুধর্ষ। এই পরিবারের মা এবং পিতা-পুত্রের ইতিহাস নাৎসীদের চেয়ে ভয়ংকর। '৭১এর ধর্ষিতা এবং বিধবা, তারা খালেদা জিয়ার সঙ্গে নিজামীদেরকে দেখে মরে যেতে

চায়। ঘৃণায় পান্না কায়সার টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। তার অভিযোগ, তার স্বামীর রক্তে রঞ্জিত পতাকা নিজামীর গাড়িতে। তার অভিযোগ জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বলতে লজ্জা হয়। তার অভিযোগ একজন ৬২ বছরের বিধবার সাজকাজ এবং ক্ষমতার লোভ দেখে লজ্জা হয়। তার অভিযোগ, স্বাধীন বাংলাদেশে এই অধঃপতন দেখার চেয়ে মৃত্যু ভালো। অনেকের অভিযোগ এই দৃশ্য দেখার চেয়ে আত্মাহত্যা ভালো। অনেক শহীদ পত্নীরা এর চেয়ে আত্মহত্যা করে জিয়ার যন্ত্রণামুক্ত হতে প্রস্তুত। আমার প্রশ্ন সেনাবাহিনীর কাছে, '৭৭এর গণহত্যারীর বিচার কি আপনারা করবেন? তথ্য-প্রমাণ আমি দেব। তবু আপনাদের ভাইয়ের খুনির বিচার করুন। বীর কর্নেল তাহের আপনাদের ভাই। বীর খালেদ মোশাররফ আপনাদের ভাই। বীর হুদা ও হায়দার আপনাদের ভাই। এই খুনির বিচার করে দেশকে ৭৫এর অভিশাপ মুক্ত করুন। অকাল বিধবা লুৎফা তাহেরের উপর যে অবিচার হয়েছে, আমি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করি। বাংলার এই বিধবাগুলো আপনাদেরই বোন, ভাবী। এখন সময় সত্য উদ্ঘাটনের, যে পরিবারটি, দেশদ্রোহী গোলামকে ভিসা দেয়, নাগরিকত্ব দেয়, সেই পরিবারেরই খালেদা জিয়া, স্বাধীনতার পুরো ৯ মাস কোথায় ছিলো? কার কাছে ছিলো? আমারা জানতে চাই।

জিয়া পরিবারের দুই উত্তরাধিকারী – হেরোইন এবং কোকেইন জিয়া, পুরো যুবসমাজের ত্রাস। আসুন আমরা '৭৫-এর পশু হত্যা করি। নাহলে আসুন সকলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করি!

হ্যালো! যে ব্যক্তি গণহত্যকারী পুনর্বাসন করে, মুক্তিযুদ্ধের স্থপতিকে খুন ও খুনের ষড়যন্ত্র করে, দেশে '৫৮এর চেয়ে দীর্ঘ সামরিক শাসন কায়েম করে, ৪ সেক্টর কমান্ডারদেরকে খুন করে, তাদের লাশ পচায়, মুক্তিযুদ্ধের সকল অপরাধীদের কার্যক্রমকে বৈধ ঘোষণা দেয়, গণহত্যকারীদেরকে দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, সে লোক মুক্তিযোদ্ধা বলে নিজেকে দাবী করলে তা, মিথ্যা। রাষ্ট্রের আইনকে অপব্যবহার করে '৭১এর গণহত্যাকারীদেরকে বৈধ করলো যে-সে কেন মুক্তিযোদ্ধা? তার নির্দেশেই কি সৃষ্টি হয়নি ৩১/১২/৭৫এর গেজেট? দালাল আইন রহিতকরণ?

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ কেন পাকবাহিনীর অপবাদে কলঙ্কিত, তার কারণ আমি বিশদভাবে বলতে চেষ্টা করেছি। আর কতো প্রমাণ দিলে, তার বিচার হবে? মাননীয় সেনাপ্রধানের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা।

৩১/১২/৭৫এ গেজেট জারি করে জিয়া কি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেনি- যখন মাতৃ জরায়ুতে সন্তানের শিশ্ন পৌছে যায়? ভাষার জন্য ক্ষমা করবেন।

প্রথম খণ্ড

জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা নয়–১৭৮ টি কারণ

(আসুন আমরা '৭৫-এর পশু হত্যা করি)

১. নিশ্চয়ই জিয়া যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তি দিতে ৩১শে ডিসেম্বর '৭৫এ বিশেষ গেজেট জারি করে যুদ্ধাপরাধীদেরকে বৈধ করেছিলো। নিশ্চয়ই জিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়ে বাংলা নাৎসীদেরকে বৈধ করেছিলো। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রের আইন, বাতিল করবে না। একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা গণহত্যাকারীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করবে না। [দ্রঃ গেজেট, ৩য় খ]। জিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থ রক্ষা করেছিলো। জিয়া রাষ্ট্রকে করেছিলো নিজের প্রতিপক্ষ। হলোকস্ট বিশেষজ্ঞরা জিয়ার ৩১শে ডিসেম্বর '৭৫এর যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজবন্দীর সম্মানে মুক্তির এহেন হীন মনোবৃত্তির কর্মকাণ্ডকে কী বলতো? ইহুদি নয় বলেই, বাঙালির জীবনের কি মূল্য নেই? সামরিক শাসন মুক্ত হতে যে সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের সাড়ে তিন বছরের মাথায়, নিজেকে সামরিক শাসক কোন মুক্তিযোদ্ধাই করবে না। ৭ই নভেম্বর-এর ক্যু'র পর প্রদত্ত ভাষণে জিয়া জাতির কাছে নিজেকে প্রধান সেনাপতি ও সামরিক শাসক পরিচয়ে বাণী দেয়। জিয়া '৭২ থেকে '৮১ পর্যন্ত একা ১১টি রাষ্ট্রীয় পদ দখল করে। '৭৫ পরবর্তী জিয়ার পদবীর ফিরিস্তি– ১০দিনের মাথায় সেনাপতি। আড়াই মাসের মাথায় সেনাপতি ও উপসামরিক প্রশাসক। ১৪ মাসে প্রধান সামরিক শাসক ও সেনাপতি। ২০ মাসের মাথায় প্রধান সেনাপ্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি। ...এতো পরিচয় আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? '৭৫এর দালাল আইন বাতিল করে জিয়া নিজেকে প্রমাণ করেছে, দেশের ১নং দালাল সে নিজে। জিয়া করেছে যা কোন মুক্তিযোদ্ধাই করবে না। '৭১ কে হত্যা।

২. '৭১এর একজন বীরউত্তম কখনো বৈধ রাষ্ট্রপতির হত্যাকে লুফে নিয়ে অবৈধ রাষ্ট্রপতির আনুগত্য স্বীকার করবে না। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ৫২-৫৩]। (জিয়ার বাড়িতে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ফারুক-রশিদ, ওসমানী ও জিয়ার সম্পর্কে অশোক রায়নার বই, ইনসাইড র‍্য দ্যা স্টোরি অফ ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস)।

৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা বরং ২৪/৮/৭৫এ সেনাপতির পদাধিকার বলে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির খুনি, মুক্তিযুদ্ধে তার সুপ্রীম কমান্ডার শেখ মুজিবের হত্যাকারী অবৈধ রাষ্ট্রপতিসহ সামরিক-বেসামরিক সকল খুনিদেরকে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করবে। একজন উপসেনাপতি, পরবর্তীতে সেনাপতি, বৈধ রাষ্ট্রপতির খুনি মোশতাকসহ সকল খুনিদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করবে। যাদের ব্যাভিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ, আইয়ুব-ইয়াহিয়া যদি ১২ বছর সামরিক শাসন দিয়েছিলো, জিয়া দিয়েছে আরো দীর্ঘ, জিয়া-এরশাদ বছর। সুতরাং কেন বাংলাদেশ? কেন মুক্তিযুদ্ধ? তাহলে পাকিস্তান কি অন্যায় করেছিলো? ইয়াহিয়া এবং জিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? এসব রেকর্ড নিশ্চয়ই কোন মুক্তিযোদ্ধার নয়।

৪. একজন মুক্তিযোদ্ধা তার উপসেনাপ্রধানের পদাধিকার বলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের গ্রেফতারের বদলে আলোচনায় বসবে না, পাল্টা অভ্যুত্থান থেকে বিরত থাকবে না। রক্তাক্ত অধ্যায় এবং তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান পুরো বই পড়লে ৭ই নভেম্বরকে ঘিরে এক দুধর্ষ এবং ষড়যন্ত্রবাদী জিয়ার আইএসআই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। জিয়া, আইএসআই না হলে, সাড়ে পাঁচ বছরে যে ল্যাগেসি রেখেছে, সম্ভব নয়।

৫. একজন উপসেনাপতি মুক্তিযোদ্ধা কখনো ১৫/৮/৭৫ তারিখে বিদ্রোহের বদলে, বৈধ এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের খুনিদের অস্ত্র যোগানের কাজে লিপ্ত হবে না। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, চ্যাপ্টার ২, ৩]।

৬. একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে তার সুপ্রীম কমান্ডারের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র, কয়েকজন প্রায় নিরস্ত্র খুনির বিরুদ্ধে তার বাসভবন থেকে কয়েক পা দূরে অবস্থিত ৪ হাজার সৈন্যের ৪৬ বিগ্রেডকে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ক্যু'র নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো ৪৬ ব্রিগেডের সৈন্য মুভ করানোর বিরুদ্ধে বাধা দেবে না। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, শফিউল্লাহর জবানবন্দী, পৃঃ ৮৯-৯৫]। "একপর্যায়ে ডেপুটি চিফ জিয়া বলিল, খালেদ মোশাররফকে আর বাহিরে যাইতে দিও না, কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট গেট ইন..., কর্নেল তাহের একদিন আমার বাসায় আসিয়া বলে, স্যার এতোদিন তো চিফ অফ আর্মি থাকলেন, এখন এই পদটা জিয়াউর রহমানের জন্য ছাড়িয়া দেন... এখানে আসিয়া দেখেন জেনারেল জিয়া ইতিমধ্যে চিফ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করিতেছেন।" জিয়ার জন্য যা সেনাকোড এবং ১৫ই আগস্ট সে তা ভঙ্গ করেছিলো। কিন্তু সে ২৫শে মার্চ রাতে সেনাকোড ভঙ্গ করে সোয়াত জাহাজে যেতে অস্বীকার করেনি সামান্য ডক শ্রমিক যখন বিদ্রোহ করলো, জিয়া কেন সেই রাতে সোয়াতে যাবে? একজন সামান্য ডকশ্রমিক যদি বোঝে, কমলা না কামান, মাল্টা না মেশিনগান, একজন মেজর হয়ে সে বুঝতে পালো না? হ্যালো!

৭. ১৫ই আগস্টে উপসেনাপ্রধান এবং ২৪শে আগস্টে সেনাপ্রধানের পদাধিকার বলে একজন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুক্তিযোদ্ধা হলে বৈধ রাষ্ট্রপতির হত্যা মেনে নেবে না। ইনডেমনিটিকে বাতিল করবে। জেলহত্যা ও শেখ হত্যাকা রে বিচার করবে। পদাধিকারবলে খুনিদেরকে গ্রেফতার করবে। কুখ্যাত গোলামের ভিসা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করবে। ২৫শে মার্চ রাতে জিয়া, পাকিস্তানিদের সব সেনাকোড মান্য করেছিলো। সে সোয়াত জাহাজে গণহত্যার জন্য আনা অস্ত্র খালাসে তৎপর ছিলো। জিয়া সেদিন সোয়াতে না গিয়ে সঙ্গের দুই পাকিস্তানিকে খুন করে বিদ্রোহ করতে পারতো। করেনি। বরং হাতেনাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত সে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলো।

৮. সত্যিকারের একজন মুক্তিযোদ্ধা, অবৈধ রাষ্ট্রপতির আনুগত্য স্বীকার করে দেশদ্রোহীর পরিচয় রাখবে না। বরং প্রথম সুযোগেই বৈধ রাষ্ট্রপতিকে হত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে। ষড়যন্ত্রকারী খুনিদেরকে গ্রেফতার করে '৭১এর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণ দেবে। ১০ বছর ধরে জিয়া নিজেকে বারবার রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ বলে প্রমাণ করেছে। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে, মোশতাক মন্ত্রীসভায় জিয়ার ছবি, পৃঃ ৮৭]। ১০ বছর ধরে জিয়া, তার সকল কর্মকাণ্ড প্রমাণ করেছে সে, আইএসআই । বারবার সে পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করেছে, যার জলজ্যান্ত প্রমাণ– ২৫/৩/৭১।

৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনোই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের শক্তির স্বার্থে বারবার সংবিধান সংশোধন করবে না। যুদ্ধাপরাধীদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবে না। এমনকি বিশ্বাসঘাতক মোশতাক পর্যন্ত যে কাজ করেনি। জার্মানরা করলে পুরো ইউরোপ জ্বলে যেতো। তার হাতে ১৯৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধী আইন বাতিল। ১৯৭৬ সালে অর্ডার নং-৩ জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি বাতিল। ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগ। ১৯৭৬এর ১৮ই জানুয়ারি দালালদের নাগরিকত্ব দানের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ। ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাওয়া গোলাম আজম গংদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল। ৮নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ, সমাজতন্ত্র বাদ, বাঙালির বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু করে বাংলাদেশে কায়েদী-দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। [দ্রঃ একাত্তুরের যুদ্ধাপরাধ ৭৭ ও ৭৮ পৃঃ। দ্রঃ সংবিধান ও সংশোধনী ৮ম পৃষ্ঠা ৫ম সংশোধনী।] ৫ম সংশোধনীর বিবরণ– "১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে পর ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকার যতো ফরমান, যতো আইন, বিধান ইত্যাদি জারি করে, কিছু বৈধ করে নেওয়ার জন্য শাহ আজিজুর রহমান, জাতীয় সংসদের সংবিধান বিল (৫ম সংশোধনী) ১৯৭৯ শিরোনামে একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন, ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৯। জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ এটি গৃহিত হবার পর, ৬ই এপ্রিল ১৯৭৯, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ৫ম সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার শুরু বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম সংযুক্ত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষার পরিবর্তে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা, ও পূর্ণ বিশ্বাস। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারকে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা আনা হয়। মুক্তি সংগ্রাম শব্দের পরিবর্তে স্বাধীনতার সংগ্রাম করা হয়। ১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বৈধ করে নেয়া হয়।" এই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সামান্যতম চেতনা বিবর্জিত বিষাক্ত একজন জিয়ার বিশ্বাসঘাতক ৫ম সংশোধনী। [দ্রঃ সংবিধান ও সংশোধনী পুস্তিকা]। পশু জিয়া, মুক্তিযোদ্ধা নয়, এভাবেই নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে '৭৫এর পশু ইয়াহিয়া। '৭১এর মতো, '৭৭এ সেকি দেশজুড়ে সৃষ্টি করেনি– বধ্যভূমি? এবার '৭৫এর পশু হত্যা করা জরুরি।

১০. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের শক্তির জন্য সাংবিধানিক আইনে এমন কোন সংশোধন আনবে না, যা কুখ্যাত গোলামদেরকে পুনর্বাসন করবে, নাগরিকত্ব দেবে, রাজনীতি করার সুযোগ ও ভোটাধিকার দেবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে। জার্মানরা যা চিন্তাও করবে না। যে কাজ নিকৃষ্ট লাইবেরিয়া পর্যন্ত করেনি। জিয়া, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাকিস্তানি পক্ষের প্রসিকিউটরকে পর্যন্ত মন্ত্রী করেছিলো।

১১. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো '৭১এর গণহত্যাকারীদের স্বার্থে গেজেট প্রকাশ করবে না, যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। যারা '৭৩এর ১৮ই এপ্রিলে নিষিদ্ধ হয়েছিলো, যে সংশোধনের মাধ্যমে '৭১এর খুনি, ধর্ষক এবং অগ্নিসংযোগকারীরা রাজবন্দীর সম্মান পাবে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে সক্রিয় রাজনীতি করবে এবং '৭১এর পক্ষের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, ভোটাধিকার পাবে, নির্বাচনে যাবে, প্রধানমন্ত্রী হবে..., একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কখনো খুনিদের পক্ষে সংবিধান সংস্কার করবে না। যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা করবে না। জিয়ার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ একজন মক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং আন্তর্জাতিক লবিস্ট, জাতিসংঘে প্রেরিত ৫ ঘাতকদালালের এক লবিস্ট। চরম যুদ্ধাপরাধী মওদুদীবাদী মাহমুদ আলীর, এক মতাদর্শ। [দ্রঃ '৭১এর ঘাতক-দালাল]। '৭১এ শাহ আজিজের বক্তৃতার মধ্যে "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাধীনতা দেয়ার চেষ্টা করছেন।" এরপরেও তাকে প্রধানমন্ত্রী! তাহলে ভুট্টো কি দোষ করেছিলো জিয়ার পুনর্বাসিত বাংলা নাৎসীদের অতীত, যাদের অনেকেই জিয়া পরিবারের '৭৯, '৯১ ও ২০০১এর মন্ত্রীসভায়, দলে। অধিকাংশই আপনার আমার আশে পাশে। যে দিকেই তাকাই রাজাকার। সুতরাং এই মুক্তিযুদ্ধের কি প্রয়োজন? এই বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়াবাদী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ? বোরম্যানকে জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী দেখার জন্য? ১৯৭৩এ বঙ্গবন্ধু যে ৪৪জনের নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, গোলাম আজম, মাহমুদ আলী...। জিয়া এইসব মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে, ৫ম সংশোধনী এবং সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলো [দ্রঃ দৈনিক পূর্বদেশ, ৬/৪/৭১।] বাঙালি নিধনের জন্য রাও ফরমান আলীর সঙ্গে গোলাম আজম, হামিদুল হক, এবং নুরুল আমিনের বৈঠকের ছবি অস্বীকার করে এদেরকে বৈধ করা? ইউরোপীয়ানরা কি নাৎসীদের এই ছবিগুলো অস্বীকার করবে? এই মুক্তিযুদ্ধ আর সমকামের মধ্যে তফাৎ কোথায়? ১৯৯৩ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে খালেদার পুলিশ বাহিনী আক্রমন করেছিলো মুক্তিযুদ্ধের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও তার কর্মীদেরকে। শহীদ জননীকে লাঠিপেটা এবং রাষ্ট্রদ্রোহির অপবাদসহ কবর? গডমাদার খালেদার জিয়ার এ কোন রূপ? জননীর অপরাধ, তিনি বাংলার গোয়েবলস, শান্তিবাহিনীর প্রধান, খুনি, চরম

মওদুদীবাদী, ঘাতক গোলামআজমের নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। খালেদার নির্দেশে, তার পুলিশবাহিনী একজন শহীদ জননীর উপর চড়াও হয়েছিলো। জাহানার ইমামকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো। অন্যান্য অনেককেও। গোলামের পক্ষে, একজন শহীদ জননীর বিরুদ্ধে পুলিশী আক্রমণ! এই খালেদা কে? আমার প্রশ্ন, পুরো বাঙালি জাতির বিবেকের কাছে। শহীদ জননী যদি গোলামের বিচার করে অন্যায় করে থাকেন, তাহলে পুরো মুক্তিযুদ্ধ ভুল। '৭১ এবং সমকাম সমান। এবং বেগম জিয়া সেই কথাই প্রমাণ করেছিলো যে, '৭১ ভুল। এরপরেও জিয়া– মুক্তিযোদ্ধা? সেনাপ্রধানের কাছে আমার বিনীত চরমপত্র– জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা? শুধু আমি নই, আমার এবং আপনার সন্তানও জানতে চায়। জিয়া কি সেনাবাহিনীতে গণহত্যা করে, সেনাবাহিনীকে করেনি– পাকবাহিনী? সেকি তাহের হত্যা করে সেনাবাহিনীকে করেনি– খুনিবাহিনী? সেকি গর্বিত দেশের সেনা অফিসারদেরকে করেনি– টিক্কাখান, রাওফরমান আলী...? জিয়ার সকল গুপ্ত হত্যার বিচার করে কলঙ্ক মুক্ত হোন।

১২. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো সেনাপতি হয়ে একজন বৈধ সেনাপতির খুনি, অবৈধ রাষ্টপতিকে নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করবে না। তার অধীনে পদোন্নতি নেবে না। জিয়া, মোশতাকের অধীনে উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান হলো, শেখ হত্যার ১০ দিনের মাথায়। ৮৪ দিনের দিন মোশতাককে তাড়িয়ে সামরিক শাসক এবং সেনাপ্রধান। '৭৭এ সেনাপ্রধান ও প্রধান সামরিক শাসক। '৭৮এ প্রধান সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপতিসহ তিন মন্ত্রণালয়ের প্রধান। কেন হলো? কিভাবে হলো? [তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পুরো বই]। জিয়ার সকল কর্মকান্ড ৭১-৮১, নিশ্চিত করেছে সে একজন চরম আইএসআই। প্রমাণ করেছে '৭১এর ২৪–২৭ মার্চের ৪ দিনে তার ১০ বছরের রাষ্ট্রদ্রোহীতার রোডম্যাপ। রণাঙ্গণের আইএসআই জিয়া খুব স্পষ্ট। তাকে চিনতে ভুল করছে বাংলারমানুষ– মুক্তিযোদ্ধার বিভ্রান্তিতে।

১৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুক্তিযুদ্ধের সুপ্রীম কমান্ডার, রাষ্ট্রপতির খুনিদেরকে সামনে পেয়ে গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাকবে না। সেই খুনিদেরকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে নির্বাসনের নামে চাকরি দিয়ে কলঙ্ক সৃষ্টি করবে না। দেশের দূতাবাসকে নিজের অপরাধ ঢাকতে ব্যবহার করবে না। সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কিছু উচ্চাভিলাষীদেরকে উস্কানি দিয়ে সাজানো ৭ই নভেম্বর ঘটাবে না। [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকা ।] দেশ নয় ক্ষমতাই যার একমাত্র অর্জন। এই জিয়া কখনো মুক্তিযোদ্ধা নয়। ৪৬ ব্রিগেডকে অপব্যবহার করে সে তার ষড়যন্ত্রের রোডম্যাপ নিশ্চিত করেছিলো। পরবর্তীতে একা ভোগ করেছিলো– খুনের ফসল।

১৪. একজন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কখনো বৈধ রাষ্ট্রপতিকে হত্যার খবর শুনে, উপসেনাপ্রধান সত্ত্বেও কোনরকম অফেন্সেই না গিয়ে বরং খুনিদের নিয়ে ব্যস্ত দিন

কাটাবে না। অস্ত্র যোগান দেবে না। যা একজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে সম্ভব নয়। রণাঙ্গন থেকেই জিয়া খুনিদের সঙ্গে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়]। '৭২ এই শফিউল্লাহকে পদচ্যুতির ফাঁদ পেতেছিলো। '৭৩এর সেনা বিশৃংখলা, জিয়ার ক্ষমতার অত্যন্ত অনৈতিক এবং অবৈধ ও বিবেকহীন লিপ্সা, উল্লেখিত বইগুলোর প্রতিটি পাতায় যা সম্ভব, শুধু একজন আইএসআই-এর পক্ষে। জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে অপসারণের জন্য '৭২ থেকে ঘোর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিলো। জিয়া '৭১এ নিজেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে 'রাষ্ট্রপতি' ঘোষণা করেছিলো। ইতিহাসের মহা স্বৈরাচার সে। পাকিস্তান কখনোই পূর্ব বাংলা ছেড়ে যায়নি। তারা জিয়ার হাত ধরে ফিরে এসেছিলো। [দ্রঃ জিয়ার দুই ঘোষণা]। হ্যালো!

১৫. ১৫ই আগস্ট '৭৫এ একজন মুক্তিযোদ্ধা বীরউত্তম, মীরজাফর সজ্জিত ৪৬ বিগ্রেডকে নীরব দেখেও বিদ্রোহ না করে নীরব থাকবে না। উল্টো আনুগত্য স্বীকার করে ১০ দিনের মাথায় খুনি মোশতাকের সেনাপতি হয়েছিলো, শফিউল্লাহর বিরুদ্ধে ক্যু করে। [দ্রঃ শফিউল্লাহর জবানবন্দী, তিনটি সেনা অভ্যুত্থান]। শাফায়েত জামিলের মুখে হত্যা সংবাদ শুনে, জিয়ার মন্তব্য, "রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছে। তাতে কী? উপ-রাষ্ট্রপতি তো আছে।" জিয়া এবং তার সঙ্গে সেদিন আরো যারা ছিলো, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে খুনের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে জিয়ার বলদ– তাহের, রশিদ, ফারুক, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল, কর্নেল ওসমানী, তাহের ঠাকুর...। জিয়া সব বিশ্বাসঘাতকদের ধোকা মেরে, খুনের একক সুফলভোগী। ক্ষমতার জুতা কামড়াকামিড়তে সৃষ্টি হলো তিন এবং সাত নভেম্বর। অণ্ডকোষবিহীন খুনি শাফায়েত জামিল, খালেদ মোশাররফ এবং জিয়া এক জুতো, কয়েকটি কুকুর। ঘানির ষাড় কর্নেল তাহের, বিদেয় হলো ফাঁসির মঞ্চে, ঘৃণায়, ক্ষোভে, বিদ্রোহে। জিয়া, বঙ্গবন্ধু হত্যার একমাত্র সুফলভোগী। তার চেয়ে বড়ো সুফলভোগী তার আইএসআই স্ত্রী গডমাদার খালেদা। খালেদা জিয়া পরবর্তীতে তার চেয়ে দক্ষ আইএসআই।

১৬. '৭৭ সনে সশস্ত্র বাহিনীতে নৃশংস গণহত্যার জঘন্য দৃষ্টান্ত রেখে জিয়া নিজেকে প্রমাণ করেছিলো '৭৭এর ইয়াহিয়া সে। ইয়াহিয়ার পর, জিয়ার বধ্যভূমিগুলো এদেশের মাটির নতুন কলঙ্ক।

১৭. একজন মুক্তিযোদ্ধা, বৈধ রাষ্ট্রপতি হত্যার পরেও অফেন্সে না গিয়ে, মীরকাশেমের মতো রণক্ষেত্রে নীরব থাকবে। যা সম্ভব যখন সে '৭১এর পাকিস্তানবাদী, মওদুদীবাদী। ভয়ংকর মওদুদী যে পাকিস্তান রক্ষার্থে '৭১এ সবরকম দুষ্কর্ম সম্ভব করেছিলো, গণহত্যার নেতৃত্ব দিয়েছিলো। '৭১এর সংগ্রাম পত্রিকাতে গোলাম এবং মওদুদীর ছবিগুলো এখনো '৭১এর আর্কাইভে। যারাই '৭১এর কোলাবরেটরদের এইসব ছবি এবং সংবাদ অস্বীকার করেছে, তারাই রাষ্ট্রদ্রোহী। ১০ বছর ধরে একের পর এক ষড়যন্ত্রবাদী জিয়া সেই সত্যই প্রমাণ করেছিলো, সেও একজন দালাল, ১নং দালাল। ১৫ই আগস্ট জিয়া রণক্ষেত্রে মীরকাশেমের মতো অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলো।

নিশ্চয়ই জিয়া ১৫ই আগস্ট অস্ত্র ফেলে বিশ্বাসঘাতকের মতো মন্তব্য করেছিলো– "প্রেসিডেন্ট মরেছে, তাকে কী? ভাইস তো আছে।" জিয়া '৭১এর সব 'সংগ্রাম' পত্রিকা অস্বীকার করে খুনি মান্নানদেরকে বৈধ করেছিলো। ৩০ লক্ষ শহীদের খুনিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা? এ কোন মুক্তিযোদ্ধা জিয়া? আমরা কি পাগল? না– শিশু? হ্যালো!

১৮. কোন ধরনের মুক্তিযোদ্ধার জন্য ১৫ই আগস্ট তারিখের সকাল ৭টায় ক্লিন সেভ হয়ে ইউনিফর্ম পড়ে সেনাপতির ভবনে গমন, কোনরকম প্রতিক্রিয়াহীন, সেনাপতিকে স্টেনগানের মুখে জীপে তুলে রেডিওতে গমন, খুনিদের জীপের পেছন পেছন নিজের জীপে চড়ে রেডিওতে গমন, সম্ভব? [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন]। [বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী–বিশেষ করে ৪২, ৪৪, ৪৭ নং সাক্ষী, খুনি ফারুকের জবানবন্দী]। সেনাবাহিনীর কাছে এই সব তথ্য ব্যাখ্যা চাওয়ার দায়িত্ব প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন মানুষের। জানিনা বা ঠিক নয়, বললে চলবে না। নতুন প্রজন্মের প্রতিটি ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান, ইহুদি হত্যার ইতিহাস জানে। কারণ তা পাঠ্য। বাংলা হলোকস্ট মানুষ জানে না। কেন নয়, জানে, জিয়া। খুনি জিয়া পুরো গণহত্যাকেই সফলভাবে দেশে-বিদেশে নিভিয়ে দিয়েছিলো। সে গণহত্যার সব দলিলপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকও বিকৃত করেছিলো। জাতিরজনকের নাম সংবিধান থেকে মুছে ফেলেছিলো। বঙ্গবন্ধুর ছবি নিষিদ্ধ করেছিলো। '৭১এর গণহত্যাকে বিক্রি এবং বিকৃত। জিয়া পুরো '৭১কে হত্যা করেছে। সে সংবিধানকে ধর্মনিরপেক্ষ থেকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। আজ এর জবাব দেবে সেনাবাহিনী। কারণ, জিয়া তাদের প্রতিষ্ঠানের মানুষ। বাংলার মানুষ, সেনাবাহিনীর কাছে '৭৭এর গণহত্যার বিচার চায়।

১৯. খুনি ডালিমের ফাঁকা ট্যাংক জালিয়াতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের ব্যবস্থা করে সেনাপ্রধানকে রক্ষা এবং খুনিদেরকে গ্রেফতার না করা, শুধু একজন ঘোর পাকিস্তানপন্থীর পক্ষেই সম্ভব, যা সাড়ে তিন বছরের একটি নব্য স্বাধীন দেশের সেক্টর কমান্ডারের জন্য কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধ আমি দেখেছি। আমি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোনটা আইএসআই, কোনটা নয়। মুক্তিযুদ্ধে তার সুপ্রীম কমান্ডারকে হত্যার পর এই নীরবতা শুধু একজন মীরকাশেমের পক্ষেই সম্ভব, যে, ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আগেভাগে সম্রাট হত্যার চুক্তি করেছিলো। আর সময়মত রণক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে নিরবে দাড়িয়ে ছিলো। অজস্র ফ্যাক্টস এ ডকুমেন্টস থেকে প্রমাণিত যে, মীরকাশেমের মতো জিয়াও বঙ্গবন্ধু হত্যা, '৭১-এই ক্লাইভদের সঙ্গে নিশ্চিত করেছিলো। জিয়া, ২৫০ বছর পর, নতুন ক্লাইভের মীরকাশিম। '৭৪এ সেকি বোস্টার রশিদ-ফারুক-ওসমানীর সঙ্গে গোপনে বঙ্গবন্ধু খুনের ষড়যন্ত্র করেনি? 'র‍্য'-এরবইয়ের তথ্যপ্রমাণ, কে করবে অস্বীকার? আমার অনুরোধ, বইপত্র ঘেটে দেখুন, বলুন, লিখুন। বাংলার একজন মীরকাশিমকে চিহ্নিত করুন। [ইনসাইড র‍্য, ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস]। জিয়ার গুপ্ত হত্যার হিসেব চাই। দেশে সামরিক শাসনের ব্যাখ্যা চাই। সংবিধান পরিবর্তনের জবাবদিহিতা চাই।

২০. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের মুখোমুখি হলে, অফেন্স না নীরব করে থাকবে না। হত্যার ৯ দিনের দিন ৪ জাতীয় নেতাকে কারাগারে প্রক্ষেপণ, মানিবে না। ১০ দিনের মাথায় সেনাপতিকে অপসারণ করে নিজে সেনাপতি হবে না। বরং সে সশস্ত্র প্রতিবাদে অভ্যুত্থান করবে, কারণ ওই ৪ জাতীয় নেতা মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পরিচালক। [দ্রঃ খুনি ফারুকের ইন্টারভিউ ২রা আগস্ট ১৯৭৬; এই ভিডিও আমার সংগ্রহে রয়েছে]। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান থেকে দু'টি ইন্টারভিউ – ১৯৫ থেকে ২০৭ পৃষ্ঠা]। এই ইন্টারভিউতে ফারুক এবং রশিদ স্পষ্ট করে দিয়েছে একজন বাংলাদেশী ইয়াহিয়ার মুখোশ। জিয়া শেখ হত্যার একমাত্র সুবিধাভোগী। নতুন ক্লাইভের রিক্রুট মীরকাশিম জিয়া, একের মধ্যে দুই। হিটলার এবং মীরকাশিম। জিয়ার মধ্যে দুই দানব, এক বাক্সে বন্দী। জিয়ার চেয়ে বড়ো সুফলভোগী, খালেদা। খালেদা জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের মুখে লাথি মেরে, নিজামীকে নিয়ে সাভার গণকবরে গেছে। তারা দু'জনেই তাহের ও গোলাম আজম মত এবং শহীদ জননী ও গোলাম আজমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, শহীদ জননীকে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং গণহত্যকারীকে বৈধ করে।

২১. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুজিব নগরের ৪ জাতীয় নেতা, যাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ, যাদের অধীনে সো-কলড ১নং সেক্টর কমান্ডার জিয়া, এতো পরিষ্কারভাবে তাদেরকে জেলহাজতে প্রেরণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে না যাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা, সেই মুজিব নগর সরকারের খুনি মোশতাককে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করবে। সাজানো কুখ্যাত ৭ই নভেম্বর ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করবে না। শাফায়েত জামিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়ে দেশ জুড়ে ৭ই নভেম্বরের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে না। দেশকে ফের আইয়ুবের শাসনে ফিরিয়ে দেবে না। একের পর এক, ক্ষমতা দখল করে পুরো স্বাধীনতাকেই ধ্বংস করবে না। সংবিধান সন্ত্রাসী করে জিয়া স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে পর্যায়ক্রমে বিনাশ করেছে। জিয়া, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতার খুনিদেরকে দূতাবাসে চাকরি দিয়ে জাতির ভাবমূর্তিতে কুঠার মেরেছে। জিয়া, রাষ্ট্রদ্রোহীর পরিচয় রেখেছে, নাগরিক আইন সংশোধন করে। ৫ম সংশোধনী করে। খুনিদেরকে পুরস্কৃত করে। সংবিধানকে মৌলবাদী খৎনা করে। যুদ্ধাপরাধী এবং আইএসআই, দুই গ্রুপকেই মন্ত্রীত্ব দিয়ে। দেশজুড়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। এ কোন মুক্তিযোদ্ধা?

২২. একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুজিব হত্যার পর, ২৩শে আগস্টে ৪ জাতীয় নেতাকে কারাগারে প্রক্ষেপণ মানবে না, ২৪ তারিখে সেনাপ্রধান হতে ক্যু করবে না। জিয়া ইতিহাসের সব স্বৈরাচারকে অতিক্রম করেছিলো। '৭৭এ তার সর্বজনবিদিত গণহত্যা। তার হাতেই ইয়াহিয়ার মতো মুক্তিযোদ্ধা নিধন কর্মকান্ড '৭৬ থেকে তুঙ্গে ওঠে। '৭৬–'৮১এর ভিকটিমদের পরিবার এখনো জীবিত। লুৎফা তাহের বলবে তার স্বামীর খুনী দুর্ধর্ষ জিয়ার কথা। বলবে, গণবাহিনীতে ১০,০০০ খুনের ভিকটিম পরিবার। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড]। বিচার এক জিনিস, খুন আরেক জিনিস। জিয়া, '৭৫এর

অন্যান্য খুন শেষে, '৭৬ থেকে শুরু করেছিলো একের পর এক মুক্তিযোদ্ধা খুনের ল্যাগেসি অব ব্লাড। "ওরা মানুষ হত্যা করেছে, আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি।" জিয়া '৭৫এর পশু। কোন মুক্তিযোদ্ধা, একের পর এক সেক্টর কমান্ডার খুনে লিপ্ত হবে? তাদের লাশ গলিয়ে পচিয়ে পুঁতে ফেলবে!? সেনাবাহিনীর কাছে আমার প্রশ্ন, মুক্তিযোদ্ধা খুন কখন রাষ্ট্রসম্মত? খালেদ-তাহের খুন কি রাষ্ট্রসম্মত? তাদের লাশ কোথায়? তারা কি খুনি? ডাকাত? জবাব দিন। কেন নয়? দিতেই হবে।

২৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো বিষাক্ত ইনডেমনিটির মতো বিষাক্ত অপরাধকে আইন করবে না। মোশতাককে গ্রেফতার করবে [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষণা, বিজয়, অতঃপর]। ক্রাইম এ্যাগেইনস্ট শেখ এ আদার্স এর ইনডেমনিটিকে বৈধ করতে ৫ম সংশোধনীর আশ্রয় নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধকে নিভিয়ে দিলো জিয়া। জিয়া, স্বাধীনতাকে অবৈধ-অশ্লীল করে তুলেছিলো ইনডেমনিটির অন্যায় এবং অপরাধের দূর্গ গড়ে। জিয়া, সংবিধানকে পর্যন্ত মুসলমানী দিয়ে মৌলবাদের দরজা খুলে দিয়েছে। জিয়া– সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহা-স্বৈরাচার।

২৪. এতো রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কখনো বৈধ সেনাপ্রধানকে পদচ্যুতির জন্য জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে খুন ও অভ্যুত্থানের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা তার ৪ জাতীয় নেতাকে জেলে পাঠিয়েই উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান হতে ষড়যন্ত্রবাদীর ইতিহাস হবে না। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, শফিউল্লাহর জবানবন্দী]। '৭২ থেকেই জিয়া সেনাবাহিনীকে তার ষড়যন্ত্র দিয়ে কলুষিত করতে শুরু করেছিলো একের পর এক। বিশেষ করে "ল্যাগেসি অব ব্লাড" বইটিতে ইতিহাসের একজন চূড়ান্ত হিংস্র এবং নিষ্ঠুরতম জিয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে, যার টার্গেট, সেনাবিশৃংখলা। ষড়যন্ত্র এবং নৈরাজ্যবাদ। এই বইটিকে রিসার্চ করলে পুরো বাংলাদেশের চিত্রটি পরিবর্তন হয়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধার বদলে রাষ্ট্রদ্রোহী জিয়াবাদের বিরুদ্ধে ফের '৬৯এর গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজন দেখা দেবে। জিয়া উদ্যান থেকে মহা-রাষ্ট্রদ্রোহীর কবরটি তুলে নিয়ে '৬৯এর অভ্যুত্থান করবে বাংলার মানুষ। [দ্রঃ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ২০৫]। শেষের বইটিতে মহা-স্বৈরাচার জিয়ার নাৎসীবাদ, পাতায় পাতায়। বাংলার হিন্দুরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের এই মওদুদীর বিরুদ্ধে মহা-ঘুমে আচ্ছন্ন। সেনাবাহিনী এই মহাখুনিকে বুকে আগলে রেখেছে। তারা খুনি জিয়াকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

২৫. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনোই ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ডালিম এবং অন্যান্য খুনিদের সঙ্গে ৪৬ ব্রিগেড অফিস, বঙ্গভবন এবং সেনাভবনে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধার আচরণ না করে খুনির আচরণ করবে না। খুনিদেরকে অস্ত্র দেবে না। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, চ্যাপ্টার ৩, ৪, ৫ ও ৬ এবং প্রসঙ্গ কথা]। যারাই গিয়েছিলো, তারা কেউ মুক্তিযোদ্ধা নয়। বরং এরা জিয়ার ঘানির ষাড়। এবং এদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই জিয়ার

হাতে পরবর্তীতে খুন বা বনবাস হয়ে গেছে। ফলে খুনিদের মধ্যে একা জিয়াই মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি খুনের একক সুফলভোগী। জিয়া, কাউকে ক্ষমা করেনি। না বঙ্গবন্ধু না তার খুনি। জিয়া, ইনডেমনিটির মতো অপরাধের দৃষ্টান্ত।

২৬. যেমন ৩১শে ডিসেম্বর '৭৫এর গেজেট জারি করে সব বাংলা নাৎসীদেরকে খালাস করে দিলো জিয়া। ৭ এবং ২৩শে নভেম্বরের বক্তৃতায় তাদেরকে রাজবন্দী সম্মানে অভিনন্দন জানালো পাগলা কুকুর জিয়া। মনে রাখা দরকার, '৭১এর খুনিরা সব পাকবাহিনী নয়। অধিকাংশ্ই তারা কোলাবেরেটর, পাকবাহিনী যাদেরকে সৃষ্টি ও কমিশন করেছিলো তাদের গণহত্যার কাজ এগিয়ে নিতে। [দ্রঃ '৭১এর ঘাতক-দালালেরা কে কোথায়, চ্যাপ্টার– ৫, ৬, ৭, ৮]। এরাই গোলাম আজম, আল-মুজাহিদ্দী, কামরুজ্জামান ও নিজামী গং। পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির আওতাভুক্ত এরা কমিশন প্রাপ্ত জাতির বেঈমান। পাকিস্তানের কোলাবরেটদেরকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বেতন দেয়া হতো। কোলাবেরটদের মুক্তির জন্য যে কোন গেজেট জারি করে জিয়া নিজেকে প্রমাণ করেছে সে একজন গুপ্তচর। সুতরাং বাংলা হলোকস্ট কিভাবে এবং কার হাত দিয়ে নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, পাওয়া যাবে '৭১এর ঘাতকদালাল বইয়ের পাতায় পাতায় বাংলার ইদিআমিনজিয়ার গডফাদারী দুষ্কর্মের বিশ্বকোষে। পরবর্তীতে যারা এই অপরাধগুলো মেনে নিয়েছে, প্রত্যেকেই তারা নিজেদেরকে বাংলা নাৎসী বলে পরিচয় দিয়েছে। একাত্তরের দালাল বইটিতে, যুদ্ধাপরাধীদের নাড়ি-নক্ষত্র পাওয়া যাবে, পরবর্তীতে যারা জিয়ার দলে, মন্ত্রীসভায়। এও কি সম্ভব? কিসের মুক্তিযুদ্ধ? হ্যালো! যেদিকেই তাকাই, রাজাকার। '১৯৭৯, ১৯৯১ এবং ২০০১ সবখানেই দেখি শুধু রাজাকার। জিয়ার দলে সব রাজাকার। জিয়ার দলে সব হাহাকার। জিয়ার দল "বাংলাদেশ রাষ্ট্রদ্রোহী পুনর্বাসন কেন্দ্র।" শাহ মোয়াজ্জেম, জুলমত আলী খান, লেঃ কঃ মোস্তাফিজুর রহমানের মতো জাতীয় কলঙ্ক তার দলে। জিয়ার দল, রাষ্ট্রদ্রোহীদের নিয়ে জোট সরকার স্থাপন করে সাভার গিয়েছে। যারা মহা-কবরকে গণ-টয়লেটের মর্যাদা দিতে নিজামীকে নিয়ে সাভারে যায়, কি করে তারা মুক্তিযোদ্ধা?

২৭. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো এমন কোন আইন বাতিল করবে না যা, জেলখাটা যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তির একচুল সুযোগও দেবে। তাদেরকে রাজবন্দীর সম্মান দেবে। বোরম্যানকে বলবে রাজবন্দী, হিটলারকে রাজবন্দীর সম্মান দিয়ে জেল থেকে মুক্তি দেবে। জার্মানরা কি বলতো? দ্বিতীয় প্রজন্ম কি বলবে? যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রীত্ব সম্পর্কে আমরা আমাদের ইমিগ্রান্ট সন্তানদের কি ব্যাখ্যা দেবো? জিয়ার এসব দুষ্কর্ম জানলে ওরা কি বলবে? তারা হলোকস্ট পড়া প্রজন্ম। জিয়া এসব তথ্য-প্রমাণ লুকোবে কোথায়? প্রমাণ তো তার সঙ্গে। যেদিকে তাকাই, রাষ্ট্রদ্রোহীদের জয়জয়কার। আইএসআই জিতে নেয়, বাংলার সংসদ, সংবিধান। আইএসআই গঠন করে জোট সরকার, শাসন করে বাংলার রাওয়ালপিন্ডি। আইএসআই সাভারে গিয়ে প্রতিশোধ নেয়

'৭১এর। সেখানে ৩০ লক্ষ শহীদের বুকের উপর দাঁড়ায়। জিয়া কি জানে, রাজবন্দীর অর্থ কী? আমরা কাকে বলছি, মুক্তিযোদ্ধা? সে তো গোয়েবলস-গোলামআজমকেই মুক্তি দিয়েছিলো। তার আইএসআই স্ত্রী খালেদা বেগম, শহীদ জননীর গায়ে হাত তুলেছিলো। তার পেটোয়াবাহিনী, শহীদ পরিবারকে লাঞ্ছিত করেছিলো। আইএসআই খালেদা, গোলামকে কদমবুছি করে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিলো। ঢাকাকে সে করেছিলো তার রাওয়ালপিন্ডি।

২৮. '৭১এর বদ্ধভূমি, অস্বীকার? জিয়া কোন ধরনের মুক্তিযোদ্ধা? [দ্রঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, ভূমিকা।] সারা বাংলাদেশ জুড়ে সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমির বুকে লাথি মেরেছে জিয়া। অধিকাংশ বধ্যভূমিই আজ তার কারণে চাষাবাদের জমিতে রূপান্তরিত। একমাত্র তার কবরটিই বাংলাদেশের বুকে মক্কাশরীফ। তার কেবলা বাংলাদেশের জন্য একমাত্র খবর! এই সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমি কি মিথ্যা? না হলে, '৭৯র মন্ত্রীসভায় রাজাকার কেন? জবাব দিন।

২৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখন '৭১এর আন্তর্জাতিক লবিস্ট রাজাকার শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে? [দ্রঃ '৭১এর ঘাতকদালাল কে কোথায়]। সুকুমার বিশ্বাসের '৭১এর বদ্ধভূমির পাতায় পাতায় তাদের চেহারা যারা '৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বর রাজবন্দীর সম্মানে মুক্তি পেয়েছিলো। [দ্রঃ '৭১এর আর্কাইভ। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। শাহ আজিজদের লবি তথ্য।] জিয়া, এইসব বধ্যভূমির রক্ত মাড়িয়ে, গণহত্যাকারীদের মুক্তি দিতে দালাল আইন রহিত করেছিলো। সুতরাং জিয়া কক্ষণো মুক্তিযোদ্ধা ছিলো না। হতে পারে না।

৩০. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো বাংলার গোয়েবলস-গোলমআজমকে ভিসার অনুমতি দান করে, শেখ ও জেলহত্যার তদন্ত কমিটির ভিসা ৬ বার আটকাবে না। জিয়া ৩ বিচারকের গঠিত তদন্ত কমিশনকে ৬ বছরেও কাজ করতে দেয়নি। লন্ডন থেকে গঠিত তদন্ত কমিটির আইনজীবীদের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছিলো। (দ্রঃ রিপোর্ট, কমিশন অব ইনকোয়ারি, মার্চ ২০, ১৯৮৩)। জিয়া, বারবার বিদেশী তদন্ত কমিটিকে ভিসা না দিয়ে জেল ও বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্ত বন্ধ রেখেছিলো। জিয়া, ইনডেমনিটিকে আইনে রূপান্তরিত করে প্রমাণ করেছিলো, বাংলাদেশের জন্য ভুট্টোর চেয়েও সে বিপদজ্জনক। জিয়া, গোলামকে ভিসা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতারণা করেছে। জিয়া যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একজন বড়ো কোলাবরেটরেরই কাজ সম্পন্ন করেছে। জিয়া, তার রাষ্ট্রদ্রোহীতার প্রমাণ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছে। কোলাবরেটরদের ব্যাখ্যা এভাবে পাওয়া যাবে– [রাওয়ালপিন্ডি ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তান সরকার, ১নং ৩৯-১৯৫২ উক্ত আইনে সমস্ত ধারায় পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ নং-১০, ১৯৭১ এর অধীনে সংঘটিত রাজাকারদের জন্য প্রযোজ্য। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অফিসার যার অধীনে কোন রাজাকারকে ন্যাস্ত করা হইবে... রাজাকারেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আন্ডারে নিয়োগ হলো। তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের

মতো একই ক্ষমতা পাবে।] এই মুসলিম মওদুদীবাদী জিয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা কোথায়? জিয়া, সংবিধানের মুসলমানী দিয়ে– হিন্দুদেরকে করেছে মুসলমান। মুক্তিযুদ্ধকে করেছে– সমকামী। জিয়া কোন ধরনের মুক্তিযোদ্ধা? হ্যালো!

৩১. একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনদিনও স্বাধীনতার অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা, দেশকে ফের পাকিস্তানের আদর্শে ফিরিয়ে আনবে না। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বারবার ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। দেশের সংবিধানকে পাকিস্তানের আদর্শে খৎনা দেবে না। দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। দেশে মৌলবাদী রাজনীতির চর্চায়– মওদুদীবাদীদেরকে বৈধ করবে না। '৭১-৮১র ষড়যন্ত্রবাদী বলে প্রমাণের অজস্র পদচিহ্ন রাখবে না। বাংলার সেনাবাহিনীকে, পাকবাহিনীর মর্যাদা দেবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা তাহেরকে দেশদ্রোহীর অপবাদে ফাঁসি দিয়ে, গোলামকে দেশপ্রেমিক করবে না।

৩২. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো এমন ট্রেইল রাখবে না, যেমন– ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পরেও অবৈধ সরকারের প্রতি আনুগত্য, খুনিদের নিরস্ত্র দেখেও বিদ্রোহ না করা, ৪৬ ব্রিগেডের ৪০০০ সৈন্যের মধ্যে একজন সৈন্যকেও মুভ না করানো, খুনিদের অস্ত্র সরবরাহে সিজিএস এবং অন্যদেরকে সহায়তা, সাতসকালে ক্লিন সেইভ ও ইউনিফর্মড, খুনের সংবাদ পেয়ে আশ্চর্যজনক মন্তব্য– "বঙ্গবন্ধু খুন হয়েছে তাতে কী, ভাইসপ্রেসিডেন্ট তো আছে, ১ম বেঙ্গলে যাও..." রেডিওতে গমন, সেখান থেকে ব্রিগেড অফিস, খুনিদের সঙ্গে বৈঠক, ২৩শে আগষ্টে ৪ জাতীয় নেতাকে জেলে প্রেরণের বিরুদ্ধে নীরব, ২৪ তারিখে অবৈধ রাষ্ট্রপতির সেনাপ্রধানের পদদখল। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে বিদেশে চাকরি দিয়ে নির্বাসনের ষড়যন্ত্র। সেনাবাহিনীতে ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র এবং ৭ই নভেম্বর সৃষ্টির এতসব দৃষ্টান্ত বীরউত্তমের নয়। ১০ বছরে ১১টি পদোন্নতি সম্ভব নয়। জিয়া, অবৈধ মোস্তাকের সঙ্গে '৭১ থেকেই কনফেডারেশন বা বিচ্ছিন্ন কাজে লিপ্ত। '৭৫ এর মোস্তাক সরকারের সব দুষ্কর্ম সমর্থন করে নিজেকে করেছিলো বঙ্গবন্ধুর বিকল্প। মীরকাশিম কখনো সিরাজউদ্দৌলা নয়। জিয়া কখনো স্বাধীনতার ঘোষক নয়। [দ্রঃ সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা ভিডিও, ১–৫ম খ]। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, শফিউল্লাহর জবানবন্দী, পৃঃ ৯৫]। জিয়ার ঘোষণা পাঠ স্বাধীনতার জন্য বিষয় নয়। এই ঘোষণা, তারও আগে, অনেকেই পাঠ করেছিলো। সাংবিধানিকভাবে একজন সৈন্য কখনো স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারে না। একজন জিয়া না থাকলে দেশের স্বাধীনতায় কোন ব্যঘাত ঘটতো না। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কি কি অবদান আজ জাতি তার বিশদ বিবরণ জানতে চায়। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের লেখক জিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কোন অবদানের প্রমাণ নেই, বরং আছে রাষ্ট্রদ্রোহী এক গুপ্তচরের মুখ। ২৫শে মার্চ রাতে জিয়া কেন সোয়াত জাহাজে গিয়েছিলো জাতি জানতে চায়। সেক্টর কমান্ডার পঙ্গু তাহেরকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদদেরকে কেন মুক্তি দেয়া হলো–

জাতি জানতে চায়। জিয়া কার কাছে দুর্বল ছিলো, জাতি জানতে চায়। ২৫শে মার্চ রাতে সে কেন সেনাকোড ভঙ্গ করে সোয়াত থেকে পালিয়ে যায়নি, জাতি জানতে চায়। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন]। খুনি কর্নেল মহিউদ্দিনের জবানবন্দী– "জিয়া মেজর ফারুক ও রশিদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ৩/৪ দিন পর বিদেশে ফেরত পাঠান। এতে আমার মনে হয়, ১৫ই আগষ্টের ঘটনায় জিয়ার সংশ্লিষ্টতা ছিলো যার জন্য সে ফারুক রশিদের কাছে খুবই দুর্বল ছিলো।" বঙ্গবন্ধু বিচার হত্যাকাণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায়, বিচারকও একই কথা বলেছেন। তিনি এই জবানবন্দীর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন মৃত জিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া যেতো। আমাদের দুর্ভাগ্য এইজাতি বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচারের নামে একটি অতি নিম্নমানের বিচারের প্রহসন করেছিলো, যেখানে আসল খুনিকে রেখে তল্পিবাহকদেরকে নিয়ে গন্ডগোল। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তার ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভিন্ন তথ্য। তিনি বলেছেন– খুনি ফারুক রশিদ, শুধু নির্দেশই পালন করেছিলো। আসল ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক। তিনি বলেছেন আইএসআই এবং সিআইয়ের কথা। জিয়াউর রহমানদের মতো রিক্রুটির কথা। বলেছেন আসল ক্লাইভদের কথা। সেদিন জিয়াকে চার্জশীট দিলে, একটি মহা-স্বৈরাচারকে শনাক্ত করতে পারতো জাতি। ১০০০ কোটি টাকার জিয়া উদ্যান, এতোদিন সেখানে মুক্তিযুদ্ধ মিউজিয়াম হতো। সেনাপ্রধানের কাছে জিজ্ঞাসা, জিয়া কেন ২৫শে মার্চ রাতে সোয়াতে গেলো অস্ত্র খালাস করতে? তাহলে কি বলবো, রফিকুল ইসলাম একজন মিথ্যেবাদী? কেন সে সোয়াত জাহাজে গেলো? জবাব না দিতে পারলে, তার নামের সকল প্রতিষ্ঠান আজ থেকে জিয়ামুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধার সুনাম রক্ষা করুন। ২৪শে আগস্ট থেকে সামান্য ডক শ্রমিকেরা যেখানে অস্ত্রের জাহাজ প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ করলো, একজন সোকলড মুক্তিযোদ্ধা জিয়া ২৫শে মার্চ রাতে সেখানে কি করতে গিয়েছিলো? সঙ্গের পাকিস্তানি দুই জওয়ান তো তার রক্ষী। তাদেরকে খুন করে বিদ্রোহ না করে, অস্ত্র খালাসের পায়তারা? সেনাপ্রধান! আপনারা কি রাওয়ালপিন্ডির বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী? আপনাদের বন্ধু জিয়া, কি বোঝাতে চায়? ২৫শে মার্চ রাতে সে কি মাল্টা না মেশিনগান– চেনেনি?

৩৩. বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে রণাঙ্গনে ক্যু'র মতলব। ২৪-২৫-২৬-এর কেলেঙ্কারির পর, '৭১এর ২৭শ মার্চে রণক্ষেত্রে নিজেকে "রাষ্ট্রপ্রধান" ঘোষণা। কিংবা পাকিস্তানের গোয়েন্দা জিয়া, ২৪ তারিখে সরাসরি যুদ্ধ ভঙ্গের পরিকল্পনাকারী। রণক্ষেত্রের দ্বিতীয় মোশতাক জিয়া, বারবার তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে সে একজন আইএসআই। প্রথম মোশতাক, যে, মুজিবনগরে বসে '৭১ এ কনফেডারেশন সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ ভাঙ্গার পরিকল্পনা করেছিলো, ভারতীয় প্রেসের কারণে যা ফাঁস হয়ে গেলো। এদিকে রণক্ষেত্রের দ্বিতীয় মোশতাক জিয়া, যে ২৪ তারিখে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালে। প্রকাশ্যে ২৫ তারিখে সোয়াত জাহাজ ষড়যন্ত্রবাদ। ২৬ তারিখে ২,৫০০ সৈন্যসহ নিখোঁজ। ২৭শে মার্চে নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার

অবদান কী? একমাসের সেক্টর কমান্ডার সে, এরপরেই ভারত, যেখানে অন্যান্য রি-প্রেট্রিয়েটরা। জিয়ার একমাত্র অবদান, বিএনপি নামের বাংলা নাৎসী পার্টির সৃষ্টি করে দেশকে আবার পাকসারজমিনসাদবাদ করা। রাষ্ট্রদ্রোহী এবং আইএসআই জিয়া, রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কি কি দুষ্কর্ম করেছিলো, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তার বিশদ প্রমাণ আছে। ল্যাগেসি অব ব্লাড-এ '৭১-'৮১ পর্যন্ত তার সকল গডফাদারির নাড়িভুড়ির সন্ধান পাওয়া যাবে। তার হাত দিয়ে এদেশ পাকিস্তানের আদর্শে ফিরে গেছে। সে '৭১এর ব্যর্থতার সব প্রতিশোধ সম্পন্ন করেছে।

৩৪. রণাঙ্গনে নিজেকে 'রাষ্ট্রপতি' ঘোষণা যার প্রমাণ ২০০৪এর মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৩য় খ ে র ৩য় পাতায়। পরবর্তীতে এই সূত্র ধরেই '৭১ থেকে '৮১ অবধি দেশের ১১টি অন্যতম শীর্ষ পদ দখল এবং প্রতিবারই একাধিক পদাসীন থাকা এই উপসেনাপতি, সেনাপতি, সহকারী সামরিক শাসক, প্রধান সামরিক শাসক, তথ্য-অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান, হ্যাঁ না রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি... সাড়ে পাঁচ বছরে এতোগুলো পদ দখলের যে বিস্ময় তার অন্তরীণে বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে খুনি জিয়ার কর্মকাণ্ডের যে দীর্ঘ দীর্ঘ ট্রেইল, মুক্তিযোদ্ধার বদলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিশ্বাসঘাতক মীরকাশিমের অবিকল মুখ বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর একমাত্র সুফলভোগী জিয়া, এই বক্তব্য, খুনি ফারুকেরই। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ২০৩]। খুনি ফারুকের ইন্টারভিউ, স্যাটারডে পোস্ট ১৫ই আগস্ট ১৯৮৩, ১৯৭৬এ ২রা আগস্ট... "জাসদের সাথে রাজনৈতিক যোগসাজশ ধামাচাপা দেয়ার জন্য জেনারেল জিয়া ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নেয়। মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে প্রেসিডেন্ট করি সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপি-ড়ির অন্ত ছিলো না। জিয়া এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে নিজের ক্ষমতা সংহত করেছে এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে।" –কর্নেল ফারুক। জিয়া কখন কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো, প্রমাণ নেই। তবে যতক্ষণ সে যুদ্ধ করেছিলো, সে একজন আইএসআই-এর গুপ্তচর হিসেবে ছিলো, যার যথেষ্ট প্রমাণ আমি দেবো।

৩৫. একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার ফারুক-রশিদের সঙ্গে মিটিং শেষেই বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিয়ে দেবে, মিটিং শেষেই দুই খুনিকে এ্যারেষ্ট ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কিছুই করবে না যখন সে– আইএসআই। যার প্রমাণ, বিদ্রোহ না করে সে কেন অস্ত্র খালাসের জন্য সোয়াত জাহাজে গিয়েছিলো। জিয়া ১১:৩০ মিনিটে অস্ত্র খালাসের জন্য সোয়াতে গিয়েছিলো। প্রমাণ চাই? হ্যালো!

৩৬. একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার প্রয়োজনে, তার সুপ্রীম কমান্ডার বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে প্রাণ দেবে। সেনাকোড অনুযায়ী চরমপন্থীদের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করবে। যে কোন দেশদ্রোহীতা বা নাশকতামূলক কাজের সংবাদ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিহত করবে। সেনাপ্রধান অক্ষম হলে চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ

করবে। বিদ্রোহী বা দেশদ্রোহীদেরকে প্রতিহত করতে নৌ-বিমান ও স্থলবাহিনীকে সতর্ক করে দেবে। যেন দেশের সার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের সুপ্রীম কমান্ডার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ক্ষতি না হয়। যে কোন পরাশক্তি বা অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেবে। যারা অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সব বাহিনীর সাহায্য নেবে। উপসেনাপতি জিয়া এর সবক'টি কাজেরই বিরোধিতা করে প্রমাণ করেছে রণক্ষেত্রে সে একজন মুখোশধারী মুক্তিযোদ্ধা। [জেল হত্যাকাণ্ড, লেখক অধ্যাপক আবু সাঈদ, ল্যাগেসি অব ব্লাড]। [তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পুরো বই]। জিয়া, জীবিতকালে স্বাধীনতার একমাত্র সুফলভোগী। পরবর্তীতে তার স্ত্রী, তার চেয়ে বৃহৎ সুফলভোগী। এই দুই দুধর্ষ আইএসআই-এর এজেন্ট, পুরো '৭১কে বিকিয়ে দিয়ে '৭৫ থেকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতা লুটেছে। জাতি, এদেরকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। কিংবা এড়িয়ে গেছে কিংবা দু'টোই। এই দুই আইএসআই এজেন্ট, পুরো বাংলাদেশকে মৌলবাদ, ভিক্ষুক এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। এই দুই আইএসআই, পুরো স্বাধীনতাকে নষ্ট করে ফেলেছে, যার প্রমাণ ৩১/১০/২০০১ তারিখে খালেদা-নিজামীর সাভার স্মৃতিসৌধে ভ্রমণের মতো দুঃসাহস। জিয়া, খুনিদেরকে নিয়ে নিজ বাসভবনে বৈঠক করে খুনের নীলনকশা করেছে। সে ৪৬ ব্রিগেডকে অপব্যবহার করেছে। ২৫শে মার্চ রাতের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের স্থপতিকে হত্যা। মুক্তিযুদ্ধকে হত্যা। সেদিন এই বাংলাপাকবাহিনীকে যারা সাহায্য করেছিলো, সেই আবর্জনা যারা প্রত্যেকেই ক্ষমতার জুতো কামড়াকামড়িতে পরবর্তীতে জিয়ার হাতে লাঞ্ছিত হলো। খুন হলো। নির্বাসিত হলো। এরাই ৪৬ ব্রিগেড নামের, রাওয়ালপিণ্ডি।

৩৭. নিশ্চয়ই একজন পাকিস্তানি চর মুক্তিযুদ্ধে তার প্রতিপক্ষের রাষ্ট্রপতিকে খুনের সংবাদ আগাম জেনেও, চুপ থাকবে। রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা থেকে বিরত থাকবে। দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলতে সহায়তা করবে। খুনিদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করবে। মানুষ এবং রাষ্ট্রকে নৈরাজ্যতার শিকার করবে। দেশে সরকারহীনতায় সাহায্য করবে। বিশৃঙ্খলা করতে সহায়তা করবে। '৭৫এর মার্চ মাসের ২ তারিখে খুনি ফারুককে তার বাসভবনে বসে খুনের পরিকল্পনা শেষে জিয়া বলেছিলো, "আমি একজন সিনিয়র অফিসার। তোমরা, জুনিয়র অফিসাররা আগ্রহী হলে, এগিয়ে যেতে পারো।" [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে ফারুকের ইন্টারভিউ, পৃঃ নং ২০১-২০৭]। ভুট্টো চেয়েছিলো অখণ্ড পাকিস্তান। '৭৫এ জিয়া চেয়েছিলো, পাকসারজামিনসাদবাদ! জিয়া, আইএসআই এবং সিআইএ'র মূল রিক্রুট, চিলির আঁলেন্দের মতো বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে। সিআইএ এবং আইএসআই এরা কি বাংলাদেশ চেয়েছিলো?

৩৮. একজন মুক্তিযোদ্ধা উপসেনাপতি কখনো খুনির মুখোমুখি নিজ বাসভবনে বসে, খুনিদের কাছে উপরোক্ত মন্তব্য করবে না। সেনাকোড অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দেবে খুনির মতলব। তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করে খুনিদেরকে সোপর্দ করবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে। পরবর্তীতে একান্ত অনিবার্য কারণে সেনাপ্রধান হলে, প্রথমেই মোশতাককে গ্রেফতার করবে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পুরো ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদিদের প্রতি এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কোন দৃষ্টান্ত নেই। বাঙালিদের ভাগ্য খারাপ, মুক্তিযুদ্ধে যাদের একমাত্র অর্জন– জিয়া! রাজনীতিবিদদের কোন ব্যাখ্যাই বৈধ রাষ্ট্রপতি খুনের জন্য যথেষ্ট নয়। '৭১-'৮১ পর্যন্ত জিয়া প্রমাণ করেছে, নাশকতার এমন কিছু নেই যা সে করেনি। এমন কি ২৪ ঘণ্টায় সামরিক ট্রাইব্যুনাল করে অজস্র খুন। এমন কি স্বাধীনতা খুনের জন্য ৩১/১২/৭৫এর গেজেট।

৩৯. একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির খুনের ষড়যন্ত্রের সংবাদ আগাম জেনে সত্যিকারের একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো তা সমর্থন করে দেশদ্রোহীতার পরিচয় থেকে মুক্তি পাবে না। নিজ ভবনে খুনিদের সঙ্গে আগাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার মুখোশে আর লুকোতে পারবে না। বরং সে আম্রকাননের মোহাম্মদী বেগ। [দ্রঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বাংলার মসনদ। লেখক, মোঃ ফজলুল হক।] আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। আসুন আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে পাকবাহিনীর অপরাধ মুক্ত করি। তাদের হাতে সেক্টর কমান্ডার খুনের কলঙ্ক লেগে আছে।

৪০. আর কে বঙ্গবন্ধু হত্যার সুফল এতো উলঙ্গভাবে ভোগ করেছে? রক্তাক্ত অধ্যায় থেকে নেয়া... "তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন, আমাকে খবর দিলো, জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চায়, অনুমতি নিয়ে অফিসে ঢুকলাম, গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন, সব শুনে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, এটা অসহ্য এবং অসভ্য। কিছুতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ মুজিব কি বিচার করবে? তুমি শফিউল্লাহর কাছে শুনে আসো, তারপর যা করবার আমরা করবো।" সেনাপ্রধানের কাছে জিজ্ঞাসা, বঙ্গবন্ধু খুনের মাস্টার মাইন্ডার, কোন অভিধানের – মুক্তিযোদ্ধা? আমাকে সেই অভিধানের সন্ধান দিন। তাহলে, বুঝবো, ১০০০ কোটি টাকার জিয়াউদ্যানের যৌক্তিকতা।

৪১. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখন আইএসআই। নিজে খুনি না হলে, খুনিদেরকে নিশ্চয়ই গ্রেফতার করবে। উল্টো, সব খুনিরই বন্ধু সে। এবং সবার সর্বনাশই হলো জিয়ার হাতে। কেউ দূতাবাসে নির্বাসিত, কেউ ফাঁসির দড়িতে। (কর্নেল তাহের ভার্সাস কর্নেল নূর)। খুনি জিয়া, এভাবে বারংবার ইতিহাসের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো রাষ্ট্রদ্রোহীতার। সে মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্বে তাহেরের মাকে পর্যন্ত মিথ্যা বলেছিলো। একজন পঙ্গুকে ধরে খুন করে পুরো জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের কাছে দায়ী করলো। [দ্রঃ অসমাপ্ত যুদ্ধ, পুরো বই]। জিয়ার মধ্যে মানুষের বিবেক বলে কোন জিনিস ছিলো না। জিয়া, মানুষই ছিলো না। তার ভেতরে মীরকাশিম ও হিটলারের বাক্সবন্দী প্রেতাত্মা। সে

মানুষ খুন করেছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি! আসুন আমরা '৭৫এর ইয়াহিয়া নামের জিয়াকে হত্যা করি। যে এতোগুলো সেক্টর কমান্ডার হত্যা করতে পারে, সেনবাহিনীর কাছে জিজ্ঞাসা, বন্ধু বা আত্মীয়তার সামনে '৭১ কতো ছোট? এরা কি আপনাদের ভাই বা বন্ধু নয়? কে এই জিয়া যার জন্য আপনাদের পাকবাহিনী কলঙ্ক সওয়া?

৪২. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো দেশের স্বাধীনতায় হুমকি আনবে না। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৬৮-৭৮]।

৪৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো নব্য স্বাধীন দেশে তার পদোন্নতি নিয়ে উলঙ্গ ভাষায় বারবার উত্তেজনার সৃষ্টি করবে না। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান]। ক্ষমতার লোভে '৭২ থেকেই গণবাহিনী এবং জাসদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। [সাটারডে পোস্টের দুই ইন্টারভিউ, ২/৮/৭৬ ও ১৫/৮/৮৩]। সেনাপ্রধান না হতে পেরে, ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করবে না, ষড়যন্ত্রীদের হাতে ধরাও দেবে না। ২রা অক্টোবরে খুনিদেরকে সূর্য সন্তান নামে আখ্যা, পুরো সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাগলা কুকুর হয়ে উত্তেজক বক্তব্য, রাখবে না। [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বইটিতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকান্ড চ্যাপ্টার]। অপুরুষ কর্নেল তাহেরকে শফিউল্লাহর কাছে পাঠাবে না, জিয়াকে সেনাপ্রধান বানানোর দাবী তুলে। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো সদ্যমুক্ত দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত না হয়ে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্কমোচন, শফিউল্লাহর জবানবন্দী, পৃঃ ৯০ – "জিয়া আমাকে বারবার বলতেছে, সে বেটার সার্ভিস দিতে পারিবে তোমাকে সরাইয়া দেওয়ার জন্য"]। জিয়া, জাসদ এবং গণবাহিনী দুটোকেই অপব্যবহার শেষে হাজার হাজার খুন করেছে যারা মুক্তিযোদ্ধা।

৪৪. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বকে নাজুক করতে সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সেনাপ্রধানের পদের জন্য চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করবে না। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, অসমাপ্ত যুদ্ধ, বাঙালির কলঙ্ক মোচন, তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান]। অসমাপ্ত যুদ্ধে জিয়ার অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্র ও তাহের হত্যাকান্ডের অপরাধসমূহ এবং ল্যাগেসি অব ব্লাড বইতে– ১২ ও ১৩নং চ্যাপ্টারে বর্ণিত মহা-স্বৈরাচার এবং খুনি জিয়া... চিনতে হলে, জাতির জন্য অবশ্য পাঠ্য। এই দায়িত্ব থেকে জাতি মুক্ত কেন? তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান বইয়ের ৭ই নভেম্বর চ্যাপ্টারে যে জিয়ার চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, জাতি কেন নীরব? জিয়ার ইয়াহিয়াবাদ নিয়ে কেউ কথা বলছে না কেন? সেনাবাহিনীর এইসব উচ্চ পদাধীন প্রত্যক্ষদর্শীরা কি সব মেরুদণ্ডহীন? হ্যালো! আমি তাদেরকে আহ্বান করছি, মৃত্যুর আগে, মুখোশ খুলে দিন। সে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছে, আসুন আমরা অন্তত একটা পশু হত্যা করি! সেনাপ্রধানকে জিজ্ঞাসা, কর্নেল তাহেরকে কি প্রক্রিয়ায় খুন করা হলো? সে রাষ্ট্রদ্রোহী হলে, ২৫শে মার্চ রাতের জিয়া কে? বন্ধু বা সহকর্মী বা ক্লাশমেট... এসব ননসেন্স আর কতকাল? আপনারা কি রাওয়ালপিন্ডি? আপনারা কি পাকবাহিনী? টিক্কা খান? জবাব দিন।

৪৫. '৭৪এ দেশজুড়ে চক্রান্তের পর চক্রান্ত, নাশকতা এবং নৈরাজ্যবাদের চূড়ান্ত। সারা দেশেই গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস, সর্বহারাদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থির বঙ্গবন্ধুর নেয়া বাকশাল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে উস্কানি এবং তাদেরকে আরো উস্কে দিতে দেশজুড়ে নৈরাজ্য এবং মোশতাক ও বোস্টারের সঙ্গে গোপন নাশকতাবাদ। বিদেশীদের থেকে শিক্ষা নিন। আইএসআই জিয়া পরিবারকে এদেশ থেকে টিক্কা খানদের মতো চিরতরে বিতাড়িত করুন। জিয়া গডফাদার, খালেদা গডমাদার এবং কোকেইন ও হেরোইন নামের দুই জিয়া গডপুত্র! এরাই বাংলাদেশের মহা শত্রু, গণহত্যাকারীদেরকে ক্ষমতার ভাগ দিয়েছে। এখনো কি প্রমাণ হয়নি, জিয়া পরিবার পাকিস্তানের এজেন্ট?

৪৬. '৭২ থেকেই দেশ গড়ার চেয়ে বরং সেনাপ্রধানের পদের জন্য সেনাবাহিনীতে জোর লবি, শেখ মুজিব এবং সেনাপ্রধানকে উত্তপ্ত করা, পদ নিয়ে রেষারেশি ও উত্তেজনা, দেশজুড়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদ-গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রে মার্কিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্ম, মুক্তিযোদ্ধা নয়, প্রো-পাকিস্তানির চরিত্র। জিয়া, মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার, ভুট্টো এবং ঘরের শত্রুদের সঙ্গে নিয়ে '৭৪ সনে শেখ হত্যার বিষয়ে ঢাকায় বারবার মিলিত হয়েছিলো। সঙ্গে ১৭ খুনির অনেকেই। [দ্রঃ ইনসাইড র‍্য ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস, অসমাপ্ত যুদ্ধের ১ম খ , ল্যাগেসি অব ব্লাড, কিলিং অব শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু হত্যায় সিআইএ]। জিয়া, বোস্টারের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছিলো। বঙ্গবন্ধু খুনের চিত্রটি, চিলির আঁলেন্দে খুনের হুবহু সিআইএ ষড়যন্ত্র। দুর্দান্ত ক্ষমতালোভী জিয়া, ক্ষমতা পেতে সিআইএ-সহ সকলের হাতে ধরা দিতে প্রস্তুত। এই দৃষ্টান্ত, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? জিয়া, '৭১-'৮১ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সকল অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেছে।

৪৭. সকাল ৭টায়, বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র, দুঃখ-আবেগ-ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ বর্জিত জিয়া। খুনের সংবাদকে সুস্বাগতম, কোন মুক্তিযোদ্ধার কাজ? জিয়ার উত্তর- 'তাতে কী'? আমার প্রশ্ন, এর মানে কি? তার মানে, জিয়া সব জানতো এবং সেও ষড়যন্ত্রের সঙ্গী খুনিদের মাস্টারমাইন্ডার জিয়া প্রথম থেকেই যা করেছে তা '৭১এ জাতিসংঘে ভুট্টোর প্রতিকৃতি, অখণ্ড পাকিস্তান। জিয়া, কখনোই বাংলাদেশ চায়নি। চাইলে বৈধ রাষ্ট্রপতি খুনের সংবাদে, "তাতে কী" মন্তব্য করবে না। জিয়া বঙ্গবন্ধু খুনের অমিমাংসিত মীরকাশিম। জিয়া ৪ সেক্টর কমান্ডার খুন করে তাদের লাশ জাতির দৃষ্টি থেকে উধাও করেছে। বঙ্গবন্ধুর লাশ ৩৬ ঘন্টা পচিয়ে উধাও করেছে বহুদূরে, যেখানে মানুষ যাবে না এবং তারা ভুলে যাবে জাতির পিতাকে। সে বঙ্গবন্ধুর সব ছবি নামিয়ে ফেলতে হুকুম জারি করেছিলো। জিয়ার ক্লাইভ খালেদা, জিয়াতাজমহল সৃষ্টি করেছে রাজধানীর বক্ষস্থলে যেন বাংলার মানুষ একে জিয়া মক্কাশরীফ বা জিয়াতাজমহল, যেকোন কাজেই ব্যবহার করতে পারে। কোথায় মুক্তিযুদ্ধ? আসল কথা, একমাত্র জিয়াই বেঁচে আছে এই দেশে, সম্রাট জিয়া এবং তার জিয়ামহল। বঙ্গবন্ধুর কবর হদিশবিহীন।

নিখোঁজ। অবহেলা। জিয়ার কবর সর্বত্র। মিডিয়ার মাধ্যমে ৩৬৫দিন জিয়ার কবর প্রোপাগান্ডা। বঙ্গবন্ধুর কবর, একদিনও নয়। খুনি জিয়া আমাদের জাতির পিতা! মারহ-াবা! মারহাবা! জিয়া সংবিধান থেকে বঙ্গবন্ধ শব্দটি বাতিল করেছিল।

৪৮. খুনিদের জারজ আনন্দের নৈরাজ্য কায়েমে মৌনতা, খুনিদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে উপযুক্ত সংস্থাকে যোগাযোগ না করা, সৈন্য মুভমেন্ট থেকে সম্পূর্ণ নীরব, কোন সেক্টর কমান্ডারের পরিচয়? [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৭৩]।... প্রশ্ন হলো এরকম দুযোর্গ মুহূর্তে একেক সেকেন্ড যখন মহামূল্যবান, শাফায়েত জামিল সেখানে গাড়ি না নিয়ে জিয়ার বাসায় হেঁটে গিয়ে সময় নষ্ট করেছিলো কেন? সে ঐ মুহূর্তে তার ৪০০০ সৈন্যসহ অফেসে না গিয়ে হেঁটে হেঁটে ডেপুটি চিফ জিয়ার বাড়ির দিকে যাবে কেন? [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন]। আসল ঘটনা, অপুরুষ খালেদ, তাহের, শাফায়েত জামিল প্রত্যেকেই এরা একেকটা ঘানির ষাড়, ক্ষমতালোভী, ব্লাডি কিলার। ক্ষমতার জুতো কামড়াকামড়িতে খালেদ, তাহের, শাফায়েত জামিল এক। জিয়া সব্বাইকে ধোকা মেরে শেখ হত্যার একক সুফলভোগী। জিয়া ক্ষমতায় আসার পর নির্বাসিত সকল খুনিদেরকে বিদেশে বাংলাদেশ কুটনৈতিক অফিসে চাকুরি দিলো। "আমার মনে হয় যে, ১৫ই আগষ্টের ঘটনায় জিয়ার সংশ্লিষ্টতা ছিলো, যার ফলে সে ফারুক-রশিদের ব্যাপারে খুবই দুর্বল ছিলো।" "ডেপুডি চিফ অবস্টাফ জিয়াউর রহমান মাঝে মাঝে পরিবারসহ আমার বাসায় হেঁটেই চলে আসতেন... একমাত্র শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্টে এনে তাকে দিয়ে পরিবর্তন ছাড়া দেশে কোন পরিবর্তন করা যাবে না, এব্যাপারে জিয়াউর রহমানে সাথে আলোচনা হয়, এবং মতামত চাইলে তিনি বলেন, আমি কি করতে পারি, তোমারা করতে পারলে কিছু করো। রশিদ পরে জিয়া ও খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগ করে।" [লেঃ কর্নেল ফারুক রহমানের জবানবন্দী, বাঙালির কলঙ্ক মোচন।] ১৫ই আগষ্টে কোন সেনা কর্মকর্তাই সেনাপ্রধানের কথা শোনেনি। তারা সবাই জিয়া কথা শুনেছে। [দ্রঃ শফিউল্লাহর জবানবন্দী]। ৪৬ ব্রিগেডের খুনিগুলো এখনো অনেকেই জীবিত। ওদেরকে রিমান্ডে নিলেই তো সব সত্য বেরিয়ে যাবে। জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা শেষ হয়ে যাবে।

৪৯. বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে মীরজাফরের মৌনতা। হত্যায় সায় জানিয়ে শাফায়েত জামিলকে উত্তর 'তাতে কী'? পাল্টা বিদ্রোহ না করে নীরব। কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক জাহাজ এবং জিয়ার সোয়াত জাহাজে '৭০ থেকে অস্ত্র খালাসের পায়তারা, যে আমেরিকা এইসব নর-নিধনের অস্ত্র পাঠিয়েছিলো '৭০ থেকে একাজ শুধু তাদেরই। এইসব শাফায়েত জামিলগুলো সবাই জিয়ার মতো একেকটা ঠান্ডামাথার খুনি এবং চরম মিথ্যেবাদী। শুধু ব্যতিক্রম, জিয়ার হাতে সকলেই পর্যুদস্ত। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৭২-৭৫]। কেউ ক্ষমতার ভোগ বা ভাগ পায়নি। "জিয়া শেখ হত্যার একক সুফলভোগি"–কর্নেল ফারুক। পরবর্তীতে সব খুনিরাই খুনি জিয়াকে খুন করতে

চেয়েছিলো। খুনি ফারুক রশিদ পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতক খুনিকে খুন করতে দুইবার ক্যু করেছিলো। তা সত্ত্বেও জিয়া তাদেরকে ফাঁসি না দিয়ে চাকরির নামে বিদেশে নির্বাসন দিলো। যার কারণ, তারাই তাকে জিয়া বানিয়েছিলো। সেই দুর্বলতা। আর জিয়া নিজের জন্য বৈধ করে নিলো লাল কেল্লার মতো ইনডেমনিটির দুর্গ। আর এই দুর্গের গেটকিপার গোলাম আজম, যার আসল ক্লাইভ, কিং ফয়সাল। অংক খুব পরিস্কার, দুইয়ে দুইয়ে চার। জিয়া খুনিদের কাছে দুর্বল ছিলো। ফারুক-রশিদ এদেরকে ফাঁসি দিলে, বাকী ১৫ খুনি, সব ফাঁস করে দেবে। তার সকল অপকর্মের মাধ্যমে জিয়াই বুঝিয়েছিলো সে বাংলার নতুন মীরকাশিম। জিয়ার ক্লাইভ, যারা অন্যান্য দেশ থেকে চালাতো তাকে, যারা এইসব '৭১ এবং '৭৫এর ব্যর্থ ও সফল পট পরিবর্তনের মূল। জিয়া ইদি আমীনের চেয়েও দুর্ধষ খুনি বলে প্রমাণ করেছে ইতিহাসের কাছে। এবং সবসত্ত্বেও সবার মুখে কিসের কুলুপ?

৫০. বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে কারো সঙ্গেই কোনরকম যোগাযোগ না করে ক্লিন সেইভ এবং ইউনিফর্মড হয়ে সেনাপ্রধানের বাসায় যাওয়া, সেখান থেকে বিপদগ্রস্থ সেনাপ্রধানকে স্টেনগানের মুখে জীপে তুলে তৃতীয় গাড়িতে ডালিম ও অন্যান্য খুনিদের পেছন পেছন জিয়ার রেডিও স্টেশনে যাত্রা, কোন মুক্তিযোদ্ধার চিহ্ন? খুন পরবর্তী "রাষ্ট্রদ্রোহী কমান্ড" কোন বীরউত্তমের কাজ? ১৫ই আগষ্টে জিয়া সারাদিন খুনিদেরকে নিয়ে স্বরবে কাজ করে গেছে, ৪৬ ব্রিগেড অফিসে মিটিং করেছে, ক্যান্টনমেন্ট চষে বেড়িয়েছে। সেনাপ্রধানকে বানিয়েছে তার ভেড়া। ১০ দিনের মাথায় এই ভেড়াকে ব্যুটআউট করে ক্ষমতা গ্রাস। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, রক্তাক্ত অধ্যায়]। কিছু উচ্ছৃঙ্খল, ষড়যন্ত্রকারী মুক্তিযোদ্ধাগুলো জিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে জিয়ার প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে দেশে নৈরাজ্য কায়েম করেছিলো। ধূর্ত জিয়া বোকা নৈরাজ্যবাদীদেরকে ধোকা দিয়ে, ৭ই নভেম্বরের সুযোগ নিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৭৫]। "বহু বছর পর সংসদে শফিউল্লাহর বক্তব্য, ঐ দিন ঢাকার ৪৬ বিগ্রেড কমান্ডার আমার কথা শোনেনি, সে জিয়ার কথা শুনেছে।" আসল কথা, এরা প্রত্যেকেই একেকটি খুনি। আর জিয়া, খুনের একমাত্র সুফলভোগী। জিয়া, মহা ধূর্তবাজ। '৭৭এর সশস্ত্রবহিনীতে বিশাল গণহত্যার একক– ইয়াহিয়া। জিয়া, ক্ষমতার জুতাটি একাই খেয়ে সাবার করেছে। ঘানির ষাড় খালেদ, তাহের, শাফায়েত জামিল এরা সব মহামূর্খ জাতীয় বেঈমান শুধু। এরা পেয়েছে ময়লা জুতোর, জুতোপেটা।

৫১. রেডিওতে খুনিদের সঙ্গে আলোচনা, আনুগত্যের ভাষণ দান এবং অন্যান্য প্রধানদেরকে সংগঠিত করে আনুগত্যের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া প্রমাণ করেছে সে, '৭১এ অখণ্ড পাকিস্তান কনফেডারেশনের পক্ষে। [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, লেখক সিরাজউদ্দিন আহমেদ]। '৭৫এর পাকিস্তান কায়েম শেষে জিয়া সব খুনিদেরকে

নির্বাসন দিয়ে নিজের জন্য রেখেছিলো ইনডেমনিটির লাল কেল্লা। জিয়া, ১৫ই আগষ্টে পাল্টা ক্যু না করে প্রমাণ করেছে সে একজন আইএসআই জিয়া। হ্যালো! কিসের মুক্তিযোদ্ধা? আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। কোথায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ? আপনারা কি দেখেননি বাংলাদেশের সংবিধান, জিয়ার হাতে মুসলমান হয়ে গেছে! মওদুদীবাদী জিয়া, আপনাদেরকে মুসলমানী দিয়েছে? হাত দিয়ে পরীক্ষা করুন। দেখুন, হিন্দু? নাকি মুসলমান! মুসলমান হলে, লিঙ্গের মুখে টুপি থাকবে না। হ্যালো!

৫২. ১৫ আগষ্টে উপসেনাপ্রধান সত্ত্বেও, নিম্নপদস্থদেরকে প্রতিহত বা পাল্টা ক্যু না করে, খুনিদের ট্যাঙ্কে রাজেন্দ্রপুর থেকে গোলাবারুদ সরবরাহকারী অপর খুনি খালেদ মোশাররফ এবং শাফায়েত জামিলকে বাধা না দিয়ে বরং সহায়তা দান এবং সেদিন দুপুরেই বঙ্গভবন, সেনাভবন, খুনিদের সঙ্গে মিটিং, ৯ দিনের মাথায় ৪ নেতার কারাবাস, ১০ দিনের দিন সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্যু– কোন বীরউত্তমের পরিচয়? '৭১ মানে কি? '৭১এর উদ্দেশ্য কি? এই স্বাধীনতার সুফল কি? [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, মোশতাক মন্ত্রীসভার বৈঠকে জিয়ার স্নানগ্রাশ পড়া ছবি, পৃঃ ৮৭]। '৭১এর মানে– জিয়ার কাছে মাথানত করা। '৭১এর মানে, নিজামীর পায়ের তলে সাভার স্মৃতিসৌধ। '৭১এর মানে– শহীদ জননীর গায়ে লাঠিপেটা। '৭১ মানে সেক্টর কমান্ডারদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন এবং লাশের অবমাননা। '৭১এর মানে বঙ্গবন্ধুকে জাতীয় বেঈমানের মর্যাদায় ইতিহাসে নথিভুক্ত। '৭১ মানে, জিয়াই বঙ্গবন্ধু এবং জানান দিতে জিয়ার নামে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। '৭১ মানে, গোলাম আজমদের বৈধতা। '৭১ মানে, অখণ্ড পাকিস্তান। '৭১ মানে, আইএসআই জিয়া ও গোলাম আজমের জারজ পুত্রবধু। '৭১ মানে, যুদ্ধাপরাধী-রা আমাদের গৌরব! '৭১ মানে, বঙ্গবন্ধুকে নিজ গ্রামে পুঁতে ফেলে, জিয়ার জন্য– জিয়াউদ্যান যার ছবি বারবার দিন মিডিয়ায় দেখতে হয়।

৫৩. একজন বাঙালি সেক্টর কমান্ডার কখনো অপারেশন সার্চলাইট করবে না। সম্ভব না। '৭১এ একজন রাও ফরমান আলী যে কাজ করেছিলো, মনেপ্রাণে পাকিস্তানি না হলে একজন জিয়াপাকিস্তানি কখনো মুক্তিযোদ্ধা নিধনসহ দেশজুড়ে নাশকতাবাদে লিপ্ত হবে না। একমাত্র রাও ফরমান আলীর পক্ষে যা সম্ভব, ২৫শে মার্চের বিপুল গণহত্যা, জিয়ার '৭৭ এর উদাহরণ, ব্যতিক্রম কিসের? নৃশংস রাও ফরমান আলী এবং জিয়াপাকিস্তানি দু'জনই কি ব্যাপকহারে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা নিধন করেনি? নাৎসী হলোকস্টের বিচার হলো, বাংলা হলোকস্টের বিচার কেন বন্ধ? ১৯৯৪ সনের রুয়ান্ডা এবং '৯৬এর বসনিয়ার হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে, গণহত্যাকারীদের শাস্তি হয়েছে। লাইবেরিয়ার গণহত্যার বিচার কাজ শুরু হয়ে গেছে। নাৎসীদের বিচার এখনো চলছে। ২০০০ বছর আগে জুলিয়াস সিজার হত্যাকান্ড এবং ১০০ বছরের আর্মেনিয়ানদের বিচারের জন্য কোর্ট এখনো উন্মুক্ত। আমাদের দেশের গোলাম আজমদের বিচার হলো না কেন? কে দায়ী? জিয়াবাদে অন্ধ বাঙালি ৩০ লক্ষ শহীদদেরকে অপমান করেছে,

নীরব থেকে। জিয়া আর ইয়াহিয়া, '৭৭ আর '৭১এ একই দুষ্কর্ম করেছে। জিয়া আর ইয়াহিয়া একই মন-মানসিকতার দুস্কৃতকারী, প্রমাণ করেছে। '৭১এর খুনিদের কেন বিচার হলো না, তার মূলে জিয়া। জিয়ার জন্য আজ দেশের এই অবস্থাহীনতা। জিয়া, ইয়াহিয়ার ব্যর্থতাকে সফলতায় পূর্ণ করেছে। ১৫ই আগস্ট কায়েম করে মুক্তিযুদ্ধকে শেষ করে দিয়েছে। সৌদির স্বীকৃতি আদায় করতে ১৫ই আগস্ট, একের পর এক, সংবিধানের খৎনা দিয়ে দেশকে মৌলবাদ বানানো। জিয়া এবং রাওফরমানআলী দু'জনেই কি করেনি– অপারেশন সার্চলাইট?

৫৪. হত্যাকাণ্ড শেষে "তাতে কী" মন্তব্যে জিয়ার মধ্যে ষড়যন্ত্রের চেহারা প্রস্ফুটিত।

৫৫. "তাতে কী" মন্তব্য, জিয়ার সঙ্গে সিআইএ ও আইএসআই ষড়যন্ত্রের প্রমাণ করে।

৫৬. "তাতে কী" মন্তব্য, দেশের মধ্যে '৭১এর ঘাতক-দালালদের উপস্থিতি এবং নাশকতা কর্মকান্ডের সম্পর্ক নিশ্চিত করে।

৫৭. "তাতে কী" মন্তব্য, জিয়ার সঙ্গে সকল খুনিদের পূর্বের যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৫৮. "তাতে কী" মন্তব্য, পরবর্তীতে জিয়ার মৌলবাদ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সিফিলিসের প্রতি সমর্থন এবং সৌদি জঙ্গীবাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। গোলামের দেশে প্রত্যাবর্তনের কারণ নিশ্চিত করে। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, পৃঃ ৪৮-৫২]। দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকরণ এবং সংবিধানের খৎনা, নিশ্চিত করে।

৫৯. "তাতে কী" মন্তব্য, তার সঙ্গে খুনিদের ২০শে মার্চের ষড়যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে। [দ্রঃ ইনসাইড র‍্য দ্য ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস, পৃঃ ৬]।

৬০. "তাতে কী" মন্তব্য, তার বাসভবনে '৭৫এর মার্চ মাসে খুনি ওসমানী, রশিদ ও ফারুকের বৈঠকের পর, ডাস্টবিনে পাওয়া নীল নকশাটির সত্যতা প্রমাণ করে যা নিয়ে 'র'এর পরিচালক মি. কাও নিজে এসে বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। আশোক রয়না রচিত বই, 'র ইনসাইড ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস' এসব তথ্য পাওয়া যাবে। এই বইটি বিগ্রেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন তার "রক্তাক্ত অধ্যায়" বইতে অনেকখানিই উল্লেখ করেছেন। বাঙালির এসব তথ্য জানা থেকে মুক্তি নেই। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে বলে দাবী করে, তাদেরকে এসব বই পড়তে হবে। কেন নয়? [দ্রঃ পৃষ্ঠা ৫২... তদন্ত ইঙ্গিত দেয়, পশ্চিমা এজেন্সিগুলো সক্রিয় হচ্ছে, 'র‍্য' এজেন্ট এ তথ্য সংগ্রহ করে জিয়ার বাড়িতে মেজর রশিদ, ফারুক ওসমানির মিটিং-এ। মিটিং-এ তিনঘন্টা ব্যাপী ক্যু নিয়ে আলোচনা। জিয়ার বাড়ির ডাস্টবিনে নীল নকশার একটুকরো কাগজ ফেলে দিলে র‍্য-এর এজেন্ট সেই নকশাটি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়।] এই কাজ,

কোন মুক্তিযোদ্ধার? জিয়া যে বঙ্গবন্ধুর খুনি তা তার ১০ বছরের কর্মকান্ডে পরিষ্কার। স্বাধীনতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডই জিয়ার একমাত্র কর্মকাণ্ড। মুক্তিযোদ্ধা খুন। '৭১এর অপরাধীদের বৈধতা। ৫ম সংশোধনীর রাষ্ট্রদ্রোহীতা। সামরিক শাসন এবং ৫ম সংশোধনী – জিয়ার একমাত্র অর্জন। আর '৭১ এর অর্জন –জিয়া।

৬১. "তাতে কী" মন্তব্য, জিয়ার পাকিস্তান-সৌদি কানেকশন প্রতিষ্ঠা করে। গোলাম আজমের সঙ্গে সৌদি কানেকশনের মূল, সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সৌদি জিহাদে জিয়া-গোলামের প্যাক্ট সৌদির উদ্দেশ্য সাধনকারী। সৌদি উদ্দেশ্য সাধনকারী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নামে– দ্বি-জাতিতত্ত্ববাদী এই নব্যজিন্নাহ, মওদুদীবাদী, বিশ্বাসঘাতক জিয়ার পাকিস্তানের পতাকার প্রতি সমর্থন। যার প্রমাণ তার প্রতিটি কর্মকান্ডেই, পাকিস্তানের ছায়া। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , পৃঃ ১৭১, ২২৬, ২৮৬-২৮৬, ২৭৭-২৭৯]। জিয়ার পাকসারজামিনসাদবাদ প্রীতি। সংবিধানের মুসলমানী। মাইনরিটিদেরকে মুসলমান বানিয়ে ফেলা।

৬২. "তাতে কী" মন্তব্য, হত্যাকান্ডের সঙ্গে গোলাম-জিয়া-পাকিস্তান-সৌদি-চীন-আমেরিকার পূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন এবং সায় প্রকাশ করে। জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ এই বইয়ের পাতায় পাতায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ফর্মূলায় নিয়ে আসার নীলনকশা কিং ফয়সালের মুখে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার ইঙ্গিত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৌদি গোলাম এবং জিয়ার একাত্মতা। জিয়ার জিন্নাহবাদ মানেই, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। জিয়ার মৌলবাদ আর ৩৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন – এক। জিয়া, কায়েদীবাদী এবং মওদুদীবাদীর আদর্শ। জিয়া ৩৮ অনুচ্ছেদ খণ্ডনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ছেটে সংবিধানের মুসলমানী দিয়ে প্রমাণ করেছে সে মহা-মৌলবাদী দানব।

৬৩. মুক্তিযোদ্ধা হলে নিশ্চয়ই সে সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈরাজ্যকারক লিফলেট রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য এসবই তার চেতনার দায়িত্ব। আবার একজন আইএসআই এজেন্টের জন্য গণহত্যাও সম্ভব যখন সে নিজেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের জন্য সৃষ্টি করে ৭ই নভেম্বরের জঘন্য ষড়যন্ত্র। জিয়া, মৌলবাদ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সিফিলিসে আক্রান্ত চরম ক্ষমতালোভী চক্রান্তবাদ এবং উন্মাদ। এসব ষড়যন্ত্রের কথা জিয়ার নির্বাসিত ভিকটিম ফারুক রশিদের মুখ থেকে বারবার বেরিয়ে এসেছে– জিয়াবাদের সমালোচনায়। বারবার এরা বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তবাদী জিয়াকে খুন করতে ক্যু করেছিলো। কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হলেও, ফারুক-রশিদকে দেয়া হলো নির্বাসন। কেন? খুনি কর্নেল মহিউদ্দিনের ভাষায়, "১৫ই আগষ্টের ঘটনায় জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিলো। তাই জিয়া এই খুনিদের প্রতি দুর্বল ছিলো", (দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, পৃঃ ১১৬)। রক্তাক্ত অধ্যায়, চ্যাপ্টার ৩,৪,৫।

এখানে রয়েছে জাতীয়-বিশ্বাসঘাতক এবং পাকসারজামিনসাদবাদ জিয়াউর রহমান নামক এক খুনির– বিশ্বকোষ। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৫১-৫২]। জিয়া, ইয়াহিয়া ও কিসিঞ্জারের '৭১এর ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিয়ে শত্রুদেশের প্রিয়ভাজন হয়েছে। জিয়া, খুনিদেরকে জেলে না দিয়ে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে প্রমাণ করেছে সে রাষ্ট্রদ্রোহী যার শাস্তি মৃত্যুর পরেও সম্ভব। একজন '৭১এর শত্রুবাহিনীর গুপ্তচরের ঠাঁই এদেশের মাটিকে অপবিত্র করেছে। একজন খুনি জিয়া, সেনাবাহিনীকে করেছে, শত্রু। সৃষ্টি করেছে দৃষ্টান্ত মানবাধিকারহরণ এবং গণহত্যার। জিয়াকে রাষ্ট্রদ্রোহীর পদক দিয়ে, বীরউত্তমদেরকে বীরউত্তম কলঙ্ক থেকে মুক্ত করা কেন জরুরি নয়? এই বীরউত্তম– খুনির দোষে বিষাক্ত।

৬৪. একজন মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষমতার জন্য একজন পঙ্গু তাহেরকে অপব্যবহার করে, তাকে দিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না, খুনিদেরকে রেডিওতে সূর্য সন্তান আখ্যা দিয়ে সেনাবাহিনী জুড়ে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না। [তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান পৃঃ ২০৫]... "মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে মনোনীত করি সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়ির অন্ত ছিলো না,এই ক্ষেত্রে জাসদ আমাদেরকে সকল বাকশালী চরদের নিশ্চিহ্ন করতে সকল আশ্বাস দেন, আমরা কর্নেল তাহেরকে আরো বলেছি– জাসদ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতেই চায় তাহলে জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।" [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, চ্যাঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৬]। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বই থেকে "বঙ্গবন্ধু ও পবিারের হত্যাকাণ্ড।" এসব বইয়ে একজন উন্মাদ, পাগলা জিয়ার মুখ। সাড়ে পাঁচ বছরে কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিধন করেছে। কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধার রক্ত তার দুই হাতে। শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা তাহেরের হত্যাকে কেন্দ্র করেই সে ইয়াহিয়ার মতো খুনি। যে সাহস ভুট্টো পর্যন্ত করেনি, বঙ্গবন্ধু খুনের সব ব্যবস্থাই জিয়া বহু আগে থেকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে আলোচনা করে সম্পন্ন করেছিলো, নাশক জাসদ এবং গণবাহিনীর সঙ্গে শেখ হত্যার চুক্তি। কর্নেল তাহেরকে সে বিভিন্ন জনের কাছে তদবিরে পাঠায়। তাহেরকে সে প্রচণ্ড ব্যবহার করে দেশজুড়ে নাশকতা এবং সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজে। বাকশাল নিয়ে যে বিভ্রান্তি সেটাও জাসদ এবং গণবাহিনীর কাজ। জিয়ার হাতে তাহের অপব্যবহৃত এবং খুন, দুটোই হয়েছে। একাজ আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? জিয়া, বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েমের প্রধান পাইলট। সাড়ে পাঁচ বছরে এতো ক্যু, ব্যাপার কী? সবাই কেন জিয়াকে হত্যা করতে চায়? নাকি জিয়াই সবাইকে হত্যা করতে চায়? '৭১ এর অর্জন কী – ক্যু, সামরিক শাসন এবং মৌলবাদ আমদানি? সেনাপ্রধানের কাছে জিজ্ঞাসা, ক্ষমতার জন্য এই জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কে স্থাপন করবে? জিয়ার হাতে মুক্তিযোদ্ধা খুনের রক্ত দিয়ে সে জিয়াউদ্যান নামের বাংলার মাটিকে করেছে কলঙ্কিত।

৬৫. একটি নব্য স্বাধীন দেশের উপসেনাপ্রধান, নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে এহেন চক্রান্ত করবে না, যা দেশকে পুনরায় '৭১ পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। [দ্রঃ শফিউল্লাহর জবানবন্দী– "স্যার! এতোদিন তো চীফ অব আর্মি স্টাফ থাকলেন। এখন এই পদটি জিয়াউর রহমানের জন্য ছাড়িয়া দেন। [দ্রঃ কর্নেল তাহেরের বক্তব্য. বাঙালির কলঙ্ক মোচন, পৃঃ ৯০]। জিয়া, '৭২ থেকেই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে লাগাতার নৈরাজ্যবাদ এবং গুপ্তহত্যার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করেছে– আইএসআই।

৬৬. শফিউল্লাহর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথোপকথন– "জিয়া বারবার বলিতেছে, সে বেটার সার্ভিস দিতে পারবে, তোমাকে সরাইয়া দেয়ার জন্য।" দ্রঃ শফিউল্লাহর জবানবন্দী। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো দেশগড়ার কাজ বাদ দিয়ে বারবার বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রের এসব তথবির করবে না। পদ নয়, একজন মুক্তিযোদ্ধা চাইবে, দেশ। জিয়া কখনো মুক্তিযোদ্ধা নয়। সে চেয়েছে– ক্ষমতা। তাহের বা খালেদ বা হায়দারের মতো মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার সামান্যতম অবদানও ছিলো বলে কোথাও প্রমাণ নেই। জিয়া বিদ্রোহ করেনি, আত্মরক্ষা করেছিলো। [লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে]। কালুরঘাট শেষ করেই ভারত। এরপর থেকে তার কর্মকাণ্ড কী? একটু জানাবেন কী? বাকী ৮ মাস সে কি কি করেছিলো? কোন অপারেশন? কোথায়? কার সঙ্গে? তার সম্পর্কে কোন বীরত্বের কাহিনী কোথাও লেখা নেই যা একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা পর্যন্ত গর্ব করে বলতে পারে। আমি তাকে সর্বনাশের আরো কঠিন শব্দে বর্ণনা করতে চাই। জিয়া না জন্মালে, দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। বরং ১১,০০০ খুনি গোলামদের বিচার হতো। জিয়া না জন্মালে, এদেশের অবস্থা এতো কঠিন ব্যর্থতায় পৌঁছুতো না। জিয়া, ৩১/১২/৭৫এর গেজেট জারি করে দেশকে অখণ্ড পাকিস্তান ঘোষণা করেছে। খালেদা, নিজামী ও আইএসআই ১৩/১০/০১ তারিখে, একসঙ্গে এদেশের মাটিতে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

৬৭. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হত্যার বর্বর খবর শুনে সেনা প্রধানের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবে না। দ্রঃ শফিউল্লাহর জবানবন্দী, "খালেদ মোশাররফকে ৪৬নং ব্রিগেডে পেয়ে তাড়াতাড়ি সাফায়েত জামিলকে সাহায্যের নির্দেশ দেই। কারণ তখন পর্যন্ত পূর্বের দেয়া নির্দেশের কোন তৎপরতা দেখিতে পাই নাই। এক পর্যায়ে ডেপুটি চিফ জিয়া বলিল– "খালেদকে পাঠানোর দরকার নাই। সে সব নষ্ট করে দেবে। ...ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট এ্যাটাক আস।" অফেন্স ঠেকানোতে জিয়ার প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র। 'ইন্ডিয়া' শব্দটি জিয়ার মুখে বারবার উচ্চরিত হয়েছিলো, যা ৭ই নভেম্বরের অভিশপ্ত দিবসে বলদ খালেদের বিরুদ্ধেও প্রোপাগান্ডার কাজে প্রচণ্ড ব্যবহার করেছিলো জিয়া। ইন্ডিয়া নামটি জিয়া তার সর্ব অপকর্মে ব্যবহার করেছে। ইন্ডিয়া নামটি সে মৌলবাদীদের কোর্টে ব্যবহার করেছিলো বিশ্বকাপের ফুটবলের মতো। সেনাবাহিনীর

কাছে ভারতকে সে প্রোপাগান্ডা শব্দ করেছিলো। এবং ভারতের এজেন্ট হিসেবে খালেদকে সফলভাবে চিহ্নিতকরণ। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ৬৮-৬৯, তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান] ফলে যেভাবে খালেদের মৃত্যু হলো, এবং একজন বীরউত্তম খালেদের দাফন, যেন সে চোর। এই চ্যাপ্টারটি অত্যন্ত দুঃখের, জিয়া যখন ক্ষমতার শীর্ষে, ৭ই নভেম্বরের রাতে বনানী গোরস্থানে ভীত সন্ত্রস্ত ৪/৫জন আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে বাংলার এক দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার কবর হলো ডাকাতের কবরের মতো। বিউগল বাজেনি, পতাকায় মোড়ানো হয়নি তার কফিন, তাকে মাটি দেয়া হলো যেন সে খুনি। মর্গে দুই দিন গলে-পচে, পোকামাকড়ের খাদ্য হয়ে মাটিতে পড়েছিলো বাংলার এক সেক্টর কমান্ডার এই বীরের মৃতদেহ। জিয়া তাকে হুকুম করে খুন করিয়েছিলো। খালেদ, হুদা ও হায়দারের মৃতদেহগুলো কুকুরের দেহের মতো মর্গে ফেলে রেখেছিলো জিয়া। এই কি একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়? জিয়া কি মানুষ? তাদের কবরের কেন হদিস নেই? ক'জন জানে, তাহের, হুদা, হায়দারের– কবর? কে যায় তাদের কবরে– মৃত্যুবার্ষিকীতে? জিয়ার কবর বসে আছে রাষ্ট্রের ১০০০ কোটি টাকার সম্পত্তির উপর। কেন? আমাদের প্রশ্ন, এইসব দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা কি দেশ স্বাধীন করে অন্যায় করেছিলো? তারা বিশাল বিশাল অপারেশন করে অন্যায় করেছিলো? তাহের কি পা হারিয়ে খুনির নিদর্শন? একমাত্র যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন ছাড়া এদেশে জিয়ার কৃতিত্ব কি? তার জন্য জিয়া উদ্যান কেন? সংসদে কর্নেল শফিউল্লাহ কি বলেছিলো? ""১৫ই আগষ্টে ৪৬ বিগ্রেড কমান্ডার আমার কথা শোনেনি। সে জিয়াউর রহমানের কথা শুনেছে।" আমার প্রশ্ন, খালেদ মোশার-রফকে এভাবে খুন করে, লাশের চরম অবমাননা করে সে কি, মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে? সে বঙ্গবন্ধুর লাশ ৩৬ ঘন্টা ৩২ নম্বরে গলিয়ে পচিয়ে দেশকে অবমাননা করেছিলো। তাহেরকে রাষ্ট্রদ্রোহীর অপরাধে জফাঁতে চড়িয়ে গোলামকে ৭৪৭নং উড়োজাহাজে করে দেশে নিয়ে এলো। বিচারের বদলে নাগরিকত্ব এসব কিসের লক্ষণ?

৬৮. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো সাজানো ৭ই নভেম্বরের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিবর্তনবাদী কর্নেল তাহেরকে দিয়ে ৭ই নভেম্বরের নীলনকশা এবং শাফায়ত জামিলকে দিয়ে নিজ বাসভবনে স্বেচ্ছা গ্রেফতারের কৌশল করে সিপাই বিপ্লবের নামে সাজানো অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক ধ্বংসের পথ আনবে না। মুক্তিযোদ্ধা হলে, এই জঘন্যতম কাজ সে করবে না। একমাত্র তাহের হত্যাই প্রমাণ করে, সে মুক্তিযোদ্ধা নয়। লুৎফা তাহের এখনো খুনি জিয়ার বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে মামলা করে স্বামীর মুক্তিযোদ্ধা সুনাম কলঙ্কমুক্ত করতে পারে। রোমের কোর্ট এখনো ২০০০ বছর আগে জুলিয়াস সিজার হত্যাকান্ডের বিচারের অনুরোধ গ্রহণ করবে। [ল্যাগেসি অব ব্লাড, চ্যাপ্টার ক্যু মিউটিনি এক্সিকিউশন।] এই চ্যাপ্টারটি গণহত্যাকারী জিয়ার বিশ্বকোষ, "ওদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখো", বলেছিলো, খুনি জিয়াউর রহমান। এই বইটি পড়া ছাড়া বাঙালির গন্তব্য নেই। বাংলাদেশের

হিটলার জিয়াকে চিনতে হলে এই বইটি অবশ্য পাঠ্য। এই বইটি ব্যাপকভাবে জানাজানি হলে বাংলার মানুষ খুনি জিয়াকে সনাক্ত করতে এক মুহূর্তও দেরী করবে না। এই জাতি, মুক্তিযুদ্ধ করা জাতি। আর এই বইটি পাঠ, বাংলাদেশের আরেকবার গণ আন্দোলনের জন্য জরুরি। মুক্তিযোদ্ধা? কিসের মুক্তিযোদ্ধা সে? কি তার রেকর্ড? কি অবদান? মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কোন অবদান নেই। যা আছে, তা বঙ্গবন্ধুর বরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণের পর প্রমাণ। জিয়া, মুক্তিযোদ্ধা হত্যার জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করে হুকুম দিয়েছিলো– সবগুলোকে জবাই করে দাও।

৬৯. ১০ বছরে ১১টি পদ! তিন রাষ্ট্রপতিকে বুট-আউট! ১৭ খুনিকে গেট-আউট! খুনিদেরকে দূতাবাসে নির্বাসন। নিজেকে খুনের বিচার থেকে বাঁচাতে কলঙ্কিত পাপের বোঝা, অবৈধ এবং ব্যভিচারের দুর্গ– "ইনডেমনিটি" বৈধকরণ! শেখ এবং জেলহত্যার বিচার প্রক্রিয়াকে বারবার বন্ধকরণ। সুপ্রীম কমান্ডার বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রে খুনিদেরকে প্ররোচনা, ক্ষেত্র তৈরি এবং নেতৃত্বদান, কোন বীরউত্তমের? [দ্রঃ ১৫ই আগস্ট ও ৭ই নভেম্বর, ১৯৮৩, স্যাটারডে পোস্টে ফারুক রশিদের ইন্টারভিউ।] বঙ্গবন্ধু কি হিটলারের মতো মৃত্যুকূপ খুলে মানুষ খুন করেছিলো? সেকি বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে অন্যায় করেছিলো? সুতরাং তাকে কেন এভাবে অন্যায়ভাবে, সপরিবারে খুন করা হলো? আমরা আরেকটা '৬৯ চাই। আরেকজন বঙ্গবন্ধু চাই এবার যে জিয়াকে ঠেকাবে। আরেকটি ৭ই মার্চ চাই, জিয়া ঠেকাতে। আরেকটি ২৫শে মার্চ, ইয়াহিয়ার বদলে এবার জিয়াকে তাড়াতে। আমরা মৃত জিয়ার বিচার চাই। আমরা পশু হত্যা করতে আরেকটি বঙ্গবন্ধু চাই। জিয়াকে হত্যা না করে খালেদ মোশাররফ যে ভুল করেছিলো, তার মাশুল দিচ্ছে জাতি।

৭০. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো ৭ই নভেম্বরের সাজানো ক্যু করে বিভিন্নভাবে নিজেকে হিরো বানানোর প্রতারণা করে, জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে ক্রমশ মিলিটারি চেতনায় পতিত করবে না। আইয়ুবের মতো দেশকে পুনরায় সামরিক শাসনে অভিশপ্ত করবে না। ইতিহাস ও মানুষের চেতনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিকৃত বা মুছে দেবে না। মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করবে না। ৭ই নভেম্বর শতশত মুক্তিযোদ্ধা এবং খালেদ মোশাররফের মতো একজন বীরকে হত্যা করে, অপুরুষ তাহেরকে কুকুরের মতো অপব্যবহার করে, নিজেকে সংহতির বীর করবে না। বীরউত্তম এক অণ্ডকোষহীন সমকামী খালেদকে হত্যা করবে না। বীরউত্তম নপুংসক বলদ হায়দারকে খুন করবে না। হায়দার, ইতিহাসে যে নাকি ১৬ই ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের মঞ্চে ভারতীয় জেনারেল অরোরার পাশে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মিত্রপক্ষের গৌরব। হায়দার, যার নেতৃত্বে হোটেল ইন্টারকমে ঐতিহাসিক অপরাশেন সফল হলো। জিয়ার কোন বীরত্বেরই প্রমাণ নেই যেজন্য সে বীরউত্তম! যেজন্য তার নামে পুরো দেশ একটা বিলবোর্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেজন্য ইতিহাসে সে সংহতির বীর। হত্যা নাকি সংহতি? '৭১কে জিয়া আবার

কার মিলিটারি শাসনে ফিরিয়ে দিয়েছিলো? সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা ও শেখ হত্যা শেষে উল্লাস? [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, জিয়া দ্য ম্যান এন্ড দ্য মিথ। জিয়া একহাতে খেতে পারতো, অন্য হাতে খুন।} [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, চ্যাঃ ১১]। খুনি জিয়া, বীর সেক্টর কমান্ডারদের দেহগুলো কুকুরের দেহের মতো মর্গে রেখে পচিয়েছিলো, দুই দিন। মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু তাহেরের মতো অন্যান্য বীরদের কবরের হদিস না থাকলেও, জিয়ার কবর, পতাকার চেয়ে বড়ো হয়ে বিরাজ করছে জাতির মাথায়। জিয়ার কবর, দেশের বুকে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র চিহ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে সেতো গায়েব করে ষিয়েছে মানুষের দৃষ্টি থেকে। খালেদ-হুদা-তাহের এদের কবরের খবর নেই। কেন? এরা কি সবাই '৭১এ পাপ করেছিলো? সেনাপ্রধানের কাছে আমার প্রশ্ন, এই কি মুক্তিযুদ্ধের অর্জন? অন্যান্যদের কবর কোথায়? মুক্তিযুদ্ধ করে খালেদ-তাহের-হায়দার-হুদা কি ভুল করেছিলো? জিয়া, '৭১এর একমাত্র অর্জন? আমার প্রশ্ন, এইসব সেক্টর কমান্ডারদের কবর কি জাতির কাছে ন্যূনতম স্বীকৃতির দাবী রাখে না? জিয়া কি দেশের একমাত্র পতাকা? দেশ কি তার জন্য স্বাধীন হয়েছে? হ্যাঁ, এদেশ শুধু জিয়ার জন্য স্বাধীন হয়েছে। তার পরিবারের জন্য।

৭১. একজন সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধের অপর চারজন সেক্টর কমান্ডারকে হত্যা করবে কেন? ৭ই নভেম্বরে খালেদ মোশাররফ, হুদা এবং হায়দারকে একমুহূর্তে হুকুম দিয়ে হত্যা, কোন মুক্তিযোদ্ধার কাজ? তাহেরকে এমন নিষ্ঠুরভাবে খুন, কোন মুক্তিযোদ্ধার? [দ্রঃ অসমাপ্ত যুদ্ধ ২য় খন্ড।] তাহেরকে যে নির্বিচারে খুন করেছিলো জিয়া, শুধু এই একটি অপরাধেই তার বিচার হওয়া উচিত। তার দেহাবশেষ জিয়া উদ্যানে নয়, চলে যাক পাকিস্তানে। জিয়া কেন দেশের বীরদেরকে এভাবে খুন করেছিলো? এই সেনাবাহিনীকে সে জাতির শত্রু করেছে।

৭২. দেশে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধা ছিলো চাইলে যা খুশি করতে পারতো, যারা চেষ্টা করেছিলো জিয়ার হাতে একএক করে জীবন হারালো। যারা বেঁচে, তারা নির্বাসিত বা বেকার। জিয়া, একেরপর এক খুনের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা অপহরণ করে নিয়েছিলো। শেখ হত্যার একমাত্র সুফলভোগী জিয়া, কর্নেল ফারুক, দ্রঃ '৭৬এর ২রা আগষ্টের বিবিসি ইন্টারভিউ। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ১৯৫, ২০৩-২০৫]। '৮৩এর ১৫ই আগষ্টে ও ৭ই নভেম্বরের স্যাটারডে পোস্টে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার। '৭১ এরপর একমাত্র জিয়া এই দেশে খুনের ঐতিহাসিক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। জিয়া নতুন প্রজন্মকে বিএনপির মাধ্যমে ক্যাডার প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে। জিয়া, যুবক ও ছাত্র-সমাজকে খুনি তৈরি করেছে। জিয়ার দলে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির সমাবেশ। জিয়া, সারা বাংলাদেশকে নষ্ট করেছে তার মৌলবাদ, ক্যাডারবাদ, অস্ত্রের রাজনীতি চালু করে। গডমাদার এবং হেরোইন ও কোকেইন জিয়া– দেশকে তাদের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য বানিয়েছিলো। পুরো ছাত্র এবং যুব সমাজের এই যে অবক্ষয়, যার মূলে মহাদানব– জিয়া।

৭৩. ৭ই নভেম্বরের সাজানো ক্যু করে সারাদেশ জুড়ে নৈরাজ্য এবং সহিংসতা, সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডে ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে হিরো বানানোর জঘন্য ষড়যন্ত্রবাদ... জিয়ার আলোকিত ফাঁসির মঞ্চে মুক্তিযোদ্ধাদে লাইন... বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যা খুনিদের পদোন্নতি এবং পুনর্বাসনের মতো জঘন্য দৃষ্টান্ত, ৩৬ বছরে জিয়া ছাড়া আর কোন মুক্তিযোদ্ধা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো? জিয়া, খুনি আওরঙ্গজেবের জারজ দৃষ্টান্ত, পিতাকে বন্দী এবং নিজের বড়োভাইকে খুন করে ক্ষমতা নিশ্চিত করেছিলো। জিয়া, আইয়ুব শাসন মুক্ত হতে যে মুক্তিযুদ্ধ, সাড়ে তিন বছরের মাথায় তার ইয়াহিয়াবাদ জঘণ্য ও উন্মাদ ম্যানিক সাইকোসিস রোগির চরিত্র, পরবর্তীতে দেশকে আউয়ুবের চেয়ে দীর্ঘ সামরিক শাসনে ডুবিয়ে দেয়া। শুধুই কি তার ইয়াহিয়া চরিত্র? ভুট্টো এবং হিটলার? '৭১এর সব রাজাকার, মওদুদী, আলবদরদেরকে রাজবন্দী ঘোষণা করে গৌরবের সঙ্গে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাগলা কুকুরের মতো ৭ই নভেম্বরের উত্তেজিত বক্তৃতার মাধ্যমে সকল রাজাকারদের নিঃশর্ত মুক্তির ঘোষণা। কেন? তার স্ত্রী খালেদা, শহীদ জননীসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে গোলাম আযমের বিচারের প্রতিশোধ নিতে দেশদ্রোহীর মামলা দায়ের করেছিলো। "শহীদের মা দেশদ্রোহী আর গোলাম আযম দেশপ্রেমিক?" বেগম জিয়া তাকে নাগরিকত্ব দিয়ে কী প্রমাণ করলো? সে জিয়ার চেয়ে বড়ো ষড়যন্ত্রবাদী? গোলামের সকল বই পুনর্মুদ্রণ এবং তার পুনর্বাসন? দেশে-বিদেশে তার ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং '৭১এর মতো আবার স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে লবিষ্ট গোলামের দ্বারা দেশে-বিদেশে মৌলবাদের বীজ রোপণ এবং দেশদ্রোহী কর্মকান্ডের সুযোগ দান? কে এই বেগম জিয়া? গোলামকে নাগরিকত্ব দিতে কোর্টকে প্রতারণা? বেগম জিয়া, আসলেই কে? বেগম জিয়া স্বাধীনতার ৯ মাস কোথায় ছিলো? কার ঠিকানায়? আসুন! সবাই মিলে বলি "বীরশ্রেষ্ঠ গোলাম আযম!" বলি, গোলামআজম– পায়েন্দাবাদ। খালেদা জিয়া পায়েন্দাবাদ এবং এর মূলে জিয়া।

৭৪. 'ভারত' শব্দটিকে সেনাবাহিনীতে তার সকল অপকর্মে ব্যবহার করে ভারতের সঙ্গে খালেদ মোশাররফকে জড়ানোর ঘৃণ্য চেষ্টা, সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারত বিরোধী প্রচারণা, উত্তেজনা। সমকামী তাহেরকে বলদ বানিয়ে সারা ঢাকা শহরে লিফলেট রটিয়ে দিয়ে প্রতারণা "খালেদ ভারতের চর"...নৈরাজ্য এবং ষড়যন্ত্রবাদী জিয়ার এই দৃষ্টান্ত একমাত্র জিয়া ও বেগম জিয়া ছাড়া গত ৩৬ বছরে আর কে স্থাপন করেছে? যারা করেছিলো, তারা দুইজনেরই হাতে প্রাণ হারিয়েছে। জিয়া সবাইকে ধোকা মেরেছে তার ছেঁড়া লুঙি ও ভাঙ্গা স্যুটকেসের রাজনীতি দিয়ে। গডফাদার উন্মাদ ইদি আমিনের মতো জিয়ার হাতে হত্যার পর হত্যার দৃষ্টান্ত। হত্যার দিন রাত দু'টোয় জিয়া কর্নেল তাহেরের মাকে নিজ মুখে বলেছিলো– "মা আমি তো আপনার আরেকটি ছেলে। আপনি কিছু ভাববেন না।" জিয়া একজন মহা-স্বৈরাচারই নয়, মানবিকতার সকল সংজ্ঞা শূন্য। অসুস্থ্য এবং চরম সাইকোপ্যাথ। ক্ষমতা ও খুনের সিফিলিসে আক্রান্ত, তার ভেতরে

দৈত্যের ঘর, না হলে কেন সে তাহেরের মাকে মিথ্যে বলবে? জিয়া ষড়যন্ত্রের উন্মাদনার সিফিলিসে আক্রান্ত একজন নিকৃষ্ট স্বৈরাচারের ভাগাড়। সেনাবাহিনীকে 'ভারত' শত্রু করার গডফাদার। মিথ্যা প্রতারণাবাদী গডফাদার। সে ১৫ই আগস্ট '৭৫এও সেনাপতি অপুরুষ শফিউল্লাহর কাছে ভারত শব্দটিকে বারবার অপব্যবহার করেছে কুপ্রবৃত্ত তাড়িত হয়ে। দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান। ভারত শব্দটিকে সে বারবার ব্যবহার করে সংবিধান পরিবর্তনের সঙ্গে সৌদি কানেকশনটি সুস্পষ্ট করেছে। সৌদির কথা, ভারত– সৌদির শত্রু। সৌদি বাদশা, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, তার মতামতকে স্পষ্ট করেছে '৭১এ। সৌদি চায়নি, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ। গোলাম চায়নি। জিয়াও চায়নি। সৌদি ও সুদান এবং পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে যথাক্রমে– ১৬, এবং ৩১শে আগস্ট ১৯৭৫। [দ্রঃ গোলামের জীবনী – জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , ১৭২-১৭৫, পৃঃ ৩০ ও ৩৬]। [দ্রঃ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভাবনা।] জিয়া, '৭১এর পর এদেশে ভুট্টো ইয়াহিয়ার দৃষ্টান্ত। জিয়া সংবিধান থেকে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাকেই মুসলমানী দেয়নি, সে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষেত্রেই প্রস্তুত করেছিলো, সংবিধানে ধর্মের অংলকার জুড়ে দিয়ে জিন্নাহবাদের মওদুদী সংস্করণের দ্বি-জাতিতত্ত্ব। সংবিধান থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তুলে নেয়ার মধ্যেও তার ভারত বিরোধী জিন্নাহতত্ত্ব। জিয়া, মওদুদীবাদী এবং মৌলবাদী এক সংবিধান সন্ত্রাসী। জিয়া, '৭১ এর পর এদেশে সৃষ্টি করেছিলো ক্ষমতার জন্য খুনের রাজনীতি। ফলে দেশে আজ শুধু সংঘাত আর সংঘাত। এছাড়া কোন রাজনীতি নেই। জিয়া সংবিধানকে বারবার মুসলমানী দিয়ে, বাংলাদেশকে করেছে মুসলমান। এদেশে আর কারোই অস্তিত্ব নেই। কোথায় হিন্দু জাতীয়তাবাদি হিন্দু নেতৃবৃন্দ? দেখুন, জিয়া আপনাদেরকে কেমন মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে! জিয়াউদ্যান হয়েছে, খুনের রাজনীতির চর্চাকেন্দ্র। জিয়া, নষ্ট করেছে তরুণ সমাজ। সুতরাং বার্লিন দেয়ালের মত আজাই ভেঙ্গে ফেলুন এই জিয়াউদ্যান।

৭৫. ১৫ই আগষ্টের সকাল ৮টায়, সেনাপ্রধানকে দেয়া জিয়ার বক্তব্য, "খালেদকে পাঠিও না, ও সব নষ্ট করে দেবে, ভারত আমাদেরকে আক্রমণ করবে" এর সঙ্গে ৭ই নভেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে জিয়ার লিফলেট প্রোপাগাণ্ডা সরাসরি প্রমাণ করে জিয়া মুক্তিযোদ্ধা নয়, বরং '৭১এর রাওফরমান আলী। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচনের জবানবন্দী]। '৭৫এর ১৭ই এপ্রিলে পলপটও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কম্বোডিয়ার মুক্তির নামে– ঠিক একই রকম নাশকতাবাদের চরম স্বাক্ষর রেখেছিলো। নমপেন শহরে নেমেছিলো, ৭ই নভেম্বরের খুনির ঢল। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে, '৬৫তে জিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে "আলফা" পদক লাভ করে। জিয়া ১২ বছর বয়স থেকে পাকিস্তানে, পরবর্তীতে "পাকিস্তান পেন্টাগনের" গোয়েন্দা কর্মচারী। জিয়াপেন্টাগনি, সে বাংলাদেশ চেনে না, বাংলা পর্যন্ত লিখতে পড়তে জানে না। জিয়া একজন পাকি-ইমিগ্রান্ট ২য় প্রজন্ম। পাকিস্তান তার চেতনার মাতৃভূমি। সে পাকিস্তানের

জল-হাওয়ায় বড়ো হওয়া জিয়াপেন্টাগনি। সুতরাং পাকিস্তান-পেন্টাগনের লোক হয়ে বাঙলাদেশে এসে কোন দুঃখে সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া]। জিয়ার কর্মজগতের সব ট্রেইল কি প্রমাণ করে না, সে একজন বাংলাদেশ ভুলে যাওয়া দ্বিতীয় প্রজন্ম, যার মধ্যে বাংলাদেশ নেই? মাননীয় সেক্টর কমান্ডারগণ! পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা জিয়ার, বাঙালি অফিসারদের প্রতি দুর্ব্যবহার কি আপনাদের– অজানা? তার উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং ব্যভিচার! কোন দেশপ্রেমিক সংবিধান সংশোধন করে গণহত্যাকারীদের পুনর্বাসন করবে? আপনারা করবেন? মাননীয় সেক্টর কমান্ডারগণ, জবাব দিন, করবেন? এখন সময়, সত্য বলার। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। অনেক অন্যায়, হজম করা হযেছে। মাননীয় চিফ অব স্টাফ! আপনি এইসব করবেন? আপনারা কি এইসব দেখতেই, দেশ স্বাধীন করেছেন? জবাব দিন। তাহলে,ইয়াহিয়া-ভুট্টো কি দোষ করেছিলো? সামরিক শাসন এবং লুটপাট? জিয়াপাকিস্ত ানি তো তাদের রেকর্ডও ভঙ্গ করেছিলো। জিয়া, পাকিস্তানকে গোল দিয়েছিলো। ১৯৭৯, ১৯৯১ এবং ২০০১ এর সরকার যে লুটপাট, যতো স্বৈরাচার করেছিলো, আউয়ূব-ইয়াহিয়া একসঙ্গে কি এতো স্বৈরাচার ও লুটপাট করেছিলো? এতো বঞ্চনা? নরকে বসে ইয়াহিয়া আইয়ুব কি মজা করছে না, দ্যাখ শ-শালা! সুতরাং কেন মুক্তিযুদ্ধ? কেন ৩০ লক্ষ প্রাণ বিনাশ! '৭১এ আমি শহীদদের লাশ দেখেছিলাম। আমি ভুলিনি। আপনারা কি ভুলে গেছেন? আপনি? এই যে, হ্যালো! জিয়া ৬ বছর বয়সে এদেশ ত্যাগ করে ভারত যায়। ১২ বছর বয়সে পাকিস্তান। '৬৩ সনে সে গোয়েন্দা বিভাগে, '৬৫তে সামরিক প্রশিক্ষক, '৬৯এ দেশে। '৭১এ কোথাও নেই। হ্যালে! গুপ্তচর জিয়া- এবার মুক্তিযোদ্ধার মুখোশে। আমাকে বলুন, কে এই জিয়া? আইয়ুব কি তার চেয়ে স্বৈরাচার? জিয়া বিশ্বাসঘাতক কিছু রি-পেট্রিয়েটদের গডফাদার। লাস্ট হোপ। তার পারিবারিক গোরস্তান পাকিস্তানের মাটিতে শুয়ে আছে তার বাবা-মা। সেনাপ্রধানু! আপনারা কি পাকবাহিনী? নাহলে ব্যাখ্যা করুন, আমাকে নয়, নিজের ছেলের কাছে।

৭৬. ৭ই নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণের সঙ্গে সিপাইদের ভূমিকা এবং জিয়াকে মুক্ত করতে একই সিপাইদের গণবন্ধন এবং ৩টি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান বইটিতে আত্মস্বীকৃত খুনি ডালিমের শ্বেতপত্রে, সাজানো ৭ই নভেম্বরের তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যে অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন, এই জিয়া কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা? ইন্টারভিউ এবং ইন্টারনেটে ডালিম বলেছে, "যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি" বইতে সাজানো ৭ই নভেম্বরের গল্প। ল্যাগেসি অব ব্লাড, দ্যা কিলিং অব মুজিব। এই চ্যাপ্টারের প্রতিটি শব্দে জিয়ার সঙ্গে মুজিব হত্যার কানেকশন। এক নৃশংস্য জিয়ার চরিত্রকে সাক্ষ্য নিতে তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান এবং ল্যাগেসি অব ব্লাড বইটিকে কে অস্বীকার করে? রক্তাক্ত অধ্যায় এবং অসমাপ্ত যুদ্ধকে কে অস্বীকার করে? [দ্রঃ ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৬৭-৬৮, ৭৩, ৯২-৯৩, ৯৬, ১১৯, ১৪৫, ১৬৬, ১৮০-

১৮৮, ১৯৪-১৯৫, ২০৩-২০৪]। ক্যু-মিউটিনি ও এক্সিকিউশন মাস্টার জিয়ার চেয়ে আইয়ুব-ইয়াহিয়া কি অধিক নিরাপদ ছিলো না? '৭৭এর নিষ্ঠুর গণহত্যার যে ট্রেইল রেখে গেছে, জিয়া, আইয়ুব-ইয়াহিয়া যার কাছে শিশু। ওরা করেছিলো লুটপাট এবং গণহত্যা। জিয়া নষ্ট করে দিয়ে গেছে পুরো রাজনীতির জগৎ এবং দেশ। জিয়া করেছে, দেশ হত্যা। পতাকা হত্যা। সংবিধান হত্যা। বঙ্গবন্ধুসহ সকল স্বাধীনতার শক্তি হত্যা। "সেনাবাহিনীকে ডিসিপ্লিন করতে, সব জবাই করে দাও।" ৬নং গোপন সামরিক ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান, মেজর জহিরুল হক খানের প্রতি জিয়ার নির্দেশ। সে যথেষ্ট জবাই দেয়নি বলে তাকে বরখাস্ত। [দ্রঃ ভিডিও সশস্ত্রবাহিনীতে গণহত্যা, পরিচালক-আনোয়ার কবির]।

৭৭. অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বারবার নিজের পদোন্নতির পথ সুগম, আর কে করেছিলো? আইয়ুব খান? টিক্কা খান? ইয়াহিয়া? ১০ বছরের সামরিক শাসনমুক্ত হয়ে, ফের মাত্র সাড়ে তিন বছর থেকে আরো দীর্ঘ সামরিক শাসন? ১৫ই আগষ্টের মাধ্যমে প্রধান সেনাপতি, ৭ই নভেম্বরের মাধ্যমে সামরিক শাসক এবং প্রধান সেনাপতি। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ১১৭-১১৯] ফারুক-রশিদের দৃঢ় অভিমত ৩রা নভেম্বরের ক্যু'র নায়ক জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ নয়। তাহের-জিয়া এবং জিয়া-শাফায়েতের মধ্যে গোপন চুক্তি। জিয়াকে তার নিজ ভবনে ষড়যন্ত্রকারী শাফায়েতের তত্ত্বধানে স্বেচ্ছায় আটকে রাখা হয় [পৃঃ ১১৯]। অন্য কেউ নয়, সব অভ্যুত্থানেই একা জিয়া বিজয়ের সঙ্গে প্রতিবারই সে অক্ষত এবং প্রতিবারই অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা খুন। এই দৃষ্টান্ত এড়াবে, কার সাহস? ২৪শে আগস্ট '৭৫ থেকে জিয়া, ১১টি পদ পরিবর্তন এবং দখল, প্রতিবারই সশস্ত্রবাহিনীতে ক্যু-মিউটিনি এক্সিকিউশনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত একটি নব্য স্বাধীন দেশে, স্বৈরাচার ও সামরিক শাসন এবং '৭১এর নাখোশ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বারবার সংবিধানে টেরোরিজম এবং প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন, মাওলানা মন্নানের মতো খুনি যার মন্ত্রী, জিয়া কি বলতে চায়? বাংলার মানুষ তার এই ইয়াহিয়া চেহারাকে কি বলে ব্যাখ্যা করবে? হ্যালো! ওরা মানুষ হত্যা করেছে। আসুন আমরা পশু হত্যা করি। দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃষ্ঠা ৯৬ ঃ রশিদ তার সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছে, "জিয়া এই সময় সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাকে কত বুঝালাম, স্যার, আপনি এখনও অনেক ইয়াং। এখন আপনাকে প্রেসিডেন্ট মানাবে না। একটু অপেক্ষা করুন। এখন 'চীফ' আছেন ভালই আছেন। কিন্তু জিয়া অস্থির। অগত্যা আমি তাকে বলি, তাহলে স্যার এটা আমি পারবো না। আপনাকেই আপনার পথ করে নিতে হবে। আমি যতদূর পারি আপনাকে সাহায্য করব।" এবং পৃষ্ঠা ১৪৫ ঃ "প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিএমএলএ হিসাবে জিয়া থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু

তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতাটি থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করেন। সুতরাং সায়েমই সিএমএলএ থাকলেন, জিয়া অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডিসিএমএলএ-র পোষ্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপুত ছিল না, কারণ ভোরেই তিনি CMLA হিসাবে রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিলেছিলেন।" [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পুরো বই]। চলুন বলি, জিয়াই আমাদের স্বাধীনতার জনক। বেগম জিয়ার শাসন, "মুজিবের ঘোষণা ভিত্তিহীন।"

৭৮. ক্ষমতার জন্য ১৯টি রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। ২২বেঙ্গল হলো গোরস্থান। "জিয়া একহাতে খেতে পারতো, অন্য হাতে খুন।" [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড]। "সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে সবাইকে জবাই দাও।" ৬নং ট্রাইবুনাল কোর্টের চেয়ারম্যান, মেজর জহিরুল হক খানকে জিয়ার হুকুম। সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা ভিডিওতে চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার, কেন ফাঁসি, বিচারকেরা নিজেরাও জানে না। ভিডিও চিত্রে খুনের জঘন্য বিবরণ। ৯ মিনিটে ১৫টি ফাঁসির বিচার চূড়ান্ত। নামের সাযুজ্য থাকায়, অনুসন্ধান না করেই অন্য আনোয়ার বা মনোয়ারকে ধরে ফাঁসি। ফাঁসির কোন আগামাথা নেই। যারা ছুটি থেকে ফিরলো, রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে জেলখানা। সেখান থেকে মিলিটারি ট্রাইবুনাল শেষে ফাঁসি। গণকবরের বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে আনোয়ার কবিরের ভিডিও চিত্রে, সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যার ডকুমেন্টারিতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে, '৭৭এর নারকীয় বর্ণনা। চিত্রটি সংগ্রহ করুন। "ওদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখ।" –জিয়াউর রহমান। ইয়াহিয়া যে কাজ করেনি, আন্তর্জাতিক সমাজকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি। ইয়াহিয়া চাইলে আরো বেশি গণহত্যা করতে পারতো। বঙ্গবন্ধুকেও খুন করতে পারতো। করেনি। জিয়া একলার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে করেছে যা খুশি। জিয়া, আন্তর্জাতিক সব কম্যুনিটির অনুরোধ উপেক্ষা করে শতশত ফাঁসি দিয়েছে। নির্বিচারে খুন করে তাহের খুনের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জিয়ার সৃষ্ট বিধবার সংখ্যা কতো হাজার? ১৯টিক্যুর অধিকাংশই পাকিস্থানপন্থী। জিয়ার উদ্দেশ্য. সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে ধ্বংসে ফেলা। বাংলাদেশের মানচিত্র বদলাতে হলে '৭১এর পক্ষের শক্তিকে ধ্বংস। খুনি জিয়ার মধ্যে বহু স্বৈরাচারের কম্বিনেশন। এই মাপের স্বৈরাচারগুলোকে না চিহ্নিত করে বেঁচে থাকার অর্থ কী! তবু কেন "জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর?" কিসের "জিয়া উদ্যান?" আমার সন্তানকে আমি কি বলবো, একজন খুনির নামে – উৎসব? তাই কী? বিচার, সেনাবাহিনীর । আসুন আমরা ৭৫এর পশু হত্যা করি।

৭৯. ১৫ই আগস্টের মাধ্যমে প্রধান সেনাপতি, ৭ই নভেম্বরের মাধ্যমে ডেপুটি সামরিক শাসক, ৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বরে প্রধান সামরিক শাসক এবং সেনাপতি ও স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান, '৭৭এর ২১শে এপ্রিল মোশতাকের পর সায়েমকে পদচ্যুতি ঘটিয়ে প্রধান সামরিক শাসক এবং রাষ্ট্রপতি, '৭৭এর ৩০শে মে "হ্যাঁ-না"

রাষ্ট্রপতির ব্যঙ্গ ভোটে 'হ্যাঁ-না' ব্যঙ্গ রাষ্ট্রপতি। '৭৮এর ৩রা জুনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপতিসহ তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বাংলার বুকে ক্ষমতাবাদীর এই চরম দৃষ্টান্ত আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? এমন কি নৃশংস ভুট্টোও যা পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে '৭১এ খুন করে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ধৃষ্টতা। ইয়াহিয়া-ভুট্টো – বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড দিতে সাহস করেনি। জিয়া, খুনি বীর সেক্টর কমান্ডারদেরকে খুন শেষে হিরো হয়ে ৭ই নভেম্বরের মঞ্চে বক্তৃতারত এক উন্মাদ কুকুর। [দ্রঃ ফারুক-রশিদের সাক্ষাৎকারের ভিডিও]। ভুট্টোকে পর্যন্ত পরাজিত করে '৭১এর সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ সে করেছিলো। মুজিব হত্যা। [রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ৫২-৫৩। র‍্য-এর রিপোর্ট]। সাড়ে পাঁচ বছরে মহা-স্বৈরাচার জিয়া ১১টি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে প্রত্যেকবার দ্বৈত টুপির আশ্রয় নিয়ে খুন করেছে অসংখ্য '৭১। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার চরম ঘটনা। প্রত্যেকবার সে অসীম ক্ষমতার মালিক। জিয়া কি ঈশ্বর? নাকি দস্যু? [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড]। হ্যালো!

৮০. মহা-স্বৈরাচার জিয়ার '৭১ হত্যার প্যাটার্ন। ১৫ই আগস্টের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু, ২৪শে আগস্টে শফিউল্লাহ, ৭ই নভেম্বরে মোস্তাক, ২১ এপ্রিলে সায়েম, এদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতার বদল হয়েছে একমাত্র জিয়ার হাতে। জিয়াই প্রধান সেনাপতি, জিয়াই রাষ্ট্রপতি, জিয়াই সামরিক শাসক, জিয়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! জিয়াই হিরো, জিয়াই আদর্শ, জিয়াই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা। জিয়াই সব। জিয়াই সর্বত্র। জিয়া জিয়া-জিন্দাবাদ। জিয়াবাদ এবং জিয়াদেশ। বহুরূপী জিয়া, খুনিদেরকে পুরস্কার দিয়েছে কিন্তু অব্যাহতি দেয়নি। তাদেরকে বারবার নিজের ক্ষমতা কায়েম করতে হত্যাকান্ডে অপব্যবহার এবং হত্যাকান্ড শেষ হলে ১৭ খুনিকে চাকরির ছদ্মবেশে হত্যার বদলে দূতাবাসে নির্বাসন। সমকামী তাহেরের মতো ফাঁসি দিলে, অন্যান্য খুনিদের বেফাঁস মুখের সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাই নির্বাসন। আর নিজের জন্য বৈধকরণ, ৫ম সংশোধনীর ইনডেমনিটি দূর্গ। জিয়া এই দুর্গের ভেতরে অবস্থান নিয়েছিলো, হিটলারের বাঙ্কারের মতো। হিটলারের বাঙ্কার এবং ইনডেমনিটি এক ইনডেমনিটির প্রয়োজন শুধু একমাত্র জিয়ার, তার স্বৈরাচারি শাসন ও সামরিক অত্যাচারের দুর্গের ভিতরে সে ইনডেমনিটির কামান দিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করেছিলো। না করলে, মানুষ তাকে ফাঁসি দিতো। সমকামী এরশাদকেও সৃষ্টি করেছিলো জিয়া। [দ্রঃ ইনডেমনিটি গেজেট, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।] কতিপয় কার্যাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত অথবা অন্য কোন বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা। জিয়া "ইনডেমনিটির" পাপের দুর্গের ভিতরে উঁইয়ের আত্মরক্ষার দূর্গ গড়ে পুরো জাতিকে ভেড়া বানিয়ে দিলো। এমনকি জেনারেল থেকে শুরু করে দেশের সমকামী ষাড় সকল বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত নীরব। বরং সকলেই তার ভেড়ার পালের মেষশাবক। জিয়া, যার ছেড়া লুঙ্গি এবং ভাঙ্গা স্যুটকেস মাহাত্ম্য, সমালোচনা নেই এই হিটলারের। জার্মানরা

হলে কি করতো? জিয়া কি এই দেশে অপরাধের রাজনীতির প্রবক্তা নয়? সে পুরো রাজনীতিকে শেষ করেছে। রাজনীতির নামে খুনের উৎসাহ। আসুন আবার আমরা মানুষ হত্যার প্রতিবাদে '৭৫এর পশু হত্যা করি। জিয়া খুন করেছে সব ৭১। জিয়া খুন করেছে প্রজন্মের কোটি কোটি মাথা।

৮১. দেশের সংবিধানে পাকিস্তানের প্রভাব। কায়েদীআজমী সংশোধনী, কোন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে সম্ভব? (দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, পৃঃ ১৬৬)। '৭১এ সংবিধানে ইয়াহিয়ার প্রাদেশিক মন্ত্রী আব্বাস আলী খানকে '৭৯তে ৫ম সংশোধনীর পরই তাকে জামাতের আমীর ঘোষণার ধৃষ্ঠতা। পাকিস্তানি নাগরিক এবং '৭১এর জারজ গোলামকে, নীরব আমীর। তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আরো ভিসা নবায়ন অন্তত ১২ বার, এবং '৯৪তে নাগরিকত্ব দানের ক্ষেত্র প্রস্তুত। সংবিধানের ইসলামীকরণ ও পাকিস্ত ানিকরণ। গোলামের আত্মজীবনীতে এসব তথ্য ভুড়িভুড়ি। আব্বাস আলী খান, যে নাকি ৭১ এর জুন মাসে ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভায় শপথ নিয়েছিলো, প্ররোচনা, দেশদ্রোহী এবং খুনের অবিশ্বাস্য তথ্য। তাদের রচিত সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমিগুলোর প্রমাণ '৭১এর কোন আর্কাইভয়ে নেই? এরপরও জিয়া আব্বাস আলী খানদের জন্য সংবিধান সংশোধন করে তাদেরকে জামায়েতের আমীর হওয়ার গেট খুলে দেয়? এই আব্বাস আলী খান ইয়াহিয়ার প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলো যার সচিত্র প্রতিবেদন আমারও সংগ্রহে এবং অন্যান্য বইগুলোতে। এই নিষিদ্ধ অপশক্তি '৭১এর আব্বাস আলী খানকেই স্বাধীন বাংলাদেশে বৈধ করেছে জিয়া জার্মানীরা শুনলে কি বলবে? এই লোকের নাৎসী চরিত্রের পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে 'গণতদন্তের' বইতে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তার রক্ত ছিঁড়ে ফেলা জেহাদি বক্তৃতা। জিয়ার চেয়ে বড় নাৎসী কি জার্মানিতেও ছিলো? জিয়া, কায়েদেআযমের প্রেতাত্মা, দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রেতাত্মা, সে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব সৃষ্টি করতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে খৎনা দিলো সংবিধান থেকে। বিছমিল্লাহ এবং অন্যান্য মুসলমানী শব্দ সংযোজন করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তির প্রিয়পাত্র হওয়া এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল। বিনিময়ে ক্ষমতার জিঘাংসা পূর্ণ করতে নিজেকে একসঙ্গে হিটলার এবং মীরজাফর দুই দৈত্যে রূপান্তরিত। [দ্রঃ গণতদন্ত রিপোর্ট, যুদ্ধাপরাধীদের জীবনী]। সেনাবাহিনীকে সে ব্যবহার করেছিলো, কুকুরের রক্তের মতো।

৮২. শত্রুপক্ষ পাকিস্তান নয়, ৭ই নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে মিত্রশক্তি ভারতকে জড়ানো এবং ১৫ই আগস্টের ঘটনার মধ্যে ভারতকে টেনে আনার একমাত্র দৃষ্টান্ত জিয়া। কিং ফয়সাল, গোলাম ও জিয়ার চিন্তায় ভারত ও রুশ বিরোধী প্রকল্প একই মাত্রায় কাজ করেছে। (দ্রঃ জীবন যা দেখলাম, ৪র্থ খণ্ড)। ইসলামী জেহাদ এবং আমাদের সংবিধানে একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে খৎনার দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু খুন এবং বাংলাদেশের হিন্দু বিনাশে তৎপর, হিন্দুগুলোকে মুসলমানের পরিচয়দান, তাই

বাংলাদেশ আজ প্রায় হিন্দু শূন্য দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতা নেই অর্থাৎ এদেশ এখন, ইসলাম সংযোজনের পর, সরকারীভাবে মুসলমানের দেশ। হিন্দু হলে তার জন্য কি বাংলাদেশ নিষিদ্ধ? না হলে, ধর্মনিরপেক্ষতা কেন সংবিধান থেকে মুসলমানী করে বাদ দেয়া হলো? ভারত কি তাদের সংবিধানে হিন্দু ধর্মের খৎনা করেছিলো? ভারতের ৩০ কোটি মুসলমান কি বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো অসহায়? সুতরাং মুখে বলুন– পাকসারজামিনসাদবাদ! হ্যালো! সংবিধানের খৎনা– কেন? হিন্দুরা কি সব অমানুষ? আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। আজ হিন্দুস্থানে, মুসলমানগুলো তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গে যে বিপ্লব ঘটালো, তসলিমাকে বিতাড়ন এবং ৩২ বছর পর দেশে সৈন্য নামানো, বাংলাদেশের নেংটি ইঁদুর হিন্দুদের অধিকার কোথায়? হিন্দুস্থানের প্রেসিডেন্ট যখন মুসলমান, বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য তখন, নাম দেখে দেখে চাকরি? এজন্য দায়ী কে? সংবিধানের খৎনা কে দিয়েছিলো? হিন্দু জাতীয়তাবাদীগুলো কোথায়? হিন্দুদের জন্য দেশে আজ কোন অধিকারই নেই। কারণ, এদেশ এখন সরকারীভাবে মুসলমানের দেশ। আপনাদের জানা উচিত, আপনারা সবাই রাষ্ট্রধর্ম মুসলমানের দেশে ঘোষিত ভাবে মুসলমান। হিন্দুদের জন্য ঈদ এবং কোরবানী। হ্যালো!

৮৩. সহযোদ্ধা সেক্টর হত্যার জঘন্য দৃষ্টান্ত কোন মুক্তিযোদ্ধার? ২২ বেঙ্গল শেষ করে দেয়ার দৃষ্টান্ত আর কার? সামরিক ট্রাইবুনাল করে গোপনে নির্বিচারে ফাঁসির দৃষ্টান্ত কার? আপনারা করবেন? বলুন! সুতরাং তার বীরউত্তম ফিরিয়ে নেয়া হবে না কেন? তার গোরস্তান সরিয়ে অন্যত্র তাকে কবর দেয়া হবে না কেন? জিয়ার মতো একজন কোলাবেরটরের কঙ্কাল এদেশের মাটি গ্রহণ করবে কেন? জিয়াকে তুলে তার নিজের দেশ পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হোক, যেমন করে মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ ফিরে এসেছেন তার নিজের দেশে। এদেশের মাটিতে একই সঙ্গে মীরকাশিম আর সিরাজের কবর সম্ভব নয়। আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে চাই তার গর্বিত বাংলাদেশ। আমরা আর একটি বঙ্গবন্ধু চাই – '৭৫এর পশু হত্যা করতে। তার দেহাবশেষ, ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হোক তার প্রিয় রাজধানীতে। জিয়া-মৌলবাদ এবং পাকসারজামিনসাদবাদ– অভিন্ন। তার পিতামাতার কবরের সঙ্গে এই ভূতকে পাকিস্তানে রেখে আসা হোক। মীরজাফরদের জন্য বাংলার মাটি অবৈধ। জিয়া বাংলার সকল গণহত্যাকারীদের বৈধ করে প্রমাণ করলো, ১নং গণহত্যাকারী সে।

৮৪. ৭ই নভেম্বরের মাধ্যমে মোস্তাককে উৎখাতের জন্য তাহের গ্রুপ এবং জাসদকে অপব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে যাত্রার এই কলঙ্কিত সাড়ে পাঁচ বছরে সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাহীন করার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কাছে ধরা দেয়া কোন মুক্তিযোদ্ধার কাজ? এবং '৮২-'৯০, খুনি এরশাদ, তারই জারজ সন্তান। '৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশে জিয়ার হাতে নষ্ট করে ফেলা সৈন্যবাহিনীতে তার করাপ্ট অফিসারদের অভাব? জিয়া কি গোটা সৈন্যবাহিনীকে খুন-সিফিলিসে আক্রান্ত করেনি? তার '৭৭এ

সন্ত্রশ বাহিনীতে গণহত্যার প্রমাণের কি অভাব আনোয়ার কবিরের ডকুমেন্টারিতে? আমি ভিকটিম পরিবারের ক্রোধ দেখেছি। তাদের ভিডিও সংগ্রহ করেছি। তাদের জবানবন্দী সংরক্ষিত। শুধুমাত্র সন্ত্রশবাহিনীতে গণহত্যার জন্যই মৃত জিয়ার কয়েক হাজার বার ফাঁসি হওয়া উচিত। বাঙালি বই পড়ে না, না জেনে তারা খুচরো রাজনীতি করে। সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যার বিচার হতেই হবে। ভিকটিমদেরকে এগিয়ে আসাতেই হবে। নিশ্চয়ই কোর্ট তা গ্রহণ করবে। মাননীয় চিফ অব স্টাফ এবং সেক্টর কমান্ডারগণ– আপনারা কি আওরঙ্গজেবের মতো একজন খুনিকে ভুল করে বীরউত্তম বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন? নাকি নিজেদের পদবী ত্যাগ করে, কলঙ্কমুক্ত হবেন? আসুন আমরা '৭৫এর পশু জিয়াকে হত্যা করি যে, পুরো মুক্তিযুদ্ধকে হত্যা করেছে। রাজাকারকে বৈধকরণ? এদেশ কি, পাকিস্তান? আপনারা আপনাদের সেক্টর কমান্ডার পদবী প্রত্যাখান করে, জিয়ামুক্ত হোন। জিয়া, '৭১এর নষ্ট উদাহরণ।

৮৫. সৌদি আরব, পাকিস্তান (দুইবার), চীন, বাংলাদেশকে এদের স্বীকৃতি দানের সময়ের সঙ্গে জিয়ার ক্ষমতারোহণের সমান্তরাল দৃষ্টান্ত। উক্ত সময়ে গোলাম আজমের লন্ডন ও সৌদিতে উন্মুক্ত স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকান্ড, ইতিমধ্যেই দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রসার। তাদেরকে 'রাজবন্দীর' সম্মান দান করে গেজেট। '৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বর থেকে জেলের ১১,০০০ যুদ্ধাপরাধীদের ক্রমাগত মুক্তিদান এবং মৌলবাদের সমর্থনে '৭৬ এর ২২শে এপ্রিল তারিখে সংবিধানের মূল কাঠামোতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে পরিবর্তনের সঙ্গে জিয়ার সঙ্গে সৌদি ও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের যে সাজুয্য, একজন মুক্তিযোদ্ধার নয় বরং আইএসআই-এর। "৭১এর যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের" বইয়ের পাতায় পাতায় জিয়া ও খালেদার আইএসআই মুখ। ফারুক-রশিদ এরা সব জিয়ার পুতুল। তাহের, খালেদ, শাফায়েত সব তার মেষশাবক। জিয়া, স্বাধীনতার নাখোশ শক্তির ভেড়া। জিয়া, '৭১এর পর, স্বাধীনতার বৈরী শক্তিদের ১ম হাতিয়ার। জিয়ার ক্লাইভ, পাকিস্তান ও সৌদি আরব। মাননীয় দেশপ্রেমিকগণ! আমি কি আমার বক্তব্য বুঝাতে পেরেছি? রাজাকারদের জন্য সংবিধান সংশোধন? আমি কী উন্মাদ, নাকি শিশু? এরপরেও – জিয় আ-আ-আ-আ-আ...? জিয়া কি গোলামকে ফিরিয়ে এনে খুন করেনি অসংখ্য '৭১?

৮৬. ঘটনা আগে, ১৫ই আগস্ট নিশ্চিত করেই, পাকিস্তান ও সৌদি, ১৬ই আগস্ট এবং চীন, ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধে এরা সবাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধের শক্তি। '৭১এর চরম ব্যর্থতার পর, '৭৫এ এরাই দূতাবাসের মাধ্যমে জিয়া গংদের একত্র করে চিলির আলেন্দের মতো বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করেছিলো। এরা সবাই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে '৭১এ পুরো নয় মাস জাতিসংঘে সংগ্রাম করেছিলো। '৭১এর ডিসেম্বরে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে বারবার ভেটো দিয়েছিলো, সৌদি আরব ঘোরতর বিরুদ্ধে। শত্রুরা চেয়েছিলো,

রাজনৈতিক সমাধান ছাড়াই, যুদ্ধবিরতি। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র একটি ভেটো শক্তি, রাশিয়া, তিনবার ভেটো না দিলে বাংলাদেশের জন্ম কক্ষনোই হতো না। সুতরাং রাশিয়া এবং ভারত বাংলাদেশের ধাত্রী-মাতা। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের স্বীকৃতি দান এবং জিয়ার ক্রমশ ক্ষমতায় আরোহণের মধ্যে যে সাযুজ্য, তার কোন মুক্তিযোদ্ধার? বাংলাদেশকে সে মৌলবাদী সৌদি করেছে। গোলাম আজম, তারই অবদান। জানতে হলে, উল্লেখিত বইগুলোর পুরোটা পড়তে হবে। সৌদির স্বীকৃতিদান, পাকিস্তানের দুইবার স্বীকৃতিদানের সঙ্গে আমাদের ১৬ই আগস্ট এবং ২৪শে আগস্ট এবং ৭ই নভেম্বর এবং '৭৯এর ২৯শে নভেম্বর এবং '৭৭এর ২০শে এপ্রিল এবং '৭৮এ ৫ই এপ্রিল এবং '৭৯এর ৫ই এপ্রিল এবং '৮৭এর ১১ই জুলাই গোলামের প্রত্যাবর্তন সম্পর্ক কী? ২৪শে আগস্টে সেনাপ্রধান, ৭ই নভেম্বরে সেনাপ্রধান এবং সামরিক উপশাসক '৭৬এর ২৯শে নভেম্বর প্রধান সামরিক শাসক ও সেনাপ্রধান, '৭৭এ 'হ্যাঁ-না' রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধান, '৭৭, '৭৮ এবং '৭৯তে সংবিধানের বিপুল পরিবর্তন এবং সব অপরাধগুলোকে ৫ম সংশোধনীর আইন প্রণয়নে সম্পর্ক কী? '৭৯তে প্রেসিডেন্ট পদসহ দলীয় প্রধান এবং ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আবারো ক্যু।] জিয়া, সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে মহা-স্বৈরাচারের ইতিহাস হয়ে যাওয়া ইদি আমিন গডফাদার। তাকে এতো শক্তি দিলো কে? সৌদি কেন ১৬ই আগস্টে বাংলাপদেশকে স্বীকৃতি দিলো? ১৫ ও ১৬ই আগস্টের সরাসরি যুক্তি কী? চুক্তি কী?

৮৭. '৭৪এর ২২শে ফেব্রুয়ারির পর, '৭৫এর ১৬ই আগস্ট দুপুর বেলায় বাংলাদেশকে হঠাৎ পাকিস্তানের আরেকবার স্বীকৃতি দানের রহস্য, রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্র একজন উপসেনাপ্রধানের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ও ১০ দিনের মাথায় সেনাপ্রধানকে বুটআউট, গেটআউট করে নিজে সেনাপ্রধান, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ বলবেন কী? কেন বলবেন না? এখন প্রয়োজন, দেশজুড়ে জিয়া ভিকটিমদের একাত্মবাদ। গঠন হোক "জিয়া ভিকটিম পরিবার।" মামলা করুক, মৃত জিয়ার বিরুদ্ধে। ফাঁসি হোক তার হাড়গোড়ের। তাকে পাঠানো হোক তার প্রিয় পাকিস্তানে। এখন পুরো বাংলাদেশই জিয়া ভিকটিম দেশ। জিয়া জানতো, একের পর এক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির উদ্ভাবন। তাদের সঙ্গে তার সময়ের সম্পর্ক। জিয়া, পালাতে পারবে না। এই মহা-স্বৈরাচারকে নিয়ে রিসার্চ করতেই হবে এবং তা করবে পরবর্তী প্রজন্ম। এবং তা দূরে নয়। জিয়াকে তারা এক আসনে দাড় করিয়ে বলবে, ইদি আমিন গডফাদার, পলপট স্বৈরাচার, ইয়াহিয়া-হিটলার। দূরে নয়। আসুন আমরা '৭৫এর জিয়া পশুকে হত্যা করি।

৮৮. সেনাপ্রধানকে আমি অনুরোধ করবো, ন্যূরেনবর্গ ট্রায়ালের কপি আপনাকে দিয়েছি, এবার জিয়ার অপরাধের বিচার করুন। "ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি।" আমি আপনাকে হাতেনাতে দিয়েছি, ন্যূরেনবার্গ নিয়ে ডকুমেন্টারির কপি। আপনার মেয়েকে কি জবাব দেবেন?

রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃ: ৫২, ৫৩:

"The war liberation was over. Bangladesh was established as a sovereign state with Sheikh Mujibur Rahman as head. Raw agents continued to keep an eye on the developments in the newly born country. By the end of 1973, the reports began to indicate unrest in the country. By the end of February 1974, the reports turned to be correct, as two major general strikes were followed by a massive demonstration of hungry marchers. The growing unrest forced Mujib to establish a one party government on February 24, 1974. According to a RAW services the situation in Bangladesh had become critical.

Reports indicated that western intelligence agencies were becoming very active. Nair, who by now was regarded as respected figure by Mujib Government, met Mujib along with tiger Siddiqi and apprised him of the situation Mujib preoccupied with other events that engulfed his country shrugged off the warning that a coup was imminent.

Four months later, RAW agents received, information of a meeting between major Rashid, major Farooq and Ltcol. Usmani at Zia-ur-Raman's residence. The discussion among other thins, had centered on the coup during the three hour meeting one of the participants had doodled on a scrap of paper, which had been carelessly thrown into waste paper basket. The scrapped paper had bee collected from the Rubbish pile by a clerk and passed on to the RAW operative. The information finally reached New Delhi.

Kao, convinced that a coup was in the offing, flew into Dacca, under cover of a pan exporter. After his arrival at Dacca, he was driven to a rendezvous arranged before hand. Mujib is reported to have found the exercise highly dramatic and just could not understand why Kao could not have come to see him officially. But having known him personally, he went along with the charade. The kayo-Mujib Meeting lasted one hour. Kao was unable to convince Mujib that a coup was brewing and that his life was threatened, inspite of being given the names of those suspected to have been involved. The euphoria that, "These are my children and they an do no harm" proved to be death knell. Reference: 'Inside RAW the story of India's secret service'

by Asoka Raina. Vikas publication, New Delhi, India." সেনাপ্রধানকে অনুরোধ, খুনি জিয়ার বিচার আপনাকে করতেই হবে। কারণ আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই বইটি সংগ্রহ করে খুনি জিয়ার কলঙ্ক থেকে সেনাবাহিনীর নাম আলাদা করুন। জিয়া কখনো বীরউত্তম নয়, সে আইএসআই।

৮৯. ৭ই নভেম্বরের ঘটনায়, তিন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, খালেদ, হায়দার ও হুদাকে হত্যাসহ '৭৬ ও '৭৭এর কয়েকমাস ধরে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যা এবং খালেদের মৃতদেহ ক্যান্টমেন্টে এনে পাবলিক ডিসপ্লে করে একজন সেক্টর কমান্ডারকে চরম অপমান, মিথ্যে শ্লোগান, মুখের উপর থু থু মারা, তাকে কিল-ঘুষি ও জুতো মারার ঘটনাকে উস্কে দেয়া, ভারতের দালাল বলে, মাইক মেরে লিফলেট ছড়িয়ে সারা শহরে উন্মুক্ত প্রচারণা এবং সেদিন প্রত্যুষেই মাত্র দুই মাস আগে জোরপূর্বক পদোন্নতি নেয়ার পর, জিয়ার আরেক ধাপ ক্ষমতার পদোন্নতি, নিজেকে সেনাপ্রধান এবং চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর বলে জাতির উদ্দেশ্যে দুইবার ভাষণ, দুর্ধর্ষ ইদি আমিনকেও কি লজ্জা দেয় না? নিজেকে সিএমএলএ ঘোষণা এবং বাধ্য হয়ে প্রত্যাহার। ক্ষমতার দোর্দণ্ড লোভ– আমার প্রশ্ন, কে এই জিয়া? [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়াউর রহমান ও ৭ই নভেম্বরের ভাষণ]। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ১৭১-১৭৬]। নাকি এরা, মুক্তিযোদ্ধার মুখোশে, '৭১এর দালাল! এরা কি সত্যি সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা? নাকি, বানানো মুক্তিযোদ্ধা? না কি বাধ্য হয়ে? [দ্রষ্টব্য– লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পৃষ্ঠা ১৪৫] ঃ "প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিএমএলএ হিসাবে জিয়া থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতাটি থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করেন। সুতরাং সায়েমই সিএমএলএ থাকলেন, জিয়া অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডিসিএমএলএ-র পোস্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপুত ছিল না, কারণ ভোরেই তিনি CMLA হিসাবে রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন।" জিয়ার ৭ই নভেম্বরের ঘোষণা, বইয়ের ৩য় অংশে যোগ করা হলো।

৯০. ৭ই নভেম্বর '৭৫ এ সিপাই বিপ্লবের পর থেকে ক্রমাগত তার খুনির হাত সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যাপক গণহত্যার শুরুতে একদিকে সেক্টর কমান্ডারের মৃতদেহকে বরং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবরের ব্যবস্থা না করে, সেটাকে পাবলিক ডিসপ্লে করে মৃতদেহটি গণ-ঘৃণার জন্য প্রদর্শন, দুই দিন ধরে মর্গে গলিয়ে পচিয়ে পোকা দিয়ে খাইয়ে বীরের অপমান, পতাকার অপমান, '৭১কে ঘৃণা, অন্যদিকে ক্যান্টমেন্টে সেই সকলেই নিজেকে প্রধান সামরিক প্রশাসক বলে ঘোষণা দিয়ে আরেকধাপ ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? আইয়ুব যা করেনি, শুধুমাত্র জিয়াউর রহমান, যার অমুক্তিযোদ্ধা

চেহারা ফাঁস হয়ে গেছে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের বইটি ছাড়াও অন্যান্য বইগুলোতে। দুর্ভাগা বাঙালি, এসব বই কেয়ার করে না বরং তারা মূর্খের মতো না জেনে খুচরো রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-তে সৎ কর্মী নেই বরং অধিকাংশই মূর্খ এবং ক্যাডার গোছের, যাদের একমাত্র যোগ্যতা তারা সন্ত্রাসী। 'তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের' পাতায় পাতায় দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসী জিয়ার যে মুখ, আনোয়ার কবিরের ভিডিও চিত্রে যে গণহত্যাকারীর দানব চোহারা, 'ল্যাগেসি অব ব্লাড' বইতে একহাতে খাদ্য, অন্য হাতে খুনের হুকুম নামা সামনে এক দুর্ধর্ষ পাগলা হিটলারের মুখ। সোয়াত জাহাজে জিয়ার অস্ত্র খালাস কেলেংকারির পর জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বলার জায়গা কোথায়? নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ কুক্ষিগতকরণে তাহেরের ফাঁসি, খালেদ হত্যার পর, জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বলার, জায়গা কোথায়? লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের লেখক এবং জিয়া দুইজনেই ১নং সেক্টরের কমান্ডার। সেকি মিথ্যা লিখেছে? বহু বছর ধরে এতো অবিচারের নিঃশেষ হতে, সবার এখন এগিয়ে এসে এসব তথ্য জানান দেয়া উচিত। জাতির কাছে দায়মুক্তি। মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কোন অবদান নেই। হুদা, হায়দার, তাহের বা খালেদ মোশাররফের আছে। পুরো ৯ মাসের মধ্যে ৮ মাস। তার সঙ্গে রিপ্রেট্রিয়েটদের যোগাযোগ। একই খুনিদের সঙ্গে মোশতাকের যোগাযোগ– কোলকাতাতে। কনফেডারেশন সরকারের ষড়যন্ত্র। অধিকাংশ রি-প্রেট্রিয়টরা চায়নি স্বাধীনতা। জিয়া, খালি মাঠে গোল দিয়ে গেছে। কলুর ষাড় তাহেরের মতো, খালেদের মতো, তার এক বিন্দুও বীরত্বের ঘটনা থাকলে, জানতে চায় জাতি। থাকলে, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হোক। আসলে নেই। জিয়া সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা। প্রাণের ভয়ে, এই মুখোশ। ক্ষমতার অজুহাতে তাকে ব্যালেন্স করা চলবে না। জিয়া এবং বেগম জিয়া, এই দুই অভিশাপ, বাংলার সকল মুক্তিযুদ্ধ স্বপক্ষের শক্তির জন্য গডফাদার এবং গডমাদার। জিয়া কখনোই বিদ্রোহ করেনি, সে শুধুআত্মরক্ষা করেছিলো।

৯১. সাজানো ৭ই নভেম্বরের মতো ভয়াবহ উন্মাদনার অনৈতিক এবং নৈরাজ্যবাদের রাজা ইদি আমীন স্টাইলে জিয়ার ক্ষমতা দখলের পর, খালেদ নামের মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী বীরউত্তম সেক্টর কমান্ডারের মৃত দেহকে পাবলিক ডিসপ্লে করে তাকে থু থু এবং জুতো মারার ব্যবস্থা করে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকেই জুতো ও থু থু মেরেছে জিয়া, যা একজন মুক্তিযোদ্ধা কক্ষনো করবে না। বিউগল নয়, পতাকা নয়, লাশগুলো দু'দিন পচিয়ে নিজেকে সামরিক শাসক ঘোষণা? জিয়া সাজানো ৭ই নভেম্বরে প্রচুর হত্যাকান্ড করে দুর্ধর্ষ ইদি আমীন স্টাইলে কিভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলো যার বীভৎস বর্ণনা বইতে প্রচুর রয়েছে। পরপর জিয়ার সাজানো গোছানো ১৫ই আগস্ট থেকে ২৪শে আগস্ট এবং ৩রা ও ৭ই নভেম্বর, যা কোন মুক্তিযোদ্ধা করার প্রশ্নই ওঠে না। যা '৭১এ ব্যর্থ আইএসআই-এর কাজ। মুক্তিযুদ্ধে খালেদ মোশাররফ ও হায়দার এবং হুদার দান ও বীরত্ব অসীম। জাতির কাছে তাদের ঘৃণা পাওয়ার কোন জায়গা নেই। তারা

মুক্তিযুদ্ধের জানান দেয়ার মতো বীর, যারা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে বীরউত্তম ও বীরবিক্রমের খেতাবপ্রাপ্ত। যে দাবী জিয়ার জন্য সম্ভব নয়। জিয়া জোরপূর্বক কিংবা দয়ার অনুকম্পায় বীরউত্তম। বঙ্গবন্ধুর বড় হৃদয়। তাই সেরদরে বীরউত্তম। জিয়া একাই সব মুক্তিযুদ্ধ, সব দৃষ্টি, সব বীরত্ব দখল করে আছে। বঙ্গবন্ধুর বদান্যতার শেষ নেই। তিনি সৃষ্টি করেছেন বীরউত্তম জিয়া। তাকেই খুন করেছে বীরউত্তম জিয়া। আবার খেতাবপ্রাপ্ত এদেরই কয়েকজনকে নির্মমভাবে খুন করে জিয়া নিজেকে নৃশংস আওরঙ্গজেব বলে প্রমাণ করেছে। আওরঙ্গজেব, যে তার নিজ ভাই দারাশিকোকে ক্ষমতার লোভে হত্যা করে মুন্ডু নিয়ে উল্লাস শেষে সেটাকে কারুকার্যখচিত কেসকেডে ভরে, তারই হাতে বন্দী পিতা, সম্রাট শাহজাহানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। আওরঙ্গজেব, যার অত্যাচারে ভারতবর্ষের বিশাল একটি হিন্দু সমাজ মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিলো। যার অত্যাচারে মোগল সাম্রাজ্যের আরো দ্রুত পতন ঘটলো। আরেক বঙ্গ-আওরঙ্গজেব জিয়া, এই দেশে প্রমাণ করেছিলো, বাংলাদেশ তার মোঘল সাম্রাজ্য, সে আওরাঙ্গজেব। বাংলাদেশ তার ইসলামী প্রজাতন্ত্র। সে সম্রাট কিং ফয়সাল। ইসলাম শব্দ ব্যবহার করে সংখ্যালঘু সমাজকে অস্বীকার। ধর্মনিরপেক্ষতার মুসলমানীখৎনা। বিসমিল্লাহ সংযোজন করে– নিরপেক্ষ সংবিধানকে মুসলিম ধর্মে পরিবর্তন। ধর্ম পরিবর্তন করে নিরপেক্ষ থেকে মুসলমান। হুবহু এক মৌলবাদী মোঘল আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি এই জিয়ার প্রতিকৃতি, যা অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধারই নয়। খালেদ এবং দারাশিকো এক। খালেদকে জিয়া বন্দী করে গুলি করে হত্যা করিয়েছিলো, দারাশিকোর মতো। আওরঙ্গজেবও তার ভাইকে হাতির পিঠে চড়িয়ে শেকলে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেধে, হত্যা করতে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলো যারা তার রক্তাক্ত মুন্ডু এনে সামনে দিয়েছিলো দেখার জন্য। সম্রাট আওরঙ্গজেব দারাশিকোর মুণ্ড ধুয়ে, ভাইয়ের চোখে নিজ হাতে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিত করেছিলো এটা তার ভাইয়ের মাথা। নৃশংস এবং উন্মাদ, ক্ষমতার লোভে দারাশিকোর মুন্ডু প্রদর্শন এবং খালেদের মৃতদেহের পাবলিক ডিসপ্লের ঘটনা আমাদের ফিরিয়ে নিয়েছে, ৩৫০ বছর আগের ইতিহাসে। ফের নব্য পাকিস্তানি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে সাড়ে তিন বছরের স্বাধীন বাংলার পতনের পথ করে দেয়ার জন্য এসব কাজ আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? [দ্রঃ ম্যাসাকার এবং ১১অধ্যায়ে আওঙ্গজেবের গল্প]। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান এর ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লব।] শুধু এই চ্যাপ্টারটি রপ্ত করতে পারলেই বাঙালির ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তারা জিয়াবাদ প্রত্যাখ্যান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে যাবে। 'একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়' বইটি পড়লে আসল ইয়াহিয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে, যার পরিচয় '৭৫এর ঘাতকদালাল। জিয়া, '৭৫এর দালালআইন বাতিল করেছিলো। কারণ এই দালাল সে নিজেই যা সে বাতিল করলো। ফলে '৭১এর ৩০ লক্ষ শহীদ খুন করে, '৭৫এর বাংলাদেশ আবার পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ। জিয়া, মুক্তিযুদ্ধে যার কোন উল্লেখ করার

মতো অপারেশন নেই। জিয়া, একজন সুবিধেবাদী মুক্তিযোদ্ধা। জিয়া '৭১এর ঘাতকদালাল। জিয়া '৭৫এর ঘাতকদালাল আইন বাতিল করে প্রমাণ করলো এই দালাল সে নিজে। জিয়া বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করে বীরউত্তম আদায় করেছে। যে যোগ্যতা তার জন্য – সমকামীর তুল্য অপমান।

৯২. ১২ দফার প্রলোভন এবং পুনর্বাসনসহ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায়, সেক্টর কমান্ডার তাহেরকে পথভ্রষ্ট করা। ৭ই নভেম্বরের সকাল থেকেই সিপাই বিপ্লবের প্রতারণার মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যুষেই দুইবার নিজেকে সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক সরকার ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীকে ধোকা মেরে উতপ্ত এবং রক্তাক্ত ৭ই নভেম্বরের অসংহতির কলঙ্কিত সকাল, সেই অভিশপ্ত সকাল, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা এবং ৭ই নভেম্বর প্রত্যুষ হতেই রিট্রেয়াল এবং দুর্ধর্ষ গণবাহিনী ও জাসদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়ের অভিসন্ধি ও জাতিকে ফের ঘোরতর সামরিক শাসনে ডুবিয়ে দেয়ার এক অনন্য আইয়ুবী চরিত্র, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? '৬৯এর অভ্যুত্থান কেন? '৭১ কেন? ৩০ লক্ষ শহীদ কেন? আইয়ুব কি এতো অন্যায় করেছিলো, যা জিয়া করেছিলো? খালেদা গডমাদার এবং তাদের গডচাইল্ড হেরোইন ও কোকেইন জিয়া! এতো লুটপাট কি আইয়ুব করেছিলো? এতো খুন কি আইয়ুব করেছিলো? সত্যি করে বলুন আপনারা। জিয়ার দল যে নাশকতা, যে সন্ত্রাসী ও লুটপাটসহ ঘুষের রাজত্ব কায়েম করেছিলো– আইয়ুব করেছিলো? সত্য কথা বলতে হবে। '৭৬এর নভেম্বর থেকে গণবাহিনী এবং জাসদের ১০,০০০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার, যারা তাকে ৭ই নভেম্বরের রক্তখেকো বন্য জিয়া হতে সহায়তা করেছিলো, রিট্রেয়াল এবং অস্বীকার, ভুট্টো চরিত্র প্রদর্শন করে মঞ্চে উপস্থিত সাজানো ৭ই নভেম্বরের প্রত্যুষে উন্মাদ এক পাগলা কুকুর জিয়ার নিজমুখে এই স্বাধীন দেশে প্রধান সামরিক শাসক বলে ঘোষণা এবং উত্তেজনার সৃষ্টি এবং উত্তপ্ত নৈরাজ্যবাদী– পরিস্থিতি কায়েম করে সামরিক শাসনের জঘন্য প্রতারণা, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? [দ্রঃ ৭ই নভেম্বরের ভিডিও]। জিয়া, ইঁদুর-বেড়ালের মতো যাকে খুশি তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, শ' নয়, হাজারে। সুতরাং, কে এই জিয়া? ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শয়তান? স্যাটার্ন? শনিগ্রহ প্রভাবিত অশুর? সিন্দাবদের দৈত্য? '৭৭ এর ট্রাইবুনালের দৃষ্টান্ত বিশ্বের আর কোথায়? সাজানো ক্যাঙ্গারু কোর্টে ৩০ সেকেন্ডের বিচার। ১২ ঘণ্টায় ফাঁসি। কোথায়? এর জবাব কি সেনাপ্রধান দেবেন? খুনি জিয়া, আপনাদেরই লোক। সেনা পবিবার, ভাইবোন, মা, ভাবীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন। তারাও মানুষ। জিয়ার খুনের ল্যাগেসির বিচার করুন। আনোয়ার কবিরের ভিডিওচিত্রটি কথা বলে। একে ব্যবহার করলেই জিয়ার দুশ্চরিত্র, প্রমাণ হয়ে যাবে। ইয়াহিয়ার গণকবর দেখেছেন। আপনারা জিয়ার তৈরি গণকবর দেখেননি? কেন দেখিননি? এই ভিডিওটি অনুসরন করে জিয়ার তৈরি গণকবর দেখে আসুন রাজশাহীতে। কথা বলুন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে। হৃদয়বিদারক এই লাশ সন্ত্রাসী! কতো কুৎসিত এই লাশ সন্ত্রাসীর

মুখ! চলুন, রাজশাহউীতে ঘুরে আসি। জিয়া দালাল আইন বাতিল করেছিলো নিজের জন্য। '৭১এর বড়ো দালাল সে নিজে। চলুন আমরা জিয়ার হাতে তৈরি মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর দেখে আসি। সে মানুষ নয়, সে ইয়াহিয়াও নয়, সে একাই তার উদাহরণ।

৯৩. দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসান চেয়ে যে উত্তাল '৬৯–'৭১, সে-ই দেশকে ফের সামরিক শাসনে ফিরিয়ে দেয়ার যে ধৃষ্ঠতা, শুধু একা জিয়ার জন্যে যে দেশের সকল ক্ষমতা সদা প্রস্তুত, অন্য কেউ নয় শুধু জিয়া... ইতিমধ্যেই উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক... যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজবন্দীর চিৎকারে মুক্তি, তাদের নিয়ে মন্ত্রীসভা, ৩১ ডিসেম্বরের গেজেট... কোন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র? পাকিস্তানের প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রী, ইয়াহিয়ার প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী, খুনি আব্বাস আলী খানকে '৭৯ থেকে জামাতের আমীর হতে দেওয়ার মূলে যে ৫ম সংশোধনী, যা গোলাম আজম তার বইতে খোলামেলা স্বীকার করেছে। আব্বাস আলী খানের মতো '৭১এর খুনিদেরকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ হত্যা? '৭৯ এ জিয়া সংবিধান সংশোধন করে আব্বাস আলী খানের মতো একজন বাংলামুসোলেনিকে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিতে ঢুকিয়ে, জামায়েতের মশারির তলে সরকারিভাবে মৌলবাদের উদ্বোধন! সংবিধান হত্যা ছাড়া যে কাজ সম্ভব ছিলো না। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম পৃঃ ১৬৬]। জিয়া, যতো অপরাধ করেছিলো, তার বিচারের জন্য যথেষ্ট আদালত কি আমাদের আছে? বড়ো হৃদয়ের মানুষ বঙ্গবন্ধুর দেয়া পাইকারি খেতাবের জন্য দায়ী বঙ্গবন্ধু। কোন যোগ্যতা ছাড়াই সে অনুসন্ধান না করেই জিয়াকে বীরউত্তম উপাধি দিয়েছে। এবং এই বীরউত্তমই তাকে হত্যা করেছে। কিংবা না দিলে, '৭২এ-ই তাকে হত্যা করতো আইএসআই জিয়া। '৭৭এর গণহত্যার জন্য জিয়ার কতশতবার ফাঁসি হওয়া উচিত?

৯৪. দীর্ঘ আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে যে '৬৯ থেকেই '৭১, ৩০ লক্ষ শহীদ, ২ লক্ষ ধর্ষিতা, সেই দেশকে ফের দীর্ঘসামরিক শাসনে ডুবিয়ে নিজে উপ এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক পদে আইয়ুব চরিত্র জিয়া, সোয়াত জাহাজের পর কি এখনো প্রমাণ করেনি যে সে মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না? এই দৃষ্টান্ত একা জিয়া আসলেই যে, গুপ্তচর আইএসআই। এইসব ব্যভিচারের অধিকার, দেশ জিয়াকে দেয়নি। জিয়া জোর করলেও, দেশ জিয়ার সম্পত্তি নয়, তার পরিবারেরও নয়। এই বাংলাদেশ, জিয়া পরিবারের জন্য স্বাধীন হয়নি। গডফাদার-গডমাদার-কোকেইন-হিরোইন জিয়া! ৩০ লক্ষ শহীদ তাকে জিয়া বানাতে প্রাণ দিয়েছে? হ্যালো! দেশ তাদের, যারা সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। জিয়া মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ যা সে ২৫শে মার্চ রাতেই প্রমাণ করেছে। জিয়া সাজানো ৭ই নভেম্বরের কলঙ্ক। [দ্রঃ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ১৪৫]। [দ্রঃ খালেদের দাফন, পৃষ্ঠা ১৫৯]। "সন্ধ্যাবেলা ঘোর অন্ধকারে উপস্থিত ছিলেন মাত্র চার/ছয় জন অতি নিকট আত্মীয় এবং চাচা।" ...আন্দোলনের প্রলোভন ও প্রতিজ্ঞায়, তাহেরের ১২ দফা দাবী

শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, ক্ষমতায় যাওয়া মাত্র সে দেশব্যাপী যে গ্রেফতার অভিযান চালায় তাতে হাজার হাজার জাসদ ও গণবাহিনী কর্মী গ্রেফতার।... ১৬ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের মুহূর্তে অপূর্ব ভঙ্গিতে দেখায় কর্নেল হায়দারকে জেনারেল অরোরা ও নিয়াজীর সঙ্গে মঞ্চের দিকে।" "...এর কিছুক্ষণ পর জোয়ানরা লেঃ হায়দারকে কিলঘুষি চড় মেরে নিচে নামিয়ে আনলো। ...খালেদের পেটের ভূড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিলো, বোধহয় বেয়োনেট চার্জ করা হয়েছিলো। একজন লেঃ জিয়াকে স্যালুট মেরে বললো- স্যার আপনাকে আমি তিনটি মৃতদেহ উপহার দিতে এসেছি, খালেদ, হুদা এবং হায়দার।" [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ১৪১]। বাংলা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে মোগল আওরঙ্গজেবের কতো মিল! ...খালেদের চাচা মোশাররফ ফোনে বললেন, কবরটা কি খুড়ে দেয়া যাবে? বিকেলে টেলিফোন করলেন, সন্ধ্যার দিকে খালেদকে দাফন করতে চাই।" এই কি একজন বীর উত্তমের প্রতি বীরউত্তমের দৃষ্টান্ত? বীরউত্তম থেকে বীরউত্তমের, এই প্রাপ্তি! দেশের কাছে! দেশের মনুষের কাছে! জাতির জন্য যাদের এতো ত্যাগ! এই বিশ্বাসঘাতক জাতি তাকে মুক্তিযোদ্ধা বলছে? জিয়া হাজার হাজার খুন করেও কি উন্মাদ গডফাদার, যুদ্ধবাজ, খুনি, ইদিআমীন নয়? তার জন্য ২৫০ কোটি টাকার কবর? জিয়া, বীরত্বের প্রমাণহীন- ১০০০ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় জমি দখল করে শুয়ে আছে। ডালভাতের দেশে তার জন্য মার্কিন স্যাম্পেইন বিলাসিতা। তার কবরটি কোটি কোটি গরীবের পেটে লাথি। ২৫০ কোটি টাকার কবর কি একজন খুনির জন্য শোভা পায়? তার চেয়ে এখানে 'হকার্স মার্কেট'ও ভালো। মুক্তিযুদ্ধ করেও দেশদ্রোহীর পদবী পাওয়া খালেদ-তাহের-হুদা-হায়দারের মৃতদেহ কেন কালের আস্তিনে নিখোঁজ? চলুন আমরা ইয়াহিয়ার চেয়ে বড়ো গণকবর দেখতে জিয়ার ইতিহাস অনুসরণ করি। চলুন আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জারজ বলে ঘোষণা করি। তাদেরকে বলি, পাকিস্তানের কাছে ক্ষমা চাও হে পাপী! মুক্তিযুদ্ধ একটি পাপ!

৯৫. বাংলাদেশের সংবিধানকে পাকিস্তানের সংবিধানের হুবহু করে তোলার যে ট্রেইল, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষেধাজ্ঞা বাতিলের যে ট্রেইল, যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজবন্দী উপাধি দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার যে গেজেট, যুদ্ধাপরাধীদের জন্য নিষিদ্ধ আইন বাতিল করে তাদের জন্য নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার, রাজনীতি ও আত্মরক্ষার যে ট্রেইল... শুধু একজন পাকিস্তানির জন্যই বিষাক্ত গেজেটগুলো ৫ম সংশোধনীর আইন করা সম্ভব। ভুট্টোর জন্য যা সম্ভব কিংবা তার চরের জন্য। জার্মানরা কি বলবে? ২য় বৃহত্তম গণহত্যার দেশে এসবের মানে কি? আমাদের সন্তানেরা '৭১ এর খবর জানে না, মানে কি? ইতিহাসে ইঞ্জিনিয়ারিং করার মানে কি? জিয়া কি 'সংবিধান ইঞ্জিনিয়ার'? জিয়া কি ইতিহাস ইঞ্জিনিয়ার? খালেদা কি সংসদ ইঞ্জিনিয়ার? তারেক জিয়া কি লুটপাট ইঞ্জিনিয়ার? কোকো কি 'কোকেইন', ইঞ্জিনিয়ার? হায়! কতো ইঞ্জিনিয়ার এক পরিবারে। [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, স্বাধীনতার ঘোষকের

বিবৃতি, ৮৪ ও ২০০৪ এর সংস্করণ]। জিয়া ও খালেদা জিয়া, উভয়েই ছুরিকাঁচি হাতে, পুরোপুরি 'ইতিহাস ইঞ্জিনিয়ার'। ২০০৪এ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে খালেদার নিজস্ব রচিত সংবিধানে জিয়াউর রহমানের নাম সংযোজন। জিয়া পরিবারের নিজস্ব সংবিধান, সংসদ, ক্ষমতা, পতাকা। তারেক জিয়ার হেরোইন বাহিনী এবং কোকো জিয়ার কোকেন বাহিনী। এদেশ কি স্বাধীন হয়েছিলো, জিয়া পরিবারের প্রজাতন্ত্র হতে? মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, জিয়াবাদীদের প্রতিষ্ঠা করতে? হ্যালো! এদেশ কি জিয়া ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণাগার? দেশকে শেষ করে দেয়ার জন্য জিয়াবাহিনী? সুতরাং এইসব ইঞ্জিনিয়ারিং এর মানে কি? এর শাস্তি কী? যুদ্ধাপরাধীরদেরকে মুক্তির মানে কি? গণহত্যার বিশ্বকোষে বাংলাদেশের গণহত্যা নেই কেন? এর জন্য দায়ী কে? জার্মানরা এই ঘটনাকে কিভাবে নিতো? বাঙালিরা কিভাবে নিয়েছে? ইয়াহিয়ার '৭১ এর প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানদেরকে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য জিয়ার সংবিধান খৎনা আর কোন মুক্তিযোদ্ধার উদাহরণ? আমার সন্তান জানতে চায়, বাংলাদেশে হলোকস্ট মিউজিয়াম কোথায়? হ্যালো! শুনছেন? সেগুনবাগিচার মিউজিয়ামটি এতো ছোট কেন? সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমির খবর কী? জিয়া উদ্যান মানে কী? কার কবর? কেন কবর? শহীদ পরিবারের ভাতা কোথায়? জিয়া উদ্যানের ভারে ঢাকার মাটি যখন জর্জরিত, একটি উপযুক্ত হলোকস্ট মিউজিয়ামের অভাবে পুরো মুক্তিযুদ্ধ কেন ঋজু হয়ে কাঁদে? বাংলাদেশ মানে কী জিয়া? হ্যালো! জিয়া উদ্যান কি, মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে বড়ো? পঙ্গু শহীদ এবং যারা রিক্সা চালায়, জিয়া না হলে তারা মুক্তিযোদ্ধা নয়? জিয়া পরিচয় না হলে, মুক্তিযুদ্ধের ফসল তাদের জন্য কি অবৈধ? জিয়া, গন্ধ না থাকলে, সে ফসল কি ফসল নয়? জিয়া উদ্যানকে মুক্তিযোদ্ধা হকার্স মার্কেটের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে না কেন? হকার মুক্তিযোদ্ধা না খেয়ে মরে, জিয়া পরিবারের ৩৫ হাজার কোটি টাকা দেশে-বিদেশে ব্যবসা করে। ইয়াহিয়ার জারজ পুত্র জিয়া, '৭৭ এ সৃষ্টি করেছে নতুন গণকবর। আপনারা কি শুধু ইয়াহিয়ার গণকবরই দেখেছেন? জিয়ার তৈরি বধ্যভূমি দেখবেন না? চলুন যাই। তারপর লিখবো, জিয়াইয়াহিয়ার বধ্যভূমি প্রীতির ইতিহাস। জিয়ার বধ্যভূমিতে আছে বাংলার বীর যাদের অপরাধ তারা মুক্তিযোদ্ধা, যারা কেউ জিয়া নয়।

৯৬. বঙ্গবন্ধু হত্যার ১০ দিন পর– উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান, আড়াই মাস পর সেনাপ্রধান এবং ডেপুটি সামরিক প্রশাসক, দেড় বছর পর সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক শাসক, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও অর্থমন্ত্রী, সোয়া এক বছর পর প্রধান সামরিক প্রশাসক, সেনাপ্রধান এবং দুইরকম রাষ্ট্রপতি [হ্যাঁ-না এবং নির্বাচন]। ...কোন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়? বরং হুবহু মীরকাশিমের। উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক, উপসেনাপ্রধান এবং তিনটি মন্ত্রনালয়ের প্রধান। একই অঙ্গে জিয়ার কতো অলংকার! জিয়ার চাই সব অলংকার। জিয়ার চাই ১৫ কোটি মানুষের রক্তালঙ্কার।

অপুরুষ তাহেরের রক্তে গদি। সমকামী খালেদের রক্তে ক্ষমতা। ঘানির ষাড় হুদা ও হায়দারের রক্তে – জিয়াবাদ। অর্থাৎ বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের পতাকায় ফিরিয়ে দেয়া। জিয়া যা চাইতো তাই হতো। জিয়া চেয়েছিলো, সব বাংলাদেশ তার। সবটুকু। ৩০ লক্ষ শহীদ তার কাছে– 'মল'। মহা-স্বৈরাচার ইদি আমীনের রক্ত যার গায়ে, জিয়া, তার পাপ কি কোনদিনও প্রকাশ হবে? আমরা চাই আরেকটি বঙ্গবন্ধু, এই জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে। চাই ৭ই মার্চ, দেশকে জিয়ামুক্ত করতে। মুক্তিযুদ্ধ এবং পতাকা, দশ বছরে জিয়া কি প্রমাণ করেনি– কতোখানি ঘৃণা তার বুকের '৭১এর ব্যর্থতা জুড়ে?

৯৭. ১৫ই আগস্টের পর থেকে, একের পর এক এত মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি এত অভ্যূত্থান এবং মোস্তাক ও সায়েমের পতনের মাধ্যমে একমাত্র বিজয়ী বীর জিয়া, একমাত্র পদোন্নতির শিখণ্ডি জিয়া, তিন সেক্টর কমান্ডারের প্রাণ বিনাশকারী জিয়া, সংবিধান হত্যা করে দেশকে পুনরায় '৭১ পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া জিয়া, সৌদির জন্য সংবিধানের খৎনা পূরণ, আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? ১৫ই ডিসেম্বরে জাতিসংঘে ভুট্টোর গালাগাল, "দেশকে ওরা ৫ বছরের জন্য নিয়ে যাক, আমরা আবার পূর্ব-পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনবো।" জিয়ার '৭৫, '৭৬ ও '৭৭এর অপরাধের ট্রেইল এবং এই কাজটাও সম্পন্ন করে সে প্রমাণ করেছে '৬৯এর গণঅভ্যুত্থানের সময় হঠাৎ তাকে কেন বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিলো। একজন আমেরিকান বাংলাদেশী মেজরকে পেন্টাগণ থেকে হঠাৎ বাংলাদেশে পাঠিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বললে সে কী করবে? জিয়া বাংলাদেশ চেনে না, যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে ৬ বছর বয়সে। তার বাবা, মা, '৪৭ হতেই দেশত্যাগী। সেদেশই তাদের এবং প্রেমপ্রীতি চেতনায় যাদের বিদেশমাতৃভূমি, জিয়ার ব্যাপারটাও তাই। জিয়া বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতার বীরউত্তম। জিয়াকে বীরউত্তম না দিলে, আরো আগেই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হতো। জিয়ার বীরউত্তম, বঙ্গবন্ধুর বড়ো হৃদয়ের পরিচয়। কিংবা, ভয়ের। জিয়া পরিবার, সংবিধান এবং ইতিহাস, ইঞ্জিনিয়ার। হেরোইন ইঞ্জিনিয়ার! কোকো ইঞ্জিনিয়ার! খালেদা ইঞ্জিনিয়ার! খালেদা ইঞ্জিনিয়ার তো দলিলপত্রকেই নতুন চেহারা দান করেছে। জিয়া ইঞ্জিনিয়ার, সংবিধান পাল্টে উল্টে দিয়েছে। কোকেইন ও হিরোইন ইঞ্জিনিয়ার, হাওয়াভবনে বসে '৭১কে ইচ্ছেমত বিক্রি করেছিলো ফলে, নিজামীরা এখন বধ্যভূমিতে গিয়ে শহীদের হাড়গোড় দিয়ে ফুটবল খেলে! মাথা দিয়ে গোল! একাজ আর কোন বীরউত্তমের? হ্যালো! জিয়ার পারিবারিক গোরস্তান কি পাকিস্তানে নয়?

৯৮. সায়েম এবং মোস্তাক, দুইকেই ক্ষমতা থেকে বিতাড়ণ। জিয়ার ৪টি ক্যু, সায়েম ও মোস্তাকের বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র করে আগে তাদেরকে ক্ষমতায় আনা, কিছুদিন পরেই ক্ষমতা দখলের ট্রেইল নিশ্চিত। ২৭শে মার্চের সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রকৃত জিয়ার ঘোষণা এবং মোটিভ, "আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট...।" যা তার উচ্চমার্গের আইএসআই রিক্রুটি কাটাকুটি ইঞ্জিনিয়ার ধূর্ত স্ত্রী

খালেদার অপকর্মেরও প্রমাণ, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে যা বিকৃত করে প্রকাশ করা হয়েছে ২০০৪ সনে। বেগম জিয়া প্রমাণ করেছে সে জিয়াউর রহমানের চেয়েও বড়ো আইএসআই। '৭১এ সে ক্যান্টমেন্টে পাকিস্তানিদের হেফাজতে। '৭১এ সে শরীর ও চেহারা দিয়ে পাকিস্তানিদের হেফাজত করেছিলো। খালেদা জিয়া বরাবরই পাকিস্তানি আর্মির উচ্চ মহলের জনপ্রিয়, উর্দিহীন ভাবী। একজন ৬২ বছরের বাঙালি বিধবার লোলিটা সাজকাজ দেখে যা অনুমান করা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়। এই যে! মোল্লারা সব কোথায়? এই পর্দাহীন বিধবা মেয়েমানুষের জঘন্য সাজগোজ করে পুরুষদেরকে প্রলোভন এবং হাতিয়ে নেয়া। ফতোয়া কোথায়? এই লোভী এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি কোথায়? তার পরকীয়া প্রেমের বিরুদ্ধে মোল্লারা কোথায়? হ্যালো! সে তো ফালুকে বিয়ে করেছিলো, লুকিয়ে লুকিয়ে। ছিঃ! ফতোয়া কি শুধু সখিনাদের? বেগম গডমাদার জিয়া কি '৭১এর সব কারণ মুছে ফেলতে তৎপর ছিলো না? সেকি দেশকে পরিপূর্ণ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো না? সে কি '৯১তে বঙ্গবন্ধুর চেতনা উপড়ে ফেলতে সব নকশা সম্পন্ন করেনি?

৯৯. গণহত্যাকারীদেরকে রাজবন্দী কোন মুক্তিযোদ্ধা বলবে? ইতিহাসের কু-পুত্র, আম্রকাননের মীরজাফর-ভাগাড়, জার্মানরা আমাদের এই ইতিহাস শুনলে কি বলবে? আমাদের ২য় প্রজন্ম আমাদেরকে কি বলবে? জিয়া '৭৫এর ২৩শে নভেম্বরে ভাষণে বলেছিলো, "আমরা অনেক রাজবন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছি এবং আরো অনেককে পর্যায়ক্রমে মুক্তি দেবো।" [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া]। একজন ওয়ার ক্রিমিনালকে জিয়া কেন রাজবন্দী বলবে? আমি যখন এই কথা হলোকস্ট মিউজিয়ামে ব্যক্ত করেছিলাম মিউজিয়ামে পরিচালক উস্মাতে হেসে উঠেছিলো, সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, রিয়েলি! ইন্টারেস্টিং! তা তোমাদের সরকারকে বলো, লবি করতে। আমি বলি, সর্ষের মধ্যে ভূত! জিয়া, জার্মানীতে জন্ম নিলে তার এই লোভের ফল, কি হতো? রাজাকারের রাজবন্দী হলে, মুক্তিযোদ্ধারা কি খুনি? হ্যালো! আসুন আমরা '৭৫এর জিয়া পশুকে হত্যা করি। নাহলে, এদেশ শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় সেনাপ্রধান আপনি আপনার সন্তানকে কি জবাব দেবেন? বেগম গডমাদার আপনার পরিচয়, আপনি একজন মিথ্যেবাদী।

১০০. '৭১এর কোন গণহত্যাকারীই রাজবন্দী নয়। এরা সব কোলাবরেটর। রাজবন্দী এবং '৭১এর ঘাতকদালাল, দুই। ৭ ও ২৩শে নভেম্বরের ভাষণে জিয়া যাদেরকে রাজবন্দী বলে সম্বোধন করেছিলো, তারাই '৭১ এর ১১ হাজার বন্দী যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিলো ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের। যাদের ৭৫২ জন ইতিমধ্যেই প্রমাণ সাপেক্ষে সাজাপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে ড. শহীদুল্লাহ কায়সারের খুনি খালেক মজুমদার রাজবন্দী, জিয়া যাদেরকে রাজবন্দী উপাধি দিয়ে স্বাধীনতার মুখে লাথি মেরেছিলো। ইয়াহিয়ার শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানের মতো নাৎসী পাকিস্তানিকে

জিয়া রাজবন্দীর সম্মানে মুক্তি দিয়েছিলো। জামাতের আমীর হতে দিয়ে বাংলাদেশে তার স্বাধীনতা বিরোধী সকল কার্যকলাপ বৈধ করে দিলো। একাজ কার? জিয়ার নির্দেশে প্রায় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী, রাজবন্দী নামে, জেল থেকে বেরিয়ে এলো '৭৫ এর শেষ দিনটি থেকে। যে দুষ্কর্ম এমনকি খুনি মোশতাকও করেনি। প্রজ্ঞাপন জারি করে ঢোল বাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে জিয়া, সাজাপ্রাপ্ত এবং খুনি ও বিচারাধীন ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী খুনিদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। যাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যার খুনিরাও। [দ্রঃ একাত্তরের ঘাতকদালালেরা কে কোথায়]। [দ্রঃ খালেক মজুমদারের বই, শেকল পরা দিনগুলি, জেনোসাইড এ ওয়ার্ল্ড প্রেস, জেনোসাইড '৭১, গণহত্যার বিশ বছর পর... "পূর্ব পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না, আপনার নির্ভয়ে পাকিস্তানি বন্ধুদের সহায়তা করুন।" – আব্বাস আলী খান, ১১/১০/৭১। "৭১এ যা করেছি ঠিক করেছি, স্মৃতির সাগরে ঢেউ, আব্বাস আলী খান।" খালেক মজুমদার, যে ড. শহীদুল্লাহর জেলখাটা খুনি, বিচার বিভাগকে ধুলোয় মিশিয়ে তার মুক্তি সম্ভব করেছে জিয়া স্বৈরাচার। (শেকল পড়া দিনগুলি, পৃঃ ১২৯)। জিয়ার অপরাধের ফসল বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মরণ। সাফ কথা। এরপরেও সে মুক্তিযোদ্ধা? হ্যালো! যারা কারাগার অপহরন করে– মুক্তিযোদ্ধা? আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। জিয়া পাকিস্তানবাদী, মওদুদীবাদী ও মৌলবাদী। বাঙালি? নাকি বাংলাদেশী? ধর্মনিরপেক্ষ না মুসলমান? বিছমিল্লাহ নাকি মানবতা? ইসলামধর্ম নাকি নিরপেক্ষতা? আমি এর জবাব চাই। সংবিধান ম্যাসাকার কার হাতে? এদেশ আমাদের সবার। কিন্তু জিয়াবাদ একে করেছে তাদের দেশ। আসুন আমরা জিয়াইয়াহিয়ার বধ্যভূমি ঘুরে আসি। তাকেও ইয়াহিয়ার সমান সর্যাদায় ভূষিত করি। ২৫শে মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইট আর জিয়ার '৭৭এ গণহত্যা এক। জিয়া, ইয়াহিয়ার চেয়েও বড়ো খুনি। আসুন আমরা এই পশুকে চিহ্নিত করি। যে পশু ২৫শে মার্চ রাতে, সোয়াতে গিয়েছিলো, আমাদের খুনের অস্ত্র সরবরাহের কাজে। যা একজন সামান্য ডক শ্রমিক পর্যন্ত ঘৃণা করেছিলো।

১০১. যারা '৭১ এর খুনি, তাদেরকে রাজবন্দী সম্বোধন এবং মুক্তির জন্য গেজেট? '৭২এর ঘাতকদালাল আইন বাতিল করে ৩১শে আগস্টের গেজেটের মাধ্যমে ১১ হাজার কোলাবেরটরের মুক্তি? জিয়া কাকে বোক ভাবে? হ্যালো! দেশজুড়ে হেরোইন এবং কোকেইন জিয়া, খালেদা ইঞ্জিনিয়ার, জিয়া তাদের– জিয়াবাদ, নাৎসীবাদকেও হার মানিয়েছে। যে নিজামী, আব্বাস আলী খানের নাগরিকত্ব ফেরত দিতে ৫ম সংশোধনী, জিয়া মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেছে ৫ম সংশোধনী জারি করে। ৫ম সংশোধনী একটি বিষাক্ত আবর্জনা এবং অপরাধের ডিপো। ৫ম সংশোধনী, ৩০ লক্ষ শহীদের বুকে লাথি। গালে চর। মলদ্বারে বাঁশ। এই সংশোধনীতে ধর্ষিতাদের ধর্ষকদের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার বীর

এবং মুক্তিযোদ্ধা হত্যার বিচার রহিত করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে গণহত্যা বৈধ হয়েছে। দেশ মুসলমান হয়েছে। এই সংশোধনীতে নিজামী সাভারে গেছে। দ্বিতীয় প্রজন্ম শুনলে কি বলবে? জার্মানরা শুনলে কি বলবে? জিয়া, সংবিধানের খৎনা, ইতিহাস ও সংবিধান ইঞ্জিনিয়ারিং করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পতিত ঘোষণা করেনি? জিয়া পরিবার, বাংলাদেশকে তাদের দেশ করেছে তারা নিজামী ও সাঈদীকে সাভারে পাঠিয়ে বধ্যভূমিকে মানুষের মলদ্বার সমান করেছে। ৩০ লক্ষ শহীদ, জিয়াবাদের আশ্রমে বন্দী। জিয়া, বারবার '৭১কে হত্যা করতে '৭১-'৮১ – ১০ বছর সচেষ্ট ছিলো যার প্রমাণ, ২৫শে মার্চ ১৯৭১।

১০২. মুক্তিযুদ্ধের তিন সেক্টর কমান্ডার খুন, কার কাজ? জিয়া? নাকি ক্লাইভ! মাননীয় জীবিত সেক্টর কমান্ডারগণ, আপনারা আর কেউ করেছেন একাজ? না হলে, এখনো সেটা বরদাস্ত কেন? আপনারাই বলুন, আপনারা সাক্ষী, রণাঙ্গণে জিয়া কি যুদ্ধ করেছিলো? বীরউত্তম যোগ্যতার জন্য কি অবদান? মুক্তিযুদ্ধে জিয়া কতটুকু যুদ্ধ করেছিলো, যে জন্য সে বীর উত্তম? যেজন্য সে জিয়া উদ্যান? যেজন্য সে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর? তিন সেক্টর কমান্ডার খুনের মাধ্যমে জিয়া কি নিজেকে প্রমাণ করেনি যে সে, ব্যভিচারী আওরঙ্গজেব? রবার্ট পেইন তার ম্যাসাকার বইতে এভাবেই লিখেছেন, "বড়ভাই দারাশিকোকে হত্যার আদেশ দিয়ে তার কাটা মাথা দেখতে চাইলেন আওরঙ্গজেব। বড়ভাইয়ের রক্তাক্ত মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে আসতে বললো। ভেবেছিলেন, অন্য কারো মাথাও তো আনতে পারে। ছোরা দিয়ে চোখের পাতাকে উঠিয়ে দেখলেন, খুঁজলেন একটা চিহ্ন, দেখে নিশ্চিত হলেন, চমৎকার কারুকার্যখচিত ক্যাসকেডে করে অন্তরীণ সম্রাট শাহজাহানকে তা পাঠিয়ে দিলেন। ...যতদূর সম্ভব অমানবিক আচরণ করেছেন হিন্দুদের সাথে। কোন মন্দির তৈরি করতে পারেনি তারা। অত্যাধিক করের বোঝা চাপিয়ে বহু হিন্দুদের করেছে সর্বস্বান্ত। তারপরও প্রতিবাদ করলে, প্রতিপক্ষকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে বাধেনি আওরঙ্গজেবের।" রণক্ষেত্রের সহযোদ্ধারা ভাইয়ের চেয়ে বেশি। আমেরিকাতে এদেরকে বলে রণাঙ্গণের ব্রাদার। আর আপনাদের চোখের সামপনে এদেরকে একের পর এক– খুন? কোথায় আপনাদের বিবেক? জিয়ার নৃশংস হাতে তিন সেক্টর কমান্ডারসহ প্রায় ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা খুন এবং পচাগলা লাশ হয়ে বীর খালেদ মোশাররফের মৃতদেহ ক্যান্টনমেন্টে প্রদর্শন করে, গণ ঘৃণার উদ্রেক করানোর নিদর্শন যা একজন জঘন্য ইদিআমীনের কিংবা সিরাজের খুনি মোহাম্মদী বেগের মুখ। জিয়া, ত্রাসের রাজা, নৃশংস, দুধর্ষ ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ডধারী স্বৈরাচার আওরঙ্গজেবের চেয়েও ভয়ংকর স্বৈরাচার বলে প্রমাণ রেখেছে, রণক্ষেত্রের দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন। ইতিহাসে দারাশিকো এবং খালেদ মোশাররফের দৃষ্টান্ত এক। দুধর্ষ আওরঙ্গজেব যে নাকি হিন্দু ধর্ম বিনাশে তৎপর ছিলো; সে এবং জিয়া এক। আওরঙ্গজেবের কারণে ভারতে হিন্দু ধর্ম লোপ পেয়েছিলো

আর জিয়ার কারণে বাংলাদেশে মাইনরিটি নিধন তুঙ্গে উঠেছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্বংস করে সংবিধানকে মুসলমানী, খৎনা। ভারত কি ৩০ কোটি মুসলমানদেরকে অস্বীকার করতে সনাতন ধর্ম সংযোজন করেছে তাদের হিন্দু সংবিধানে? ভারত যা করেনি, '৭১ এর সাড়ে চার বছর পরেই সংবিধান সংশোধন করে, ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল বা ইসলাম ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে আজ সংবিধানকে পরিপূর্ণ মুসলমান করে ফেলা, হিন্দুদেরকে পরিপূর্ণ অস্বীকার, তাদের মানবাধিকার চরম অপমান, দেশকে পরিপূর্ণ ছুরিকাঁচি দিয়ে ধর্মীয় কায়দায় জিয়ার হাতে মুসলমানী দান, আমার প্রশ্ন কেন এই ব্যভিচার! আসলে জিয়া বহুদিন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করায়, ষড়যন্ত্রে সিদ্ধ হস্ত। আমার প্রশ্ন, ধর্মের অধিকার সারা বিশ্ব জুড়ে আজ শুধু কি মুসলমানদেরই? অথচ ইসলাম ধর্মকেই কেন্দ্র করেই ৩২ বছর পর ভারতে নেমেছিলো সেনাবাহিনী। পশ্চিমে, মুসলিম ধর্ম নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় রেনেঁসাস চলছে রণদামামা বাজিয়ে। অথচ বাংলাদেশে হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারকে সংবিধানের মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাদের লিঙ্গে চাকু চালানো হয়েছে। এবং তা করেছে, জিয়া। হ্যালো!

১০৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা কেন, কেউই '৭১ এর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য জাতীয় নেতাদের খুনের তদন্তে বাধা দেবে না। সে যদি সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকে, বিচার কার্যে বরং তারই এগিয়ে আসার কথা। তদন্ত এবং দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার কথা। এটাই নিয়ম। কারণ, মহান মুক্তিযুদ্ধে সে তাদের কমান্ডেই মুক্তিযোদ্ধা। ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর, '৭৭এ একমাত্র তার হাতেই যখন প্রধান সামরিক প্রশাসক, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, তখন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং ৪ জাতীয় নেতার খুনিরা তার নির্দেশেই বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে নির্বাসিত, '৭৫এর ৪ঠা নভেম্বরে সুপ্রীম কোর্টের তিন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত জেলহত্যার তদন্তকারী বিচারপতি আহসানউল্লাহ চৌধুরী, বিচারপতি কে.এম সোবহান, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের সব কর্মকাণ্ডেই জিয়ার নিষেধাজ্ঞা। জিয়া, কি বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যার তদন্তকারী ব্রিটেনের রাণীর উকিল স্যার টমাস উইলিয়ামসকে ৬বার ভিসা দানে অস্বীকৃতি জানায়নি? সে কি সাংবাদিক এন্থনীর ভিসা বন্ধ করে দেয়নি, শেখ হত্যা তদন্তের কারণে? বরং '৭৫ এ গেজেট জারি করে জিয়া, ঘাতকদালাল আইন অবৈধ করে, '৭৮ এ অবৈধ গোলামকে বৈধ ভিসা দিয়ে জিয়া, হত্যার সব হত্যা তদন্তে বাধা দেয়, '৭৫-'৮১ পর্যন্ত। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুক্তিযুদ্ধে তার সুপ্রীম কমান্ডারের হত্যার বিচার করতে আসতে চাওয়া লন্ডনের আইনজীবীর ভিসা ৬ বার বন্ধ করে একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী গোলামের মতো বাংলারগোয়েবলসকে লন্ডন থেকে বাংলাদেশের ভিসা দেবে না। [দ্রঃ জেল হত্যাকা । কমিশন অব ইনকোয়েরির রিপোর্ট। এখানে নাশকতাবাদী দুধর্ষ জিয়ার, দুষ্কর্ম ধরতে ভাবতে হবে না]। [দ্রঃ '৭১এর যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শেখ হাসিনার

ঐতিহাসিক বক্তব্য, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত, পৃঃ ৭২, প্রসঙ্গ গোলাম আজম ও গণআদালত]। তার স্ত্রী খালেদা জিয়া গোলামকে চুমা খেয়ে, বুকে এবং গলায় তুলে নাগরিকত্ব ও আমীরত্বের পাইকারী অনুমতি, শহীদজননী জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনকে দেশদ্রোহীর হুলিয়া, তাদেরকে লাঠিপেটা এবং হাসপাতাল। তাদেরকে পেটালো, যেন তারা দুস্কৃতিকারী, চোর। জিয়া এবং খালেদা, বাংলাদেশের দুই আসল দুস্কৃতিকারী, গডফাদার এবং গডমাদার। শঠ এবং দুর্দান্ত ব্যভিচারের ধৃষ্ঠতার অন্যতম সমন্বয় এরা দুই স্বামী-স্ত্রী যাদের কানেকশন– পাকিস্তান। যাদের কর্মকাণ্ড পাকিস্তান। তাদের দুই পুত্র, তারেক-লুটপাট এবং কোকো-কোকেইন। সংবিধান ইঞ্জিনিয়ার জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে জাতিরজনক থেকে বিলুপ্ত করেছিলো। তার স্ত্রী সংসদে বলেছিলো, "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তি নেই।" একই বছর সে গোলামকে নাগরিকত্ব দিলো। ২০০৪ সনে বঙ্গবন্ধুকে বইপত্র থেকে বিতারণ করে গডফাদার জিয়াকে বঙ্গবন্ধু করার জন্য চূড়ান্ত জিয়াবাদ প্রদর্শনী। গডমাদার জিয়া, কি বলতে চায়? বঙ্গবন্ধু একটা জারজপুত্র? তাহের একটা রাষ্ট্রদ্রোহী? খালেদ মোশাররফ একটা চোর? গোলাম আজম বীরশ্রেষ্ঠ? আর কতো ঋণ শোধ দেবে এদেশ? কবে এদেশ জিয়ামুক্ত হবে?

১০৪. একজন মুক্তিযোদ্ধা কি কখনো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের শক্তিকে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করায়? একজন আইএসআই জিয়া, শেখ হত্যার বিচার বন্ধ করে, বাংলার গোয়েবলসগোলামআজমকে দেশে ঢুকতে দিয়ে কি প্রমাণ করলো না? একজন মুক্তিযোদ্ধা জিয়া, বাংলার গোয়বলসগোলামআজমকে ভিসা দিয়ে দেশে কায়েদীতন্ত্রের আর কি বাকী রেখেছিলো? একজন রাষ্ট্রদ্রোহী জিয়া, একজন যুদ্ধাপরাধীদের লিডার, নিশ্চয়ই গোলাম আজমের ভিসার জন্য লন্ডন দূতাবাসকে হুকুম দেবে। চূড়ান্ত রাষ্ট্রদ্রোহী গোলামআজম, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং জাতীয় বেঈমান, '৭১এর খুনি জিয়ার হস্তক্ষেপে ১১ই জুলাই '৭৮এ বাংলাদেশে ঢুকেছিলো, যখন শেখ হত্যা তদন্ত নিষিদ্ধ। '৭১এর নভেম্বরে যে গোলাম, মওদুদীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিরতি তৎপরতা চালিয়েছিলো পাকিস্তান থেকে, আমেরিকা ও চীন। এবং সুদূর সৌদি আরব ও সুদান। যে গোলাম, মওদুদীর টেলিগ্রাম নির্দেশেই নভেম্বর মাসে নিশ্চিত বিজয় দেখে পাকিস্তানে পালিয়ে গেলো। সংবিধান মতে '৭৩এর ১৮ই আগস্ট তার নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ হয়েছিলো বাংলাদেশে। পাকিস্তান থেকে সে মওদুদীর তদবিরে ভিসা সংগ্রহ করে ভুট্টো, বাদশা ফয়সালসহ কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহরাইনের বিভিন্ন ক্ষমতাবান মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির সঙ্গে নব্য স্বাধীন দেশে ফের মৌলবাদ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম এবং পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলো। তার কর্মকান্ডের মধ্যে লন্ডনে তার শক্তিশালী জামাত নেটওয়ার্ক এবং সাপ্তাহিক সংগ্রাম পত্রিকা, লন্ডন, বাহারাইন, পাকিস্তান... বিভিন্ন দেশের ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের মৌলবাদীদেরকে পুনর্গঠন করে হজের নামে তাদেরকে সৌদিতে টিকেট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে একসঙ্গে এনে, হজের

মাঠে বসিয়ে মুজিবের বিরুদ্ধে আব্বাস আলী খানসহ অন্যান্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, যা তার আত্মজীবনী, "জীবনে যা দেখলাম" বইতে প্রকাশিত। এই বইয়ের পাতায় পাতায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ। বই নয়, এ্যাটম বোম্ব। গডমাদার তার প্রকাশনীর সব অর্থ দিয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো এই মাপের (যার সংবাদ '৭১এর সংগ্রাম পত্রিকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ বার) একজন মুক্তিযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারীকে বাংলাদেশে ঢোকার অনুমতির ধৃষ্ঠতা কিছুতেই দেখাবে না। দিলে যে মুক্তিযোদ্ধা নয়। গোলামের আত্মজীবনীতে জিয়ার সাথে সৌদির মৌলবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনে যা দেখলাম বইটিতে, সৌদির ইচ্ছা, বাংলাদেশের সংবিধানে মূল পরিবর্তন, খুব স্পষ্ট এবং অমুক্তিযোদ্ধা জিয়া সেই কাজটিই সম্ভব করেছিলো। [দ্রঃ জীবন যা দেখলাম ৪র্থ খ পৃঃ ১৭০-১৭১, ২১০-২১১]। এই বইয়ের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লোমহর্ষক ষড়যন্ত্রের গন্ধ, যা জিয়ার ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। [দ্রঃ ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার দেশে ফিরে আসার পর সেপ্টেম্বর মাসে আমীর পদে উপ নির্বাচন হয়, ১৯৭৯ সনের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামাতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামাত তার কার্যক্রম শুরু করে।] এইখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় ৫ম সংশোধনীর সঙ্গে সৌদি কানেকশন। জিয়া যেসব কর্মকা করেছে, আমার প্রশ্ন, দেশের আর কোন বিবেকবান চিফ অব স্টাফ, সরকার, সচিব, মহাসচিব যারা নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে, এই দুষ্কর্ম করেছে? তাহলে জিয়ার পদচিহ্ন ধরে পারভেজ মোশাররফ বা নওয়াজ শরীফ বা বেনজীর ভুট্টোকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী বানালেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো। আমরা কি সত্যি সত্যিই স্বাধীন যখন আমাদের জন্য রাজাকার মন্ত্রীসভা এবং চারিদিকে রাজাকার? অখণ্ড পাকিস্তানে আর বাকী থাকলো কী? বিবেকবানদের কাছে আমার কঠিন জিজ্ঞাসা। আসুন আমরা 'এক্টিভিজম' শিখি। আন্দোলন শিখি। সঠিক ভাষা ও শব্দ ব্যবহার শিখি। সেনাপ্রধানকে অনুরোধ- 'আবার তোরা মুক্তিযোদ্ধা হ'। আসুন আমরা '৭৭এর বধ্যভূমি দেখে এসে, একজন পশু হত্যার প্রতিজ্ঞা করি। এই পশু, '৭১এর চেয়ে ভয়ঙ্কর। এই পশু ঘরের। এই পশু হত্যা করেছে নিজের ভাই। ইয়াহিয়া হত্যা করেছে, শত্রু। জিয়ার অপারেশন সার্চলাইট, '৭১এর চেয়ে জঘন্য। ইয়াহিয়া কখনো বেছে বেছে হত্যা করেনি। জিয়া হত্যা করেছে যারা- মুক্তিযোদ্ধা।

১০৫. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জালিয়াতি? রাষ্ট্র যাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলো ১৮ই এপ্রিল '৭৩এ এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, কোন মুক্তিযোদ্ধাই সেটাকে বাতিল করে এমন কোন আইন সংশোধন করবে না যার ফলে নিষিদ্ধ নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী খান, হামিদুল হক চৌধুরী এবং গোলামেরা বৈধ হবে। করলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী। বাংলার গোয়েবলসগোলাম আজম যাকে বাংলানাৎসীদলবিএনপ-খালেদা বারবার ভিসা নবায়ন করে দেশে রেখে '৯৪তে ফের এদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে

দিলো। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খণ্ড]। শুধু তাই নয়, গোলামের গোলাপী-প্রেমিকা-খালেদা-জিয়া গোলাম আজমের মৌলবাদী বইগুলোকেও গোলাপী ভালোবাসায় পুনঃপ্রকাশ করেছিলো। আহা! উহু! খালেদা জিয়া, তার সব বই এবং আত্মজীবনী প্রকাশ করেছিলো রাষ্ট্রীয় খরচে। এই ব্যাভিচারি তাকে '৯৪তে বিদেশের ভিসা দিয়ে বিদেশে ফের '৭১এর সমপরিমান দেশদ্রোহীতার সুযোগ করে দিলো। তাকে আমীর বানালো। যে সাহস জিয়া করেনি; খালেদা, জিয়াউর রহমানের চেয়ে বড়ো আইএসআই রিক্রুট, যার হাত দিয়ে গোলাম আজম ফের এদেশের নাগরিক হলো যা গোয়েবলসকে পুনরায় জার্মানীর নাগরিকত্ব দেয়ার সমান। যার মূলে জিয়ার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, তারিখ ৫ই এপ্রিল ১৯৭৮। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, পৃঃ ১৬৬]। ৫ই এপ্রিল ১৯৭৯তে একে ৫ম সংশোধনীকরণ। এই সরাসরি চোর ধরার ট্রেইল আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? বিদেশের পাসপোর্ট হাতে যে কেউ এদেশের রাজনীতিতে ঢোকার অযোগ্য। সংবিধান মোতাবেক, কোন বিদেশীই দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। গোলাম, পাকিস্তানি পাসপোর্ট হাতে পাকিস্তান থেকেই বাংলাদেশে জামাতের কর্মকান্ডে সক্রিয় যার ফলাফল জিয়ার '৭৬ এর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ৩৮ অনুচ্ছেদ খৎনা যা ৬৬টি অবৈধ ইসলামিক দলকে বৈধ করে দেয়। '৭৭এ দেশকে মুসলমানী দেয়ার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা বাতিল। জিয়া না হলে, গোলামেরা কখনো রাজনীতি করার সুযোগ পেতো? এই সেনাবাহিনীকে জিয়া, প্রচ ভারত বিদ্বেষী করে তুলেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে সে ধাত্রীমাতা ভারতকে পর্যন্ত অস্বীকারের ফায়দা লুটেছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচ ভারত ঘৃণা, জিয়ার দান। জিয়া, রণাঙ্গন থেকেই দেশকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়ার জন্য তৎপর, সে বাংলাদেশকেই বিশ্বাস করতো না। তার অজস্র কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে, জিয়া বিশ্বাস করতো পাকিস্তান। জিয়া একজন পাকিস্তান-পেন্টাগণের তুখোড় গোয়েন্দা। [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের ভূমিকা।] জিয়াপাকিস্তানি, প্রতিটি কর্মকান্ডে প্রমাণ করেছে তার ৬ বছর বয়েস থেকে রক্তে গাঁথা পাকিস্তানের জন্য আকুল ভালোবাসা। জিয়াপাকিস্তানি, গোলামের সকল অবৈধ কর্মকান্ডে সম্মতি দিয়েছিলো বলেই ভিসার অনুমতি, যার প্রমাণ, জিয়াপেন্টাগনি গোলামের দেশদ্রোহী কার্যকলাপকে সম্মতি দানের মাধ্যমে এদেশকে পাকিস্তানের আদলে তৈরি। দেশদ্রোহী জিয়ার কাছে দেশদ্রোহী গোলাম– দেশপ্রেমিক। জিয়ার চোখে, শহীদেরা সবাই রাষ্ট্রদ্রোহী বা সমকামী। তাহের-শহীদ জননী তার চোখে সমকামী। গোলামআজম-নিজামী তার চোখে খাঁটি দেশপ্রেমিক। এ কোন বাংলাদেশ? নাকি, পায়েন্দাবাদ! রাজাকার আলবদর জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বাংলা নাৎসী পার্টি জিন্দাবাদ। জিয়াপেন্টাগনি পায়েন্দাবাদ! খালেদা পেন্টাগনি পায়েন্দাবাদ! এদেশ এখন পূর্ব পাকিস্তানের ষাড়। এদেশ এখন, আফগানিস্তান। এদেশের সব এখন তালেবান। জিয়ার চেয়ে বড়ো আইএসআই তার গোলাপী বেগম যার মধ্যে গোলাম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ১৯৯৪তে। সে রাষ্ট্রদ্রোহীকে করেছে বীরউত্তম। খালেদা

জিয়ার হাতে বাংলাদেশ পতিতা হয়ে গেছে! '৭১ কে গডমাদার খালেদা করেছে গণপতিতালয়। সাভারকে দিয়েছে গণটয়লেটের পদক! মাননীয় সেনাপ্রধান, জবাব দিন! আপনারা কি ইসলামাবাদের কর্মচারি?

১০৬. একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা হলে, পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী নিষিদ্ধ যুদ্ধাপরাধীকে দেশে ঢুকতে দেয়ার মতো দেশদ্রোহী কাজ করবে না। গোলাম আজমকে ফের জামাতের আমীর হওয়ার সুযোগ দেবে না। বর্হিবিশ্বে তার '৭১এর বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ড এবং অখ পাকিস্তানের পক্ষে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সংগ্রাম পত্রিকার বাংলাদেশ বিরোধী সংবাদকে উপেক্ষা করবে না। হিটলারের গোয়েবলস এই গোলামকে দেশের মাটিতে ঢুকতে দিতে তাদের জন্য সংবিধান খণ্ডনা করে, নিষিদ্ধ নাগরিকত্ব আইনগুলোকে অবৈধ করবে না। '৭১এর সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত মওদুদী ও গোলাম আজমের শান্তিবাহিনীর সংবাদ এবং গোলামদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বপক্ষে সচিত্র আন্দোলন, বক্তৃতা, মিছিল এবং রাওফরমান আলী ও নিয়াজীর সঙ্গে সেইসব শ্বাসরুদ্ধকর বিশ্বাসঘাতকদের ছবি... উপেক্ষা করবে না। জিয়া, ১৫ই মে '৭৩এ বাংলাদেশ গেজেটে আনা যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সকল আইন বাতিল করে দেয় '৭৫ থেকে '৭৭ এর মধ্যে। সাড়ে পাঁচ বছরে তুলনাহীন অপরাধ করে জিয়া, যুদ্ধাপরাধীদেরকে বৈধ করেছে, জেলখাটা রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়েছে। শহীদদের হাড়গোড় এবং বধ্যভূমিগুলোকে নিজামীদের জন্য প্রস্রাবের জায়গা করেছে। জার্মানরা শুনলে কি বলবে, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যখন রিসার্চ করতে এসে এসব তথ্য জানবে, কি বলবে? আমাদের প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেবো? যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসনকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? মুক্তিযোদ্ধার চেহারা কি? চরিত্র? নিশ্চয়ই তারা জিয়াকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের একজন অপরাধীর ছবি তৈরি করবে। যেসব ছবি পলপট এবং ইদি আমীনকে নিয়ে তৈরি হয়। আমি অপেক্ষায় আছি প্রজন্মই তার উচিত জবাব দেবে। আদালতে তারা মৃত জিয়াকে প্রশ্ন করবে, মি. জিয়াউর রহমান! যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন? হোয়াই! হোয়াটস্ রঙ্গ। হ্যালো! ইতিমধ্যেই জিয়াকে তারা ঘৃণা করছে। তারাও জানে, জিয়ার যুদ্ধাপরাধী প্রেম। মাননীয় দেশনেতা-নেত্রীগণ! আমার জিজ্ঞাসা আপনাদের বিবেক কি কথা বলে? বিবেকের শব্দ কি শোনা যায়? আপনারা কি আরো ১০০ বছর বাঁচবেন? জীবন শুদ্ধ করুন। মৃত্যুর কথা ভাবুন। প্রজন্মক ভালোবাসুন। জিয়া যদি মুক্তিযোদ্ধা হয়, গোলাম কে? আসুন সবাই গোলামকে বলি– বীরশ্রেষ্ঠ! জিয়া পরিবার, সংবিধান এবং ইতিহাস ইঞ্জিনিয়ার। সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমিকে যারা নিজামীর টয়লেট করতে পারে, যারা সাভারে নিয়ে যায় নিজামীর মলমূত্র মাখা হাত পা, যারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে সংসদে দাঁড়িয়ে বলে ভিত্তিহীন, আমরা কেন ইয়াহিয়াকে বলছি, নরপশু? সেকি নরপশু? না। ইয়াহিয়া কখনো নরপশু নয়। **বরং সে নরপশুর জারজ পিতা। ইয়াহিয়া, জিয়ার একশভাগের একভাগ অন্যায়ও করেনি। ইয়াহিয়া, জিয়ার কাছে ইঁদুর।**

১০৭. কোন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ বিরোধী পাকিস্তানের নাগরিক ভয়ংকর মওদুদীবাদী গোলামের মতো একজন চিহ্নিত এবং দেশদ্রোহী হয়ে পাকিস্তান পালিয়ে যাওয়া এবং পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী যুদ্ধাপরাধীকে দেশে ঢোকার অনুমতি দান করে হিটলারের উদাহরণকে ম্লান করে দেবে? সংগ্রামসহ সব পত্রিকায় প্রকাশিত সেই বিশ্বাসঘাতক ছবি, স্বাধীনতার মুখে চুনকালি মাখিয়ে শান্তিবাহিনীর প্রধান খাজা খায়েরউদ্দিনের পাশে পাকিস্তানের পক্ষে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলে হেঁটে যাওয়া গোলামের '৭১ এর হাজার হাজার স্বাধীনতা বিরোধী সংবাদ অগ্রাহ্য করবে? এই কলঙ্ক থেকে জিয়ার মুক্তি কেন? '৭১এর সংগ্রাম পত্রিকার পরেও, জিয়ার বীরউত্তম, কেন? এদেশের মাটি কেন তার জন্য নিষিদ্ধ হবে না? 'জু'দের থেকে শিক্ষা নিয়ে, নাৎসী পার্টির মতো তার প্রো-পাকিস্তানি পার্টিও কেন নিষিদ্ধ হবে না? [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চ্যাপ্টার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার]। [দ্রঃ গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট, '৭১ ঘাতকদালালের কে কোথায়]। এই বইগুলোতে যুদ্ধাপরাধীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের পাকবাহিনী অনুগত বাঙালি হত্যা, উস্কানিমূলক বক্তব্য, এবং ইয়াহিয়ার প্রতি আনুগত্যের হাজার হাজার কোটেশনসহ পত্রিকার নিবন্ধ তারিখসহ পাওয়া যাবে। আমার প্রশ্ন, যুদ্ধাপরাধী মাস্টারদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা? তাহলে, বিদেশ থেকে বেনিয়া ভাড়া করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো! বেনজির বা নেওয়াজ শরীফ। এ কোন মুক্তিযুদ্ধ? আমার সন্তানেরা জানতে চাইলে কি জবাব দেবে জিয়াউর রহমান? আমি '৭১ এর সংগ্রাম পত্রিকা থেকে হাজার হাজার কোটেশন এনে কোর্টে প্রমাণ করতে পারি, জিয়া কেন রাষ্ট্রদ্রোহী। জিয়া, ইদি আমীনের চেয়ে ভয়ংকর খুন প্রেমিক। খুনের নেশাগ্রস্থ। ভুট্টো নেই, বেনজিরকে ক্ষমতা দিলেই তো এসব নাটক দেখতে হতো না। বেনজির অন্ততঃ সংবিধানের খণ্ডনা করে রঙ্গ করতো না। ৩০ লক্ষ লাশ কোন কারণে? জিয়া তো তাদেরকে টয়লেট বানিয়ে ছেড়েছে। এ কেমন মুক্তিযোদ্ধা? হ্যালো! ইয়াহিয়া কখনো নরপশু নয়, বরং সে নরপশুর সমকামী পিতা।

১০৮. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো '৭১এ গোলামের কর্মকান্ডের সকল ব্লুপ্রিন্ট, দৈনিক পূর্বদেশের ৬ই এপ্রিল '৭১এর সেই লোমহর্ষক মিটিংয়ের ছবি এবং '৭১এর সব পত্রিকার আর্কাইভ জুড়ে তার নিত্যদিনের বক্তৃতা, মিছিল এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে তার একাত্মতার সংবাদ উপেক্ষা করবে না। এইসব নাৎসী সংবাদ উপেক্ষা করে তাকে দেশে ঢুকতে দেবে না। তার জন্য সংবিধান সংশোধন করে তার নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সুগম করবে না। তাদের জন্য ঘাতকদালাল আইন অবৈধ ঘোষণা করে গেজেট জারি করবে না। '৭১এর সংবাদ পত্রিকাগুলোকে উপেক্ষা করবে না। ১১ই ডিসেম্বর '৭১এর দৈনিক আজাদে ছাপা হওয়া জেলখাটা পিশাচ মাওলানা মান্নান নামের বিষাক্ত কোবরা সাপ এই নরঘাতকের বিচারের প্রতিবন্ধক হবে না। '৭৫এর খুনিদের অবৈধ পিতার দৃষ্টান্ত হবে না। ৩১শে ডিসেম্বর'৭৫এ ঘাতকদালাল আইন খণ্ডনা করবে না। নরহত্যার দায়ে ২৭শে

ডিসেম্বরে গ্রেফতার হওয়া মাওলানা মান্নান যার বিরুদ্ধে ডা. আলীম চৌধুরী হত্যার প্রমাণ রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৮ম খ রে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় তাকে তার, '৭৯র ধর্মমন্ত্রী করবে না। এই জিয়াপাকিস্তানি, রাষ্ট্রদ্রোহী, নরঘাতক গোয়েবলি, গোলামকেও হার মানিয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধার জন্যই এ দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়। [দ্রঃ '৭৫এর ৩১শে অক্টোবর গেজেট]। [মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৮ম খ , ন্যুরেনবার্গ ট্রায়াল]। এই ট্রায়ালে ২৪ শীর্ষ নাৎসীর বিচার হয়েছিলো, তাদের মধ্যে ১১ জনের ফাঁসি হয়েছিলো। জিয়ার মন্ত্রীসভার অধিকাংশ মন্ত্রীগণই এইসব নাৎসীদের হুবহু। [দ্রঃ ন্যুরেনবার্গ ট্রায়ালের ভিডিও, যা সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব।] এইসব প্রামাণ্য চিত্র দেখা থেকে পুরোনো প্রজন্মের মুক্তি নেই। এই সব প্রামাণ্য চিত্র এখন নতুন প্রজন্মের হাতে। জিয়া, পালাবে কোথায়? ভবিষ্যৎ বাংলা হলোকস্ট বিশেষজ্ঞরা শিঘ্রই তার পিছু ছুটবে, নাৎসীদের মতো তার কুর্কিতিও বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবে। সিএনএন এবং বিবিসি। তার গণহত্যা নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করবে "কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে", আমি অপেক্ষায় আছি। প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে '৭১ এবং '৭৫ নিয়ে হেগ কোর্টে মুখোমুখি দাড়াবে বিধায়। বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যার বিচার ফুঁসে উঠবে রুশ বিপ্লবের মতো। মি. জিয়া! আপনি কি মানবেন না যে আপনার ধর্মমন্ত্রী একজন যুদ্ধাপরাধী! তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো! তারপরেও তাকে মন্ত্রী? আপনি কি মানবেন না, আপনার জেলমন্ত্রী একজন– খুনি? শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী তো জীবিতই। তারপরেও? ব্যাপারটা কী? নীতির কথা বলে কিসের ভণ্ডামি, ক্ষমতা কি এতোই– হীরক রাজার দেশ? মি. জিয়া! এতো দ্রুত মুক্তি পেয়ে গেলেন! আপনি সত্যিই ভাগ্যবান! না হলে গলায় জুতার মালা, গালে জুতার আঘাত খুব দূরে ছিলো না। তবে আপনার জিয়া উদ্যানের সময় শেষ। বহু বছর আরাম করেছেন। এবার আপনাকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে। সেনাপ্রধান নিশ্চয়ই আপনার বিচার করে, সেনাবাহিনীকে দায়মুক্ত করবেন পাকবাহিনীর কলঙ্ক থেকে। নিশ্চয়ই তিনি এখানে ওয়ার মেমোরিয়াল গড়ে দেশের সেবা করবেন। আপনার হাড়গোড় যাবে পাকিস্তানে যেখানে আপনার বাবা-মা, আপনাকে জন্ম দিয়ে দুঃখিত। আপনি কি গোলামের চেয়ে বড়ো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে প্রমাণিত নন?

১০৯. ৩১/১২/৭৫এর গেজেটের মতো দেশদ্রোহী কাজ এমনকি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরও করেনি। এখন বোঝা যায়, মোশতাক যা করেছিলো, জিয়া ষড়যন্ত্রের ফসল। আজ একথা স্পষ্ট যে, সায়েম এবং মোশতাক, জিয়াভিকটিম। বিচারপতি সায়েমের জবানবন্দীতে বিস্তারিত পাওয়া যাবে কিভাবে জিয়া তার বিরুদ্ধে ক্যু করে ক্ষমতা নিয়েছিলো। মোশতাক ও সায়েম, জিযার পূর্ব ষড়যন্ত্রের ফসল। জিয়া দম না নিয়ে একের পর এক খুন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো। যে লোক মুক্তিযোদ্ধা বলে নিজেকে দাবী করে, সে কখনো ১৫ই আগস্ট, ৩ ও ৭ নভেম্বর ঘটিয়ে, ইনডেমনিটিকে বৈধ করে রাষ্ট্রকে তার প্রতিপক্ষ করবে না। এই গেজেটটি জার্মানীর এস.এস বাহিনীর গেজেট যা ইহুদিদেরকে হত্যার ঘোষণা দেয়। একাজ শুধু একজন ইয়াহিয়া বা ভুট্টো

হলে সম্ভব। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানপন্থীদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে ফের রাজনীতির বৈধতাকে খৎনা দান করে পুরো মুক্তিযুদ্ধকে হত্যা করেছে জিয়া। জিয়া, মীরজাফরের চেয়েও বিশ্বাসঘাতক। জিয়া, গোলামের চেয়ে বড়ো রাষ্ট্রদ্রোহী। জিয়া ইয়াহিয়ার মন্ত্রী আব্বাস আলী খানকে এদেশের জামাতের আমীর হয়ে রাজনীতি করার সুযোগের ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে যা কোন মুক্তিযোদ্ধার জন্য '৭১ বর্জিত কাজ। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম।] [দ্রঃ '৭১এর ঘাতকদালালো কে কোথায়, আব্বাস আলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী]। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ভিকটিম পরিবার যখন জীবিত, তাদের স্বামীর খুনিকে মন্ত্রীত্বদানের মধ্যে আসলেই জিয়ার রহস্য কি? তাদের খুনির রক্তে রঞ্জিত পতাকা নিজামীর গাড়িতে? আমার জিজ্ঞাসা, এতো অন্যায় আপনারা কেন স্বীকার করে নিলেন? আমাদের আরেকবার প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু। এই জানোয়ারকে ধরতে প্রয়োজন– বঙ্গবন্ধু। সেই বিখ্যাত কার্টুন, এই জানোয়ারকে ধরিয়ে দিন। আমরা চাই, ৭ই মার্চ, এই জিয়াখুনির বিরুদ্ধে। চাই আরেকটি '৭১। আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। আসুন আমরা '৭৫এর জানোয়ারকে ধরি। জিয়া, আল-মুজাহিদীর চেয়ে অনেকগুণ বড়ো রাষ্ট্রদ্রোহী। নিজামীদের বিচারের চেয়ে জিয়ার বিচার ও নাম শুদ্ধি জরুরি।

১১০. কোনো মুক্তিযোদ্ধাই ৩১শে ডিসেম্বরের গেজেট জারি করে, ১১,০০০ বিচারাধীন ঘাতকদালাল এবং ৭৫২ জন সাজাপ্রাপ্ত খুনিকে রাজবন্দী উপাধি দান করে কক্ষণো মুক্ত করবে না। [জিয়ার ভাষণ – ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৫... সকল রাজবন্দীকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি দেয়া হবে]। বঙ্গবন্ধু যাদেরকে মুক্ত করেছিলো সেই ২০ হাজার, যাদের লঘু পাপ, '৭৩এর ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ৩৭৪৭১জন দালাল গ্রেফতার হয়েছিলো। '৭৩এর অক্টোবর পর্যন্ত ২৮৩৮টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছিলো, ৭৫২ জন দন্ডিত হয়। জিয়ার হাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিলো, এদের মধ্যে ২২শত কেস তৈরি ছিলো, ৭৫২জন জেল খাটছিলো। জিয়া, জেলখাটা সব খুনিসহ খালেক মজুমদারদেরকে পর্যন্ত মুক্তি দিয়ে নিজেকে জাতির কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করেছে। [দ্রঃ ৭১এর যুদ্ধারপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।] খালেক মজুমদারের জীবনী শেকল পড়া জীবন...। জিয়া, ইদি আমীন ও হিটলারের গণহত্যার দৃষ্টান্ত ম্লান করেছে। জিয়া, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রদ্রোহীতা করেছে। জিয়া হাজার হাজার বধ্যভূমির বুকে ঘৃণার বুলেট মেরেছে। জিয়াপাকিস্তানি, একে ধরিয়ে দিন। এই জানোয়ারকে ধরিয়ে দিন। হ্যালো! ইয়াহিয়া কখনো পশু নয়, সে জন্ম দিয়েছে নরপশু নামক– জিয়া। জিয়া বৈধ করেছে– গোলাম। খালেদা দিয়েছে নাগরিকত্ব। কোকেইন ও হেরোইন জিয়া, গোলামের সব প্রকাশনা নিয়ে গেছে ৫৬০০০ বর্গমাইল জুড়ে মৌলবাদের সব কারখানায়। ফলে দেশ জুড়ে আজ এতো– রাজাকার। বিএনপি ক্যাডার।

১১১. কোনো মুক্তিযোদ্ধাই ২৬শে সেপ্টেম্বরে খুনির বিচারের পথ রুদ্ধ করতে যে অপরাধ সেই ইনডেমনিটিকেই বৈধ করবে না। অসম্ভব! বরং সে তার সুপ্রীম কমান্ডার

হত্যার বিচার বন্ধের এই আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ইনডেমনিটি একটি– নাৎসী অপরাধ। ইনডেমনিটির দূর্গ, জিয়া যাকে বৈধ করেছিলো, ৫ম সংশোধনী দিয়ে। ইনডেমনিটির দূর্গ গড়ে জিয়া কাকে রক্ষা করেছিলো? একথা বুঝতে হলে কি বিশেষজ্ঞ হতে হবে? খুনিরা তো তখন দেশেই ছিলো না। সুতরাং ইনডেমনিটর দূর্গ একমাত্র জিয়ার জন্যই প্রয়োজন ছিলো, যা খালেদ মোশাররফ নিষিদ্ধ করতে মোশতাক সরকারের কাছে ৪দফা দাবী করেছিলো ৩রা নভেম্বরে। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায় পৃঃ৭৭।] "মোশতাকের সব আইন রহিতকরণ।" জিয়া, ইনডেমনিটিকে আইন করে দূর্গ গড়েছিলো, নিজের জন্য এবং আব্বাস আলী খানদের জন্য। "জিয়াপাকিস্তানির, ইনডেমনিটিদূর্গ।" খালেদ মোশাররফ বেঁচে থাকলে, জিয়ার ফাঁসি ছিলো– নিশ্চিত। খালেদ মোশাররফের ৪ দফার ১ দফা, ইনডেমনিটি রহিত। জিয়াপাকিস্তানি যা বৈধ করে মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ করেছিলো। এ কোন বিচার? হ্যালো! সমকামী খালেদ মোশার-রফ চেয়েছিলো, জিয়ার অপসারণ। নিশ্চয়ই সে বেঁচে থাকলে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিতো সকল বদকর্মের জন্য। ৭ই নভেম্বরের দুই কারিগর, তাহের ও শাফায়াত জামিল। তাহের খুলবে তালা। শাফায়েত দেবে বন্দী প্রোপাগাণ্ডা। হ্যালো! এইসব সংহতির কারিগরদের সঙ্গে খালেদ মোশাররফের প্রথম যুদ্ধ, জিয়াকে রহিত করো। নিশ্চয়ই সে জিয়ার ১৫ই আগস্টের ষড়যন্ত্র বুঝে গিয়েছিলো। নিশ্চয়ই সে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করলো, জিয়া একজন আইএসআই।

১১২. কোনো মুক্তিযোদ্ধাই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং জেলখাটা লোকেদের নিয়ে মন্ত্রীসভা করবে না। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিদেরকে ফের স্বাধীনতার হুমকি বানাবে না। '৭১এ পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত গণহত্যাকারী নাৎসীগুলোকে বৈধ করবে না। দৈনিক পূর্বদেশের ৬ই এপ্রিল তারিখে গোলাম আজম, নূরুল আমীন ও টিক্কাখানের বৈঠকের ছবিতে শান্তিকমিটির নাম, যে নাম '৭১এর সব পত্রিকায়, দৈনিক আজাদের ৯ই ডিসেম্বর সংখ্যায় আল-মুজাহিদীর ছবি, ৭ই মে '৭২এর দৈনিক আজাদে মাওলানা মান্নানের ছবি, '৭২এর ৮শে সেপ্টেম্বরে আজাদে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশে মাওলানা মান্নানের সঙ্গে নিয়াজীর ছবিতে আল-বদরদের মিটিং... আজাদী দিবসে নিজামীর ছবিসহ বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদাগার এব হত্যার প্ররোচনা... পাকিস্তানপন্থী বাংলা দালালদের চিৎকার– হত্যা করো! হত্যা করো! নিজামীর চিৎকার, ওরা সব দুস্কৃতিকারী! গোলামের চিৎকার, অখ পাকিস্তান– জিন্দাবাদ...! কোন লোক সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা হলে, তা উপেক্ষা করে খুনিদেরকে মন্ত্রী বানাবে? কোন মুক্তিযোদ্ধা! হ্যালো! ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো-এর লেখক, '৭১র দালাল, স্পষ্ট ভাষণের লেখক যে দালাল, খোন্দাকার আব্দুল হামিদ নামের এক রাজাকার যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, যে ঘাতকদালাল আমার প্রতিবেশী, বিশ্বজুড়ে যে লোক পাকিস্তানের পক্ষে লবি করেছিলো, চরম পাকিস্তানবাদী এবং শহীদ সংবাদিক সিরাজউদ্দিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আসামী, এই বুদ্ধিজীবী হত্যার বুদ্ধিদাতা জেলখাটা রাজাকারকে কোনো মুক্তিযোদ্ধা

বা যুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি, মন্ত্রী বানাবে? তার গাড়িতে শহীদের রক্তে মাখা পবিত্র বাংলার পতাকা তুলে দেবে? এ কেমন মুক্তিযোদ্ধা? এই লোক কলাম লিখে, '৭১এর রেডিও থেকে রণাঙ্গনে পাকবাহিনীর মনোবল যোগাতো, এই লোক ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো ও স্পষ্টভাষণ মর্দে মোমিন ও স্পষ্টভাষী কলাম লেখক, '৭৪এ লন্ডনে গিয়ে গোলাম আজমের সঙ্গে দেখা করে তার পাকিস্তাপন্থী কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলো, '৭৮এ গোলামের পক্ষে কলাম লিখে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছিলো। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম ৪র্থ খ পৃঃ ৫০]। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী চরম মওদুদীবাদী এবং মুসলিমবাদী এই চরম মৌলবাদী খোন্দকার হামিদ, মর্দে মোমিনের ছদ্মবেশে দেশের মুজিব বিরোধী চক্রকে উস্কে দিয়েছিলো, তার লেখার মাধ্যমে '৭৩ এবং '৭৪ এবং '৭৫এ ছড়িয়েছিলো ঘৃণএবং প্রোপাগান্ডার চরম তূর্যবীণা। লন্ডনে জামাতের কার্যকলাপকে তার কলামে বারবার সে চরম সমর্থন করেছিলো, '৭১এ ভারত বিদ্বেষীরা '৭৪এ দেশে মুজিব বিরোধী সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলেছিলো, ১৫ই আগস্টের পর, ইত্তেফাকের স্পষ্টভাষী কলামের মাধ্যমে শেখ হত্যার প্রশংসা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বকেই উস্কে দিতে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এই মুসলমান থিঙ্কট্যাঙ্ক" সরাসরি সৌদির পেইড গুপ্তচর বাংলার এই কায়দেআজম কে.এ.হামিদ, সৌদি অর্থের পৃষ্ঠপোষকতায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদ পত্রিকাতে ছদ্মবেশি মর্দে মোমিনের তুখোড় ক্যাম্পেইন চালিয়েছিলো কয়েক বছর যার ফল, ১৫ই আগস্ট, যার সঙ্গে গোলাম আজম এবং বাদশা ফয়সলের সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদ শব্দ দুটোর বিরুদ্ধে সৌদির জেহাদ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, ১৬ই আগস্ট ভরদুপুরে একসঙ্গে সৌদি, পাকিস্তান ও সুদানের স্বীকৃতিদানের ইতিহাস যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের 'বীর্য'! এরপর আর কি সন্দেহ থাকতে পারে, জিয়া কেন আইএসআই? জিয়া এই বাংলা কায়দেআজমকে যুবমন্ত্রী বানিয়ে সরাসরি প্রমাণের এসব নথিপত্রকেই উপেক্ষা করে '৭১কে অস্বীকার করেছিলো।

কোন মুক্তিযোদ্ধা সুস্থ মাথায় '৭১এর জেলখাটা এই খুনিকে মন্ত্রী করবে যার প্ররোচনায় বাংলাদেশ জুড়ে গণহত্যা সম্ভব হলো? কাদের জন্য সংবিধান সংশোধন? বাংলার কায়েদেআজমকে যারা মন্ত্রী বানায় তাদের পক্ষেই, যারা জিয়া নামের ছদ্মবেশি মুক্তিযোদ্ধা, আসলেই যারা জিয়া নামের, ভুট্টো। জিয়া, নিজামীর মতো যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে বাংলার ফ্ল্যাগ তুলে দিয়ে প্রমাণ করেছে '৬৯এ সে বাংলায় এসেছিলো পাক-ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ধূর্ত ক্লাইভের নির্দেশে ছদ্মবেশী। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , তিনটি সেনা অভ্যুত্থান পুরো বই]। জিয়া, মুসলমান এবং জাতীয়তাবাদের নামে '৭১এর রাজাকারের 'বীর্য' রোপণ করে এদেশে করেছে কায়েদীতন্ত্রের চাষাবাদ। জিয়ার অন্যতম জারজপুত্র, কে.এম হামিদ, যার একমাত্র লক্ষ্য অখ পাকিস্তান। যার মাথায়, পাকিস্তান। গোলামকে সে বড়ো ভালোবাসতো। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , পৃঃ ৫০]।

১১৩. কোনো মুক্তিযোদ্ধাই পাকিস্তান জাতিসংঘ ডেলিগেশনের ৫ সদস্যের অন্যতম সদস্য শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা ইহকালে চিন্তা করবে না। পিপিডি দলের কেন্দ্রীয় নেতা '৭১এ গ্রেফতার হওয়া রাজাকার শাহ আজিজকে জিয়া তার মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী করে ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯তে নিজেই নিশ্চিত করেছে সে, মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে একজন ঘোরতর আইএসআই জিয়া, যা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের ভিডিও বক্তব্যে স্পষ্ট, যা আমার সংগ্রহে। কোন আমেরিকা বা ইউরোপই, পরবর্তীতে গোয়েবলসকে মন্ত্রী বানাবে না। বিশ্বাসঘাতক বাঙালি, সবসত্ত্বেও পাকসারজামিন জিয়াকে হিরো বানিয়েছে। তার নামে জিয়া উদ্যান, জিয়া বিমানবন্দর করে '৭১-কেই অবৈধ ঘোষণা করেছে। খালেদ মোশাররফের বীরত্বের কথা কে না জানে? হুদা এবং হায়দারের মতো দুধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর কোথায়? খালেদ মোশাররফের মতো মুক্তিযোদ্ধাকে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো কবর দেয়া হলো বনানী গোরস্থানে– কেন? সে কি মুক্তিযুদ্ধ করে অন্যায় করেছিলো? '৭১ কি অবৈধ পিতার জারজ বীর্য প্রক্ষেপণ? মুক্তিযুদ্ধ কি, তাহলে অবৈধ? জারজ? তাহের, হায়দার, এরা কি সব মুক্তিযুদ্ধের জারজ সন্তান? হ্যালো! বধ্যভূমিগুলো কি ভুল? নিশ্চয়ই জিয়া একা স্বাধীন করেছিলো, '৫৬ হাজার বর্গমাইল! সুতরাং বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই মিথ্যা! বেগম জিয়া '৯৪তে তো সংসদে সেকথাই বলেছিলো। "বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার ভিত্তি নেই।" বেগম জিয়া, ইতিহাস ইঞ্জিনিয়ার। তারেক জিয়া সংবিধান ইঞ্জিনিয়ার। কোকো কোকেইন, ঘুষ ইঞ্জিনিয়ার। আহ! কতো ইঞ্জিনিয়ার এক পরিবারে! এইসব চরম সত্য থেকে বাংলাদেশীদের মুক্তি কোথায়? "আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৭। জিয়াইনডেমনিটি দিবস।" আমেরিকাতে একটি ভবনের নকশায় নাৎসীর চিহ্ন পাওয়া গেলে চরম প্রতিবাদের সঙ্গে তা মিডিয়াতে তুলে ধরা হলো। আক্রোশের ভয়ে ভবনের মালিক ১৪কোটি টাকা ব্যয় করে তা সংশোধনের ঘোষণা দিলো। শুধু মাত্র একটি নাৎসী চিহ্ন। আর আমাদের দেশের নাৎসীরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, উপদেষ্টা, সচিব। যেদিকে তাকাই রাজাকার দিয়ে ভরা। বাংলার মানুষ কি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো? নাকি '৭১ নয়, ভুলে জিয়াকে দিয়ে রাজাকার চাষাবাদ করেছিলো? নাকি '৭১এ প্রচ ভুল করেছিলো? নাকি গৃহযুদ্ধ করেছিলো? নাকি '৭১এ তারা খাল কেটে পাকিস্তানের কুমির এনেছিলো। নাকি জিয়াকে অর্জন করেছিলো? তারা কেন মোশতাককে বিশ্বাসঘাতক সম্বোধন করে জিয়াকে বলে মহান স্বাধীনতার ঘোষক? সে তো জিয়ার তুলনায় ফেরেস্তা। আসুন, আমরা জিয়াকে বলি– জাতিরজনক! মুক্তিযুদ্ধ ব্যালেন্স করে কায়দেআযমজিয়াকে বলি– পাকসারজামিনসাদবাদ! পাকিস্তানজিন্দাবাদ। [দ্রঃ বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ভিডিও।] [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চ্যাপ্টার বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের হত্যাকান্ড]। পাঁচজন ্াতিসংঘ ডেলিগেশনের নাম– শাহ আজিজ (জিয়ার প্রধানমন্ত্রী), জুলমত আলী খান (সহ-সভাপতি, বিএনপি), রাজিয়া ফয়েজ (সহ-সভাপতি, মুসলিম

লীগ), ড. ফাতিমা সাদিক এডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট। আসুন আমরা মোশতাকের নামে, স্টেডিয়াম বানাই। তাকে বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করি। তার নামে, মোস্তাক উদ্যান। মোস্তাক সড়ক এবং স্মৃতিসৌধ। কেন নয়? সেতো জিয়ার তুলনায় ছোট ক্রিমিনাল। মোশতাক-সায়েম, দু'জনই জিয়া ষড়যন্ত্রবাদের ভিকটিম। মোস্তাক জিয়ার তুলনায় বীরউত্তম। আসুন আমরা ক্রিমিনাল ব্যালেন্স করি। মোস্তাক? না জিয়া? নিশ্চয়ই আমরা '৭১এ ভুল করেছি। নিশ্চয়ই '৭৭এ আমরা ইয়াহিয়ার চেয়ে বড়ো বধ্যভূমি রচনা করেছি। নিশ্চয়ই '৯১ আমরা পাকিস্তান কায়েম করেছি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র অর্জন নিজামী এবং বেগম জিয়ার সতো ঘোরতর পাকিস্তানবাদী। যুদ্ধের ৯ মাস বেগম জিয়ার ঠিকানা কোথায়? অমাদের '৭১এর একমাত্র অর্জন কি– জোট সরকার? নাকি বাংলাদেশ নামের গণপতিতা?

১১৪. '৭১এর পত্রিকা জুড়ে শাহ্ আজিজের মতো সচিত্র প্রতিবেদনের একজন ঘোর পাকিস্তানপন্থী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী লবিস্টকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর পেছনে যে হীন চক্রান্ত, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে হিটলারকে ফের জার্মানীর চ্যান্সেলর করার তুল্য, কোনক্রমেই জিয়া সেক্টর কমান্ডার হতে পারে না। খাজা খায়েরউদ্দিনের সঙ্গে গোলাম আজমের ছবি যে লোক অস্বীকার করে সে লোক– রাষ্ট্রদ্রোহী! তার চেয়েও অধিক মীরজাফর বাংলার মানুষ, জিয়াকে যারা বলে– বীরউত্তম। নতুন প্রজন্ম কি জিয়ার ৫ম সংশোধনী তদন্ত করবে না? '৭৮এর ১১ই জুলাই গোলামকে দেশে আনতে ৫ই এপ্রিল '৭৮এ নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, ৫ই এপ্রিল '৭৯তে ৫ম সংশোধনী এনে তাদের জন্য রাজনীতির সুযোগ প্রদান। জিয়া জন্ম না নিলে গোলামেরা এদেশের মাটিতে পা রাখতে পারতো? জার্মানরা কি একজন গ্রেফতার হওয়া নাৎসীকে তাদের প্রধানমন্ত্রী বানাবে? এই দৃষ্টান্ত কি জগতে আছে? জিয়া উদ্যানে এ কোন মীরকাশেমের দেহ? আমি বরং মোশতাককে বলবো, জিয়ার তুলনায়– বীরউত্তম। চলুন, মোস্তাক উদ্যানে যাই। কেন নয়? আসলে সে পথভ্রষ্ট, ভিকটিম। জিয়া না জম্মালে, '৭৫এর ১৫ই আগস্ট এবং ৩১শে ডিসেম্বরের বিষাক্ত গেজেট হতো না। জিয়া না জন্মালে, মুক্তিযুদ্ধ অবৈধ হতো না। জিয়া না জম্মালে আজ বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতো। আহা! আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করে, বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে তুলি। বঙ্গবন্ধুকে আবার আমরা বাঁচিয়ে তুলি আরেকটি '৭১ ঘটাতে। তাহলেই মরবে '৭৫। মরবে ১৯৯১ এবং ২০০১। আমি তাহের, হুদা, হায়দার, খালেদের কবর দেখতে এসেছি। কোথায় ওরা? এখানে এতো কালো মোমবাতি কেন? আসুন আমরা তাহের হত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগিয়ে তুলি। সে একজন পঙ্গু! একজন রণক্ষেত্রের গৌরব। তাকে ফাঁসি! জিয়া বারবার কাকে ফাঁসি দেয়?

১১৫. '৭১এর ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় "তিন শয়তান কোথায়" শিরোনামে একজন মাওলানা মান্নান যাকে ২৭শে ডিসেম্বরে গ্রেফতার করে পুলিশে দেয়া হয়, খোন্দকার আব্দুল হামিদ নামের অপর চরম পাকিস্তানি যাকে পুলিশ গ্রেফতার করে

'৭২এর ফেব্রুয়ারিতে, যার নামে দৈনিক পূর্বদেশের ১১ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় খবর ছাপা হয়, "দালাল খোন্দকার গ্রেফতার, এলায় কেমন বুঝতাছেন?" শাহ্ আজিজ '৭১এর ৪ঠা মে তারিখে যার বক্তৃতার অংশ হলো– "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহকে অখণ্ড পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। ...আমি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দূরভিসন্ধি নস্যাতের জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্যের আবেদন জানাই।" আব্দুল আলীম ডিসেম্বরের যাকে গ্রেফতার করে খাঁচায় পুরে জয়পুর হাটের জনসাধারণের দেখার জন্য রেখে দেয়া হয়েছিলো, যে ছবি ঘাতকদালাল নির্মূল কমিটির বই জুড়ে, বুদ্ধিজীবী হত্যার কাগজে যার স্বাক্ষর... এইসব নরপিশাচদেরকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের চেয়েও ভয়ংকর এই জিয়া, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মদদে মীরজাফরের মন্ত্রীসভা গঠনের পর, একমাত্র মহা-রাষ্ট্রদ্রোহী, জিয়া। যার আরেক উপমা– দুধর্ষ যুদ্ধবাজ এবং গণহত্যাকারী অমানুষ– ইদি আমীন! আলী আকবর টাবীর লেখা বই, মতিউর রহমান নিজামী, আলবদর থেকে মন্ত্রী– বইয়ের পাতায় পাতায় জিয়া এবং খালেদার মন্ত্রীসভার অধিকাংশ নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিষদ বিবরণ, বইটি পড়ার জন্য আমি বিশেষভাবে সরকার এবং সকলকে অনুরোধ করছি। চিফ অব স্টাফকে বিশেষ অনুরোধ, পড়ুন! জানুন। কিছু করুন। [দ্রঃ একাত্তরের ঘাতকদালালেরা কে কোথায়, ম্যাসাকার, জেনোসাইড ওয়ার্ল্ড ব্রেড]। মতিউর রহমান নিজামী, আলবদর থেকে মন্ত্রী, আলী আকবর টাবির লেখা এই বইটি পড়ার পর, দেশের পত্রিকা আর্কাইভ থেকে নেয়া এই সব সংবাদ পড়ার পর আর কার সন্দেহ থাকবে যে, এই নিজামীর গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়া খালেদা, কোন মুক্তিযোদ্ধার ভাঙ্গা স্যুটকেস পীরের স্ত্রী? নাকি দুইজনই গুপ্তচর! '৭১কে উল্টে দিতে যারা বদ্ধপরিকর। তাদের দুই সন্তান– তারেকলুটপাটবিশেষজ্ঞ আর কোকোকোকেইন পিএইচডি! এই পরিবারটি মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ করে দিয়েছে, ৪ সেক্টর কমান্ডারসহ ১০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা খুন এবং গোলাম আযমকে কদমবুসি দিয়ে। '৭৭এর সামরিক ট্রাইবুনাল এবং ইয়াহিয়ার সকল পাপ একসঙ্গে করলে সমান। '৭১এর পাপ জাতির মাথায়। '৭১এর অর্জন, যুদ্ধাপরাধী। '৭১এর কলঙ্ক– সেনাবাহিনী। '৭১এর অর্জন– বঙ্গবন্ধু খুন এবং রাষ্ট্রদ্রোহী গোলামের বিজয়।

১১৬. জেলখাটা যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন, সংবিধানের বুকে গুলি করার সমান। একমাত্র সম্ভব, যারা পাকিস্তানি ও মওদুদীবাদী। যারা দ্বিজাতিতত্ত্ববাদী, যারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রবাদী। যারা সৌদি ও পাকিস্তানবাদী। যারা নিয়াজী ও রাওফমানবাদী। যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনি সেইসব জিয়াবাদী। গোলামকে অবৈধ থেকে বৈধ করে জিয়া ও বেগম জিয়া প্রমাণ করেছে তারা মওদুদীবাদী। তারা রাষ্ট্রদ্রোহীবাদী এবং বিশ্বাসঘাতকতাবাদী। তারা মৌলবাদী। তারা, বাংলাভাই এবং শায়খবাদী। তারা শহীদ জননীকে পিটিয়ে, গোলামের হাতে দিয়েছে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট। তারা খালেদের

দেহ, বঙ্গবন্ধুর দেহ, শেয়ালের মতো দু'দিন পচিয়ে গর্তে পুতেছে। তার মৃত্যুর খবর শোনামাত্র খালেদাবিবি প্রেমিক জানজুয়ারের জন্য পাকিস্তানের কাছে সর্বপ্রথম পাঠিয়েছে সকল প্রটোকল ভঙ্গ করে– শোকবার্তা। প্রেমের মরা জলে ডোবে না। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস খালেদা কোথায় ছিলো? কার তত্ত্বাবধানে ছিলো? কি তার দায়িত্ব ছিলো? কেন সে ভারতে যেতে অস্বীকার করেছিলো? জাতির জনকের দেহ যদি রেডক্রসের কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করা হয়, জিয়ার লাশের জন্য কেন এতবড় রাষ্ট্রের সম্পদ দখল? আসুন জিয়াকে বলি জাতিরজনক! আসুন সেনাবাহিনীকে ঘোষণা করি, পাকবাহিনী! কেন নয়? তারা কি বেগম জিয়ার পদভারে জর্জরিত সংস্থা নয়? তারা কি জিয়ার পায়ের তরে অভাগা নয়? আমাদের কপাল মন্দ, এই বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী! এরা সব বেগম জিয়ার পায়ের তলে গড়াগড়ি খায়। আদৌ কি এরা সেনাবাহিনী নাকি বেগম জিয়া বডিগার্ড? নাকি, ব্যক্তিগত জার্মান সেপার্ড!

১১৭. নাৎসী দল বিলুপ্ত করা হয়েছে জার্মানীতে। আমাদের নাৎসীরা হাওয়াভবনে, সংসদে, পাজেরো গাড়িতে, বঙ্গভবনে। একজন মুক্তিযোদ্ধা কক্ষনো তার রণক্ষেত্রের সরাসরি বা পরোক্ষ শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো আলবদর-রাজাকারকে বৈধ করবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মাওলানা মান্নানকে মন্ত্রী করবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মাওলানা মান্নানের মতো '৭১এর মন্ত্রীত্ব দিয়ে ১৭৫৭-র পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পরেও নিজেকে আর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবী করতে পারবে না। সম্ভব নয়, বিশ্বাসঘাতক জাতি দিলেও, দেশ তাকে আর সে সুযোগ দেবে না। হলোকস্ট অস্বীকার করে গোয়েবলসকে বৈধ করবে এমন সাহস কার? [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৮ম খ মাওলানা মান্নানের সঙ্গে ড. আলীম চৌধূরী হত্যার সরাসরি প্রমাণ।] জার্মানী হলে, জিয়াকে তারা খোলা মাঠে ফাঁসি দিতো, যেমন– দিয়েছিলো, গিয়ারিংকে। জিয়া সোয়াত জাহাজের মুখোমুখি কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে সে একজন– পাকিস্তানি গুপ্তচর।

১১৮. মীরজাফরের মন্ত্রীসভাকে ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকের মন্ত্রীসভা বলে চিহ্নিত করেছে। মোশতাক এবং তার মন্ত্রীসভাকে বাংলার মানুষ বর্জন করেছে। তারা তাদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। শাহ আজিজকে এই বাংলার মানুষ পথেঘাটে লাঞ্ছিত করেছে। জিয়ার মন্ত্রীসভা কখনো ১৭৫৭ থেকে ভিন্ন নয়। তার মন্ত্রীসভা '৭১এর আদর্শের পরিপন্থী মাওলানা মান্নান, আব্দুল আলীম, কে.এ খোন্দকার, শাহ আজিজের মতো বাংলার মীর মদন, মোহাম্মদী বেগ, রাজা রায় বল্লভ এবং রায় দুর্লভ ও মীর কাশেম সুসজ্জিত। তার মন্ত্রীসভা এবং মীরজাফরের মন্ত্রীসভা– এক। জিয়া এবং মোহাম্মদীবেগ চরিত্র– এক। জিয়ামোহাম্মদীবেগ কখনো বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযোদ্ধা ছিলো না। রণক্ষেত্রে এইসব ষড়যন্ত্রীবাদীরা অস্ত্র ফেলে নিরবে দাঁড়িয়েছিলো। ১৭৫৭এর বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেদিন অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখেছিলো ১৯৭৫এর বঙ্গবন্ধুর প্রতি

তার বিশ্বাসভাজনদের এক বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৭৫এ ও '৫৭ এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি, ১৫ই আগস্টে যারা অস্ত্র ফেলে নীরব দাড়িয়েছিলো, যারা বঙ্গবন্ধু হত্যার পর উল্লাস করেছিলো... শেখ হত্যার সময়ে উর্দু কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা গেছে... জিয়াউর রহমান সেদিন গোপনে যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো, সেইসব মৌলবাদী, সৌদি এবং পাকিস্তানবাদী। খুনিদেরকে নিয়ে নিজ বাড়িতে শেখ হত্যার পরিকল্পনা? আর '৭৯তে জিয়া শেখ হত্যাকারী মীরাজাফরদের সঙ্গে নিয়ে সরাসরি ইস্ট-ইন্ডিয়া, অর্থাৎ পাকিস্তানবাদীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন? যারা '৭১এর খুনি, বিশেষ করে তাদের নিয়ে বিএনপি? বহুদলের নামে, সংবিধান টেরোরিজম? ধর্মভিত্তিক রাজনীতেকে খণ্ডনা করে রাজাকার, আলসামস, আলবদরকে বৈধ করা? এই দৃষ্টান্ত কি মীরজাফর কিংবা হিটলারকেও লজ্জা দেয়নি? জিয়ার বিএনপি রাজনীতিবাদের প্রধান সমর্থক সৌদি আরব, যারা '৭১ থেকে এদেশকে "ইসলামী প্রজাতন্ত্র" করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলো। যারা ১৬ই আগস্ট '৭৫এ, শেখ হত্যার মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। জিয়া সংবিধান সংশোধন করে সৌদির প্রত্যাশা পূরণ করেছে। দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ থেকে মুসলমান বানিয়েছে। জিয়া হিন্দু খেদাও আন্দোলন করে হিন্দু খেদিয়েছে। আজ ভারত যদি সে দেশের ৩০ কোটি মুসলমানকে অস্বীকার করতে ধর্ম নিরপেক্ষতা তুলে নেয়, এই বিশ্বাঘাতক জাতি তখন কি করবে? আমরা চাই ভারত তার ধর্মনিরপে্ক্ষতাকে তুলে নিক, দেখা যাক ভারতের মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া, কেন নয়? ফেরী কি কখনো একদিকে চলাচল করে? [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ ও '৭১এর সকল সংবাদপত্র]। জিয়া আমার ধর্মকে অস্বীকার করে চরম মৌলবাদের পরিচয় দিয়েছে। জিয়া, মহা-মৌলবাদ। জিয়া, বেগম জিয়া, এরা সব ইতিহাসের স্বৈরাচারদের ঘরে। এরা চিত্রিত হবে, ইদি আমীন, ইভা পেরোন, পলপট, নরিয়েগা... খলনায়কদের সঙ্গে। বেগম জিয়া, বাংলার ইভা পেরোন, যার অত্যাচার-ব্যভিচার-খলনায়কত্ব এবং অশালীন সাজসজ্জা– ইভা পেরেনকেও লজ্জা দিয়েছে। ধর্মের অধিকার কি শুধু মুসলমানদের? কোথায় সব হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান জাতীয়তাবাদীদের ঘোড়া? নিশ্চয়ই জিয়াকে নিয়ে তৈরি হবে, অস্কার উপযোগী ডকুমেণ্টারি যেখানে জিয়ার পরিচয়– বাংলার হিটলার!

১১৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো রণক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের মনোবল যোগানো, ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো, স্পষ্ট ভাষণ, মর্দে মোমিনের মতো প্রতারককে মন্ত্রী করবে না। কে.এ. হামিদ শেরপুরে আমার প্রতিবেশী। মুক্তিযুদ্ধে তার রাজাকারী কর্মকাণ্ডের সাক্ষী আমি। কে.এ. হামিদ বরাবর একজন ঘোর পাকিস্তানপন্থী। বলা যায়, ২য় মওদুদী, যে পুরো '৭১ জুড়ে পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞকে সহজ করে দিয়েছিলো। রণক্ষেত্রে তাদের উত্তেজনা যোগাতে, স্পষ্ট ভাষণ ও ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো লিখেছে– মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। যা একেকটি এ্যাটম বোমের মতো– স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। কুৎসা, মিথ্যা রটিয়ে, নিয়াজীর প্রিয়ভাজন হয়েছিলো কে.এ. হামিদ। '৭৪এ লন্ডনে গিয়ে গোলাম আজমের সঙ্গে দেখা

করে তার বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ডের প্রশংসা করে তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলো। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , পৃঃ ৫০]। ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একাত্মতা দেখিয়েছিলো। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ]। গোলাম আজম তার '৭১এর ভূমিকার সাফাই গেয়েছিলো। "গোলামের ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাতে আবার পাকিস্তান ফিরিয়ে আনার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো।" লন্ডনে তার সকল বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ড সমর্থন করে গোলামদের মনোবল জুগিয়েছিলো। সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালিদের সঙ্গে লন্ডনে দেখা করে তাদেরকে সমর্থন, সংগ্রামের আহ্বান, সংবিধানের নিন্দা জানিয়ে, মুজিবের বিরুদ্ধে বিষোদগার সৃষ্টি করেছিলো। আবার পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। মৃত্যু শয্যায় গোলাম তাকে দেখতে গেলে যার মন্তব্য, "ইউ আর এ গ্রেট ম্যান।" জীবনে যা দেখলাম-এর লেখক গোলাম আজম যার আত্মজীবনীর ৪র্থ খ রে পাতায় পাতায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন, (পৃঃ ১৬৮-১৭১), বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিং ফয়সালের সঙ্গে বৈঠক করে মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র... সেই গোলাম একজন "গ্রেট ম্যান!" এবং যে এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলো– সেই, কে.এ. খোন্দকারকে জিয়ার মন্ত্রীসভায় যুবমন্ত্রী করা! স্বৈরাচার আমি দেখেছি, কিন্তু জিয়াকে আমি দেখিনি এতোকাল। কারণ সে ঘাপটি মেরে বসেছেলো, মুক্তিযোদ্ধার কাফন গড়ে। '৭২এর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজাকার এবং ঘোর মুসলিম লীগার কে.এ হামিদকে মুক্তিযোদ্ধারা ধরে নিয়ে পুলিশে দিলে, তার পুরো পরিবার আমাদের বাসায় এসে ১০দিন ধন্না দিয়েছিলো। তার পরিবার আমার বাবাকে বলেছিলো, রাজাকার হামিদকে চাঁদা দিয়ে খালাস করে আনতে। রাজাকার কে.এ. হামিদের হাত ধরে কামরুজ্জামান আমাদের বাসাতে তার আলবদর ক্যাম্প খুলে, পাকিস্তানিদেরকে সাহায্য করেছিলো। এই বাসাতেই '৭১এর হলোকস্টের অন্যতম মৃত্যু ক্যাম্পটি এখনো রয়েছে। ফিরে এসে এই জেলখানাতে রক্ত, অস্ত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের পোষাক... দেখেছি। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো, সেরীঘাটে গুলি করে মারার জন্য। ভিকটিমদের পরিবার এখনো জীবিত। আমাদের বাড়ি এখনো রয়েছে।

কে.এ হামিদ একজন ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধী যার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে বুদ্ধিজীবি হত্যার বুদ্ধি দান, বিদেশে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। কে.এ হামিদ যার একমাত্র তুলনা, হিটলারের প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী গোয়েবলস, তাকে নিয়ে মন্ত্রীসভা... জিয়া কাকে বোকা ভাবে? দেশে কি ভালো ও যোগ্য লোকের আকাল পড়েছিলো? তাহলে, দেশের যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রী না করে, বিদেশ থেকে বেনিয়া ভাড়া করলেই সেটা কি মুক্তিযুদ্ধের জন্য অধিক সম্মানের হতো না? জিয়ার মন্ত্রীসভাকে ব্যাখ্যা করতে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কি জবাব দেবো? ইউরোপ যখন ১০০ বছর বয়সের নাৎসীকে ধরে

বিচার করছে, উল্টো আমরা নাৎসীদেরকে মন্ত্রী বানাচ্ছি কারণ আমরা প্রকৃত অর্থেই মীরজাফরের বংশধর, তাই বলবো কী? না হলে, কি বলবো? নিজেরা মীরজাফর না হলে, কেন সিরাজের খুনি মীরজাফরকে বানাবো বাংলার নবাব? কেন মাওলানা মান্নান হবে ধর্মমন্ত্রী? শাহ্ আজিজ কেন হবে প্রধানমন্ত্রী? তার চেয়ে কুকুর বেড়াল কি খুব খারাপ? নাকি অসম্মানের! শাহ্ আজিজ যখন প্রধানমন্ত্রী হয়, তখন আমি কুকুরকে প্রধানমন্ত্রী মানতে রাজি! কি বলবো আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মকে, বিদেশে যারা গণহত্যার ইতিহাস পড়ে? হলোকস্ট যাদের পাঠ্য? ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে কম্বোডিয়ায় যে ঘটনা ঘটলো তা আমাদের মুখে চুনকালি। তারা '৭৫এ কম্বোডিয়ার ২নং গণহত্যাকারী 'নিউন চিয়াকে' ৮২ বছর বয়সে গ্রেফতার করলো। ১ লক্ষ মানুষ হত্যার দায়ে লাইব্রেরিয়ার খুনি চার্লস টেলর এখন বিচারাধীন। আমার এক বিদেশী বন্ধু সেইফ ফরাইজন-এর পরিচালক, এ্যালেন গ্রোস সবেমাত্র লাইব্রেরিয়া থেকে ফিরেছে, ভিকটিমদেরকে সংঘবদ্ধ করার কাজ শেষ করে। জিয়াবাদ, বাংলাদেশকে দিয়েছে ভাঙ্গা স্যুটকেস এবং নাৎসীবাদ যা, কায়েদীবাদ। এর চেয়ে বেনজির ভুট্টোকে এদেশের প্রধানমন্ত্রী বানালে কি খুব খারাপ হতো? বিশ্বাসঘাতকের চেয়ে, বেনিয়া উত্তম। জিয়ার চেয়ে, ভুট্টো উত্তম। জিয়া, ইয়াহিয়ার অবৈধ পশুসন্তান। তার যুবমন্ত্রী কে.এ হামিদ পাকিস্তাপনের বেতনভুক্ত রাজাকার। ইয়াহিয়ার খরচে বিশ্বজুড়ে '৭১এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিদাতা। লবিস্ট। কে.এ হামিদ, মুসলিম লীগ জাতীয়তাবাদের নামে মৌলবাদের শায়খ রহমান। তার কিছু উত্তেজনা বইয়ের ৩য় অংশে উল্লেখিত।

১২০. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো সৌদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের তৈল মর্দন করবে না যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিই দেয়নি ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত। একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো জাতিসংঘে পুরো ৯ মাস, '৭১এর চরম শত্রু সৌদির সঙ্গে হাত মেলাবে না। যেমন করবে না, মুসোলিনির সঙ্গে চার্চিল। গোলামকে বাদশাহ ফয়সল বলেছিলো, "বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ ও সমাজতন্ত্র উৎখাত না করা পর্যন্ত আমি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবো না। আমি এ ব্যাপার মজবুত আছি।" সৌদি বাদশা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো '৭৫এর ১৬ই আগস্ট। সেদিনই পাকিস্তান দিলো ২য় বার। চীন দিলো ৩১শে আগস্ট। জিয়া, সৌদি বাদশার আশা পূরণ করেছিলো, '৭৭এর এপ্রিল মাসে মোস্তাক এবং সায়েমকে তাড়ানোর পরদিন। জিয়া, সৌদি প্রত্যাশা পূরণ করতে, দেশকে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে, সংবিধান সন্ত্রাসী করে, নিজে একক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো। তাদের সব দাবী, এমনকি গোলামকে দেশে এনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চাঙ্গা করা। '৭৭এর ২১শে এপ্রিল সায়েমকে খেদিয়েই ২২শে এপ্রিল সংবিধানের মূলস্তম্ভে সন্ত্রাসী। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য খৎনা। সৌদির এই ফর্মূলাকে বাস্তবায়ন একজন সৌদি-পাকিস্তানের চরকেই শনাক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধকে যারা অস্বীকার করেছে, '৭৭এ সৌদির

প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের সঙ্গে বাংলাদেশকে ১৬ই আগস্টের স্বীকৃতিদান এবং '৭৭এর ২২শে এপ্রিলে তার বাস্তবায়ন অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল প্রমাণ করে জিয়ার সঙ্গে মৌলবাদী শক্তি সৌদির পূর্ব ষড়যন্ত্র এবং জিয়ার ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষারোহণ। প্রমাণ করে সৌদি আরব জিয়ার সংবিধান খৎনাকে করেই জেনেই স্বীকৃতি দিয়েছিলো। এবং এই সূত্রটিই প্রমাণ জিয়া, '৬৯এ জিয়া দেশে এসেছিলো অভ্যুত্থান বানচাল করতে। সৌদি আরব গোলামদেরকে ৬০এর দশক থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছিলো যার ফলাফল, '৭১কে ব্যর্থ করে, '৭৯এ রাজাকার ভর্তি মন্ত্রীসভা, বহুদলীয় রাজনীতির নামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ১৭ বার সংবিধানে পরিবর্তন করে স্বাধীনতার সকল আদর্শ বর্জন, গোলামকে বাংলাদেশে ঢোকানো, দেশে মৌলবাদীদের উত্থান, চট্টগাম ক্যান্টনমেন্টে ২৫শে মার্চ রাতের গণহত্যার সময় ৮ম বেঙ্গলকে নিষ্ক্রিয় রেখে জিয়াপাকিস্তানির পাকিস্তানি ভূমিকা, ২৫শে মার্চ রাত ১১টায় জিয়ার সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের জন্য দুই পাকিস্তানি জোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা... মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম সেক্টর কমান্ডারকে ২৫শে মার্চ রাতে যুদ্ধ না করার পরামর্শ... এসবই কি মিথ্যা? হ্যালো! পলাশীর আম্রকানন এবং ২৫শে মার্চ ও ১৫ই আগস্টের ঘটনাতেও মীরকাশিমরূপী জিয়ার স্পষ্ট মুখ, যা রাষ্ট্রদ্রোহ, যুদ্ধবাজ, ভয়ংকর বিষাক্ত এক ইদি আমীন...। যাকে '৬৯এর গণঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলো ইয়াহিয়া খান। চট্টগ্রামে ২৫শে মার্চ '৭১এর রাত এবং ঢাকায় ১৫ই আগস্ট '৭৫এর রাত, দুটো বৃহৎ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জিয়ার সংস্পৃক্ততা এবং তার সর্বময় সেনা ক্ষমতা সত্ত্বেও ১৫ই আগস্ট ভোরে এক নব্য মীরকাশেমের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, ২৫শে মার্চ রাতে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে ব্যাপক গণহত্যা এবং ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের সময় একজন বহু চরিত্রের জিয়া, যথাক্রমে- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। '৭৫এ বঙ্গবন্ধুর উপসেনাপতি। সেদিন ৮ম বেঙ্গল এবং সবমিলে জিয়ার ছিলো প্রায় ২৫০০ সৈন্য। আর উপসেনাপতির ঘরের পাশেই ৪৬ ব্রিগেডে প্রায় ৪০০০ সৈন্য, যারা ১৫ই আগস্টে জিয়ার হুকুমমত নিষ্ক্রিয় ছিলো। সেদিন অথর্ব সেনাপ্রধানের কথা কেউ শোনেনি। না, খালেদ। না, শাফায়েত জামিল। দুই অপুরুষ এবং জিয়া সমকামী যারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে করেছে পাকবাহিনী। এবার পড়ুন জিয়ার "মেঘনাথবধ" কাব্য। খুনি জিয়ার কালো চশমা এবং মুক্তিযোদ্ধা পোষাকের রহস্য জানুন।

তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান বই থেকে উদ্ধৃত করা হলো (পৃষ্ঠাঃ ৭১-৭৫)

ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেন সৈন্য মুভ করলো না? "১৫ আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলো। ক্যান্টনমেন্টে DGFI প্রধান ও সেনা গোয়েন্দা প্রধান ভোর ৫টার আগে অভিযানের খবর পান। সেনাবাহিনী প্রধান খবর পান আনুমানিক সোয়া ৫টায়। রাষ্ট্রপতির সাথে তার ফোনে শেষ কথা হয় ৫:৫০ মিনিটে। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল আক্রমণ সংবাদ পান সাড়ে ৫টায়। ভোর ৬টার দিকে রাষ্ট্রপতি আক্রান্ত হয়ে নিহত হলেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সাহায্যার্থে একটি সৈন্যও মুভ করলো না। এ ব্যর্থতা কার? বহুদিন পর আজও সবার মনে বারবার এই একটি জিজ্ঞাসা তাড়া করে ফেরে, সৈন্য কেন মুভ করলো না ক্যান্টনমেন্ট থেকে? এ নিয়ে আজও চলছে প্রবল বাকবিতন্ডা। প্রথমেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ভোর সাড়ে ৫টায় ফোন করেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ সৈন্য মুভ করতে বলেন। কিন্তু শাফায়াত জামিল বলছে সেনাপ্রধান তাকে আক্রমণের সংবাদ ঠিকই দেন কিন্তু সৈন্য মুভ করার কোন নির্দেশ দেননি। তাই তখন সে মুভ করেনি। তার ভাষায় শফিউল্লহ তখন কেবল বিড়বিড় করেছেন। কিন্তু তাকে কোন নির্দেশ দেননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সাথে ফোনে কথা হয় শফিউল্লাহর। তাঁর ফোন পেয়েই শফিউল্লাহ আবারো শাফায়াতকে ফোন করেন আনুমানিক ৬টার দিকে, কিন্তু তখন দেখা যায় শাফায়াত তার ফোনের রিসিভার তুলে রেখেছে। এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটর তা-ই জানায়ঃ শফিউল্লাহর ভাষ্য। এমতাবস্থায় শফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফকে ফোন করে তার বাসায় ডেকে এনে তাকে শাফায়াত জামিলের কাছে পাঠান। তার সৈন্য মুভ করাতে। শফিউল্লাহ চতুর্দিকে ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন। ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহসমানসহ অন্যান্যদের সাথে কথা বলতে থাকেন। তারপর তিনি তৈরি হয়ে অফিসে ছুটে যান। এখানে তার যে বড় ভুল হলোঃ তা হলো, তিনি যখন দেখলেন যে কে কারণেই হোক শাফায়াত জামিল তার সৈন্য মুভ করছে না, তখন তিনি মাত্র পাঁচ'শ গজ দূরে অবস্থিত শাফায়াতের হেড কোয়ার্টারে একে ওকে না পাঠিয়ে নিজেই ছুটে গিয়ে শাফায়াতের সৈন্য মুভ করাবার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এখানে তিনি চরম মুহূর্তে টেলিফোন ও কথাবার্তায় অযথা সময় নষ্ট করলেন। কিন্তু একটি সৈন্যও ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুভ করাতে পারলেন না। এখানে দ্রুতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলেন সেনাপ্রধান।"

শাফায়াতের অ্যাকশান

"...তার অধীনে ছিল ৪০০০ হাজার সৈন্য। ১৫ই আগস্ট ভোর বেলা কর্নেল শাফায়াতের ট্রুপ দ্বার আক্রান্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে ভোর বেলা আক্রমণের নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তার সৈন্যদের নিরস্ত্র করার বা ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেফন। বরং এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে সময় ক্ষেপণ করে। সে জিয়াউর রহমানের দিকে যায় নির্দেশ নিতে। সেনাপ্রধানকে সে এড়িয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সৈন্য মুভ করতে না-পারার জন্য শাফায়াত সরাসরি সেনাপ্রধানকেই দায়ী করে বলেছে, তিনি তাকে কোন নির্দেশ দেন নাই, তাই সে তার সৈন্য মুভ করে নাই। এরপর বলছে, রশিদ সকালবেলা তার কাছে এসেছিল দু'টি ট্যাংক এবং দু'ট্রাক সৈন্য নিয়ে। এগুলো দেখে সে নাকি তখন কোন অ্যাকশনে যেতে পারেনি। ...মেজর রশিদ ছিল শাফায়াতেরই অধীনস্থ একটি ইউনিটের কমান্ডার। তারই অধীনস্থ একটি ইউনিট এবং তারই অধীনস্থ একজন কমান্ডিং অফিসার, ১৫ আগস্ট ভোরবেলা ট্রুপস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রমণ করে ঘটাল হত্যাকাণ্ড। এরজন্য কি রশি একাই দায়ী? দায়-দায়িত্বের কোন কিছুই কি কমান্ডার হিসাবে শাফায়াত জামিলের উপর কিছুই বর্তায় না? ...ভোর ৬টার সময় রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে স্বয়ং রশিদই প্রথমে ছুটে আসে ৪৬ ব্রিগেড লাইনে কর্নেল শাফায়ত জামিলের কাছে। তাকে স্যালুট ঠুকে বলে, Sir, we have killed Sheikh. তারই অধীনস্ত অফিসার একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে এসে তার বসের কাছে রিপোর্ট করার পর একজন কমান্ডার হিসাবে কর্নেল শাফায়াতের কি উচিত ছিল না তৎক্ষণাৎ তাকে অ্যারেস্ট করে সেনাপ্রধানকে রিপোর্ট করা? ...রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরাসরি হত্যাকারীর কাছ থেকে পয়েও সে সেনাপ্রখধানকে ফোনে কিছুই জানায়নি। সেতো নিজেও তার কাছে দার্বী করতে পারতো, 'স্যার, অনুমতি দিন। ঘাতক রশিদ আমার ঘরে বসে আছে। আমি তাকে এ্যারেস্ট করতে চাই'। ....সকাল বেলা রশিদ, ডালিমরা এমন কি পরে ফারুকও তার এরিয়াতে খোলামেলা হাসিখুশি ঘোরাফেরা করছিল। ...তার চার হাজার সৈন্য নিয়ে কেন তাদের ঘেরাও করতে পারলো না? এসব রহস্য নয় কি? সে ছিল ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের স্বাধীন কমান্ডার। চরম মুহূর্তে চার হাজার সৈন্য নিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলো। ...ভোর সাড়ে ৪টার দিকে তারই ব্রিগেড এরিয়ার ভেতর দিয়ে ফারুক ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়। প্যারেড গ্রাউন্ডে তারই জওয়ানরা তাকিয়ে তা দেখলো। শাফায়াতর বাসার পেছন দিয়েই ট্যাংকগুলো বিকট শব্দে গড়িয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, ফারুক কোন সাহসে সেখান দিয়ে গেলো? এটা কি কোন পূর্ব সমঝোতার ইংগিত বহন করে? ...রশিদই কিভাবে সাহস করে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা করে প্রথেমেই সরাসরি ছুটে আসে তার বসের কাছে রিপোর্ট করতে? কেউ খুন করে একমাত্র সুহৃদ ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে খুনের ঘটনা ফাঁস করতে ছুটে আসে? ...রশিদকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমরা তোমাদের আক্রমণ-প্ল্যানে ট্যাংক কামান সবকিছু নিয়ে দুর্বল রক্ষী বাহিনীকে কাউন্টার করার চিন্তা

ায় থাকলে, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত শাফায়াত জামিলের শক্তিশালী ৪৬ ব্রিগেডের কথা একবারও চিন্তা করলে না? রশিদ মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল, 'সেতো অমাদেরই লোক। তার তরফ থেকে আমরা কোন আক্রমণ আশংকা করিনি। শাফায়াত এবং তার অধীনস্থ অফিসার সবাইতো ব্যাপারটা জানতো'। ...সামগ্রিক ঘটনা মিলিয়ে দেখলো বুঝতে কষ্ট হয় না, রশিদ একেবারে মিথ্যা বলেনি। ...খালেদ মোশাররফ কর্নেল শাফায়াতের হেড কায়ার্টারে আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে পৌছান। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখান থেকে সেনাপ্রধানকে ফেন করেন, 'স্যার, আমাকে ওরা আসতে দিচ্ছে না, কথা বলতেও দিচ্ছে না'। কারা তাকে আটকে রাখলো, কারা তাকে কথা বলতে দিচ্ছে না? ...খালেদ-শাফায়েত ঐ সময় লিসের নাটক করছিলেন? ...সকাল ৯ ঘটিকা। সেনাপ্রধান এসে উপস্থিত রন ৪৬ ব্রিগেড লাইনে। তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন শাফায়াত জামিলের জন্য। ...শাফায়েত কাছে না এসে দূরে দূরেই থাকে। তারই স্টাফ অফিসার মেজর হাফিজউদ্দিন এগিয়ে আসে রশিদকে নিয়ে সেনাপ্রধানের কাছে। তাকে অনুরোধ করে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য। শাফায়াতের সমর্থন না থাকলে কিভাবে তার স্টাফ অফিসার প্রকাশ্যে সেনাপ্রধানকে এভাবে অনুরোধ করতে পারে? ...কিছুক্ষণ পরে আসেন বিমান ও নৌবাহিনী প্রধান। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান উপস্থিত শাফায়াত জামিলের এরিয়াতে। তারা মিটিং করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শাফায়াত তাদের ধারেকাছেও আসলো না, এড়িয়ে চললো। ...একটি পত্রিকায় শাফায়াত ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছে, 'ঐদিন সেনা প্রধানের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনের কোন যৌথ পরিকল্পনা (স্থল, নৌ, বিমান) গ্রহণ করা হল না, অথচ ...বিদ্রোহের তিন প্রধান নেতা মেজর রশিদ, ফারুক, ডালিম তার এরিয়াতেই তার করমর্দন দূরত্বে নির্বিঘ্নে ঘুরাফেরা করছিল। সেতো হাত বাড়িয়েই তাদের ধরতে পারতো। তা না করে সে এখন বলছে সেনা প্রধান ওদের ধরতে কেন যৌথ অভিযান পরিকল্পনা করলেন না? ...সংসদে শফিউল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন। 'ঐদিন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার আমার কথা শুনেনি, সে জিয়াউর রহমানের কথা শুনেছে'...। ...কিছুক্ষণ পর রেডিওতে প্রচারিত হড নতুন সরকারের প্রতি তদের আনুগত্য। এতোদিন পর শাফায়াতের আস্ফালন, 'ওরা ভীরু, ওরা খুনিদের কাছে নতজানু হয়েছে'। ...চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিন চীফসহ ডালিম, রশিদ, ফারুক, মোশতাক সবাইকে রেডিও স্টেশনে গিয়ে ঘেরাও করে গ্রেফতার করলো না কেন? সকাল থেকে তো ওরা তার এরিয়াতেই ঘোরাফেরা করছিলো। ...একটি বড় সত্য তিক্ত হলেও সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। ...রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদটাই ছিল সবচেয়ে বড় বজ্রপাত। ...সৃষ্টি হয় 'ক্ষমতার বিশাল' শূন্যতা। কমান্ডাররা ভাবলো, শেখ সাহেবই যখন নেই, তখন তার জন্য শূন্য মর্গে ফাইট কারে আর কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে,...। ...অভ্যুত্থানটাতো ঘটিয়েছে জ্ঞাতি ভাইরাই। অতএব 'Salute the rising sun'. ১৫ই আগস্ট... সময় যতোই গড়াতে থাকে, ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র জ্ঞাতি ভাইদের সাফল্যকে সমর্থন করার প্রবণতা ততোই বাড়তে

থাকে। এর প্রতিফলন দেখতে পাই বেলা ১২টার দিকে ৪৬ ব্রিগেডে কর্নেল শাফায়াতের হেডকোয়ার্টারে। ...সবাই আনন্দিত। উল্লসিত শাফায়াত জামিল। ...শ'খানেক অফিসার। শাফায়াত, খালেদ দু'জনই শেখ সাহেবের প্রিয়পাত্র হলেও ...তাদের কাউকে বিমর্ষ দেখতে পাইনি।" এরপরেও জিয়া মুক্তিযোদ্ধা নাকি, '৭১এর ১নং দালাল?

গোয়েবলসকে যদি কেউ ইউরোপের মিত্রপক্ষ বলে, শুধু তাহলেই আমি জিয়াকে বলবো মুক্তিযোদ্ধা। যদি মীরজফরকে কেউ সিরাজের বন্ধু বলে, শুধু তাহলেই আমি জিয়াকে বলবো, সেক্টর কমান্ডার। নাহলে নয়। যদি হিটলার এবং ট্রুম্যান– ৪৫ এর পর হোয়াইট হাউজে বসে একই সঙ্গে ইহুদি হত্যার প্রশংসা করে বাণী দেয়, নাৎসীদের জয়গান গেয়ে মঞ্চে ওঠে, ২৩শে নভেম্বরে মঞ্চে উঠে ঘোষণা দেয় যুদ্ধাপরাধীরা সব রাজবন্দী... তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হবে... শাহ আজিজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী...। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ পৃঃ ১৩৬]। এইখানে ভ সুযোগ সন্ধানী এক মৌলবাদীজিয়া এবং মওদুদীবাদীদের গোলামদের যোগাযোগ এবং সৌদির কানেকশন স্পষ্ট। জিয়া ক্ষমতার জন্য সব করেছিলো। এমনকি বাংলাদেশকে গোলামের পতিতা। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায় চ্যাঃ ২-৭; তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের অন্য জিয়ার গল্প]। এর মূল্য কতো যা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। যেদিন নিজামী এবং খালেদা সাভারে একসঙ্গে গেছে, সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমিকে লাশের মলমূত্র করেছে। কেস ফিনিশ!

১২১. সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে উঠিয়ে নেয়ার যে বাক্য কিং ফয়সাল এবং গোলাম আজম বসে আলোচনা করেছিলো, '৭২, '৭৩, '৭৪ এবং '৭৫এর রাজনৈতিক হত্যাকান্ড শেষে জিয়ার ব্যাপক অভ্যুত্থান এবং ধাপে ধাপে সংবিধান সংশোধন এবং যুদ্ধাপরধীদেরকে ক্ষমা করে তাদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন, তারই প্রমাণ। এ কোন মুক্তিযোদ্ধার কাজ? জিয়া কি ইদি আমীনের জারজ? সেকি ইয়াহিয়ার অবৈধ পুত্র? জিয়া কি ম্যানিক সাইকোসিস রোগে আক্রান্ত এক ভয়ানক উম্মাদ রোগি? [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে, রক্তাক্ত অধ্যায়, তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, বাঙালির কলঙ্ক মোচন, লি্যগেসি অব ব্লাড, অসমাপ্ত যুদ্ধ, জেলহত্যাকা , '৭১ এর ঘাতক দালাল, গণতদন্ত কমিশন।] এসব বই হাজার বার প্রমাণ করে, জিয়া উন্মাদ কুকুর। বাংলাদেশ সস্ত্রশবাহিনীতে ব্যাপক গণহতা এবং ৫ম সংশোধনীর মতো বিষাক্ত অপরাধ, নাৎসীদের জন্য বৈধতার আইন? আমার আপনার বিবেক এবং প্রজন্ম কি বলবে? বাঙালি যদি মোশতাককে প্রত্যাখ্যান করলো, জিয়া কেন ধোয়া তুলসীপাতা? ইয়াহিয়ার '৭১ এর মন্ত্রী, যুদ্ধের সময়ে শপথ নিয়ে সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানির পক্ষে ক্যাম্পেইন করা আব্বাস আলী খানের মতো বাংলা মুসোলিনির সচিত্র সংবাদগুলো কি কিছুই নয়? আসুন আমরা ইয়াহিয়াকে বীরশ্রেষ্ঠ বলি! জিয়া উদ্যানে তার

মেমেরিয়াল স্থাপন করি। পাশে মোস্তাক এবং ভুট্টো। আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের একটি কবর রচনা করি। আসুন, আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের আশায় অনশন পালন করি যেন জিয়া মৌলবাদীদের হাত থেকে এদেশ মুক্ত হয়। কোথায় শেষ মুজিব! তার প্রত্যাবর্তন আজ জরুরি। আসুন ইয়াহিয়ার জন্য আমরা গৌরব করি। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে সে হত্যা করেনি। জিয়ার তুলনায় ইয়াহিয়া একজন– দরবেশ। সে বধ্যভূমিকে অপবিত্র করেনি। সংবিধানকে পাকিস্তান করেনি। '৭১এ ইয়াহিয়া মানুষ হত্যা করেছিলো। আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। ইয়াহিয়া হত্যা করেছে বাঙালি, জিয়া হত্যা করেছে মুক্তিযোদ্ধা।

১২২. শত্রুপক্ষকে নিঃশর্ত ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন একমাত্র জিয়াই করেছিলো, যার হাত দিয়ে ৭৫২জন সাজাপ্রাপ্ত খুনি এবং ১১০০০ অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী বিচারের দরজা ডিঙিয়ে এসে বাংলাদেশের মানুষকে পৃথিবীর কাছে লজ্জিত করেছে। জিয়া, হলোকস্টের নাৎসী বাহিনীদেরকে ক্ষমতায় বসানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, নিজে একজন ঘোরতর নাৎ-সীর প্রমাণ দিয়েছে। জিয়া, নাৎসীবাদকে লজ্জা দিয়ে বাংলার হিটলারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জিয়া '৭১এর নাৎসীদেরকে দিয়ে তার বিএনপি গঠন করেছিলো। আমার প্রশ্ন জার্মানীরা কি নাৎসীদের বিচার না করে জিয়ার মতো তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলো? আমার প্রশ্ন, জার্মানীবা কি একদিকে হলোকস্ট আরেক দিকে যুদ্ধাপরাধীদেরকে ব্যালেন্স করেছিলো? মুক্তিযুদ্ধকে কি ব্যালেন্স করা সম্ভব? আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধ ব্যালেন্স করি। একপাল্লায় যুদ্ধাপরাধী, আরেক পাল্লায় জিয়া। এক পাল্লায় গোলাম, আরেক পাল্লায় মুজিব। এ্যালাই কেমুন বুঝতাছেন? হ্যালো! [দ্রঃ ন্যূরেনবার্গ ট্রায়ালের বই ও ভিডিও চিত্র; একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায় এবং দুই দফায় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট – জিয়ার অপরাধের সাক্ষরগুলো।]

১২৩. রণক্ষেত্রে জিয়ার কৃতিত্বের প্রমাণ নেই, তার কারণে, মুক্তিযুদ্ধের একবিন্দুও জল সঞ্চার হয়েছে বলে প্রমাণ নেই, জিয়া না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতি হতো কিংবা তার কারণে দেশ স্বাধীন হয়েছে, নথিপত্র নেই। আসলকথা, সোয়াত জাহাজ কেলেঙ্কারি এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্ট ম্যাসাকারে জিয়ার অগ্রণী ভূমিকাই একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ করার মতো ঘটনা যা করে সে নিজেই প্রমাণ করেছে, জিয়া ইয়াহিয়ার লোক। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বইটি জিয়ার পাকিস্তানপন্থী চেহারার প্রচ স্বাক্ষর। জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা করেনি, পাঠ করেছে। রণক্ষেত্রে একাজ যে কাউকে দিয়ে করা সম্ভব। জিয়ার ঘোষণা ছাড়াই দেশ স্বাধীন হয়েছে। ঘোষণা করেছেন– বঙ্গবন্ধু। সুতরাং জিয়ার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অপ্রয়োজনীয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই চূড়ান্ত। জিয়া-পাকিস্তান-পেন্টাগনের একজন গোয়েন্দা এক্সপার্ট। জিয়া 'আলফা' পদক প্রাপ্ত একজন পাস্ট পেন্টাগনি। জিয়া একজন পাকিস্তানি ইমিগ্রান্টের দৃষ্টান্ত। গুপ্তচর জিয়া '৭১এ ব্যর্থ হয়ে, পর্যায়ক্রমে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে খুনে লিপ্ত হয়। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, অসমাপ্ত যুদ্ধ; বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, ভিডিওতে ১০ পর্বে বেলাল মোহাম্মদের লম্বা সাক্ষৎকার।]

তার বক্তব্যের সারমর্ম– "জিয়ার চেয়ে মুক্তিযোদ্ধা শামস মোবিন চৌধুরী আরো বহুবার এই ঘোষণা পাঠ করেছে।" ...অথচ জাতি তার নাম একবারও বলে না। আসল কথা এসব হলো জিয়ানাৎসীদের ষড়যন্ত্রবাদ, তাকে বঙ্গবন্ধু বানানোর অপচেষ্টা। জিয়া শুধু প্রতিশোধের পর প্রতিশোধ নিয়ে গেছে তার '৭১এর পরাজয়ের। তার '৭২এর পরাজয়ের। তার '৭৩ এবং '৭৪এর ব্যর্থতার। জিয়া একে একে সবার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু, শফিউল্লাহ, মোস্তাক, সায়েম, খালেদ...। জিয়া, শুরু থেকেই, ক্ষমতার জন্য বঙ্গ-ইদি আমিন। বঙ্গবন্ধুকে তার খুনের পরিকল্পনা '৭২এই। বঙ্গবন্ধু হওয়ার চেষ্টা '৭১এ। '৭৫এ জোর পূর্বক বঙ্গবন্ধু হওয়ার ধৃষ্ঠতা। জিয়ার বীরউত্তম, বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা। সে কি সেরদরে বিক্রি করেনি, বীরউত্তম?

১২৪. রণক্ষেত্রে জিয়ার গুপ্তচরী ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকাকে সুপারসিড করে। এক মাসের সেক্টর কমান্ডার এবং অপ্রয়োজনীয় জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়া, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে উল্লেখ করার মতো একটি কাজও করেনি, যেজন্য তাকে বলবো, বীরউত্তম। তার বীরউত্তম বঙ্গবন্ধুর ইমোশনের ফসল। রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর আরেকটি অক্ষমতা ও দুর্বলতার ফসল, জিয়ার এই বীরউত্তম। বরং লক্ষকোটি গুণ মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণ রেখেও অনেকেই স্বীকৃতিহীন। অধিকাংশই অভুক্ত এবং মজুর। মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকা নেই। কিন্তু সোয়াত জাহাজের অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তার ইয়াহিয়াপন্থী ভূমিকা, মেজর রফিকুল ইসলামের সঙ্গে তার ২৩-২৪-২৫শে মার্চের কথোপকথন, ২৫ তারিখ রাত ১১টায় ক্যান্টনমেন্টে ১০০০ বাঙালি সৈন্য হত্যার খবর জেনেও জিয়ার ক্যান্টনমেন্ট রক্ষা না করে ১১:৩০ মিনিটে তার সোয়াত জাহাজে যাত্রার যে বিভৎস্য বিবরণ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া যায়, হত্যাকান্ড শুরুর পরেও হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে না যাওয়ার যে উপদেশ সে মেজর রফিকুল ইসলামকে দেয়, তার এই একতরফা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব, '৭১এর ডিসেম্বরের ৬ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘে চীন পাকিস্তান ও আমেরিকাও দিয়েছিলো। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে রাত ১১টায় ক্যান্টনমেন্টে বাঙালির গণহত্যার সময়ে রাত ১১:৩০ মিনিটে জিয়ার যে বীভৎস মুখ আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজের সামনে দেখেছি, কোন মুক্তিযোদ্ধার? হোয়াইট হাউজ যদি হলোকস্টের প্রশংসা করে হিটলারকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, গোলামের বন্ধু জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বললে তা সমান। [দ্রঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, পৃঃ ২০-২৩, ১০৪-১০৯।] আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো নিজেকে বাংলাদেশী বলে পরিচয় দেয়ার আগে এই বইটি পড়ে আমাদের আশপাশের রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদেরকে শনাক্ত করা হোক। এই ব্রত আমাদের মধ্যে '৭১ হয়ে ফিরে আসুক। চলুন আমরা একসঙ্গে বলি, বীরউত্তম হিটলার। জিয়া, বঙ্গবন্ধু হত্যাই শুধু নয়, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের একমাত্র বেনিফিসিয়ারি এবং ২ লক্ষ ধর্ষিতার। তার দল, মুক্তিযুদ্ধের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের সব ফসল একা ভোগ করেছে। তার স্ত্রী বাংলার

অত্যাচারি ইভা পেরোন, দুই দফা শাসনকালে দেশকে লুটেপুটে খেয়ে ন্যাংটো করে ছেড়েছে। বেগম জিয়া, বাংলাদেশের বিষাক্ত সাপ! তার দুই পুত্র ঘুষখোর এবং দুর্নীতিবাজ হেরোইন এবং কোকেইন। জিয়া, ৯ মাস ধরেই, গুপ্তচর। '৭১-৮১, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জিয়া সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমির চরম অপমান করেছে। তার হাতে গোলাম ভিসা পেয়েছে। রহস্য খালেদা জিয়া ৩০ লক্ষ শহীদকে টয়লেট বানিয়ে সেখানে নিজামীকে নিয়ে গেছে বাথরুম করাতে, ১৩ই অক্টোবর, ২০০১এ।

১২৫. রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমের লেখা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে "গোপন সাঙ্কেতিক বার্তা" এবং ৬-৭-৯-১৫নং চ্যাপ্টারে যে জিয়ার পরিচয় আমরা পাই, বিশেষ করে ৭নং চ্যাপ্টারের ১০৫ থেকে ১০৯ নং পৃষ্ঠায় জিয়ার যে অদ্ভুত দিকটির পরিচয় আমরা পাই, ৮ম বেঙ্গলকে ক্যান্টমেন্টের সৈন্যদেরকে রক্ষা না করে, ২০ বালুচের হাতে নির্বিবাদে হাজারের উপরে বাঙালি সৈন্য হত্যাকান্ড ঘটতে দিয়ে এবং ঠিক সেই সময়েই জিয়ার সোয়াত জাহাজ অস্ত্র খালাসের প্রয়াসে দুই পাকিস্তানি জওয়ানকে সঙ্গে করে রাস্তার বাধা সরিয়ে অস্ত্র খালাসের জন্য রাত ১১:৩০ মিনিটে সোয়াত জাহাজের দিকে অগ্রযাত্রা। মুক্তিযুদ্ধ যখন দাবানলের মতো জ্বলছিলো, চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে যখন গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে... এবং ২৫শে মার্চ রাতে মেজর রফিকুল ইসলামকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না যাওয়ার উপদেশ... সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে যখন ২৩ তারিখ থেকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত, এমতাবস্থায়, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জিয়ার অস্ত্র খালাসের যে চাক্ষুষ বর্ণনা আমরা পাই, মেজর রফিকুল ইসলাম, বীরবিক্রমের প্রত্যক্ষদর্শী এই বইয়ের বর্ণনা জিয়ার ১৫ই আগস্টের চরিত্রকে নিশ্চিত করে। ৩রা নভেম্বর, ৭ই নভেম্বর '৭৭এর ২২শে এপ্রিল নিশ্চিত করে। জিয়া শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি, অস্ত্র খালাসের এই নজির, তা নিশ্চিত করে। যখন সারা দেশ জুড়ে হত্যাকা , যখন জগন্নাথ হলে চলছে পৈশাচিক অপারেশন সার্চলাইট... জিয়া চলেছে বাঙালি হত্যার জন্য অস্ত্র এনে শত্রুর হাতে তুলে দিতে। বাহ! বাহ! জিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বারবার লেখা হয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীতে তার গণহত্যার কথা ল্যাগেসি অব ব্লাড এবং তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে পরিষ্কার। তবু কেন মোশতাককে বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করে, জিয়াকে বলে মহান? জিয়া মোশতাকের চেয়ে লক্ষগুণে বিপদজ্জনক। এইসব সত্য কে এড়িয়ে যাবে? এইসব দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে জিয়াকে কে বলে মুক্তিযোদ্ধা? মোশতাকও তো মুজিব নগর সরকারে ছিলো। অমুক্তিযোদ্ধা মোশতাক যদি মুক্তিযোদ্ধা না হয়, জিয়া কেন সেনাবাহিনীতে ব্যাপক গণহত্যা সত্ত্বেও, বীরউত্তম? হ্যালো! ৩০০০ খুনের দায়ে চিলির জেনারেল পিনোশের বিচার করা হয়েছে লন্ডনে, জিয়া হলেই তার বিচার হবে না, বাংলাদেশের মানুষের এই বিশ্বাস ঠিক নয়। বিশ্ব থেকে উদাহরণ নিতে হবে। মহান হতে হবে। মৃত্যু চিন্তা থাকা প্রয়োজন। তাহলে, আসুন আমরা মোশতাককে বলি বীরউত্তম। লক্ষ লক্ষ শহীদের কবরের খবর নেই। ৪ সেক্টর কমান্ডারসহ শতশত বীর,

অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। তাদের কবরের কোন নিশানা নেই, ফলক নেই, মর্যাদা নেই, উদ্‌যাপন নেই, হত্যা দিবস নেই, স্মরণ নেই, কিছুই নেই। একা জিয়া দখল করে আছে– ১০০০ কোটি টাকার জিয়া উদ্যান! সারা বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলে– জিয়াপাকসারজামিনসাদবাদ। বেগম জিয়া, ২০০১ সনের ১৩ই অক্টোবর, আমাদের বাংলাদেশকে নিজামীর জন্য পাকিস্তান ঘোষণা করেছে, সাভার স্মৃতিসৌধের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে। জিয়া ৫৬০০০ বর্গমাইল জুড়ে পাকিস্তানের অদৃশ্য পতাকা স্থাপন করে গেছে।

১২৬. ২৫শে মার্চ রাতে, মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেছে, এইরকম অবস্থায় যখন ক্যান্টনমেন্টের গুলির আওয়াজে আকাশ বাতাস তোলপাড়... তখন, রফিকুল ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধে না যেতে জিয়ার উপদেশ এবং সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের প্রস্তুতি, কোন মুক্তিযোদ্ধার? রফিকুল ইসলামের বইতে স্পষ্ট, জিয়া কোন টাইপের মুক্তিযোদ্ধা। জিয়া, সুযোগ সন্ধানী মুক্তিযোদ্ধা। [দ্রঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের ভূমিকা...]। জিয়া যদি মুক্তিযোদ্ধা হয়, তাহলে গোলাম আজম কি? এই গোলাম আজমকে আমাদের ইতিহাসের কাছে চিহ্নিত করতে হবে। তার গণহত্যার ডক্যুমেন্টারি করে প্রজন্মের কাছে তাকে গণহত্যাকারীর পরিচয় দিতে হবে। জিয়া নিজেকে বাঁচাতে বিদ্রোহ করেছিলো। না হলে, এই জাতীয় বেঈমানকে, সেইদিনই মুক্তিযোদ্ধারাই খুন করে ফেলতো বলে প্রমাণ আছে। জিয়া বিদ্রোহের নামে কিছু খুনটুন করে, নিজেকে রক্ষা করেছিলো, ২৫শে মার্চ ১৯৭১এ। জিয়ার ইতিহাস, শুদ্ধ করা জরুরি। সেনাপ্রধান জবাব দিন। প্রজন্ম এখন সামনে।

১২৭. ২৫শে মার্চ রাতে ১১:৪৫ মিনিট। "জেসিও সুবেদার দৌড়ে এসে বলল, স্যার গাড়িতে কতগুলি পশ্চিমা সৈন্য আছে। উড়িয়ে দেই গাড়িটা? পরে জানতে পারি, প্রথম গাড়িটা মেজর জিয়াকে নিয়ে বন্দরে দিকে যাচ্ছিলো। তার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে তা ক্যান্টমেন্টে নিয়ে আসার জন্য সমুদ্র বন্দরে যাচ্ছিলো।" তথ্যঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। এই পরিচয় একজন ইয়াহিয়ার লোকের। '৭৭এ জিয়া সস্ত্রশ বাহিনীতে যে ব্যাপক গণহত্যা করেছিলো তার বিবরণ পাওয়া যাবে ল্যাগেসি অব ব্লাড বইয়ের "ক্যু এবং মিউটিনি" চ্যাপ্টারে। সশস্ত্র বাহিনীতে জিয়ার গণহত্যার সংবাদে বাংলার মানুষ কেন নীরব? '৭৭এর গণহত্যার ভিকটিমদের পরিবার আজো সারা বাংলাদেশ জুড়ে, তারা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু উপায়হীন এবং অধিকারহীন। বাংলার মানুষের উচিত, চিলি এবং কম্বোডিয়ার থেকে উদাহরণ। ৫০০০ মানুষ হত্যার দায়ে নরিয়েগার সমাপ্তি হলো। ২২ বেঙ্গল খালি করেও জিয়া, বাংলাদেশের বীরউত্তম? তার গণহত্যা নিয়ে তিনটি ভিডিও চিত্র আমি দেখেছি, সে '৭১কেও লজ্জা দিয়েছে। সস্ত্রশ বাহিনীতে গণহত্যার এই নজির দেড়শ' বছর আগে আরেকবার ঘটেছিলো... গায়ের রক্ত বলকে ওঠে। বাংলাদেশে এতো দুঃশাসন দেখে আমার ধারণা হয়েছে, একমাত্র জিয়া পরিবার

না হলে এদেশে কারো যেন কোন অধিকারই নেই। একমাত্র তার বাংলা নাৎসী দলের পরিচয় না থাকলে, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। বাংলাদেশে জিয়ার দল, মানুষ খুনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তার মানুষের রগ এবং আঙুল কেটে দিয়েছে, ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার শাস্তি দিয়ে। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের শক্তিকে চাষ করেছে পুরো ৫৬০০০ বর্গমাইল জুড়ে। তারা রাজাকার দিয়ে ৫৬ হাজার বর্গমাইল চিহ্নিত করেছে। তারা বধ্যভূমিগুলোকে রাজাকারদের টয়লেট করেছে। ৬নং ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান মেজর জহিরুল হক খান বলেছেন, সে যথেষ্ট ফাঁসি দেয়নি বলে তাকে জিয়ার নির্দেশে অব্যহতি দেয়া হয়। "সেনাবাহিনীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সবগুলোকে জবাই দাও।" জিয়ার নির্দেশ। তার কথা, তারাও জানতো না কেন ফাঁসি? আমরা '৭১এর কথা বলি। '৭৭ কি ধোয়া তুলসিপাতা? আসুন আমরা ঘরের পশু আগে হত্যা করি।

১২৮. কোন মুক্তিযোদ্ধাই '৭৭এ সশস্ত্রবাহিনীতে নির্বিচারে এমন ব্যাপক ও উন্মুক্ত মুক্তিযোদ্ধা খুন করবে না। যে দৃষ্টান্ত '৭১এ প্রথম স্থাপন করেছিলো ইয়াহিয়া, নিয়াজী, টিক্কা খান। জিয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও সৌদির ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বানিয়েছে, সেই বিষ আমরা ভোগ করছি, বাংলাপাকিস্তানে এই যদি স্বাধীনতার সুফল হয়, কুফল কি? বাংলাদেশ থেকে হিন্দু মাইগ্রেশন আজ কেন রেকর্ড? '৭১এর কি প্রয়োজন? শেষমেশ এই কথাই সত্য হলো, বাংলা হবে আফগান, আমরা সবাই তালেবান। জিয়া, এই পাক-তালেবানদেরকে বাংলার সরকার গঠনের পাসপোর্ট দিয়েছিলো। যার প্রমাণ– জিয়া এবং বেগম জিয়ার মহা-মন্ত্রীসভাগুলো। আসুন সবাই মিলে গাই– 'আমরা সবাই জিয়া তালেবান'।

১২৯. কোন মুক্তিযোদ্ধাই সিপাহী বিপ্লবের নামে সাজানো ক্যু'র মাধ্যমে নির্বিচারে খুন করবে না। দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড – তিনটি ব্যর্থ সেনা অভূত্থান এবং রক্তাক্ত অধ্যায়, "ক্যু মিউটিনি-এক্সিকিউশন।" "জিয়া একহাতে খেতো আরেক হাতে খুন করতো।" এইসব বইয়ের পাতায় পাতায় এই বাংলা-রাওফরমান আলীর প্রমাণ এইসব বই পড়া থেকে মুক্তি কোথায়? বাংলা হলোকস্ট মিউজিয়ামে আমরা জিয়ার ছবি দেখতে চাই, রাও ফরমান আলীর পাশে। আমরা শত শত হলোকস্ট মিউজিয়াম চাই। আমরা খালেদা ও তার খুনি স্বামীর ছবি সারা বিশ্বের স্বৈরাচারদের সঙ্গে ইতিহাসভুক্ত দেখে যেতে চাই। ভিডিওতে '৭৭এর সশস্ত্রবাহিনীর গণহত্যার বিবরণে সহকারীদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, দাফনকাফনহীন শতশত নিরিহ সিপাইয়ের নির্বিচারে গর্তে পুতে ফেলার প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা।

১৩০. জিয়া বঙ্গবন্ধুকে জাতিরজনক পদ থেকে স্খলন করেছিলো। তার ছবি নির্মূল করেছিলো।

১৩১. এ দৃষ্টান্ত আমরা আরেকবার দেখেছিলাম ১৬০০ শতাব্দীতে, আওরঙ্গজেবের ব্যাপক হিন্দু বিলুপ্তি আন্দোলনে, এক পাল্লায় ব্রাহ্মণদের পৈতা আরেক পাল্লায় তার

খাবার। সমান না হলে সম্রাট ভোজন করতো না। জিয়া, বাংলাদেশের মাইনরিটি, বিশেষ করে হিন্দুদেরকে অস্বীকার করে, মৌলবাদীদেরকে আশ্বস্ত করেছে। যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে '৭১, সেই সংবিধানই আজ পাকবাংলাদেশের সংবিধান এবং তা সম্ভব করেছে এই দুর্ধর্ষ জিয়া। এই সংবিধানে পাওয়া যাবে– ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সকল উপকরণ। হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে মুসলিম বানানোর জন্য সংবিধানের খৎনা! কে এই জিয়া? হ্যালো ইন্ডিয়া! খবর শুনেছেন? এদেশের হিন্দুদের দুঃখের শেষ নেই! তারা ধর্মনিরপেক্ষতা খুইয়ে সবাই এখন মুসলমান হয়ে গেছে! তারা সবাই এখন খৎনা এবং মুসলমানী দিয়ে বসে আছে। জিয়া হিন্দুদের জন্য এদেশ অবৈধ করেছে।

১৩২. জিয়া বাংলাদেশকে করেছিলো ইয়াহিয়ার জল্লাদখানা। সে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ঘৃণা করে গর্তে পুতে ফলেছিলো। দাফন-কাফন ও বিউগল কি শুধু তার? জিয়াউদ্যান কি তার পৈত্রিক? বঙ্গবন্ধু যখন নিজ গ্রামে, জিয়া উদ্যান কেন? সে কি জাতির পিতা? নিশ্চয়ই জিয়া জাতির পিতা! বিএনপি তো সেটাই বলে।

১৩৩. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ৪৩, ৪৪ ও ৪৫নং আসামীর জবানবন্দীতে জিয়ার দুধর্ষ এবং দুর্বৃত্ত চেহারা বেরিয়ে এসেছে সূর্যের আলোর মতো। ল্যাগেসি অব ব্লাড, খুনি এবং বিশ্বাসঘাতক জিয়ার অন্যতম শ্বেতপত্র। মানুষ কি এসব বই পড়ে? তার কি অন্ধ? জার্মানরা কি নাৎসীদের এসব তথ্যপ্রমাণ ফেলে দিয়ে হিটলারকে বৈধ করেছিলো? খুনি আইকম্যানকে মুক্ত করে তাকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছিলো? [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচনে সাক্ষিদের জবানবন্দী।] বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারক পর্যন্ত ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, খুনি জিয়াকে অভিযুক্ত করে চার্জশীট দেয়ার কথা। দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। খুনি জিয়া, ইয়াহিয়ার চেয়ে জঘন্য দৃষ্টান্ত রেখেও মহান! বনানী, আজিমপুর, টুঙ্গিপাড়া এবং রাজশাহীতে তার বধ্যভূমিগুলো কি কিছুই নয়? সেনাবাহিনী কি এতোটাই নষ্ট হয়ে গেছে? আমি সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জিয়ার বধ্যভূমিগুলোর হালনাগাদের দায়িত্ব আপনাদের।

১৩৪. যারা '৭১এ গণহত্যা করেছিলো, '৭১এর প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রতিটি সংখ্যায়, গোলাম আজম এবং শান্তিবাহিনীর সংবাদ উপেক্ষা করে তাকে দেশে ঢোকালে সে মুক্তিযোদ্ধা নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধের যেকোন অপরাধীকেই বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে নাৎসীদের মতো দৃষ্টান্ত মূলক বিচারের উদাহরণ রাখবে। আলবদর-আলশামস-জামায়েত-মুসলিম লীগ-পিপিডি এদের সচিত্র সংবাদগুলো থেকে প্রমাণ নিয়ে মামলা। কিন্তু '৭৫এর ৩১শ ডিসেম্বরে জিয়া, বাংলা নাৎসীদেরকে রাজবন্দীর সম্মানে মুক্তির গেজেট জারি করে যে অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করেছিলো, তা হিটলারের গোয়েবলস এবং বোরম্যান ও হিমলারকে হোয়াইট হাউজে এনে সম্বর্ধনার মতো অসম্ভব। ওসামা বিন লাদেনের জন্য বোমা ও নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে আমেরিকা ঢোকার জন্য বর্ডার খুলে দেয়ার সমান। কিংবা হিটলারের ৬টি মুখ্য নাৎসী সংগঠনের সদস্যদেরকে আমেরিকাতে

এনে গণহত্যার বদলে রাজবন্দীর সার্টিফিকেট দান করে সম্বর্ধনা দেয়ার সমান। '৭১এর খাজা খায়েরউদ্দিনের সঙ্গে গোলাম আজমের শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার সচিত্র সংবাদের পরেও সেই গোলামকে বাংলাদেশের ভিসা এবং বঙ্গবন্ধু খুনের তদন্তকারী কমিশনের প্রধান উকিল টমাস উইলিয়ামের ভিসা অস্বীকার? জিয়া বারবার প্রমাণ করেছে এদেশে তার কায়েদীআজমী মতলব । খাজা খায়ের উদ্দিন, ১৮ই এপ্রিল '৭৩এ যার নাগরিকত্ব বাতিল, জিয়া, এই দুর্ধর্ষ খুনিকে পর্যন্ত বৈধ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলো বাংলাদেশে তার মওদুদীবাদ, জিয়ামওদুদীবাদী। আসুন আমরা মওদুদীকেও সংহতির বীর বলে উদ্‌যাপন করি। [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃঃ ৫৯৯, আলবদর থেকে মন্ত্রী, মতিউর রহমান নিজামী।] একজন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা? নিশ্চয় সে পাগল বা শিশু! জার্মানরা যেখানে ট্রাইবুনাল করে বিচার করেছে আর আমরা...! জিয়া কাকে বোকা ভাবে? জিয়ার ছেঁড়া লুঙি এবং ভাঙ্গা স্যুটকেস রাজনীতি আজ মুক্তিযুদ্ধকেও উৎরে গেছে। বাঙালির বৈধিক মৃত্যু হয়েছে। জিয়া, পুরো সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে তার নিজের যুদ্ধ বানিয়েছে। জাতিরজনক সে নিজে। জিয়া দেশদ্রোহী, তাহেরদেরকে হত্যা করে, নিজামীদেরকে বরাদ্দ করেছে সংসদ। জিয়া বঙ্গবন্ধুকে করেছে টিক্কা খান।

১৩৫. জিয়া মুক্তিযোদ্ধা হলে, '৭১এর সংগ্রাম পত্রিকা উপেক্ষা করবে না। ...জিয়ার ৫ম সংশোধনীর অর্থ, "মুক্তিযুদ্ধকে ফাঁসি।" ৫ম সংশোধনী, সভ্যজগতের ১ম কলঙ্ক। যৌনকর্মীর কাতর জরায়ুতে বিষাক্ত সিফিলিস। জিয়া ১নং গোলাম আজম।

১৩৬. জিয়া মুক্তিযোদ্ধা হলে, '৭১এর ৬ই এপ্রিল পূর্বদেশে প্রকাশিত গোলাম আজমের সঙ্গে টিক্কা খানের ছবিটি উপেক্ষা করবে না। দ্রঃ ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলা, ১১/২/৭২ পূর্ব দেশে, ১৮/১/৭২ পূর্বদেশ। '৭১ শেষে, জিয়ার '৭৯ সনের মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের গ্রেফতারের খবর অস্বীকারের উপায় নেই। তার মন্ত্রী আব্দুল আলীমকে খাঁচায় ভরে গণপ্রদর্শনের ছবিকে অস্বীকারের উপায় নেই। মর্দে মোমিন নামের রাজাকার জেলখাটা বাংলা কায়দেআযম এবং ঘোর মওদুদীবাদী কে.এ হামিদের পুরো পরিবার আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কোন মুক্তিযোদ্ধাই সুস্থ মস্তিস্কে তাদেরকে বৈধ করবে না। '৭১এর রণক্ষেত্রে যারা হত্যা করেছে, পরবর্তীতে সেই শত্রুপক্ষকে রাজবন্দীর সম্মান দান? [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া।] আমি জিয়ার জীবনী নিয়ে ইদি আমীনের মতো ছবি দেখতে প্রস্তুত। অস্কার পাওয়ার মতো রোমহর্ষক এবং ঘটনাবহুল। এ্যাডভেঞ্চার এবং থ্রিল। পরিচালক কেউ কি আছেন? জিয়ার ৫ম সংশোধনীর জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে একসঙ্গে আত্মহত্যার আহ্বান জানাই। তার ৩১শে ডিসেম্বরের গেজেটের জন্য আমৃত্যু অনশনের হুকুম করি। তার ১০ বছরের কর্মকান্ডের জন্য সেনাপ্রধানকে জানাই সমকাম শ্রদ্ধা।

১৩৭. জিয়া, খুনিদেরকে দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অপব্যবহার করেছে, যে মন্ত্রণালয়ের প্রধান সে নিজেই। জিয়া, খুনিদের জন্য হাজার

দুয়ার সৃষ্টি করেছিলো। যেমন, দূতাবাসের চাকরি কিংবা মন্ত্রীত্ব অথবা বাংলা নাৎসী দল বা বিএনপি। সে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে খুনিদেরকে নাগরিকত্ব আবেদনের প্রজ্ঞাপন জারি করেছিলে '৭৬এ যার প্রধান সে নিজেই, সঙ্গে সেনাপ্রধান এবং উপসামরিক শাসকের অলঙ্কার। অর্থাৎ, একজন পরিপূর্ণ আইএসআই-এর দৃষ্টান্ত। জিয়ার ১০ বছর, পতিতার জড়ায়ুতে সন্তানের প্রবেশ। জিয়ার ১০ বছর, ইয়াহিয়ার পায়ের তলে বঙ্গবন্ধুর কবর। জিয়ার ২৫শে মার্চ '৭১এর ব্যর্থতার সূচীপত্র।

১৩৮. [দ্রঃ '৭১এর ঘাতকদালালেরা কে কোথায়?]। এই বইটিতে রক্ত ঠান্ডা করে দেয়ার মতো জিয়ার অপরাধের দৃষ্টান্ত পাতায় পাতায়। এই বই পড়া থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি নেই। এই বইতে খুনিদের অতীত-বর্তমান লিষ্ট করে অত্যন্ত সফলভাবে লেখা হয়েছে, যারা শাহমোয়াজ্জেম, বিএনপি পরিবারভুক্ত। এভাবেই খুনিরা তার বিএনপিতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। যেমন, জুলমত আলী খান এবং শাহ আজিজ। জিয়ার দলের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয়রা '৭১এর অপশক্তি। দলছুট। কিংবা গডফাদার। কর্নেল অলি, মীর শওকত এবং এরশাদের মতো কুলাঙ্গার দিয়ে সাজানো জিয়ার দুই কান। জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে পুতে ফেলেছিলো, দাফনকাফনের নাম করে। তারজন্য ৫৭০ সাবান। খুনির মর্যাদা। মিডিয়া এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে তাকে উধাও করে ফেলা। জিয়ার ছবি কি আমরা ৩৬৫ দিন দেখে ক্লান্ত হইনি?

১৩৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো '৭১এর দৈনিক আজাদ ৭ই মে সংখ্যা "তিন নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন" শিরোনামে– চৌধুরী মইনুদ্দীন, আশরাফুজ্জামান খান, খালেক মজুমদারকে রাজবন্দীর সম্মানে জেল থেকে বের করবে না। সাজাপ্রাপ্ত ৭৫২ জন গণহত্যাকারীকে রাজবন্দী সম্মানে মুক্তি দেবে না। ১ লক্ষ যুদ্ধশিশুর যন্ত্রণাকে অস্বীকার করবে না। ৪ লক্ষ ধর্ষিতার নরক যন্ত্রণা নতুন করে জাগিয়ে তুলবে না। যে জাতি ইয়াহিয়াকে প্রত্যাখ্যান করলো, সে জাতি কি করে জিয়ার মধ্যে ইয়াহিয়াকে ধরলো না? বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন চাই আরেকটা পশু হত্যার আশায়। আসল পশু, মরেনি। আসল পশু ৫৬০০০ বর্গমাইল জুড়ে জীবিত এবং রক্তপিপাসু। জিয়ার বুকে ইয়াহিয়া পশু।

১৪০. জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি ইমিগ্রান্ট। ছয় বছর থেকে দেশ ছাড়া। জিয়ার দৃষ্টান্ত আর কোন মুক্তিযোদ্ধার? ইয়াহিয়ার '৭১কে '৭৫এ ফিরিয়ে আনার দৃষ্টান্ত আর কার? ''৭১এর ঘাতকদালাল কে কোথায় বইটি রপ্ত করার পর, জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বললে তা, দেশদ্রোহীতার সমান। জিয়ার বাবা মা '৪৭ থেকেই বিদেশে। তাদের কবর পর্যন্ত পাকিস্তানের মাটিতে। এলায় কেমুন বুঝতাছেন?

১৪১. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো '৭১এর আজাদী দিবসে, গোলাম ও নিজামীর পাকিস্তানবাদী সচিত্র বক্তৃতাকে অস্বীকার করে দেশদ্রোহীকে বৈধ করবে না। আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও আল মুজাহিদ্দীর রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তৃতার সংবাদ উপেক্ষা করবে না। নিজামীর মতো রাষ্ট্রদ্রোহীকে আমাদের প্রধান বধ্যভূমিতে খালেদার সঙ্গে

১৩/১০/২০০১এ পাঠানোর সুযোগ করে দেবে না। পাকবাহিনীর দালালদের তালিকাভুক্ত নিষিদ্ধ ৪৪ জনের একজন, কাউকেই রাজনীতিতে আসার সুযোগ দেবে না। [দ্রঃ একাত্তরের সকল সংবাদ পত্রিকা]। আলী আকবর টাবীর লেখা "মতিউর রহমান নিজামী আলবদর থেকে মন্ত্রী" বইয়ের দ্রষ্টব্যগুলিকে অস্বীকার করবে এমন সাহস কার? প্রয়োজনে এই বইটি আমি বিনামূল্যে সরবরাহ করবো। এই বইয়ের পাতায় পাতায় '৭১এর সংবাদ পত্রিকা থেকে নিজামীর কোটেশনসহ বক্তৃতার অংশ যা আর্কাইভে থেকে নেয়া। আসুন আমরা ৫ম সংশোধনী এবং মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞা ব্যালেন্স করি।

১৪২. মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রেরই ৮ম খণ্ডের ৬২৭ পৃষ্ঠায়। জিয়ার ইতিহাস বিকৃতির নমুনা পাওয়া যাবে ৫৭৬ পৃষ্ঠায়। '৭২এর বিচিত্রা পত্রিকাতে প্রকাশিত নিবন্ধনটিকে জিয়া এইভাবেই বিকৃতি করেছে– যেখানে লেখা ছিলো, বাবু নবীনচন্দ্রকে তিনটি গুলি ছুড়ে ফকা চৌধুরির ছেলে সাকা চৌধুরীর ছেলে অত্যন্ত কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। জিয়াউর রহমান ভার্সন লিখেছিলো, জনৈক সালাউদ্দিন, তাকে সেখান থেকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসেছিলো। জনৈক সালাউদ্দিন? এই সেই জনৈক সালাউদ্দিন, যার আসল নাম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী? যে তার কুখ্যাত স্ত্রী আইএসআই খালেদা জিয়ার সংসদ বিষয়ক উপেদেষ্টা? আরেকটি প্রমাণ এই দলিলপত্রের ৬২৬ পৃষ্ঠায় লেখা, মাওলানা আব্দুল মান্নানের বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রমাণ। ডা. চৌধুরীর মা যখন বলে উঠলেন– "কোথায় যাচ্ছ"– তিনি বললেন "মাওলানা মান্নানের কাছে যাচ্ছি।" সে বলেছিলো, এধরনের কোন ব্যাপার ঘটলে যেন তাকে খবর দেয়া হয়। তিনি নিচে নেমে মাওলানা মান্নানের দরজা ধাক্কা দিতে লাগলেন। ডা. চৌধুরী দরজা ধাক্কাচ্ছেন, চিৎকার করে মান্নানকে দরজা খুলতে বললেন, তার সাড়া নেই। খানিক পর মাওলানা ভিতর থেকে বললেন, "ভয় পাবেন না, আপনি যান। আমি আছি। ওরা আপনাকে নিতে এসেছে আহতদের চিকিৎসার জন্য" এই মাওলানা মান্নান জিয়ার ধর্মমন্ত্রী। আর কতো প্রমাণ চাই? মুক্তিযুদ্ধ কি ট্রেড করার – পণ্য? রিপেট্রিয়েট, জাতীয় বেঈমান এবং স্বাধীনতা বিরোধী এরশাদ দেশে ফিরেছিলো '৭২ এ। এরশাদ, জিয়ার যোগ্য জারজ সন্তান। দুই ঘোর আইএসআই। এদের দু'জনেরই অতীত রেকর্ড তদন্তের দাবী রাখে। পুরো সেনাবাহিনীতে এই দুই খলনায়ক, বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং দেশের মানুষকে নষ্ট করেছে এই দুই মানুষখেকো পাকিস্তানি বাঘ। এরা না হলে, বাংলাদেশ আবার রাজাকারের দেশে পরিবর্তিত হতো না। এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে যার কোন অবদান নেই। আর সে ভোগ করে স্বাধীনতার সুফল। অন্যদিকে ভিক্ষে করে মুক্তিযোদ্ধারা। এ কোন জিয়া, যার সৃষ্টি এই জাতীয় বেঈমান– এরশাদ। বাংলার বুকে এই এরশাদও মুক্তিযোদ্ধা ফাঁসির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তার জারজ পিতার ব্লাড ল্যাগেসি স্থাপন করেছিলো। এ কোন দেশ, যেখানে ভাতের অভাবে পতিতা হয়, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা? যেখানে শহীদজননী হয়, রাষ্ট্রদ্রোহী?

১৪৩. সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যাকারী জিয়ার নামে জিয়া উদ্যান, বিমানবন্দর, স্টেডিয়াম? বাংলাদেশ! সেইম অন ইউ! একজন খুনিকে খুনি না বলে জাতি যতোদিন তাকে বীরউত্তম বলবে, ততদিন এদেশ মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবে না।

১৪৪. ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল অপরাধীদের জন্য নিরাপদ আইন প্রণয়ন করে, ইনডেমনিটির মতো জঘন্যতম অপরাধকে আইনে নিবদ্ধ করে, '৭১এর বিরুদ্ধে জিয়ার জেহাদ প্রমাণ করে, পলপটের চেয়ে জঘন্য সে প্রকৃত অর্থে, জিয়াউর রহমান একজন জাহেলীয়া যুগের অন্ধকার মনের সম্পূর্ণ সভ্যতা বর্জিত চারপায়ের হিংস্র মাংসখেকো প্রাণী। '৭৫এর ১৫ই আগস্টের পর সব জিয়া ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি খুনি এবং ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পেরেছিলো, জিয়া তাদেরকে অপব্যবহার করেছে, শেখ হত্যার সুফল একা ভোগ করতে। তারা বুঝতে পেরেছিলো, এই খলনায়ককে বিশ্বাস করে ভুল করেছে। ৩রা নভেম্বর এবং ৭ই নভেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং হাতেনাতে তারা ধরে ফেলেছিলো। সেজন্যেই ১৯টি ক্যু এবং ১০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা খতম।

১৪৫. ল্যাগেসি অব ব্লাড বইয়ের "ক্যু – মিউটিনি এবং এক্সিকিউশন ও জিয়া দ্যা মিথস্" এ জিয়ার হাতে '৭৭এর দ্বিতীয় গণহত্যার যে বিবরণ, '৭১এর ইয়াহিয়ার পর, জিয়া নিজেকে প্রমাণ করেছে '৭৫ এবং '৭৭এর ইয়াহিয়া। জিয়া '৭৭এর নতুন পাকবাহিনীর রাও ফরমান আলী। জিয়া– '৭১এর মওদুদীর অবৈধ সন্তান। অসমাপ্ত যুদ্ধে তাহের খুনের যে বিবরণ আমরা পাই, বাঙালি কি বই পড়ে? নাকি শুধু নাটক দেখে। জিয়ার গণহত্যার যে সমস্ত তথ্য হামেশাই পাওয়া যায়, এইসব বই এড়িয়ে তাকে বীরউত্তম বলা, আর হিমলারকে বীরউত্তম বলা, এক। তার গণহত্যার গণকবর আমাদের জন্য অনিবার্য ইতিহাস পাঠ্য হবে। কেন হবে না? জিয়া কি জাতিরজনক পদ হতে বঙ্গবন্ধুকে বিনাশ করেনি?

১৪৬. জিয়া ১৯৭৮ এর ৫ই এপ্রিল নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছিলো তার গডফাদার গোলাম আজমসহ সকল যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করতে। ১৯৭৮এর ১১ই জুলাই গোলাম আজম দেশে প্রত্যাবর্তন করলো। ১৯৭৯এর ৫ই এপ্রিল জিয়া, ৫ম সংশোধনী করে যুদ্ধাপরাধীদেরকে বৈধ করে দিলো। হ্যালো! আমি সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জিয়া এবং খালেদার বিষয়ে তদন্ত না হলে, তাদেরকে ইদি আমীন এবং ইভাপেরন না বললে, এই জাতি কি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে না? ২য় প্রজন্ম জানতে চাইলে, কি বলবো?

১৪৭. যে লোক বীরউত্তমদের মাংস মর্গে দুইদিন রেখে পোকামাকড় দিয়ে খাওয়ায়, কি করে সে বীরউত্তম? খালেদকে খুন করে তার বীরউত্তম মাংস সে জুতো পেটা এবং গণঘৃণার জন্য প্রদর্শন করেছিলো। যে লোক মুক্তিযুদ্ধ করে, সে কেন বীরউত্তমকে খুন করবে? খুনের তদন্ত বন্ধ করবে? স্মৃতিসৌধে পাঠাবে রাজাকারের রক্তমাখা হাতের ফুল? কে এই জিয়া? জিয়া বিশ্ব থেকে '৭১কে নিভিয়ে ফেলার জন্য পর্বতপ্রমাণ দোষী। আসুন আমর একসঙ্গে সবাই আত্মহত্য করি।

১৪৮. যে দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। জিয়া, নাৎসীদেরকে বলছে রাজবন্দী? জিয়া, নাৎসীদেরকে করেছে মন্ত্রী? জিয়ার স্ত্রী খালেদাগোলামআজম বাংলার নাৎসীকে করেছে তার নিজের জোট সরকার, বোরম্যানকে করেছে তার শিল্পমন্ত্রী। সাকা চৌধুরী নামের ভুট্টোর জারজ সন্তানকে করেছে সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা? রুডলফ হেস-কে করেছে তার সমাজকল্যাণ মন্ত্রী? খালেদা জিয়া জিয়াউর রহমানের চেয়ে ধুরন্ধর আইএসআই রিক্রুট। খালেদা জিয়া, জিয়ার চেয়ে বড় আইএইআই রিক্রুট। কোনরকমের যোগ্যতাহীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী বিদ্যা। '৭১এ যে ক্যান্টমেন্টে থেকে পাকিস্তানিদের হেফাজত করেছিলো। স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী সে। এ তথ্য সবাই জানে, জেনেও কলুপ। খালেদা জিয়া, তার জোট সরকারে যা যা করেছিলো '৭১এর ইয়াহিয়াও একই করেছিলো। খালেদা জিয়া, একজন আদ্যোপান্ত, দেশদ্রোহী। এই দুই জিয়াপাকিস্তানি পরিবার সেনাবাহিনীকে অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত। দু'জনেই তারা বাংলাদেশের মধ্যে থেকে পাকিস্তান ও সৌদির স্বার্থ রক্ষা করেছে। কেউ তারা বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয় যার প্রমাণ, '৭১-'৮১।

১৪৯. ১৯৯১ এবং ২০০১ আমরা তার ভাঙ্গা স্যুটকেস এবং ছেড়া লুঙ্গি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার দৃষ্টান্ত পেয়েছি। তার দুই যোগ্য সন্তান, হেরোইন এবং কোকেইন জিয়া ক্যামেরাবন্দী দুই অপরাধী। হাওয়াভবনে বসে তারা বাংলাদেশকে সেরদরে বিক্রি করেছে। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশোর মাইনরিটিদের বিরুদ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে জেহাদি আন্দোলনের অত্যাচারি আওরঙ্গজেব। বাংলাদেশকে জিয়া হিন্দু মুক্ত করার বীর্য রোপণ করেছে। জিয়া এবং খালেদা আমাদের অধিকারের সব কল্লা চেপে বাংলাদেশকে মধ্যযুগে নিয়ে গিয়েছে। খালেদা জিয়া, ইভা পেরোনের চেয়ে স্বৈরাচার। খালেদা জিয়া গোলাম নামে বিশ্বাসী। স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী।

১৫০. '৭৩এর হজ্জ মৌসুম। কিং ফয়সাল ও গোলামের সাক্ষাৎকার। গোলাম আজম– "আমি যে দু'বছর আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেছিলম, তা উল্লেখ করলে তিনি মনে আছে বলে জানান। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র উৎখাত না করা পর্যন্ত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না বলে আমাকে জানিয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করে বললেন, তিনি এব্যাপারে মজবুত আছেন।" জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খণ্ড। ১৬ই আগস্টে হত্যাকাণ্ডের পরদিনই সৌদির স্বীকৃতি এসেছিলো সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র উৎখাতের আগেই। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র উৎখাত হলো, '৭৭ এর ২২শে এপ্রিল জিয়ার হাতে। এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র কী প্রমাণ করে? গোলামের ভিসা দিয়ে, দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বাজার! '৭৯তে আব্বাস আলী খানের মতো ইয়াহিয়ার প্রাদেশিক মন্ত্রীকে জামাতের আমীর ঘোষণার মতো নাৎসী দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে জিয়া, '৭১এর ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা। তার মানে কি রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমের কথাই ঠিক? জিয়া, ২৫শে মার্চ রাতে ৮ম বেঙ্গলকে নিষ্ক্রিয় রেখে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টের গণহত্য ঘটতে দিয়ে নিজে

সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের জন্য রাত ১১:৩০ মিনিটে সমুদ্রবন্দরের দিকে যাচ্ছিলো দু'জন পাকিস্তানিকে সঙ্গে নিয়ে? তার মানে কী, '৭৫এর ১৫ই আগস্ট থেকে ২৪শে আগস্টের জোরপূর্বক সেনাপতির পদোন্নতিপ্রাপ্ত জিয়া, ৩১শে ডিসেম্বরের কুখ্যাত গেজেট এবং '৭৭এর ২২শে এপ্রিলে অবৈধ রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক প্রশাসক এবং সেনাপ্রধান জিয়ার বিষয়ে এই অনুধাবনই কি ঠিক যে সে '৭১ থেকেই নীরবে গোপনে সৌদি এবং পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সাধন করে যাচ্ছিলো? না হলে, কেন সে '৭২এর ২৮শে সেপ্টেম্বরের দৈনিক পূর্বদেশ সংখ্যায় প্রকাশিত গণহত্যার আরেক হোতা নিয়াজীর সঙ্গে মৌলানা মান্নানের মিটিং-এর ছবিটি সত্ত্বেও '৭৯তে তাকেই তার মন্ত্রী বানালো? মাওলানা মান্নানেরা কি '৭১এর গণহত্যায় অংশ নেয়নি? ২৮/৯/৭২এর পূর্ব দেশে প্রকাশিত মাদ্রাসায় বসে গোলাম-নিয়াজী-মান্নানের মিটিং-এর বহুল প্রচারিত ছবিটি কেন জিয়ার চক্ষু এড়িয়ে গেলো? তার কালো সানগ্লাসই কি এর জন্য দায়ী? কি লুকোতে চেয়েছে জিয়? কালো চশমা কি ১৫ কোটি মানুষের জন্য যথেষ্ট ইনডেমনিটি? কালো চশমার তলে এক জিপসী জিয়া, বীরউত্তমদের মাংস কেন পোকামাকড়ের ভোজ দিয়েছিলো, বাংলার মানুষ কেন এর উত্তর চায় না? তারা কেন গোলামআজমের অবৈধ সন্তান জিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়? মাওলানা মান্নানেরা কী সৌদি অর্থেই মন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশে তাদের মৌলবাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়নি? '৯২এর রায়ট এবং রগকাটা রাজনীতির প্রবক্তা এই মাওলানা যার আসল পরিচয় জিয়ার কাছে। জিয়ার ধর্মমন্ত্রী '৭১এর নরপিশাচ মাওলানা মান্নানের সঙ্গে সৌদি কানেকশন কি বাংলার মানুষ জানে না? এই নরপিশাচকে মন্ত্রী বানানোর সঙ্গে সৌদির উদ্দেশ্য কি জড়িত নয়? তাদের উস্কানি ও অর্থেই কি দেশে আজ এতো জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদের উত্থান হয়নি? জিয়া কি '৭১ থেকেই সৌদি চক্রের রিক্রুট নয় যে নাকি ক্ষমতার দূরন্ত লোভে, সৌদি-পাকিস্তান-চীন এবং আমেরিকা, সকলের '৭১এর ব্যর্থতার পর তাদের পরিকল্পনা এক এক করে সাধন করেছে? '৭১এ জাতিসংঘ অধিবেশনে বাংলাদেশকে নিয়ে চীন, আমেরিকা, পাকিস্তান এবং সৌদির বিরোধিতা কি সকলের অজানা? জিয়া কি '৭১এর সেই অসমাপ্ত যুদ্ধকেই '৭৫ থেকে সমাপ্তির পথে এগোয়নি সৌদি এবং পাকিস্তান কি বাংলাদেশকে ১৬ই আগস্টে স্বীকৃতি দেয়নি? পাকিস্তান কি ২২শে ফেব্রুয়ারির পর ১৬ই আগস্টে ২য় বার স্বীকৃতি দেয়নি? চীন কি ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি? এদের স্বীকৃতি দানের তারিখের সঙ্গে জিয়ার সংবিধান সংশোধন এবং শাহ আজিজের প্রধানমন্ত্রী করাসহ গোলাম আজমকে বাংলাদেশের ভিসা দানের সম্পর্ক। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫এ গেজেট জারি মাধ্যমে সব যুদ্ধাপরাধীদেরকে মুক্তি, যাদের ২২০০ মামলা বিচারাধীন, ৭৫২ জন জেলখাটা, ১১০০০ অপেক্ষারত! পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলো সম্পদ ভাগবাটোয়ারা হবে ১৫ই আগস্টের পর। এই দিনটি খুব লক্ষণীয়। জিয়া জানতো এর মানে। খুনি ফারুক-রশিদ-পাশা-নূর-ডালিম... জানতো। এদের বিবিসির ইন্টারভিউতে সেই তথ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। '৭৩ থেকেই তারা জিয়ার সাথে

মিলিত হচ্ছিল। রশিদ-ফারুক, এই দুই বঙ্গবন্ধু খুনি পাকিস্তান থেকে ফিরেছিলো যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে। এরাই সেইসব চেঙ্গিস খান, লম্পট এরশাদের মতো প্রো-পাকিস্তানি যারা '৭১ থেকেই জোট বেধে দেশদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, পৃঃ ২০-২১, ১০২-১০৫, জিয়ার সঙ্গে খুনিদের যোগাযোগ।] দ্রঃ লেঃ কর্নেল ফারুক রহমানের জবানবন্দী, বাঙালির কলঙ্ক মোচন।] বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর দিন তার বাসার ফোন থেকে উর্দু আলাপ আলোোকসের আলামত? সেদিন ভোরে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও উর্দুগান কিসের আলামত? সমস্ত সেনাবাহিনীর নীরবতা কিসের আলামত? খুনিদেরকে অস্ত্রদান? গ্রেফতার না করা? ৪৬ ব্রিগেডে শেখ হত্যার পার্টি? জিয়া সেনাবাহিনীকে সর্বনাশের টেবলেট খাইয়েছিলো।

১৫১. প্রজন্ম জানতে চায়, নিজামী ও আল-মুজাহিদী কি করে মন্ত্রী হয়? [দ্রঃ '৭১এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বইটিতে খুনি মন্ত্রীদের ছবি।] হলোকস্টসহ ১০টি গণহত্যা যাদের পাঠ্য। তাদের পাঠ্যসূচিতে '৭১ অনুপস্থিত। বিশ্বের ২য় বৃহত্তম গণহত্যা '৭১ সম্পর্কে জানতে চাইলে জবাব নেই। একজন হলোকস্ট বিশেষজ্ঞ মি. জন হোস্ট, প্রশ্ন করলে, আমি সব সত্য কথা তাকে জানালাম। তার উত্তর ছিলো, "অসম্ভব! তুমি কি তামাশা করছো?" যা বিশ্বের কাছে অসম্ভব, জিয়া সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছিলো। এই গ্লানি এবং এই লজ্জা কি আমাদের জাতীয় অপমান থেকে মুক্ত হবে? আসুন আমরা লজ্জা ও গ্লানির জাতীয় পতাকা উড়িয়ে গোলাম আজম, নিজামী এবং আব্বাস আলী খানকে ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা বুদ্ধিজীবী পরিবারকে কালো পতাকা দেখাই। আসুন আমরা, গোলামকে বলি, বীরশ্রেষ্ঠ। জিয়া যদি আর কিছুদিন বেঁচে থাকতো, গোলাম হতো বীরশ্রেষ্ঠ। হ্যালো! খালেদা তাকে বাংলাদেশী বানিয়ে রাষ্ট্রকে করেছে মুক্তিযুদ্ধের খুনি। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুকে কালো পতাকা দেখাই। আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশকে গুলি করে হত্যা করি! আসুন পতাকা পুড়িয়ে দেই।

১৫২. জিয়া গোলামের অবৈধ সন্তান। অবৈধ পিতার প্রতি '৭৫ আর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে '৭১এর প্রতিশোধমূলক পিতৃস্নেহ। যুদ্ধাপরাধের অবৈধ বীর্য দিয়ে গোলামদের রাজাকার ও মৌলবাদের চাষাবাদ, যার ফল বাংলাদেশ। জিয়া, বাংলার বীরদেরকে অবিশ্বাস্য অপমানে ভরে দিয়েছে। জিয়া পতাকার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার খুনি। বাংলাদেশে বসে ইয়াহিয়ার অবৈধ অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করেছিলো। ভুট্টোর বন্ধুত্ব আদায় করেছিলো।

১৫৩. একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো মুক্তিযুদ্ধের ধর্ষিতাদের শ্লীলতায় ২য় বার ধর্ষণ করবে না। ক্ষমতার স্বার্থে ধর্ষকদের আইন বদলাবে না। হাজার হাজার ধর্ষিতা বিধবাদের বুকের আগুন জাগিয়ে তুলবে না। ধর্ষক এবং খুনিদের জন্য বধ্যভূমিকে জাতীয় টয়লেট বানাবে না। কোন যোগ্যতায় জিয়া '৭১এর মেজর থেকে ৮ বছরে এতো কিছু? চলুন জিয়াকে ঘোষণা করি, শেখ মুজিব!

১৫৪. জিয়াউর রহমান ৬ বছর থেকে ভারতে, ১২ বছর থেকে পাকিস্তানে। ১৭ বছর বয়সে মেট্রিকের পর থেকে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে। ১৯৬৯তে সে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে যোগদান। '৬৫তে পাক-ভারত যুদ্ধে তার ভারতের বিরুদ্ধে বীরত্বের জন্য "আলফা কোম্পানি" বীরপদক। '৬৫তে তাকে সামরিক একাডেমির শিক্ষক পদে নিয়োগ। জিয়া, '৬৯ তে হঠাৎ দেশে আসে। এসেই জার্মানীতে ট্রেনিং-এর নামে ৪ মাসের জন্য উধাও। এরপরেই ফিরে এসে '৭০এ চট্টগ্রামে পোস্টিং। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির। অস্ত্রের জাহাজ আসছে চট্টগ্রামে। সৈন্য আসছে, হাজারে হাজার। মাল্টা এবং কমলা নামে অস্ত্র আমদানীর শুরুতে '৭০এ চট্টগ্রামে জিয়ার পোস্টিং এক অদ্ভুত বিষয়। '৭০এ জিয়া ৮ম বেঙ্গলের ২য় কমান্ড হিসেবে সৈন্যদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়, পাকিস্তানের খেমকারানে যুদ্ধের মিথ্যা অজুহাতে। সেখানেই তার কমান্ডিং অফিসার জানজুয়ার নির্দেশে সে কাজ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে গোপন অবস্থান লালন করে যার কিছু উপমা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সরাসরি পাওয়া যাবে। চট্টগ্রাম শহর যখন ২৩ তারিখ থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে বন্ধ, ২৪ শে মার্চ রাতে নব্য মীরকাশিম চরিত্রের জিয়ার নিষ্ক্রিয় থাকার পরিকল্পনার কিছু তথ্য লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্পষ্ট, ২৫ তারিখে যখন চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে গণহত্যা চলছিলো, ঠিক তখন, অর্থাৎ রাত ১১টায় জিয়া, ২৫শে মার্চের রাতে যখন সারা বাংলাদেশে যুদ্ধের মাতম, চলছে অপারেশন সার্চলাইট, দুই পাকিস্তানিকে সঙ্গে করে আমাদের জিয়াভাই চলেছেন সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের পরিকল্পনায়। এরপর ২৭শে মার্চ রাতে নিজেকে 'প্রেসিডেন্ট' বলে আখ্যা দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্তি করার ষড়যন্ত্র। হ্যালো! সোয়াত জাহাজে জিয়ার রহস্য ভূমিকা– সত্য। [দ্রঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, ভূমিকা এবং গোপন সাংকেতিক বার্তা, পৃঃ ১০৪-১০৯। জিয়া, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত এবং সেনাকোড মেনে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রামে কাজ করে যাচ্ছিলো, '৭১এর বিরুদ্ধে। হাতেনাতে ধরা পরতেই বিদ্রোহের নামে কিছু খুন। এরপর '৭১-৮১ একের পর এক বিস্ময়। জিয়াবাদীরা বলে, ২৫শে মার্চ তার সেনাকোড মানার কথা। প্রশ্ন, ১৫ই আগস্টে তার সেনাকোড কোথায়?

১৫৫. জিয়াউর রহমান বাংলা বলতে পারতো না। মনেপ্রণে পাকিস্তানি, বাংলাদেশ চেনে না, ৬ বছর বয়স থেকে দেশ যার অপরিচিত, বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রতিটি কোষে... এই জিয়া কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? বিশেষ করে যখন সে আইএসআই-এর ধূর্ত গোয়েন্দা? জন্মভূমির প্রেম জিয়ার মধ্যে, এমন বাক্যোচ্চারণ কার সাহস? জিয়া কখন এবং কিভাবে বাংলাদেশী? জন্মই কি সব? তার কর্মকা কি বলে? এবং এমন এক সময়ে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন যখন, '৬৯এর গণঅভ্যুত্থান তুঙ্গে। '৬৯ থেকেই চট্টগ্রামে পাক-বাহিনীর কর্মতৎপরতা এবং '৭০এ জিয়াকে চট্টগ্রামে প্রেরণ যখন বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজ, আসা-যাওয়া করে– কমলার নামে

কামান নিয়ে। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাস ঘটনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে জিয়া আইএসআই। সুতরাং আমাদের দাবী, ইতিহাস শুদ্ধ করতে, হলোকস্ট থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে বাংলার মাটিতে জিয়ার অপরাধের সর্বোচ্চ বিচার হবে। ইতিহাস তাকে যুদ্ধবিরোধী বা ষড়যন্ত্রকারীর আখ্যা দেবে । প্রজন্ম সত্য জানুক। জিয়াউর রহমানের নাম থেকে 'বীরউত্তম' প্রত্যাখান করা হোক। তার নামে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিমানবন্দরসহ জিয়াউদ্যান এবং ক্যান্টমেন্টের বাস-ভবন... জিয়া মুক্ত করা হোক। তার নামে যা কিছু আছে, সবকিছু থেকে তার নাম তুলে নেয়া হোক। খোন্দকার মোস্তাকের মতো তাকেও বিশ্বাসঘাতকদের এক সারিতে ঘৃণার শব্দোচ্চারণে দাঁড় করানো হোক। তার নাম থেকে সকল সড়ক-বন্দর এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে জাতিকে জাতীয় কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেয়া হোক। তার বীরউত্তম প্রত্যাখ্যান করতে রাজাকার মন্ত্রীসভার উদাহরণসহ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের উদাহরণ ব্যবহার করা হোক (পৃঃ ৫৬৭ ও ৬৩৭)। আজ ওসামা বিন লাদেনকে যদি আমেরিকার নাগরিকত্ব দান করে এদেশে ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে ঢোকার অনুমতি দানসহ তার সকল টেরোরিস্ট কমকান্ডকে বৈধ করা হয়, যদি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আমেরিকাতে জেহাদী কার্যক্রমকে বৈধ করে, যদি গোয়েবলসকে জার্মানীর বীরউত্তম বলা হয়, যদি খুনি বোরম্যানকে গণহত্যাকারীর বদলে জার্মানীতে রাজবন্দী বলে মন্ত্রীর মর্যাদা দান করা হয়, মীরজাফরকে যদি সূর্যসন্তান বলে আখ্যা দেয় হয়...! আসুন আমরা মোশতাক এবং খুনি ফারুককে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধী দান করি। [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া, পৃঃ ৩১২-৩১৬]। জিয়া একা এদেশ স্বাধীন করেছিলো। কেন নয়? হ্যালো! [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে সংস্করণ ২০০৪, খালেদা ইঞ্জিনিয়ার ও তার পা চাটা গবেষক।] আসুন জিয়াকে আমরা পাকিস্তানে তার পারিবারিক গোরস্তানে পাঠিয়ে দেই, যেখানে তার মা-বাবা...।

১৫৬. যে লোক নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবী করে, তার প্রতিটি কাজেকর্মে কেন প্রো-পাকিস্তানির গন্ধ? '৭১এর আলবদর, শান্তিবাহিনী এবং রাজাকারদের সংবাদ তো মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৮ম খ ে র ২৮৬, ৪২৭, ৬৬৭ পৃষ্ঠায় যাদের পাকিস্তানবাদী আন্দোলনের সংবাদ '৭১এর সব পত্রিকা জুড়ে! তাহলে সেই বাহিনীর লোকেদের কেন বৈধ করা? জিয়া, কি বুঝাতে চায়? ইহুদি হলোকস্টের খুনিদেরকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করলে ইউরোপের মানচিত্র কেমন হতো? জিয়া, বাংলা হলাকস্টের খুনিদের বিচার অবরুদ্ধ করে, তাদের ক্ষমা করে কি প্রমাণ করেনি যে, সে হিটলারের চেয়ে জঘন্য? জিয়া, '৭১ এর হলোকস্টকে বৈধ করে নিজস্ব গণহত্যায় সম্মতি দিয়েছে। গণহত্যাকারীদেরকে বীরের সম্মানে মুক্তি দিয়েছে। একথা কি আমরা হলাকস্টের বেলায় বলতে পারি? জিয়া সস্ত্রশবাহিনীতে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিলো। জিয়া আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হতো। পুরোপুরি ইসলামী প্রজাতন্ত্র

কায়েম হতো। '৭১ এর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম ৪র্থ খ]। জিয়ার কর্মে প্রশান্ত গোলাম আজম। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম।] '৭২এর সংবিধানের বিরুদ্ধে বাদশা ফয়সালের তীব্র ক্ষোভ। কোন বীরউত্তম অন্য বীরউত্তমের মাংস মর্গে পচিয়ে পোকামাকড়কে খাওয়ায়? আর কোন বীরউত্তম, অন্য বীরউত্তমকে ফাঁসি দিয়ে তার লাশ গোপনে পাচার করে নিশ্চিত করে তার নিরঙ্কুশ দানব ক্ষমতা? বলতে দিন বাধা দেবেন না। শুনবো না। আসুন আমরা বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়ে ফেলি।

১৫৭. যেজন্য জিয়া কক্ষণো বীরউত্তম হতে পারে না। জিয়া, গেজেটের পর গেজেট ছেপেছে, দেশদ্রোহীদেরকে বৈধ করতে। বাংলাদেশের অন্ধকার অশিক্ষিত মানুষেরা ধর্মভীরু। তারা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মৌলবাদ দুইখানেই ধর্মের গন্ধ পায়, যেজন্য তারা একবার বঙ্গবন্ধু আরেকবার জিয়াকে হিরো বানায়, কারণ অধিকাংশই বিবেকহীন, শতকার ৯৫% গরীব এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিহীন, এদেরকে দিয়ে যা কিছু করানো সম্ভব। মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মৌলবাদ। জিয়া দুই সিফিলিসেই আক্রান্ত এক ষড়যন্ত্রবাদী, পরবর্তীতে সে পুরো দেশকেই আক্রান্ত করেছিলো তার নিজের সিফিলিস দিয়ে। ফলে "জিয়াসিফিলিটিক" নাৎসীদের যদি খুঁজে খুঁজে বিচার করা হয়, তাহলে জাতি আরেকবার ইয়াহিয়া মুক্ত হবে। [দ্রঃ ন্যুরেনবার্গ ট্রায়াল। যার আংশিক আমার সংগ্রহে আছে।] এই জিয়া জানোয়ারকে ধরিয়ে দিন।

১৫৮. ইউরোপ যদি বন্দী নাৎসীদের বিচার না করে উল্টো জিয়ার মতো রাজবন্দী ঘোষণা করে তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে যদি নাৎসীদেরকে রাজনীতির সুযোগ দেয়, ইংল্যান্ড যদি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সমর্থন করে এবং পরবর্তীতে তাকে ৫ম সংশোধনীতে পরিণত করে সকল জার্মান নাৎসীদের জন্য নাগরিকত্বের সকল সুবিধা প্রদানসহ, গোয়েবলস, বোরম্যান, হিটলার, আইভান... সব গণহত্যাকারীদেরকে নির্দোশ বলে ঘোষণা দেয়...। মিত্রবাহিনীর সৈন্যদেরকে নানান অজুহাতে ফাঁসি দিতে শুরু করে, কিংবা গোয়েবলসকে করে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী...। হিটলারকে বানানো হয় জার্মানীর চ্যান্সেলর...। '৭১এ গ্রেফতারকৃত আব্দুল আলীম ও এ.কে খোন্দকারের মতো বাংলার নাৎসীদেরকে মন্ত্রীত্বদানসহ সকল অপরাধের জন্য জিয়াকে জাতির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, তাকে বীরউত্তম বলা আর সব বধ্যভূমির মুখে লাথি মারা সমান। আসুন আমরা হোয়াইট হাউজে নাৎসী পার্টিকে এনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি। জিয়ার ব্যাপারটাও ঠিক তাই, রাষ্ট্রদ্রোহী গোলাম আজমের পাকিস্তানি পাসপোর্টকে বাংলার মাটিতে স্বাগত জানিয়ে তাকে স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনা, অপরদিকে বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যার তদন্তের দু'টি কমিশনকে তদন্তকার্য চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা... খালেদার শহীদজননী পেটোয়াবাহিনী এবং শহীদ জননীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি, নির্যাতন এবং শহীদ জননীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহীতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মহিলা

হিটলার খালেদা...। আসুন আমরা বাংলাদেশকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে গোলামকে বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করি! জিয়া, খালেদা, হাজারো বধ্যভূমির হায়েনা। জিয়া একাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তাহের-খালেদ-হুদা-হায়দার... এরা সব খুনি। আসুন আমরা বাকী সব সেক্টর কমান্ডারদেরকেও ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে, জিয়ার স্বপ্ন পূরণ করি।

১৫৯. তার নিজের জন্য ৫ম সংশোধনী অনিবার্য। ছিলো বেগম জিয়ার জন্য। ইতিহাস বিনাশ ও বিকৃতিকারী এবং ইতিহাস ধ্বংসের ইঞ্জিনিয়ার এবং গবেষক খালেদা জিয়া। [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, ২০০৪ সংস্করণ]। তার হাওয়াভবন, '৭১এর বিরুদ্ধে গবেষণাগার। তার হাওয়াভবন, পাকিস্তানের লুটপাট গোডাউন। তারা কখনো বাংলাদেশ বিশ্বাস করতো না।

১৬০. জার্মানরা কি হিটলারের নামে তাদের বিমানবন্দর বানাবে? সবুর খান, সাকা চৌধুরী, মাওলানা মান্নান ও এ.কে খন্দকারের সঙ্গে জিয়ার হাড়গোড় তুলে পাকিস্তানে পাঠিয়ে জাতীয় মাটিকে মুক্তি দেয়া হোক। আমি হলাকষ্টের সকল নির্দশন থেকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই বাংলাদেশে যা ঘটেছে বাংলা নাৎসীদের পুনর্বাসন সেজন্য এককভাবে দায়ী জিয়া। তাকে দ্রুত অমুক্তিযোদ্ধা বলে ঘোষণা করা হোক। আমি সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হ্যালো! জিয়া, আপনাদের বীরউত্তম, বীরবিক্রমদেরকে খুন করেছে। করেনি? জিয়া আমাদের শহীদ জননীকে পিটিয়েছে। পেটায়নি? কোকেইন ও হেরোইন জিয়া আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রতারণা করছে। করেনি? তারা কি বধ্যভূমিগুলোকে টয়লেট বানায়নি? জিয়া কি '৭৭এর বধ্যভূমির কারিগর নয়?

১৬১. জিয়ার নামে বিমানবন্দর মানেই হিটলারের নামে বিমানবন্দর। বাংলার পাকিস্তান-পিপলস-পার্টিবিএনপি। ইয়াহিয়ার পাকবাহিনী কি জিয়ার চেয়ে বেশি খুন করেছিলো? জিয়া পুরো জাতিকে খুন করে, পতাকার ফাঁসি দিয়েছে ৩১/১২/৭৫এ। খালেদা গডমাদার দিয়েছে '৯১তে, দিয়েছে ১৩/১০/০১ সনে।

১৬২. জিয়ার আমলে তৈরি মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম খণ্ডের অনেক জায়গাতে বাংলা নাৎসীদের সংবাদ সে নিজেই ছেপেছে। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৮৪ পৃঃ খুব স্পষ্ট করে লেখা যা তার সকল কর্মকা র বিপরীত। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৮ম খণ্ড জিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ৫৭৬নং পৃষ্ঠায় সা.কা চৌধুরীর নাম বিকৃত করে লিখেছে জনৈক সালাউদ্দিন, যার মূল কপি ছেপেছে '৭২এর বিচিত্রা, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী যে নাকি কুণ্ডেশ্বরীর মালিক বাবু নবীনচন্দ্রকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক তিন রাউন্ড গুলি করে হত্যা করেছিলো, এই সা.কা চৌধুরী খালেদা জিয়ার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা? এইসব যুদ্ধাপরাধ সত্ত্বেও জিয়াউর রহমানেরা কি লুকোতে চায়? বাংলার মানুষগুলো কি সব বোকা? নাকি তারা প্রয়োজনে একবার মুক্তিযোদ্ধা আরেকবার মৌলবাদী? বাংলার মানুষ কি না পারে? বাংলার মানুষ সব পারে, এরা সবাই জিয়াসিফিলিসে আক্রান্ত। বিএনপিসিফিলিস-এর মধ্যে রয়েছে সকল দলছুট, যুদ্ধাপর-

াধী এবং সন্ত্রাসী। আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধকে ব্যালেন্স করি। জিয়া এবং মুক্তিযুদ্ধকে দুই পাল্লায় তুলে ব্যালেন্স করি। আসুন আমরা নাৎসীবাদ ও জিয়াবাদকে ব্যালেন্স করি। আসুন আমরা সকল তথ্য প্রমাণকে আবর্জনায় ফেলে দিয়ে একসঙ্গে নাৎসীবাদ এবং জিয়াবাদের জয়গান করি। আসুন আমরা বাংলাভাই এবং খালেদা জিয়াকে ব্যালেন্স করি। দেশ আজ "জিয়াসিফিলিটিক" জ্বরে, কাঁপছে। জয়– জিয়াগোলামআজমবাদী দল।

১৬৩. উক্ত দলিলপত্রের ৩৮৪-৩৯০ পৃষ্ঠা, জিয়ার নিজের আমলেরই একটি সংস্করণ। শুধু একজন পাক-দালালই এর পরিপন্থী কাজগুলো করতে পারে। দালালদের সংবাদ বিকৃত করে ৮ম খ ে র ৫৭৬ পৃষ্ঠায় জিয়া প্রমাণ করেছে সে কোন মুক্তিযোদ্ধা নয়। জিয়া দুটোই করেছে যুদ্ধাপরাধ এবং মুক্তিযুদ্ধের নামে প্রতারণা। জিয়া প্রয়োজন বুঝে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মিশে দিয়ে তার মোশতাকী কনফেডারেশনকে ঢুকিয়ে দিতে। যার প্রমাণ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। জিয়া একজন সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা। দ্রঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের ভুমিকা।] জিয়া সেদিন চট্টগ্রামে বিদ্রোহের ছল না করলে, মুক্তি সৈন্যরা তাকে তখনই গুলি করে হত্যা করতো বলে প্রমাণ রয়েছে, "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" বইটিতে। জিয়া, মুক্তিযোদ্ধার চাতুরি করে, ক্ষমতা নিতে তৎপর। মোস্তাকের মতোই সে একজন, কনফেডারেটর। আসুন আমরা এক্টিভিজম প্র্যাকটিস করি। জোরছে বলুন! '৭১এর ৯ মাস খালেদা তুই কোথায় ছিলি?

১৬৪. জিয়াউর রহমান প্রমাণ করেছে পলপট সে, দেশদ্রোহী এবং গোলামের গোলাপবালা খালেদা জিয়া বাংলার একমাত্র, আইকম্যান। খালেদা জিয়া, গোলামকে নাগরিকত্ব দান করে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর হুলিয়া জারি করে শহীদ মায়ের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর মামলা করেছিলো। আমার প্রশ্ন, জার্মানরা এর কি জবাব দিতো? গোলামকে রক্ষা করতে, শহীদ জননীর গায়ে হাত! হ্যালো! হ্যালো! খালেদা জিয়া, জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদকে গেটপাস দিয়ে সারা দেশ জুড়ে নাশকতা করে, হত্যা করেছে, যারা তার নাশকতায় চ্যালেঞ্জ করতে পারে। খালেদা জিয়া একজন নাকশতাবাদী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী। অবিলম্বে তার উপযুক্ত বিচার হোক। বাংলাভাইয়ের বদলে তার ফাঁসি আগে হওয়া উচিত ছিলো। তার চেয়ে বড়ো জাতীয় বেঈমান এবং রাষ্ট্রদ্রোহী কেউ নেই। সে শহীদজননীর গায়ে হাত তুলেছিলো। সেনাপ্রধানের কাছে জিজ্ঞাসা, এই যে হাজার হাজার প্রমাণ আমি দিলাম, এর কি কোন মানে নেই? যদি নাই-ই থাকে, তাহলে বাকী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ফাঁসি দিতে এতো দেরী কেন? হ্যালো! আসুন আমরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করি।

১৬৫. আজীবন ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা খালেদা এবং তার স্বামী, বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে নির্মূল করতে সব রকম প্রচেষ্টাই চালিয়েছিলো, যার প্রমাণ আমার বাড়ির চারপাশে। তাদের দলের অত্যাচারে, বাংলাদেশ আজ প্রায় হিন্দুবিহীন। বাংলাদেশের দ্বিগুণ মুসলমান ভারতে, কিন্তু তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা বহাল। জিয়ার চেয়ে খালেদা

জিয়া আরো বেশি হিন্দুবিহীন বাংলাদেশের নজির রেখেছে। খালেদা জিয়া হিন্দু খেদাও আন্দোলনের পুরোধা। সে পাইকারী হারে হিন্দু বিতাড়ন করে দৃষ্টান্ত রেখেছে। ভোটের সময় রগকাটা, জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষন-খুন, সব করেছে। জিয়া পরিবার, আজীবন ক্যান্টমেন্টের নিরাপত্তায়, অমানুষ চরিত্রের সব চতুষ্পদী মাংসভুখ– প্রাণী। আসুন আমরা সবাই নামাজ পড়ি। কোরবানী দেই। হিন্দু? কিসের হিন্দু? আসুন আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এখন থেকে গরু জবাই দিয়ে প্রমাণ করে দেই, এদেশের সংবিধান কতোবড় মুসলমান। আসুন সব হিন্দুদের লিঙ্গগুলো '৭১এর মতো কর্তন করে প্রমাণ করি আমরা পাকিস্তানি এবং মৌলবাদী।

১৬৬. বিশ্বের ২য় বৃহত্তম গণহত্যাকে অস্বীকার করতেই জিয়া, গোলাম আজমের মতো গোয়েবলস চরিত্রকে বাংলার মাটিতে প্রবেশের ভিসা দিয়ে '৭৭এর ১১ই জুলাইতে প্রমাণ করেছিলো তার মওদুদী চরিত্র। জিয়া, '৭৭এর হ্যাঁ-না ভোট করে বিশ্বকে হাসিয়েছিলো। '৭৭এ সে আমার মৃত আত্মীয়-স্বজনের ভোট দিয়েছিলো। আমার বাবা মায়ের ভোটও তারা নিজেরাই দিয়েছিলো। আমি তখন সঙ্গে ছিলাম। আসুন আমরা মহাত্মা গান্ধীকে ফাঁসি দিয়ে নেহেরুর ক্ষমতা দখলের একটি সিনেমা তৈরি করি। আসুন আমরা দেশের ১নং ঘাতকদালাল জিয়ার মুখোশ খুলি।

১৬৭. জিয়া একজন মৌলবাদী এবং হিন্দু নিধনকারী দলের প্রতিষ্ঠাতা। আমাকে বলতে দিন। বাধা দেবেন না। আজ আমি বলতেই এসেছি। সৌদি আরব ১৫ই আগস্ট নিশ্চিত করেই, ১৬ই আগস্ট স্বীকৃতি দিলো। হ্যালো!

১৬৮. জিয়া– আইয়ুবের চেয়ে দীর্ঘ মিলিটারি শাসনে দেশকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো। '৭১এর যুদ্ধকে নস্যাৎ করে দেশে ফের '৭১ পূর্ববর্তী পাকিস্তান ফিরিয়ে এনেছিলো। পতাকা? কিসের পতাকা? যে পতাকা নিজামীর গাড়িতে সেই পাতাকা? মারহাবা! মারহ-াবা! মারহাবা!

১৬৯. জিয়া আমার শহরের বধ্যভূমির বুকে লাথি মেরে কামরুজ্জামানদেরকে বৈধ করেছিলো। '৭১এ আমাদের বাড়িটি ছিলো কামরুজ্জামানের আলবদর হেড কোয়ার্টার। আমাদের বাসায় আলবদরদের ব্যবহৃত মৃত্যুকূপটি এখনো কথা বলে। হিটলারের মৃতুকূপের কথা জগৎ জানে, আমাদের বাসার মৃত্যুকূপটির কথা কেন কেউ জানলো না। কেন? জিয়া পাকিস্তানের কলঙ্ক লুকোতে বিশ্বের কাছে বিশ্বের ২য় বৃহতম গণহত্যাকে ২য় বার হত্যা করেছে। বেগম জিয়া ধূর্ত এবং অশিক্ষিত, খালেদা, যার তুলনা সে নিজেই। জঘন্য, অসত্য, অশালীন, স্বৈরাচার, লোলিটা, অসামাজিক! সে নিজামীর গাড়িতে বাংলার পতাকা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে অবৈধ কুকুর বলে জনতার আদালতে গেজেট জারি করেছে। শহীদ জননীকে পিটিয়ে '৭১এর প্রতিশোধ নিয়েছে।

১৭০. ২য় প্রজন্ম বাংলা হলাকস্টের কোন ইতিহাস রিসার্চ করবে? ভুল ইতিহাস নাকি শুদ্ধ ইতিহাস? হলোকস্টের বেলায় কি আমরা একথা বলতে পারি? অন্যান্য বীরবিক্রম, বীরউত্তম বা বিদেশী মাংসভোজী সাংবাদিকদের লেখা বইগুলো কি সব মিথ্যা? জিয়া ও খালেদা কি শুধু একাই সত্যবাদী? নাকি তারা দুই চতুষ্পদী যারা বীরউত্তম এবং বীরবিক্রমের মাংস মর্গে রেখে পোকামাকড় দিয়ে খাওয়ায়। হ্যালো! যারা বীরউত্তমের মাংস প্রদর্শনের জন্য ক্যান্টমেন্টকে বেছে নেয়। এই ক্যান্টনমেন্ট কি রাওয়ালপিন্ডির বেতনে চলে? আমাকে বলতে দিন।

১৭১. আইএসআই বেগম জিয়া, একাত্তরে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলো একথা সর্বজনবিদিত। ভয়ে সবার মুখে কলুপ। বেগম জিয়া, শহীদ জননী জাহানার ইমামের গণতদন্ত কমিশনের ২৪ জনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছিলো। বিবেক কি বলবে? এক যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ জননীকে গ্রেফতারী পরোয়ানা? খালেদা কি বাংলাদেশী? নাকি পাকিস্তানি? হ্যালো! আজ আমি সত্য বলতে প্রস্তুত। জিয়া মানুষ হত্যা করেছে, আসুন আমরা বীরউত্তম, বীরবিক্রম এবং সৈন্যখেকো বাঘ হত্যা করি। আসুন আমরা পশু জিয়াকে হত্যা করি। কারণ সে, '৭১এর চেয়ে বেশি গণহত্যা করেছে। সে পুরো '৭২কে হত্যা করেছে যার প্রমাণ, ৩১/১২/৭৫ এবং ১৩/১০/২০০১। আসুন আমরা বেগম জিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করি। ৯ মাস সে কি করলো?

১৭২. জিয়ার অপরাধের তালিকা তৈরি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ইতিহাসবিদ বা গবেষকদের কাজ। কারণ এই তালিকা ইয়াহিয়া, ভুট্টো, আইয়ুব, হিটলার, বোরম্যান মীরজাফর, মীরকাশিম চরিত্রগুলোকে সুপারসিড করে। এতো জ্ঞান আমার নেই। আমি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রতিবাদী। যে অপরাধ ইয়াহিয়া, ভুট্টোও করেনি। ৫ম সংশোধনীর অপরাধ। বঙ্গবন্ধু হত্যা। সাড়ে তিন বছরের স্বাধীন দেশটিকে পুনরায় সামরিক শাসন, হত্যা, ষড়যন্ত্র, লুটপাট এবং ধর্মীয় রাজনীতির কারাবাসে একে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার জন্য সৌদির সঙ্গে হ্যান্ডশেক। তল্পিতল্পাসহ গোলামকে দেশে ঢুকিয়ে, গোয়েবলসকে অভিনন্দন, ঘাতক দালালের তালিকাভুক্ত শাহ আজিজকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী করে বোরম্যানকে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী করার মতো অবিশ্বাস্য কাজ... জিয়ার এসকল দুঃসাহস এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অস্বীকার, ইস্রায়েল যদি সত্যিসত্যিই বোরম্যানকে বৈধ করে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী করে...। মার্কিন শাসনতন্ত্রে ঝড় উঠবে। বৃটেনের হাউজ অব কমন্সে ভূমিকম্প হবে। সারা ইউরোপ জুড়ে সুনামির মতো ঢেউ উঠবে ধ্বংসযজ্ঞের। যেকথা স্বপ্নেও কেউ চিন্তা করে না, গোয়েবলস বা বোরম্যানকে প্রধানমন্ত্রী করা, জিয়া সেটাই করে প্রমাণ করেছে, মুক্তিযোদ্ধা নয় বরং তার জন্ম, দেশের জন্য – সর্বনাশ। জিয়ার কুকীর্তি যা মীর কাশেমের হুবহু, এই বাংলায় প্রায় ৩৫০ বছর পর যার পুর্নজন্ম হয়েছিলো। জিয়া, যার অশেষ অপরাধের প্রমাণ করতে, বইয়ের পর বই লেখা

হয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি। ল্যাগেসি অব ব্লাড, তিনটি সেনা অভ্যুত্থান, '৭১এর পত্রিকার আর্কাইভ, '৭১এর ঘাতকদালাল, গণতদন্ত কমিশন, রক্তাক্ত অধ্যায় '৭৫-৮১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রাজাকার থেকে মন্ত্রী, ম্যাসাকার, বাঙালির কলঙ্কমোচন, একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর...। হিটলারের নামে ক্যাপিটাল হিল এবং জিয়ার নামে বিমানবন্দর এক। জিয়া, মুক্তিযুদ্ধ দলিলপত্র ১ম বিকৃত করেছে। আর উলঙ্গ খালেদা জিয়া, স্বাধীনতার ঘোষনায় বঙ্গবন্ধুর নাম সরিয়ে জিয়ার নাম প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টাা করেছে, দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধে দলিলপত্র ৩য় খ , ১ম পৃঃ ১৯৮৪ এবং ২০০৪ সংস্করণ। আমর প্রশ্ন, আমাদের সন্তানেরা যখন '৭১ রিসার্চ করবে তারা কোন দলিলপত্রে বিশ্বাস করবে? বাংলাদেশে আরো লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা আছে যাদের নামে কিছুই নেই। জিয়া-খালেদা ইঞ্জিনিয়ার ৩২ বছর ধরে কি করেনি? '৭১কে মুছে ফেলা থেকে বাংলার পতাকা পায়ে বেধে, গোলামকে চুমা! তাকে, পতাকা কদমবুছি। কেউ কি বলতে পারবেন, শহীদ জননী যদি দেশদ্রোহী হয়, গোলাম তাহলে কেন বীরউত্তম নয়?

১৭৩. বাঙালির জীবন কি জীবন নয়? কারণ তারা ইহুদি নয়? ইহুদি না হলে বাঙালি খুন হলে, সেই খুন কি খুন নয়? দ্বিজাতি তত্ত্বের চূড়ান্ত মাস্টার জিয়া, সংবিধান সংশোধন করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী বিভেদের জিন্নাহ সে। ৩২ বছর ধরে অভিযোগ টানতে টানতে বাংলার মানুষ আজ ক্লান্ত। '৮১তে জিয়ার মৃত্যু তার পরাশক্তিকে আরো বৃদ্ধি করেছিলো। তার স্ত্রী খালেদা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা রায়ের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল করেছিলো। তারা গোলামকে নাগরিকত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছিলো- গোলামের পায়ের তলে পতাকা। জিতে গেছে- গোলাম! মারহাবা! মারহ-াবা! মারহাবা! এলায় কেমুন বুঝতাছেন? বাংলার মানুষ, উত্তর চায়।

১৭৪. বাংলার নাৎসী হিটলার জিয়া, এবং তার বাংলা নাৎসী দল বিএনপি-কে অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করে জন্মভূমির ঋণ শোধ করতে, ৩০ লক্ষ শহীদের ঋণ শোধ করতে, আত্মীয়তাবোধের ঋণ শোধ করতে, সাড়ে তিন হাজার এবং আরো অসংখ্য বধ্যভূমির প্রতি সম্মান দেখাতে... ইহুদি গণহত্যা পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে উদাহরণ নিয়ে এই বাংলার মাটিতে খোলা হোক- 'ন্যূরেমবার্গ ট্রায়ালের' মতো ট্রায়াল'। সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া হোক এই ঐতিহাসিক বিচারের কথা। বিচার করে এদের নামগুলোকে পরিচ্ছন্ন করা হোক। বিএনপি-কে নাৎসী পার্টিরমতো নিষিদ্ধ করা হোক। জিয়াকে ঘোষণা হোক বাংলার হিটলার এবং মীরকাশিম। এবং এই দুঃসাধ্য সাধন করতেই ইহুদি হলাকস্টের সব উদাহরণ ব্যবহার করে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণ, ৩ লক্ষ নারীর ইজ্জতহরণকে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে পালনের পথ খুলে দেয়া হোক। তার অপরাধ হলোকস্টের চেয়ে বড়। সে একা, মীরকাশিম এবং হিটলারের সমান অপরাধে অপরাধী। একা সে মুক্তিযুদ্ধ এবং পতাকা দুটোকেই অবৈধ করেছে। সে মুক্তিযুদ্ধকে হত্যা করেছে।

১৭৫. যুদ্ধাপরাধী জিয়া রহমানকে নিয়ে আজ অবধি বাংলাদেশে যে সকল কর্মক হয়েছে, নানান পুস্তকে তাকে যেভাবে পোট্রেট করা হয়েছে, যেভাবে তাকে একজন মহা-মানুষ করা হয়েছে, সেই দৃষ্টান্ত আমরা একমাত্র ইসলাম ধর্মের নবীর জীবনিতেই পাই। তাকে নবীর মর্যাদা দেযা হয়েছে। তাকে নবীর চেয়ে বড়ো করা হয়েছে। নবীর বিকল্প মক্কাশরীফ গড়া হয়েছে জিয়াউদ্যানে। তাকে মক্কার বিকল্প, জিয়াউদ্যান– মক্কাশরীফের নবী করা হয়েছে। তাকে ঘিরে সাহাবীদের কথা, তার গল্প, তার জীবদ্দশা এবং আদর্শ... যেভাবে পুস্তকের পর পুস্তক লেখানো হয়েছে, সেই তুলনা একমাত্র নবীর বেলাতেই সম্ভব হয়েছে। এক জিয়াকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ পাঠ্য বইপুস্তক, ইতিহাস তার জ্যান্ত প্রমাণ। তার মানে কী আমরা বিশ্বাসঘাতক এক জিয়াউর রহমানকে নবীর সমানে তুলনা করছি? পড়ে দেখুন খালেদা আমলে লেখা, জিয়া এবং খালেদা জিয়াকে নিয়ে রচিত মহাকাব্যগ্রন্থগুলো। খালেদা জিয়া, অবৈধ নিষিদ্ধ গোলামের সব বইগুলো পুনর্মুদ্রণ করে প্রমাণ করেছে সে বৈধ গোলামআজমের অবৈধ পুত্রবধূ। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫২]। ঘুরে আসুন জিয়ামক্কাউদ্যানে। হ্যালো! দেশের সব বিচ্ছিন্নবাদীদের আড্ডাখানা ঘুরে আসুন। কারণ এখানেই শুয়ে আছে ইতিহাসের অন্যতম জার– জিয়াউর রহমান। বিএনপি'র নবীর রওজা মুবারক। তাকে ঘিরে ব্যারিস্টার সাহাবীদের জিয়াপ্রোপাগান্ডা। জিয়ার নামে বিএনপি'র হাদিস প্রকাশনা। হাদিস মন্ত্রণালয়। জিয়া কি রাসুলুল্লাহ? জিয়া কি শেষ নবীকে গোল দিয়েছে? না হলে, ঢাকার বুকে কেবলা কেন? তার জিয়াউদ্যান জাতির জীবনে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা।

১৭৬. ১১/৯এর মাত্র তিন হাজার আমেরিকান হত্যা দিবস, আমেরিকানরা ভুলে যায়নি। ১০০ বছর আগে আর্মেনিয়ায় গণহত্যা ভুলে যায়নি বিশেষজ্ঞরা। ১৫ বছর আগের রুয়ান্ডা এবং ১০ বছর আগের বসনিয়ান গণহত্যা পশ্চিমে পাঠ্য। হিরোশিমা-নাগাসাকির হত্যাযজ্ঞ চাইলেই গণহত্যাকারী আমেরিকা ঢাকা দিতে পারতো। চাইলেই আমেরিকা আফ্রিকার গণহত্যা লুকোতে পারতো, কারণ এই গণহত্যার নায়ক তারাই। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার গণহত্যা, আমেরিকাসহ সারাবিশ্বের ইতিহাসে পড়ানো হয়। চার্লস টেলর এবং ইদি আমিনের গণহত্যার বিভৎসতা নিয়ে ছবি তৈরি হয়, অস্কার পায়। শুধু বাংলাদেশের গণহত্যাই আজ আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। পশ্চিম কেন, দেশেও যে গণহত্যা পড়ানো হয় না। যা পড়ানো হয় তা, বিকৃত এবং মিথ্যা। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৮ম খণ্ডে বাবু নবীন চন্দ্র এবং ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়ার মন্ত্রীদের নাম ও ইতিহাস সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। একজন চোরের দশ বছর জেল হলে, বিচার বিভাগ কেন জিয়াউর রহমানকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেবে না? খালেদা জিয়াকেও? আমাদের দুর্ভাগ্য মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের জন্য একধরনের ব্যবসায় পরিণতি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বেচাকেনা হয় রাজনীতির মাঠে। একে বিক্রি করে কেনা হয়, রাজাকার এবং আলবদর। সৌদি আরব এবং পাকিস্তান, এর ক্রেতা। জিয়া পরিবার

বিক্রেতা। ফলে এদেশে বৈধ হয় রাজাকার আলবদর। তারা চালায় দেশ। মুক্তিযুদ্ধ কাঁদে। খালেদা জিয়া, ইতিহাসের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত, যার সূত্র জিয়া, এবং বাংলা নাৎসী পার্টি 'বিএনপি'। সত্তুরের দশকে সারা বিশ্ব যখন যুদ্ধাপবাধীদের বিচারের দাবীতে মুখর, বাংলাদেশ তখন, যুদ্ধাপরাধীদেরকে বৈধ করেছে। জিয়ার অপরাধ – বহুমুখী এবং বহুমাত্রিক। জিয়া নাহলে ১৯৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বরের গেজেট জারি হতো না। ১৩/১০/২০০১ সম্ভব হতো না। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় যাওয়া বা বিচারের দাবী, প্রশ্নই উঠতো না। জিয়া না জন্মালে, বাংলাদেশের আইন তার নিজের গতিতে চলতো। কোন সমস্যাই হতো না বলে আমার, বিশ্বাস। জিয়া মুক্তিযুদ্ধকে বিক্রি করে রাজনীতির মাঠ থেকে রাজাকার-আলবদর কিনে গঠন করেছে বিএনপি নামের বাংলা-নাৎসী-পার্টি।

১৭৭. জিয়া পরিবার দেশের সকল বধ্যভূমিগুলোকে রাজাকারদের টয়লেট বানিয়ে, ১৯৯২ সনের ২৭শে মার্চে শহীদ জননীকে দিয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহীর খেতাব। খালেদ মোশার-রফ, তাহের, হুদা ও হায়দারকে খুন করে পতাকাকে করেছে পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার বিচার বিক্রি করে, কিনে এনেছে রাজাকার। মৌলবাদীকে বিক্রি করেছে রাওয়ালপিন্ডির কাছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ পাকবাহিনী।

১৭৮. গোলামের ভিসা দিয়ে, নাগরিকত্ব দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধকে দিয়েছে সমকামীর পদক। '৭১ থেকে আইএসআই কর্মকাণ্ড দিয়ে প্রমাণ করেছে, তারা পায়েন্দাবাদ। বিএনপি আমলে, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বন্ধ করে প্রমাণ করেছে তারা '৭১এর প্রেতাত্মা। বীরউত্তমদের লাশ, পচিয়ে গলিয়ে উধাও করে দিয়ে, অপমান এবং অবমাননা করে প্রমাণ করেছে– সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমি আমাদের দেশের পাবলিক টয়লেট। পান্না কায়সারের স্বামীর খুনিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে জিয়া প্রমাণ করেছে সে একজন টিক্কা খান। বঙ্গবন্ধুর নাম দলিলপত্র থেকে মুছে ফলে বা বিকৃত করে প্রমাণ করেছ এদেশ তার বীর্যে তৈরি রাজাকারদের জন্য। এদেশের সংবিধানের খৎনা দিয়ে প্রমাণ করেছে সংবিধানটি উভয়কামী। বঙ্গবন্ধুকে খুন করে প্রমাণ করেছে এদেশ– তার। আমরা তার গোলাম। সে গোলামের অবৈধ পুত্র। জিয়া, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো গোলাম আজম। জিয়া এবং খালেদা জিয়া কেন বাংলাদেশে বিশ্বাস করতো না, যার প্রমাণ তারা রেখেছে ১৯৭১এর ২৫শে মার্চ রাতে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস বেগম জিয়া পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে থেকেছে স্বেচ্ছায়। চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব কত? সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে খালেদা জিয়ার ঢাকায় যাওয়ার কারণ কী? ক্যান্টমেন্টে জামশেদ রাজার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? জিয়াউর রহমান ২৫শে মার্চ রাতে ১ম পরিচয় দিয়েছে এই দেশকে তার অবিশ্বাসের। এবং এরপর, পুরো ১০ বছর সেই পরিচয় তারা বারবার দিয়েছে প্রতিটি কর্মকাণ্ডে। বেগম জিয়া দিয়েছে, তারচেয়ে বেশি। গোলামকে নাগরিকত্ব এবং নিজামীকে মন্ত্রী করেছে। বেগম জিয়া,সাকা চৌধুরীর মতো দুর্বৃত্তকে করেছে তার উপদেষ্টা। বেগম

জিয়া, তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করেছে এদেশে তার পাকিস্তান। এই রাজধানী তার ইসলামাবাদ। এই সেনাবাহিনী তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী–পাকবাহিনী। জিয়া বাংলাদেশে বিশ্বাস করলে, এসব কান্ড করবে কেন? এদের শনাক্ত করা কি এতোই কঠিন? বাঙালির দেশপ্রেম কোথায়? যারা মেনে নেয়নি, আইয়ুব-ইয়াহিয়া, তারাই মেনে নিয়েছে খালেদা এবং জিয়ার দেশদ্রোহ কর্মকাণ্ডের সকল অত্যাচার। আমার প্রশ্ন, এই বাংলাদেশ, কোন বাংলাদেশ?

***

দ্বিতীয় খণ্ড

সংবিধান সন্ত্রাসী জিয়া

(২৫শে মার্চ রাতে জিয়া বিদ্রোহ করেনি, আত্মরক্ষা করেছিলো)

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের প্রেক্ষিতে, কে এই জিয়া? বইয়ের লেখক, কি বলতে চাইছেন?

২৫শে মার্চ ১৯৭১এর রাতে, জিয়াউর রহমান কি সত্যি সত্যিই সোয়াত জাহাজে অস্ত্র খালাস করতে গিয়েছিলো কি-না এ নিয়ে কিছু সন্দেহ বা বিতর্ক থাকলেও, জিয়াউর রহমানের ১০ বছরের সকল কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করেছে সে ২৫শে মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে সোয়াত জাহাজে নিশ্চিত অস্ত্র খালাস করতেই গিয়েছিলো দুই পাকিস্তানী জোয়ানকে সঙ্গে করে। লেখক কি সেকথাই বলতে চেয়েছেন? সন্দেহ, জিয়া আদৌ মুক্তিযোদ্ধা, নাকি নয়? '৭২এর বিচিত্রাতে জিয়ার লেখা– "উই রিভোল্ট" লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের পরিপূর্ণ বিপরীত। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, জিয়ার "উই রিভোল্ট" মিথ্যা এবং বানোয়াট। তার প্রোপাগান্ডা বিশেষজ্ঞরা বলে, সেনাকোড মেনে সে সোয়াতে গিয়েছিলো। জিয়া বলে, তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। আমার ছোট প্রশ্ন, ১৫ই আগস্ট রাতে তার সেনাকোড কোথায় ছিলো? আরেকটি প্রশ্ন, দুইজন পাকিস্তানীকে খুন করে বিদ্রোহ করা কি ২৫শে মার্চ রাতে জিয়ার জন্য খুব কঠিন কাজ? যখন সামান্য ডক শ্রমিকরা মাল্টার বদলে মেশিনগান দেখে ২৪ তারিখে বিদ্রোহ করলো, সৈন্য হয়েও জিয়া ২৫শে মার্চ মাল্টা না মেশিনগান চিনলো না? সুতরাং সোয়াত জাহাজের সামনে দাড়ানো জিয়া, কাকে বোঝাতে চায়– বিদ্রোহ?

জিয়াউর রহমানের রক্ষকেরা, নিন্দুকের মুখে ছাইচাপা দিতে বলে, সে নাকি জানজুয়ার নির্দেশে বাধ্য হয়ে অস্ত্র খালাস করতে গিয়েছিলো। [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া, পৃঃ ২৬৭।] জানজুয়া তাকে খুনের পরিকল্পনা করেছিলো। ফলে বুঝতে পেরে সে বিদ্রোহ করেছিলো। এবং তার রক্ষকেরাও স্বীকার করেছে জিয়া সোয়াতের দিকেই গিয়েছিলো অস্ত্র খালাস করতে। কারণ সে জানজুয়ার মনোভাব জানতো না। অর্থাৎ তারা দুটো পর্বকেই স্বীকার করে মিথ্যাকে ব্যালেন্স করার অপচেষ্টা করেছে। তারা আরো বলেছে, সেনাকোডের কথা। ২৫শে মার্চ রাতে সেনাকোড? কিসের সেনাকোড? ২৩শে মার্চ হতে চট্টগ্রাম যেখানে বন্ধ। আমার কথা, জিয়া কি শিশু? নাকি মানসিক প্রতিবন্ধী? এদিকে তার সহযোদ্ধা অপরপক্ষ বলেন অন্য কথা।

রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের শুরুতে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার রোল। এবং সোয়াত জাহাজ জনিত অতীব সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত জিয়া, শুধু জাহাজেই যেতে রওনা দেয়নি দুই পাকিস্তানী জোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে, লেখককে সে কোনরকম যুদ্ধের পদক্ষেপ নিতেই বাধা দিয়েছিলো, ২৫শে মার্চের রাতে

যখন, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে চলছিলো প্রচ বাঙালি হত্যাকান্ড। জিয়াউর রহমান, সেই হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে কোনরকম পদক্ষেপই নেয়ার বিরুদ্ধে কিংবা স্বেচ্ছায় গণহত্যা ঘটতে দিয়েছিলো, যা রফিকুল ইসলামের বইতে খুব স্পষ্ট এবং সরাসরি। ২৫শে মার্চ রাতে ১ম প্রকাশ, আইএসআই চেহারা এবং পরবর্তীতে আইএসআই থিওরি।

২৪শে মার্চ রাতে, জিয়াউর রহমানের সঙ্গে রফিকুল ইসলামের যুদ্ধজনিত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিলো। কেমন করে শত্রু ঠেকাবে। উত্তরে, জিয়া বলেছিলো, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। লেখক বিদ্রোহ করেছিলেন ২৪শে মার্চ। তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু জিয়া যুদ্ধে বাধা দিয়েছিলো।

৮ম বেঙ্গল এবং ইবিআরসি মিলে মোট সৈন্য সংখ্যা ২৫০০। রফিকুল ইসলাম, যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ করে রেলওয়ে হিলের ধারে অপেক্ষা করছিলেন যোগাযোগের। এবং এই বইটিতে বলা হয়েছে– "চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কথা, ইবিআরসি এবং ৮ম বেঙ্গলের বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে লেঃ কর্নেল চৌধুরী এবং মেজর জিয়ার" (পৃ: ১০৭)। এদিকে জিয়ার "উই রিভোল্ট" প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিপরীত কথা, যে প্রতিবেদনটি এই অংশেই পর পর যোগ করা হলো, পাঠকের সুবিধার্থে।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে– "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে আমি সারসান রোডস্থ আমার বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডা. জাফর এবং কায়সারকে বলেছিলাম, ৮ম বেঙ্গলে গিয়ে বাঙালি অফিসারদের যেন আমার যুদ্ধ শুরুর সংবাদটা পৌঁছে দেন। সংবাদটি সময়মত ৮ম বেঙ্গলকে পৌঁছানো হয়েছিলো। ...রাত ১১:৪৫ মিনিটের মধ্যে সন্তোষজনক সফলতা অর্জন করে ফেলেছি। আমি ৮ম বেঙ্গল এবং ইবিআরসি'র সৈন্যদের অভিযানের খবর পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। ঐ সৈন্যরা শহরে আসার পরই আমাকে নেভাল বেইজ এবং বিমানবন্দর দখল করে ফেলতে হবে। ...এমন সময় রেলওয়ে হিলের পার্শ্ববর্তী টাইগার পাস রোড ধরে নৌবাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো খুব স্লো স্পীডে। আমার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন এসে বললো, স্যার! গাড়িতে পশ্চিমা সৈন্য আছে। উড়িয়ে দেই গাড়িটা! আমি বললাম, না এখন না।"

...পরে জানতে পারি, প্রথম গাড়িটা মেজর জিয়াকে নিয়ে বন্দরের দিকে যাচ্ছিলো। তার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টমেনেন্ট নিয়ে আসার জন্য সে চট্টগ্রাম পোর্টে যাচ্ছিলো। যখন ডা. জাফর ও কায়সারের কাছ থেকে আমার ম্যাসেজটা নিয়ে ৮ম বেঙ্গলে পৌঁচেছে, মেজর জিয়া ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন, কর্নেল জানজুয়ার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে। এবং তারপর বেরিয়ে পড়েছেন চট্টগ্রাম পোর্ট অভিমুখে। এ মেসেজ পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, মেজর জিয়াকে সর্বশেষ ঘটনা জানাতে এবং সোয়াত জাহাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে, একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে চললো মেজর জিয়ার

সন্ধানে। তখন রাত সাড়ে এগারোটা, ২৫শে মার্চ। ওদিকে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাতে ২০ বালুচের সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। মেজর জিয়া চলেছেন অবাঙালি লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশমত সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে। বাঙালি ক্যাপ্টেন খালেক, ছুটে আসছে, মেজর জিয়াকে থামাতে। ...প্রথম গাড়িটি জিয়াকে নিয়ে আগ্রাবাদ রোডের মুখে ব্যারিকেডে পড়তে বাধ্য হয়। জিয়া, তার সাথের পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে ব্যারিকেড পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছিলো ...আর এই সময়েই ক্যাপ্টেন খালেকের গাড়ি জিয়ার গাড়ির সন্ধান পায়। ...মেজর খালেক জিয়াকে এটাও বলে, এই পরিস্থিতিতে পোর্ট এলাকায় গেলে মেজর জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। ...প্রথম যে গাড়িটিকে দেখে সুবেদার আইজুদ্দিন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো সে গাড়িতে মেজর জিয়া যাচ্ছিলো সোয়াত জাহাজে।"

"...রাত ১১:৩০ মিনিটের দিকে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদের ব্যরাক থেকে বেরিয়ে এসে ইবিআরসি'র বাঙালি সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। ...সেই রাতে তারা ১০০০ এর বেশি বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করে। ...সেই রাতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছিলো বাঙালি ক্যাপ্টেন এনাম। যেসব সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদের কয়েকজন দৌড়ে চলে এসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাহায্য করার জন্য তাড়াতাড়ি ক্যান্টনমেন্টে যেতে বলে। এরপর এনাম কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে বলতে থাকে, ৮ম ইস্ট বেঙ্গলকে যদি তাদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হতো তাহলে অনেক বাঙালি সৈন্য ও তাদের পরিবার পরিজনের পক্ষে বেঁচে আসা সম্ভব হতো। যদি তারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর গুলি চালানো শুরু করতো, ...ইবিআরসি'র বাঙালি সৈন্য এবং তাদের পরিবারের লোকজন পালিয়ে আসতে পারতো।"

"এরও আগের কথা– বিগ্রেডিয়ার আনসারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ২৪শে মার্চ সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ নামানো শুরু হয়। ...চট্টগ্রামের জনগণ প্রচ বিক্ষোভে নেমে আসলো পথে, পোর্ট এলাকা থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় অসংখ্য ব্যরিকেড সৃষ্টি করলো। ...আনসারীর হুঙ্কার, যে কোন মূল্যে অস্ত্র নামাতেই হবে। ডক শ্রমিকরা একাজে আগেই অসম্মতি জানিয়েছিলো। তারা কর্মস্থল ত্যাগ করে প্রস্থান করেছিলো।"

'৭১এর ২৪শে মার্চ রাতের কথা। রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম তার লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের ৬নং চ্যাপ্টারে জানাচ্ছেন, "সামনে আগ্রাবাদ এবং পোর্ট এলাকা। তারও দূরে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপাগরে বিপুল জলরাশি। বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে আসলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান। তারা চাইলেন, আমি যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেদিন অস্ত্র পরিচালনা না করি।"

"কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও পাকিস্তানীরা আক্রমণ করার আগেই তাদের উপর আঘাত হানতে হবে। আমি যুক্তি দিয়ে দেখালাম। এবং সেটা এখনই না করলে পরে আর সে সুযোগ পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানীরা গণহত্যার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। আমরা এখনই আক্রমণ করে ওদের ধ্বংস না করলে ওরা আমাদের সবাইকে জবাই করে ফেলবে।"

মেজর জিয়া বললেন, "চিন্তা করো না, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না।"

"আমিও তাই মনে করি" – সায় দিলেন কর্নেল চৌধুরী। "তোমাদের সৈন্যদের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে তুমি এক্ষুণি থামিয়ে দাও।"

"...নিয়তির কি বিধান! মাত্র ২৪ ঘণ্টা পরেই ঘটনাবলী প্রমাণ করে দিলো, তারা দু'জনে পাকিস্তানিদের যেভাবে মূল্যায়ন করেছিলো, তা ছিলো ভুল। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার আমার কার্যক্রম স্থগিত রাখার চাপ সৃষ্টি ছিলো ঐ দু'জনের একজনের জন্য তার অজান্তেই আত্মঘাতী। অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতিকে দিতে হলো চরম মূল্য। পাকিস্তানিদের সংগঠিত গণহত্যায় নিহত হলো লক্ষ লক্ষ বাঙালি। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ এম.ভি সোয়াত নামে যে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ে, তাতে অনেক অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না করার জন্য প্রথম থেকেই শেখ মুজিব দাবী জানিয়ে আসছিলেন।" (চ্যাপ্টার ২ ও ৭)।

চ্যাপ্টার-২। "১৯৭১এর ২৪ মার্চের রাত। আমার সেই বাংলোর সামনে একটা বিরাট জামগাছের তলায় গিয়ে বসলাম। গোপন সাংকেতিক বার্তা পেয়ে বেবি ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন দু'জন বাঙালি অফিসার। একজন লেঃ কর্নেল, অন্যজন মেজর। এই মুহূর্তে তোমার এধরনের কিছু করা উচিত নয়। অত্যন্ত চাপাস্বরে লেঃ কর্নেল আমাকে জানালো।"

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস করবে না। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করবে না।"

"কিন্তু তারা বিশ্ব জনমতের ব্যাপারে কোন পরোয়াই করে না। তাছাড়া, আমরা, এমন একট পর্যায়ে পৌছেছি যে, ওদেরকে আর কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

...দেখো।" লেঃ কর্নেল আবার বললেন, ...এই মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক আলোচনা চলছে, এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল বা পরশুর মধ্যেই এব্যাপারে একটা নিস্পত্তিও হয়ে যাবে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করো না যা এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।"

"ধরুন, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল, তাহলে?"

"সেটা হবে বিদ্রোহ-বিপ্লব। ...জয়লাভ না করলে ভাগ্যে কি আছে জান?"

"কিছুটা ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে। আসি যুক্তি দেখালাম।"

"অতোখানি আশঙ্কা করার কিছু নেই, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না।" মেজর বললেন।

"...অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আবার সেই টেলিফোনে ইপিআর সৈন্যদের আমার দ্বিতীয় মেসেজটি বাতিল করার জন্য নির্দেশ দিলাম।"

"ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এদের বিশ্বাস করে আপনারা কি ভুল করছেন না? আমি আবার লেঃ কর্নেল ও মেজরকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম।"

"...আমি তাকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেন তারা জেটিতে নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করছে। কেন সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ নামাতেই হবে। আপনারা কি মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যেক রাতে বিমানে করে ওরা অন্য কিছু নয়, স্রেফ কমলা আর মাল্টা আনছে? ...তারপর এক অস্বস্তিকর পরিবেশে কাটলো কিছুটা সময়। আমি প্রায় নিশ্চিত যে,এদের সঙ্গে আলোচনা করা বৃথা। ...এ দু'জন অফিসার আমাকে সশস্ত্র যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলো।"

"চলুন আমরা যাই। আমাদের অনুপস্থিতি সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। লেঃ কর্নেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মেজর।"

"আমি শেষ প্রচেষ্টায় বললাম, আপনারা আমাদের উপর প্রথম আঘাত হানার সুযোগ করে দিচ্ছেন তাদেরকে।"

"ভাবনার কিছু নেই, ওরা এমন চরম কিছু করবে না।" বললো মেজর।

...পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা এরা করতে পারে না। আমি আমার ডাইরিতে সেই রাতে লিখলাম। এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত না হানার এই দায়িত্ব ওরা কোনদিনও এড়াতে পারবে না। ...আমার কানে তখনো বাজছে, ওদের আশ্বাসবাণী, তারা কোন চরম ব্যবস্থা নেবে না। ...নিয়তির কি বিধান! তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সে দিন '৭১এর ২৫শে মার্চের রাত। সেই দু'জন অফিসারের একজন, লেঃ কর্নেল এম.আর চৌধুরীকে বন্দী করলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী। অফিসারদ্বয়ের অন্যজন, মেজর জিয়াউর রহমান, রাত সাড়ে এগারোটায় যাচ্ছিলো চট্টগ্রাম বন্দরে 'সোয়াত জাহাজ' থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার কাজে।"

এই ছিলো, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের শুরুর কথা। এই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের অন্য মেজর জিয়া, যার খুনির মুখোশ খুলে দেয়া খুব জরুরি।

এখন প্রশ্ন, ২৫শে মার্চ রাতে মুক্তিযুদ্ধ যখন পূর্ণোদ্যমে, তখন সোয়াত জাহাজে অস্ত্র খালাসের জন্য ব্যস্ত– কে এই জিয়া?

২৪ এবং ২৫শে মার্চ রাতে যে জিয়ার পরিচয় আমরা পেলাম, সেকি মুক্তিযোদ্ধা, জিয়া? নাকি আইএসআই- জিয়া! তার যে ভয়ংকর ডায়লগ আমরা জানলাম, লেঃ কর্নেল এবং জিয়ার মুখে রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমকে যুদ্ধে যাওয়া না যাওয়ার পরামর্শ এবং পাকিস্তানীদেরকে বিশ্বাস করা। যার ফলে সেই রাতে হাজারের বেশি সেনা কর্মচারী নিহত হলো ক্যান্টমেন্টে, এবং রফিকুল ইসলামের কথায়- "আমি আমার ডাইরিতে লিখলাম, পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথমে আঘাত না হানার এই ব্যর্থতার দায়িত্ব ওরা কোনদিনও এড়াতে পারবে না। ...অফিসারদ্বয়ের অন্যজন, মেজর জিয়াউর রহমান, রাত সাড়ে এগারোটায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম পোর্টে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টমেন্টে আনার কাজে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাহায্য করার কাজে।" আমার প্রশ্ন, কে এই জিয়া?

৭নং চ্যাপ্টার। এরচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার হলো, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদেরকে জিয়ার যুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস, যা দেশদ্রোহীতার সমান। যেমন, "সুবেদার মফিজ পরে আমাকে বলেন, মেজর জিয়া আমাকে ব্রিজের ওপর নামিয়ে দিলেন। আমি তাকে বললাম, আমাকে যেন শহরে এসে আপনার সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়া হয়। কারণ, সেটাই ছিলো আমাদের উপর আপনার নির্দেশ। কিন্তু তিনি বললেন যে, শহরে আর কেউই নেই। অথচ, পরে দেখলাম যে, আপনি তখনো যুদ্ধ করছেন।"

রফিকুল ইসলাম, "তারা চাইছিলেন, আমি যেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ পরিচালনা না করি।"

রফিকুল ইসলাম কি বলতে চান? জিয়া মুক্তিযোদ্ধা নয়? সে মুক্তিযুদ্ধ বাতিল করতে চেয়েছিলো? কেন তিনি লিখলেন, "পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সময়কার কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিলো ওই দু'জনেরএকজন, যা আত্মঘাতী! অন্যদিকে সমগ্র জাতিকে দিতে হলো চরম মূল্য। পাকিস্তানিদের সংগঠিত গণহত্যায় নিহত হলো লক্ষ লক্ষ বাঙালি। এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আঘাত না হানার এই দায়িত্ব ওরা কোনদিনও এড়াতে পারবে না।" একথা বলে, কি বলতে চাইছেন রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম? জিয়া একজন আইএসআই? এবং সেই রাতে জিয়া চেয়েছিলো, পাকবাহিনীর সফল গণহত্যার পথ তৈরি করে পাকবাহিনীর জন্য ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ গণহত্যার ব্যবস্থা?

জিয়া কেন ২৫শে মার্চ রাতে এমন সব কা কারখানা করবে, যেজন্য হাজারের উর্ধ্বে বাঙালি নিধনকে প্রতিহত করা গেলো না? লেখকের বই অনুযায়ী- ২৫শে মার্চ রাতে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের তো নিরাপদ পজিশনে থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস আক্রমণ করার কথা! সোয়াত জাহাজে যাওয়া ২৫শে মার্চ রাতে জিয়ার- কিসের বিচ্যুতি?

রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম বলছেন, "এ দু'জন অফিসার আমাকে সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছিলেন। ...আমি বললাম, আপনারা আমাদের উপর প্রথম আঘাত হানার সুযোগ করে দিচ্ছেন।" মেজর জিয়া বললো, 'ওরা এমন চরম কিছু করবে না'। (চ্যাপ্টার-২)।

২৫শে মার্চ রাত ১১টায় পাকিস্তানিদের এই বিশ্বাসের অর্থ কী? যখন সমগ্র চট্টগ্রাম ২৩শে মার্চ থেকে সাট-ডাউন, যখন বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ এবং হত্যাকা শুরু হয়ে গেছে, তখন ২৪ ও ২৫শে মার্চ রাতে জিয়ার মুখ থেকে পাকিস্তানিদের প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়ার এমন তাগিদ কিসের? '৭৫এর পট পরিবর্তনের পর জাতিকে ঘোষণা দিয়ে জানানো হলো– জিয়া নাকি দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা! স্বাধীনতার ঘোষক। মুক্তিযুদ্ধের জন্য একমাত্র অনিবার্য। তাহলে, ২৫শে মার্চ রাতে তার এই যুদ্ধে না গিয়ে বাধা সৃষ্টি করা, গণহত্যার পথ করে দিতে, সোয়াত জাহাজে অস্ত্র খালাসের ফ্যাক্টস্, এসব কিসের আলামত? মুক্তিযোদ্ধা? মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা কী?

চ্যাপ্টার–৯। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গেছে। রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম জানাচ্ছেন, রণক্ষেত্রে জিয়ার অন্য যুদ্ধ। সৈন্যদেরকে বিভ্রান্ত করা। আগেও বলেছি, সুবেদার মফিজের গল্প। জিয়া তাকে মিথ্যে কথা বলে ব্রিজের উপরে নামিয়ে দিয়ে বললো, "শহরে অন্য কেউ নেই। যুদ্ধ হচ্ছে না। অথচ দেখছি আপনি তখনো যুদ্ধ করছেন।" অর্থাৎ যুদ্ধের সময় জিয়া সৈন্যগুলোকে নিয়ে কালুরঘাটে পলায়নে ব্যস্ত। এবং ফ্যাক্টস্ খুব স্পষ্ট। সে যুদ্ধ চায়নি। তার এই ঘটনা সকলেই জানে কিন্তু বলে না, এসবই মানুষের '৭৫ পরবর্তী বিচ্যুতি। জিয়ার সন্দেহজনক কর্মকান্ড, প্রথম দিন থেকেই স্পষ্ট। '৭১–'৮১। এক বিভ্রান্তিকর সোকল্ড মুক্তিযোদ্ধা!

এখন দেখা যাক এই আলোকে আরো বড়ো অপরাধ। "...শহরের উপকণ্ঠে চকবাজারের শেষ প্রান্তে দেখলাম, আমার একজন সৈন্য ফিরে আসছে।"

"কোন জাহান্নামে যাচ্ছো তুমি?" আমি তাকে শাসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তো আপনার খোঁজেই আসছি স্যার! আপনি আমাদের পাঠিয়েছেন ক্যান্টমেন্টের পেছনে গিয়ে অবস্থান নিতে। কিন্তু একজন অফিসার সৈন্যদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কালুরঘাট ব্রিজের দিকে।"

"আমি চিৎকার করলাম, কে এই অফিসার?"

...পরে জনাব হান্নান এবং ড. জাফরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পাই, আমার এই সৈন্যদেরকে মেজর জিয়া কালুরঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করলাম, তারা যেন মেজর জিয়ার সাথে যোগাযোগ করে আমার সৈন্যদেরকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান। ...নেতৃবৃন্দ মেজর জিয়াকে অনুরোধ করলেন, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শহরে ও অন্যত্র যুদ্ধ করার জন্য যেন তিনি আমার

সৈন্যদেরকে ছেড়ে দেন। মেজর জিয়া বললেন, সৈন্যদের পুর্নগঠিত করে শহরে এসে আমার সাথে মিলিত হবেন।"

"...সেইদিন অপরাহ্নে তারা কালুরঘাট ব্রিজের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেখেন, জিয়া তখনো সেখানেই আছেন। ...আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দের অনুরোধে ২৭শে মার্চ বিকেলবেলা মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখান থেকে বক্তৃতা দেন। রেডিওতে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দেন। কিন্তু ঘোষণায় এ ধরনের বক্তব্য আসার কথা নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার অধিকার কোন সামরিক অফিসারের নেই।" [পৃষ্ঠা: ২২-২৫; ১০-১০৯; ১২২; ১৩০-১৩১; ১৫৮]।

২৭শে মার্চ তারিখে জিয়াউর রহমান, নিজের এবং অন্যের সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে না গিয়ে কালুরঘাটে কি করছিলেন, এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সৈন্যদেরকে রণক্ষেত্রে যেতে বাধা দিয়ে, তাদেরকে মিথ্যে বলার মধ্যেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করে, কে এই জিয়াউর রহমান? যে নাকি যুদ্ধে অংশ না নিয়ে, সৈন্যদেরকে নিয়ে পলায়ন করেছিলো। কি তার উদ্দেশ্য? কি চেয়েছিলো এই জিয়া? মুক্তিযুদ্ধ যেন শুরু না হয়? অখ পাকিস্তান! পাকিস্তানের জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার? তাই কী? "উই রিভোল্ট" প্রতিবেদনে জিয়া কি নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ নয়? সে কি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা এবং বানোয়াট তথ্য প্রদান করে, প্রমাণ করেনি সেই রাতের জিয়া– আইএসআই-এর এজেন্ট?

১৫ চ্যাপ্টারে, সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১এ দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে নিজেকে বিযুক্ত রাখার পরামর্শ দান করে বক্তব্য– "এইসব রাজনৈতিক সমস্যা, এবং এ নিয়ে মাথাব্যথা রাজনীতিবিদদেরই থাকুক, আমরা সৈনিক, এ নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। তুমিও এসব থেকে দূরে থাকো।" খালেদকেও যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবার পরামর্শ! এদিকে মুক্তিযুদ্ধ তখন নিশ্চিত। '৭১এ জিয়ার এইসব যুদ্ধ বিরোধী কর্মকান্ড কি একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় বহন করে? তবে তার প্রোপাগান্ডা পরিচালকেরা বলে, জিয়া নাকি '৭১এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো পাকসেনাদের বিরুদ্ধে। রিয়েলি? আমার জিজ্ঞাসা তাই-ই যদি সত্যি হবে, তাহলে, রফিকুল ইসলামের সকল বক্তব্য কি মিথ্যা? ২৫শে মার্চের বিদ্রোহে বাধা দিয়ে ১০০০ এর উপরে বাঙালি নিধন ঘটতে দিলো– মিথ্যা? বিদ্রোহের বদলে সোয়াত জাহাজে ১১:৩০ মিনিটে অস্ত্র খালাস করতে গেলো– মিথ্যা? তাহলে? রফিকুল ইসলাম কি মিথ্যে বলেছিলেন, জিয়া মুক্তিযুদ্ধে বাধা দিয়ে সোয়াতের অস্ত্র খালাসকেই জরুরি মনে করেছিলো? এবং ধরা পড়ে গেলে, বিদ্রোহ করলো। না করলে, তার মৃত্যু হতো সৈন্যদের হাতে! এবং তার এই বিদ্রোহের ধরনকে জনাব রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম যথার্থই বলেছিলেন, "পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করতে পারে একথা চিন্তা করেই আমাদের সাথে যোগ দেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, সার্বিক অবস্থা এবং স্বীয় নিরাপত্তার

বিবেচনাই তাকে শেষ মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করে" (ভূমিকা)। তবে আমার ব্যাখ্যা ভিন্ন। পাকিস্তানি সৈন্য নয়, সেইরাতে হয়তো মুক্তিরাই তাকে খুন করে ফেলতো হাতেনাতে ধরতে পেরে। লেখক হয়তো দ্বিমত পোষণ করবেন। তবু বলছি, জিয়া বিদ্রোহ করেছিলো প্রথমতঃ মুক্তিদের ভয়ে। "উই রিভোল্ট" প্রতিবেদনে জিয়ার বন্দরে যাওয়ার কারণ এবং বর্ণনা অতীব অগ্রহণযোগ্য। জিয়ার প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ ও বেসামাল।

জিয়া, বিদ্রোহের প্রতারণা করেছিলো। জিয়া, খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিদ্রোহ করেছিলো। সোয়াত জাহাজে যাওয়া জঘন্য অপরাধ, মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষমা করবে না জেনেই সে ধামাচাপা দিতে বিদ্রোহ করেছিলো। খালেকুজ্জামান তাকে সোয়াতের পথে হালনাগাদ করে জানিয়েছিলেন, "আর একচুল নড়লে নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই।" ২৫শে মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে পাকিস্তানিদের প্রতি আনুগত্য! আমি কি পাগল নাকি শিশু? নিশ্চয়ই আমি পাগল বা শিশু! "উই রিভোল্ট" প্রতিবেদনে জিয়া বিদ্রোহের যে বর্ণনা করেছে, একমাত্র জিয়া ছাড়া এইকথা কেউ বলে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, জিয়া সেদিন স্বেচ্ছায় সোয়াতে যাচ্ছিলো।

রণক্ষেত্রে একজন প্রকৃত জিয়ার পরিচয়, রফিকুল ইসলামের বই থেকে পরিষ্কার। রফিকুল ইসলাম বলেছেন জিয়া 'সুবিধেবাদী' মুক্তিযোদ্ধা। রফিকুল ইসলাম জানেন, ২৪ এবং ২৫শে মার্চে জিয়ার অবস্থান এবং মনোভাব। আমার বিশ্বাস, জিয়া সেদিন বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ না করলে, মুক্তিরাই তাকে হত্যা করতো। তার ভাগ্য ভালো, রফিকুল ইসলামের কথামত দুটো গাড়ির একটিকে তারা ২৫শে মার্চ রাতে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়নি। বিদ্রোহ না করলে জিয়া সেদিনই প্রাণ হারাতো। মুক্তিযুদ্ধ চলতো আপনার গতিতে, কোন জিয়া ছাড়াই। তবে জিয়া না থাকলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের চেহারা আজ অন্যরকম হতো। রাজাকারমুক্ত, সোনার বাংলা হতো। আমার প্রশ্ন, রাত ১১:৩০ মিনিটে জিয়া মুক্তিযুদ্ধে না গিয়ে, সোয়াত জাহাজে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলো? সে কি শিশু? নাকি পাগল? সৈন্য জিয়া যুদ্ধ বোঝে না? "উই রিভোল্ট"-এ সেকি নিজেই বলেনি, যুদ্ধ শুরুর কথা?

রণক্ষেত্রে জিয়া ছিলো– মীরকাশিম। সে যুদ্ধে বিঘ্ন ঘটাতে চেয়েছিলো। জিয়া পাকবাহিনীর পক্ষে ২৫শে মার্চ রাত ১২টা অবধি কাজ করে যাচ্ছিলো, যখন সারা চিটাগাং শহরে বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে। গণহত্যা, তুঙ্গে। জিয়া কেন ২৫শে মার্চ রাত ১২টা অবধি পাকসেনাদের অনুগত? স্বেচ্ছায়? নাকি বাধ্য হয়ে? বাধ্য হলে, পথিমধ্যে সুযোগ সত্ত্বেও সে কেন সোয়াতে না গিয়ে, বিদ্রোহ করলো না? তার সঙ্গে দুই জোয়ান, এদেরকে খুন করে বিদ্রোহ কি কঠিন? বরং বিদ্রোহ করলো, যখন তাকে শাসানো হলো– 'একচুলও নড়লে নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই'। ২৪ তারিখে সে কেন যুদ্ধে না যাওয়ার পরামর্শ দেবে? ২৫শে মার্চ '৭১এ পাক সেনাদেরকে বিশ্বাস?

রফিকুল ইসলামের কথা মাফিক, 'জিয়া সৈন্যদেরকে যুদ্ধে না নিয়ে কালুরঘাটের তাবুর তলে আপোষে রেখে দিয়েছিলো'। পুরো বাংলাদেশ যখন যুদ্ধে মাতম, যখন জগন্নাথ হলে ম্যাসাকার চলছিলো, তখন সোয়াত জাহাজ? আমি কি পাগল?

লেখক তাকে চট্টগ্রামের গণহত্যার জন্য দায়ী করেছেন। লেখকের ধারণা, জিয়া যদি বিদ্রোহে বাধা না দিতো, লেখক যদি ২নং সঙ্কেত বার্তা ক্যান্সেল না করতো জিয়ার কথামত, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অন্যরকম হতো। চট্টগ্রামে এই গণহত্যা ঘটতো না। দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরতো না। লেখক, এর দায়িত্ব জিয়াকেই দিয়েছেন। কারণ জিয়া, চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাক সেনাদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত ছিলো। [গোপন সাংকেতিক বার্তা, পৃঃ ২২-২৫]। আমার কথা, জিয়া বাংলাদেশে বিশ্বাস করতো না বলেই এই প্রতারণা।

রফিকুল ইসলামের ব্যাখ্যায়, জিয়া যুদ্ধ এড়িয়ে তার এবং নিজের প্রায় ২৫০০ সৈন্য নিয়ে কালুরঘাটে লুকিয়ে ছিলো। সুবেদার মফিজও প্রমাণ করে দিয়েছে, জিয়া মিথ্যে বলে সৈন্যদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাদের সঙ্গে ছিলো ইপিআর এবং আরো দু'টি কোম্পানি। তারাই কক্সবাজার থেকে যুদ্ধে যোগ দিতে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলো। কিন্তু কালুরঘাট ব্রিজ অতিক্রম করার আগে, ব্রিজের পূর্ব প্রান্তেই নামিয়ে দেয়া হয় এবং মেজর জিয়া গোপনে তাকে যুদ্ধে যোগ দেয়া থেকে বাধা প্রদান করতে, সেখানেই ডিফেন্স নিতে বলে। ২৪-২৫-২৬-২৭ মার্চ তারিখে মেজর জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের বদলে, মুক্তি-সৈন্যগুলোকে বিভ্রান্ত করেছে, মিথ্যে কথা বলে। 'চট্টগ্রামে যুদ্ধ হচ্ছে না'। এটা জিয়ার নিজমুখের পরামর্শ। রণক্ষেত্রে রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমের বইটি প্রমাণ করে, জিয়া কোনক্রমেই মুক্তিযোদ্ধা নয়। হতে পারে না। জিয়াকে ঘিরে '৭১-'৮১ এর এতো বিতর্ক, এতো সন্দেহ, এতো গণহত্যা, এতো ক্যু কেন? ৩৬ বছরে আর কোন মুক্তিযোদ্ধার বেলায় আমরা এইকথা বলতে পারি? জিয়া কি স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী একজন আইএসআই নয়? এরা চিরকাল, সব দেশে সর্বত্র ছিলো না? এবার পড়ুন জিয়ার লেখা প্রবন্ধ, "উই রিভোল্ট।" মিলিয়ে দেখুন, দুইজনের কথা।

উই রিভোল্ট (মেজর জিয়াউর রহমান)

"১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ানের সেকেন্ড-ইন কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসারেরা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ শাসনতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা– বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ান। এটার ঘাঁটি ছিল ষোল শহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মা এই ব্যাটালিয়ানকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ জওয়ানের একটি অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্র দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল তিন'শ পুরনো ৩.৩ রাইফেল, চারটা এল-এম-জি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিঠল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীর বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোবারুদ বিহারিদের বাড়িতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যক তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময় আমার ব্যাটালিয়ানের এনসিওরা আমাকে জানাল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে সামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আর শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায়। কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সয় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময় আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরা দলে দলে বিভি-নন্ন স্থানে জমা হতে থাকল। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চ আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আসিম তাকে সোজাসুজি বললাম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আমার সাতে একমত হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে, ইবিআরসির (ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) লেঃ কর্নেল এম.আর. চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দু'দিন পর ...আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

...২১শে মার্চ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রামে। ...সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারল হামিদ ২০ তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং

অফিসার লেঃ কর্নেল ফাতমক বললো, 'ফামী, সংক্ষেপে ক্ষিপ্র গতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে।' আমি এই কথাগুলো শুনছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রয়োগে চট্টগ্রামে বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েকদফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক কি দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কাল রাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যে কাল রাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর দু'জন অফিসার (পাকিস্তানি) থাকবে, তাও জনানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতে।

এ আদশে পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য এজন লোক ছিল। আর বন্দরে শধরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারি। হয়তো বা আমাকে চিরকারে মতেই স্বাগত জানাতে।

...পথে ছিল ব্যারিকেড। ...আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, 'ইউ রিভোল্ট' আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। ...আমি নৌবাহিনীর ট্রাকে ফিরে গেলাম।

...তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম– ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, ডি আই জি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ান বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

...আমি ব্যাটালিয়ানের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। ...আমি সংক্ষেপে তাদের সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিল, আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।" [সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৭৪]।

এবার দেখুন জিয়া চাটুকারদের বিদ্রোহ ভার্সন:
জিয়া বিদ্রোহ করল কেন
(ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়াউর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৮)

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পশ্চিমাদের মনোভব ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে বিক্ষুব্ধ মেজর জিয়াউর রহমান সতর্ক হলেন। তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন, ব্যারাকে-ব্যারাকে রাতের অন্ধকরে পশ্চিমাদের ফিসফিস আলোচনা। কিসের যেন ষড়যন্ত্র করছে তারা। তিনি অত্যন্ত সাবধানে থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন তাদের গতিবিধি।

এমনি করে সারা বাংলার বুকে নেমে এলো ২৫শে মার্চের গভীর নিকষ কালো রাত। পাকিস্তানি সেনারা চট্টগ্রাম বন্দরে 'বাবর' ও 'সোয়াত' নামক দুটো অস্ত্র বোঝাই জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলা-বারুদ নামাতে ব্যস্ত।

চট্টগ্রামেও পশ্চিমা সেনারা ইতোপূর্বে বাঙালিদের হত্যা করেছে। সে কারণে স্থানীয় জনগণ পাকসেনাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। তাই তারাও পথে পথে ব্যারিকেড দেয়া শুরু করেছে পাকসেনারা যেন সহজভাবে ক্যান্টমেন্ট থেকে অথবা বন্দর থেকে চলাচল করতে না পারে।

পশ্চিমা সেনারা গুলি চালিয়ে এই প্রতিরোধকারীদের হটিয়ে দিতে লাগলো– তারা বাঙালি সেনাদের হুকুম দিল, পথের ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতে।

রাত এগারোটার দিকে পশ্চিমা কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়া জিয়াউর রহমানকে অবিলম্বে এক কোম্পানি ফোর্স নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে হুকুম করেলন। জিয়াউর রহমান হঠাৎ এত রাতে এই হুকুমের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবু কমাং অফিসারের রহুকুম। তিনি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে একটা নৌ-বাহিনীর ট্রাক নিয়ে ছুটলেন সমুদ্র বন্দরের দিকে।

পথে পথে ব্যারিকেড। এগিয়ে চলা কঠিন ব্যাপার। তবু জিয়াউর রহমান সঙ্গের জওয়ানদের নিয়ে সেই ব্যারিকেড সরিয়ে-সরিয়ে এগিয়ে চলেছেন বন্দরের দিকে।

আগ্রাবাদের কাছে এসে একটা শক্ত ব্যারিকেডের মুখোমুখি হলেন। এটা সরাতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তবু সরাতে হবে। এগিয়ে চলাই যে সৈনিকের ধর্ম।

ব্যারিকেড সরানোর তোড়জোড় চলছে। এমন সময় সেখানে ছুটে এলেন মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। তাঁকে খুবই উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তিনি নিচু কণ্ঠে খুব ব্যস্তভাবে পশ্চিমাদের সকল কর্মকান্ড জানালেন সতীর্থ মেজর জিয়াউর রহমানকে। বললেন, চট্টগ্রাম শহরের পথে-ঘাটে-ঘরে-ঘরে পশ্চিমা সেনারা নির্বিচারে বঙালি হত্যা করে চলেছে। ঢাকাতেও একই অবস্থা। ই.পি.আর ক্যাম্প আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা চালিয়েছে। তুমুল লড়াই চলেছে। ঢাকার রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেছে।

সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে মেজর খালেকুজ্জামান জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমরা কি করবো?

লোমহর্ষক ঘটনা শুনতে শুনতে মেজর জিয়াউর রমহানের হাত দুটো আক্রোশে বারংবার মষ্টিবদ্ধ হয়ে আসছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি উত্তেজনা প্রশমন করছিলেন। এতক্ষণে নিচুস্বরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা দিলেন, আমরা বিদোহ করবো! সেই সঙ্গে মেজর খালেকুজ্জামানকে বলে দিলেন, আপনি এখুনি ষোলশরে ফিরে যান! ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে আমাদের ব্যাটালিয়ানকে তৈরি রাখতে বলবেন। আপনি গিয়েই অমাদের ব্যাটালিয়ানের সকল পশ্চিমা অফিসারকে আগেই এ্যারেস্ট করিয়ে ফেলবেন।

জিয়াউর রহমানের নির্দশ পেয়েই মেজর খালেকুজ্জামান ছুটলোন ষোলশহরের সেনা ঘাঁটির দিকে।

চট্টগ্রাম বন্দরের পথে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যে পশ্চিমা অফিসারটি এসেছিল, সে গাড়িতেই বসেছিল। বাঙালিরা পথেঘাটে যেভাবে ব্যারিকেড বসিয়েছে, গাড়ি থেকে নামলে না জানি কি বিপদ হয়! মেজর জিয়াউর রহমান তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, কমান্ডিং অফিসার নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এখন আর নৌ-বন্দরে যেতে হবে না। আমাদের এখুনি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে হবে!

গাড়ি আবার ফিরে চললো ষোলশহরের দিকে।

ঘাঁটিতে ফিরেই জিয়াউর রহমান সঙ্গে বাঙালি সেনাদের নির্দেশ দিলেন ট্রাকের অবাঙালি সেনাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী করতে।

নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বাঙালি সেনারা অবাঙালি সেনাদের বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে ধরলো। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দী করলো।

সেই ২৫শের কালো রাতেই মেজর জিয়াউর রহমান একটা জীপ নিয়ে ছুটলেন কমান্ডিং অফিসার জানজুয়ার বাড়িতে। জানজুয়া তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দরোজার বাইরে থেকে ঘন-ঘন কলিংবেল টিপলেন জিয়াউর রহমান।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে দরজা খুললেন জানজুয়া,– কৌন হ্যায়?

মুহূর্তে তাঁর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ঠিক সামনেই তাঁর বুক লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে স্থির হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জিয়াউর রহমান।

– হ্যান্ডস্‌আপ!

ধীরে-ধীরে হতবাক জানজুয়ার দু'হাত মাথার উপর উঠলো। বন্দী হলেন তিনি। অনুগত বাঙালি সেনাদের হাতে তাকে তুলে দিয়ে তিনি চলে আসেন অফিসার্স মেসে। সেখানে মেজর মীর শওকত আলীর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। মীর

শওকত আলী বিস্তারিত সব কথা শুনে একরকম লাফিয়ে ওঠে। অবশ্যই আমরা বিদ্রোহ করবো। ব্যস্তভাবে তিনি ব্যাটেলিয়ানে চলে আসেন।

এরপর জিয়াউর রহমান টেলিফোনে চারিদিকে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাউকেই পাওয়া গেল না। তিনি বেসামরিক টেলিফোন অপারেটরকে অনুরোধ করে বললেন, অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, এই সংবাদটা দয়া করে ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সকলকে জানিয়ে দেবেন। আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবো।

তখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন অমূল্য। দ্রুত কাজ করে চলেছেন বিদ্রোহী মেজর জিয়া। তিনি কর্নেল এম.আর. চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি অসুস্থ। তাই এই দুর্যোগ মুহূর্তে আর কাউকে পাওয়া না গেলেও কর্নেল চৌধুরীকে তো বাসায় পাওয়া যাবেই।

কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। কারণ সেই রাতেই পাকিস্তানি সেনারভ অসুস্থ কর্নেল এম.আর. চৌধুরীকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

সেই রাতেই ব্যাটেলিয়ানের প্রায় আড়াইশো বাঙালি সেনার সঙ্গে মেজর জিয়া এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। মাতৃভূমির উপর পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনের কথা সব বুঝিয়ে বললেন। যে কোন মূল্য মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দুর্জয় নির্ভয় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করলেন।

সাধারণ সৈনিকেরাও তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলো। জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে হানাদার মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিল তারা। তখন জিয়াউর রহমান কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে অন্যদের নিয়ে রাত ২টা ১৫ মিনিটে রওনা হয়ে গেলেন কালুরঘাটের দিকে। উদ্দেশ্য সর্বাত্মক মুক্তির সংগ্রাম।"

এবার বলা যাক মুক্তিযুদ্ধে আরেকটি বিশাল না বলা রহস্যের কথা। কথাটি খুব সাধারণ, কিন্তু মোটেও সাধারণ নয়। বাংলার মানুষ, জেনেশুনে মুখে কুলুপ। তারা রহস্যজনকভাবে চুপ থেকে এড়িয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় এরকম একটি সন্দেহজনক ঘটনা যা তদন্তের দাবি রাখে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান। আমার বিবেচনায় এই ঘটনাটি তদন্ত করুক সেনাবাহিনী। বাংলার মানুষের বুকফাটে, মুখ ফাটে না।

খালেদা জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলো?

কেন সে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের স্ত্রীদের মত, ভারতে গেলো না? কেন অস্বীকার করেছিলো, ক্যান্টমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব? ক্যান্টমেন্টে পুরো ন'মাস সে কার কাছে

ছিলো? কি ছিলো তার ভূমিকা? কে এই খালেদা জিয়া? এক পাকিস্তানির হেফাজতে মুক্তিযুদ্ধের পুরো ন'মাস এই খালেদা জিয়ার আসল পরিচয় কী? মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদা কেন নিরাপদ জায়গায় না গিয়ে, পাকিস্তানির ঘর বেছে নিলো? এর মানে কী এই যে, খালেদা জিয়া, একজন বড়ো মাপের গুপ্তচর? ১৯৯১ এবং ২০০১ সনে সে কি প্রমাণ করেনি সে– গুপ্তচর?

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হেফাজত করে খালেদা জিয়া কি পেলো? শর্ত কী? পাক বাহিনীর জন্য সে কী উপকারে এসেছিলো? একি তাদের পূর্ব যোগাযোগ? একি জিয়ার সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের সত্য, নিশ্চিত করে? একি জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের প্রো-পাকিস্তানি আদর্শের মন-মানসিকতাকে নিশ্চিত করে? একি ১৯৯১ এবং ২০০১এ খালেদা জিয়ার সকল প্রো-পাকিস্তানি কর্মকা ও চরিত্র নিশ্চিত করে? একি খালেদা জিয়ার পাকিস্তান প্রীতিই নিশ্চিত করে? খালেদা জিয়া কি, গোলাম আজম? সেকি ভালোবাসতো চাঁদ-তারা পতাকা এবং পাকসারজামিনসাদবাদ! সে কি, পায়েন্দাবাদ! সেজন্যই কি তার অবৈধ নিজামীকে সঙ্গে করে পবিত্র সাভার স্মৃতিসৌধে যাওয়া! সেকি বৈধ গোলামের অবৈধ পুত্রবধূর ভালোবাসা? পাকসারজামিনসাদবাদ প্রেম? ১৩/১০/২০০১ সনে খালেদা-নিজামী, সাভার গণকবরের সিঁড়িতে পাশাপাশি, ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতীক মহাস্মৃতিসৌধ এই সাভার, নিজামীর পায়ের তলে ৩০ লক্ষ শহীদের অস্তিত্বের অবমাননার চেয়ে কে বড়? খালেদা? নাকি দেশ?

প্রজন্ম এবং ইতিহাস এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। আজ না হোক কাল।

এখন প্রশ্ন, কেন ১৫ই আগস্ট? একি স্রেফ সিআইএ? নাকি, অন্য কিছু?

আজব্দি বঙ্গবন্ধুর ১নং খুনীর দিশা না হলেও সন্দেহেই পেরিয়ে গেছে, ৩৬ বছর। খুনির শতশত প্রমাণ এড়িয়ে গেছে মানুষের বিবেকহীন চোখ। অধিকাংশকেই জানতে দেয়া হয়নি জিয়াগং খুনির হালনাগাদ। বরং খুনিকে করা হয়েছে অবিনশ্বর। খুনির নামে সারাদেশ জুড়ে পোস্টার, ব্রিজ, হল, তোরণ। তার পরিচয় পতাকার চেয়ে গম্ভীর। তার নাম মুসলমান জাতীয়তাবাদের মহান নায়ক। কায়দেআজম এবং মওদুদীর জাতীয়তাবাদ যার নাম– মৌলবাদ। অন্য ধর্মকে যখন খৎনা দিয়ে মুসলমান বানানো হয়, সেই জাতীয়তাবাদ। তার দল থেকে উল্টো জাতির পিতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে চোর কিংবা দাগি আসামীর। জাতির পিতার নাম সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। দেশজুড়ে তার ছবিগুলোকে নামানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঘোষণা করে। ২০০৪ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের দলিলপত্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলে খালেদা জিয়ার দলিল ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে সেই জায়গার বসানো হয়েছে জিয়াউর রহমানের নাম। '৭১এর ইতিহাস লুটপাট করে জিয়া ইঞ্জিনিয়ারদের হাত দিয়ে যা খুশি লেখানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু, যার নেতৃত্বে এই দেশের জন্ম, বিএনপি'র প্ররোচনায় স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস পরিবর্তন করে, ২০০৪ সনের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে সে জায়গায়

বসানো হয়েছে, একজন সো-কলড সেক্টর কমান্ডার জিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবর্তিত ভার্সন, নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা। খালেদা তাকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান করেছে। বঙ্গবন্ধুকে সব জায়গা থেকে নির্মূল করার কি চেষ্টা! প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাব কী? কোন দলিল? ১৯৮৪? ২০০৪? প্রত্যেকটা ভিন্ন! কেন?

মুক্তিযুদ্ধে যার ভূমিকা নিয়ে দারুণ বিতর্ক, যুদ্ধের সময় যার নাম পর্যন্ত কেউ জানতো না, রণক্ষেত্রে যাকে ঘটনাচক্রে বলা হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করতে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, যার ৭ই মার্চের ঘোষণায় বাংলাদেশের মানুষ ২৫শে মার্চের রাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মুক্তিসংগ্রামের ডাকে... জিয়া, সংবিধান থেকে মুছে দিলো তারই নাম। এবং তার নাম, অবলুপ্ত করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টায় খালেদা জিয়ার হাতে বঙ্গবন্ধুর জায়গায় যোগ হয়েছে জিয়াউর রহমানের নাম। সংসদে দাঁড়িয়ে সে ভাষণ দিয়েছে, "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা– ভিত্তিহীন।" ভিত্তি নেই? হ্যালো! বাঙালি! ২৫শে মার্চ রাতের স্বাধীনতার ঘোষণা ভিত্তিহীন? এই যে! কে এই খালেদা? আসুন তাকে পরীক্ষা করি। তাকে হত্যার বিচারের রায় হলে, ৪৮ ঘণ্টা প্রতিবাদের হরতাল করেছে খালেদা। বঙ্গবন্ধু, যাকে হত্যা করে জন্ম হয়েছে অপর জনের, সেই অপরপক্ষ, এন্থনীর ল্যাগেসি অব ব্লাড-এর খুনি জিয়াউর রহমান এবং তার বিএনপি দল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসটাকে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট থেকে আমূল পাল্টে দিয়ে, দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে, গণহত্যাকারীদের বৈধতা এবং ভোটের অধিকারসহ গণহত্যাকারীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সব অধিকার। সুতরাং কে এই জিয়া এবং খালেদা? আসুন আমরা এক্টিভিজম শিখি। আসুন আমরা চিৎকার করে জিয়ার সব কুকীর্তি জানান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ থেকে।

গণহত্যাকারীর জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা? গণহত্যাকারী যারা, যুদ্ধাপরাধী? যারা পাকসারজামিনসাদবাদ... তাদের সঙ্গে, ক্ষমতা! তাদের গাড়িতে বাংলা পতাকা! তাদের পা সাভারের গণকবরে! বিএনপি'র হঠাৎ এহেন অভ্যুত্থান এবং '৭১কে পাল্টে ফেলার প্রচেষ্টা– কারা ওরা?

জিয়াউর রহমান, যার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু খুন হয়েছে বলে প্রমাণের অভাব নেই। বাংলার মানুষ তাকে বঙ্গবন্ধুর খুনি ও বাংলাদেশে রাজাকারী রাজনীতির প্রবক্তাসহ গণহত্যাকারীদেরকে এদেশে পুনর্বাসনের অভিযোগে, দাবানলের মতো রুখে উঠলো না তার বিরুদ্ধে আইয়ুব ইয়াহিয়ার '৬৯-এর আন্দোলন নেই আজো তার রাজাকার সজ্জিত বিএনপি জোট সরকারে, নিজামীদের মতো '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী খুনিদের অবস্থানের বিরুদ্ধে শুরু হলো না আরেকটা '৭১ বিচার হলো না বঙ্গবন্ধু খুনি ও যুদ্ধাপরাধীদের নির্ভয় আশ্রয়দাতা, জিয়ার মতো একজন দেশদ্রোহীর? বিচারের বদলে, '৯৭এর বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচার প্রহসন, চার্জশীট পেলো না বঙ্গবন্ধুর আসল খুনি? এই সমস্যা কার? কোর্টের সাক্ষীরা সবাই যখন বলেছে, জিয়া খুনি, রায়ে বিচারক পর্যন্ত বলেছেন, তখন তাকে

চার্জশীট না দেয়ার দায়িত্ব হাসিনা কি এড়াতে পারবে? শেখ হাসিনা কি বুদ্ধিহীন? [দ্রঃ মামলার জবানবন্দী]। আমার প্রশ্ন, সৌদির স্বীকৃতিদানের দিনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং হত্যার একমাত্র সুফলভোগী জিয়ার সম্পর্ক কী?

সুতরাং কে এই জিয়া? কাদের চর সে? কি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মাইন্ডসেট? জিয়াকে কতটুকু জানি? কতখানি জানি না? যেন প্রশ্নের কোন শেষ নেই। নিজামীরা কি জোর করে বৈধ হয়েছিলো? গোলাম আজম কি মামলা করে, বাংলাদেশের ভিসা পেয়েছিলো? মাওলানা মান্নান কি জেলের তালা ভেঙ্গে বাইরে এসেছিলো?

সুতরাং '৯৭এর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ। বঙ্গবন্ধু খুনের ষড়যন্ত্রের ১নং আসামী চার্জশীট পায়নি! বৈধ রাষ্ট্রপতি হত্যার বিচার হলে, খালেদার '৭২ ঘণ্টা হরতাল কেন? চোরের যখন জেল হয়, তখন রাষ্ট্রপতির খুনির বিচার হলে, খালেদার সমস্যা কী? সেকি খুনি? সুতরাং, কে এই খালেদা জিয়া? সেকি খুনিদের গডমাদার? নিজামীদের অবৈধ পুত্রবধু?

এরাই কি সেই '৬৯ এর সংঘবদ্ধ আইএসআই, যারা ৭১ ঘটিয়েছিলো? এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সময় এখন। কারণ, সব পাল্টানো যায়, শুধু ইতিহাস ছাড়া। ইতিহাস কখনো স্বরচিত করা সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ারিংও সম্ভব নয়। '৭১ হতে শুরু করে শেখকে মুছে ফেলার নীলনকশা এবং ইঞ্জিনিয়ারজিয়াপরিবার এই নিয়ম বহির্ভূত অপরাধটি সাধন করতেই ২০০৪ সনে বিএনপি নিযুক্ত হাসান হাফিজুর রহমান নামের দুর্নীতিবাজদের টিম দিয়ে মুদ্রিত স্বাধীনতার দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে যোগ করেছে তুখোড় মওদুদীবাদী জিয়ার নাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে। যার কিছু বর্ণনা "স্বাধীনতার ঘোষণা" বইতেও পাওয়া যাবে, (মুক্তিযুদ্ধে দলিলপত্র ৩য় খ , পৃঃ ৩২৮-৩৩৭)। ২০০৪ সনের এক সংসদ বক্তৃতায় খালেদা জিয়া বলেছিলো, 'শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণার কোনো ভিত্তি নেই'। ভিত্তি নেই? খালেদা কি পাগল, নাকি শিশু? আমরা বোধহয় সব– বোকা! আমাদেরকে বোকা বলেছে খালেদা। মহা-স্বৈরাচার খালেদার এইসব রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ জাতি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে আইএসআই খালেদাকে করেছে দেশনেত্রী! খালেদা, যার বিদ্যা, ক্লাশ সিক্স। ১৫ বছর বয়স হতে যে পাকিস্তানে। আর এই গৃহবধূর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে সে– দেশনেত্রী? গোলামকে নাগরিকত্ব দিয়ে যে শহীদজননীকে পুলিশ দিয়ে পেটায়– সে দেশনেত্রী? এই দেশের মানুষ কেন কষ্টে আছে তার উত্তর জিয়াউদাহরণ। দেশের মানুষ এখনো উৎরোতে পারলো না– জিয়া! আমরা বোধহয় সত্যিই– বোকা! হ্যালো!

হিটলারকে আমরা কি বলবো? আধুনিক জার্মানীর স্বপ্নদ্রষ্টা? বেস্ট মটিভেটর? মাত্র ১৪ বছর সময়ে যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সর্বশক্তিমান দলের প্রধান?

স্ট্যালিনকে কি বলবো? পশ্চিমের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের লৌহমানব? ইউরোপের সমাজতন্ত্রের সিংহ প্রতীক?

ভূট্টোকে কি বলবো? পাকিস্তানের মহাত্মা গান্ধী?

গোলাম আজম? নিজামী? পূর্ব পাকিস্তানের নাস্তিক বুদ্ধিজীবী নিধন করে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের হেফাজতে সংঘবদ্ধ করেছিলো? অবিভক্ত পাকিস্তানের কারিগর? সীমান্ত গান্ধী?

পলপটকে কি বলবো কম্বোডিয়ার শেখ মুজিব, যার বীরত্বের কারণে ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া থেকে লেজ গুটিয়ে পালালো, পশ্চিমারা?

মিলেশোভিচ? মুসলমান নিধন করে বসনিয়াকে রক্ষা করেছিলো? কি বলে আমরা এইসব খুনিদের ব্যাখ্যা করবো?

খুনি জিয়ার জানাযায় কতো লক্ষ লোক হয়েছিলো, তার ভাঙা স্যুটকেস এবং শূন্য ব্যাংক একাউন্ট, আজ তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু হত্যা সে কাদের প্ররোচনায় করেছিলো। নেটওয়ার্ক কারা? ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করে নিষিদ্ধ যুদ্ধাপরাধীদেরকে কেন বৈধতা? কি উদ্দেশ্যে তাদের বাতিল নাগরিকত্ব ফেরত? পাপিষ্ঠ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে কেন আইন? কেন ৫ বছর পর, বাতিল ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে ৫ম সংশোধনীর আইনে প্রণয়ন করে জেলহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের সব পথ রুদ্ধ করা? নির্বাসিত ও নিষিদ্ধ গোলাম আজমের মতো ডক্যুমেন্টেড ওয়ার ক্রিমিনালকে কেন ফিরে আসার অনুমতি? কেন সে বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যা খুনিদের ফাঁসি না দিয়ে, বিদেশে চাকরি দিলো? কেন সে শাহ্ আজিজের মতো ডকুমেন্টেড দেশদ্রোহীকে প্রধানমন্ত্রী করলো? কেন সে একটি নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা ভরিয়ে দিলো, ওয়ার ক্রিমিনাল দিয়ে? কেন সে বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যা তদন্তে বাধা দিয়ে গোলামকে ফিরিয়ে আনলো দেশে? কার স্বার্থে সে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মুসলমানী দিয়ে সংযোজন করলো বিভিন্ন ইসলামিক শব্দ? এদেশের হিন্দুরা কি সব– মৃত? সুতরাং এখন প্রশ্ন, কাদের গুপ্তচর জিয়া? কে তার ক্লাইভ? বিচারের বদলে, খুনিদের জন্য পোলাও-কোরমা? এ কোন বাংলাদেশ? স্বাধীনতার অর্জন কি শুধুই– জিয়া? কোন জিয়া? যে জিয়া ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালি নিধনের অস্ত্র যোগাতে সোয়াতে গিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু হত্যা শেষের ১০ম দিনেই ফের ক্যু করে সেনাপতি, পরবর্তীতে সব খুনিকে পদোন্নতি, চাকরিতে পুনর্বহাল, খুনিদেরকে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত করা। এর কোনটা মিথ্যা? মিথ্যা হলে, অবসরপ্রাপ্ত খুনি হুদা কেন ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে? বরখাস্তকৃত ডালিম কেন কেনিয়ায়? বরখাস্ত কর্নেল শাহরিয়ার কেন– ইন্দোনেশিয়ার বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে? খুনি খায়রুজ্জামান কেন ম্যানিলার বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স? বঙ্গবন্ধুর খুনী এ এস রাশেদ চৌধুরী, আব্দুল আজিজ পাশা, এ কে এম মহিউদ্দীন আহমেদ, এম এইচ বি নূর চৌধুরী, শরফুল হোসেন ডালিম এরা সব পাকিস্তানের চর, যাদের অধিকাংশই রি-পেট্রিয়েট, '৭১এর সময় থেকেই গোপন

নৈরাজ্যবাদে লিপ্ত। বরখাস্ত এরা, কিভাবে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকরি পেলো? একজন বৈধ রাষ্ট্রপতি খুনির জন্য দূত পদোন্নতি! এ কোন দৃষ্টান্ত? পুরস্কারের? কারণ তারা, জিয়ার ক্ষমতার বিষাক্ত স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছিলো! কোন প্রেক্ষিতে মানুষ বিচারের বদলে স্বঘোষিত খুনিদেরকে পুরস্কৃত করে? [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পুরো বইটি এসব উত্তর দেবে]। আমরা কি সব– উন্মাদ? নাকি গবেট!

কৌশলে খুনিদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে, চাকরির মাধ্যমে নির্বাসনে রাখা হলেও পরবর্তীতে এদের অনেকেই নির্বাসনে থেকে গোপনে ষড়যন্ত্র করে বেছে নিয়েছিলো বাংলাদেশে ফিরে আসা। এদের অনেকেই জিয়ার অত্যন্ত কু-প্রবৃত্তি বুঝতে পেরে, জিয়াকেই খুন করতে চেয়েছিলো তার চরম বিশ্বাসঘাতকতায়। জিয়া যখন একাধারে সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি, কি পদক্ষেপ নিয়েছিলো যখন মহিউদ্দিনের মতো বঙ্গবন্ধুর খুনি কানাডার দূতাবাসে কর্মরত? কি পদক্ষেপ নিয়েছিলো, বৈধ রাষ্ট্রপতির খুনিকে ফিরিয়ে এনে বিচার করার? এই কি একজন বীরউত্তমের লক্ষণ? জিয়ার অপরাধের শেষ কোথায়? জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা নয়, বরং খুনি, প্রমাণের বাকী আছে? সেকি, অন্যান্য বীরউত্তম এবং বিক্রমদেরকে খুন করে ৪৮ ঘণ্টা তাদেরকে কবর না দিয়ে মর্গে রেখে মাংস পচিয়ে পোকামাকড় দিয়ে খাওয়ায়নি? বীরউত্তমকে চোরের মার্যদায় কবর! হা–বাংলাদেশ! [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ২০৪–২০৬; ১৫৯]। জিয়ার কু-প্রবৃত্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছে খুনি রশিদ-ফারুক তাদের '৭৫ এবং '৮৪ সনের দু'টো সাক্ষাৎকারে। জিয়া খুনিদের বনবাসে দিয়ে একা ভক্ষণ করছিল, সব জুতা। বাকীদের জায়গা, ফাঁসির মঞ্চে।

জিয়ার অপরাধগুলো

স্বাধীনতার সময় মাত্র সামান্য অখ্যাত মেজর থেকে ৩ বার পদোন্নতির পর, ১৯৭৫-এর ২৪শে অক্টোবরে সেনাপ্রধানকে পদচ্যুত করে উপসেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান। শেখ হত্যার মাত্র ৪ মাস পর, '৭২এর ঘাতকদালাল আইন বাতিল। ১৯৭৬-এর ২৯শে নভেম্বরে প্রধান সামরিক শাসক সায়েমের বিরুদ্ধে ক্যু করে নিজে প্রধান সামরিক প্রশাসক, ১৯৭৭-এর ২১ শে এপ্রিলে এবার সায়েমকে সম্পূর্ণ বুটআউট করে রাষ্ট্রপ্রধান, ৩০শে আগস্ট সকল রাজনীতি নিষিদ্ধ, '৭৭এ অবৈধ ঘোষিত ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুমতি, ১৯৭৭-এর ২২শে এপ্রিলে ১৯৭২-এর শাসনতন্ত্রের ৩৮ অনুচ্ছেদের মূল পরিবর্তন এনে সংবিধানে সন্ত্রাসী, ১৯৭৭-এর ৭ই মে তে খুনিদের ক'জনকে পদোন্নতি এবং পুনর্বহাল, ১৯৭৮-এর ৫ই এপ্রিলে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে ১৯৭১-এর ঘাতক দালালদের নাগরিকত্ব দানের জন্য মন্ত্রণালয়কে আদেশ, '৭৭-এর হ্যাঁ না ভোট, ১৯৭৯-এর ৫ই এপ্রিল ৫ম সংশোধনীকে আইনে প্রণীত করে জেল ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দ্বার রুদ্ধ করতে বিষাক্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইন এবং নতুন নাগরিকত্ব

আইনের আওতায় পাকিস্তানের পাসপোর্ট হাতে রাজাকার গোলাম আজমকে দেশে ঢুকিয়ে এবং ইয়াহিয়ার মন্ত্রী গণহত্যার মাস্টার মাইন্ডার, আব্বাস আলী খানকে '৭৯তে জামাতের আমীর হতে দিয়ে, দেশে মৌলবাদ এবং জামাতের স্বাধীনতা বিরোধী সকল কার্যকলাপকে সাংবিধানিক বৈধ্যতা, '৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বর ঘাতকদালাল আইন বাতিল করে ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীর মুক্তি, যাদের ৭৫২ জন দ প্রাপ্ত..., নিহত রাষ্ট্রপতির জন্য ৫৭০ সাবান গোসল এবং জেল ও বঙ্গবন্ধু হত্যার সব তদন্ত বন্ধ করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সেক্টর কমান্ডার খুন করে তাদের লাশ পচিয়ে, '৭১কেই অপমান... জিয়া কি এখনো প্রমাণ করেনি, মোশতাক, ডালিম, ফারুক, রশিদ এরা সব আইওয়াশ? জিয়া, বাংলার নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির– মীরকাসিম। তার ক্লাইভ– পাকিস্তানে! সৌদিতে! যার অজস্র প্রমাণ গোলামের আত্মজীবনীর ৪র্থ খণ্ডে। জিয়ার ক্ষমতার আক্রোশের একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের ১৪৫ পৃষ্ঠায়। খালেদ খুন শেষে নিজেকে সামরিক শাসক বলে রেডিও ভাষণ, পরে তাহেরদের বিরোধীতায়, উপসামরিক শাসক হতে বাধ্য হওয়া। যার মেয়াদ মাত্র ১ বছর। সায়েমকে পদচ্যুত করে এখন সে প্রধান সামরিক শাসক। জিয়ার অপেক্ষা সয় না। চার মাসের মধ্যে শফিউল্লাহর মতো এবার সায়েমের হাত থেকে ১ বছরেই ক্ষমতা অপহরণ। এর তিন মাস পর সায়েমকে বুটআউট করে নিজেকে সব ক্ষমতার অধিকারী করা। ক্ষমতার এতো জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কার? মোস্তাক, শফিউল্লাহ, সায়েম, বঙ্গবন্ধু, তাহের, খালেদ...। জিয়ার রক্ত ল্যাগেসি, আর কার?

১৯৭২-এর ২২শে এপ্রিলে জারি করা সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদকে কর্তন করে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে "বিস্‌মিল্লাহ" ঢুকিয়ে জিয়া কার উদ্দেশ্য সাধন করেছিলো? সংবিধানের মুসলমানী দিয়ে সেকি দেশের সমগ্র হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? দেশে কি শুধুই মুসলমানের? হিন্দু নেই! খৃস্টান নেই! বুদ্ধ নেই! আছে। নিশ্চয়ই আছে। আমি নিজে একজন হিন্দু বাবা মায়ের সন্তান। এবং আমার মতে, এদেশে এখনো প্রায় ৮ ভাগ মানুষ আছেন যারা মাইনরিটি বাংলাদেশী। জন্ম নয়, ধর্মের অধিকারই কি একজন মানুষের পরিচয়? জিয়া, কার স্বার্থে সংবিধানকে বানালো, মুসলমান? খৎনা কি এতোই জরুরি? ভারত কি সংবিধানের খৎনা করেছিলো? কোথায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ? কোথায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এক্টিভিজম? সংবিধানে জিয়ার মুসলমানিতে আপনারা কি সত্যিই মুসলমান বনে গেছেন?

কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে বাতিল না করে বরং সেটিকে আইনে রূপান্তরের মাধ্যমে জিয়া কি প্রমাণ করলো? বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যা খুনিদেরকে বিচারের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে জিয়া আইনে প্রণীত করে, কাকে রক্ষা করেছিলো? নিজেকে? বিষাক্ত গোখরোর চেয়ে বিষাক্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে রয়েছে ১৫ই আগষ্টের সকালে যা ঘটেছিলো, সেজন্য আইনগত বা অন্য যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ

নিষিদ্ধ। অধ্যাদেশ নম্বর "এক্সএনএক্স-১৯৭৫।" ইনডেমনিটি করে জিয়া কি নিজেকে রক্ষা করেনি, সবার আগে? খুনির বিচারের পথ বন্ধ করতে আইন! যেখানে চোরের ১০ বছর জেল হয়, আর এতোগুলো খুনির বিচার না হওয়ার জন্য জিয়ার অভিনব আইন? আমরা কি সবাই প্রতিবন্ধী? এই জিয়া আয়ুর্বেদ আর কতোকাল? আর কতো ঘুমিয়ে থাকা? চলুন আজই ঘোষণা করি, জিয়ার নামের যে কোন প্রতিষ্ঠান– অবৈধ।

বিবিসির ইন্টারভিউতে, সাংবাদিক এন্থনীর সঙ্গে ফারুকের কথোপকথনে অনেক কথাই বেরিয়ে এসেছে। "১৯৭৫ সনের ২০শে মার্চ আমি জেনারেল জিয়ার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করি। দিনটি ছিলো মঙ্গলবার। রাত ৭:৩০ মিনিটে জিয়া তার বাঙলোতে উপস্থিত হন এবং এডজুটেন্ট জেনারেল কর্নেল মঈনুলকে বিদায় নিতে দেখলেন। ...অতি সন্তর্পণে আগমনের উদ্দেশ্য আলোচনা শুরু করি। আমি বললাম, দেশের একটি পরিবর্তন প্রয়োজন। উত্তরে জিয়া বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরে যাই। পরে তিনি আমাকে মাঠে নিয়ে গেলেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে তাকে বললাম যে, আমরা পেশাজীবী সৈনিক। দেশের সেবা করি, ব্যক্তিকে নয়। সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক সরকারসহ সকলে নিম্নস্তরে চলে যাচ্ছি। আমাদের অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা জুনিয়ার অফিসাররা ইতিমধ্যেই পন্থা বের করেছি। আমরা আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব চাচ্ছি। ...জিয়া বললো, তোমরা জুনিয়াররা যদি কিছু করতে চাও, তোমরা নিজেরা করো।" পাঠক বিচার করুন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফকে যখন অন্যান্য সেনা বিদ্রোহ বা ক্যু প্রসঙ্গে অবহিত করা হলো, সে সব শুনেও দেশের বৈধ ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে রক্ষার জন্য কিছুই করলো না। কেন করলো না? বরং উস্কানি। আপনি একথা বললে, লোকে আপনাকে বলবে খুনি, যেহেতু আপনি তাদের জন্য কোন ফ্যাক্টর নন। কিংবা আপনি তাদেরকে কিছু দিতে পারবেন না। জিয়া কি বারবার অসংখ্য খুনের অপরাধে অপরাধী নয়?

সাংবাদিক এন্থনী লিখেছেন, "লণ্ডনে বঙ্গবন্ধু হত্যা নিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রাম করা উপলক্ষে ফারুক যা বলেছে, সেকথা নিয়ে আমি জিয়ার সম্মুখীন হলে সে তা অস্বীকার করলো না। আমি যখন জিদ ধরলাম, সে আমার বাংলাদেশে আসা বন্ধ করে দিলো।" এদেশে বারবারই জিয়া, তার বিরুদ্ধে যে কোন শক্তিকেই সামরিক সরকারের কঠিন হাতে প্রতিহত করেছে। হয়, ভিসা বন্ধ করে। নয়, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। তার দানব ক্ষমতার মধ্যে সকলের ক্ষমতা অপহরণ করে মস্ত দানব হওয়া। বঙ্গবন্ধু, মোস্তাক, শফিউল্লাহ, খালেদ, সায়েম...। সব্বার ক্ষমতা তার চাই। সব ক্ষমতা। পাঠক! কি বুঝলেন! হ্যালো!

এন্থনীর লেখা লিগ্যেসি অব ব্লাড থেকে, "রশিদ চলে যাবার পর সেনাপ্রধানের থেকে আরো একটি ফোন পাই। শফিউল্লাহ চিৎকার করে কাঁদছিলেন। ...বিদ্রোহ দমন করার জন্য ঢাকা ব্রিগেডকে নির্দেশ প্রদানে ব্যর্থ হলেন। সুতরাং ইউনিফর্ম পড়ে

শাফায়ত জামিল তখন জিয়ার বাস ভবনের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। ...জিয়াকে বললেন, স্যার রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে, আপনার নির্দেশ কী? ...জিয়া অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। বললেন, প্রেসিডেন্ট না থাকলে কী? ভাইস-প্রেসিডেন্ট তো আছে। 'ততক্ষণে শেখ মুজিব মৃত। রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। রেডিওতে উর্দু গান এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। জিয়া তখনো শান্ত এবং বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াহীন।" বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং সেনা কোড ভঙ্গ করে– শান্ত? সশস্ত্রবাহিনীকে কোন নির্দেশ দিলো না? দিতেও বললো না? খুনি জিয়ার প্রমাণ বারবার পাওয়া যাবে বাঙালির কলঙ্ক মোচন বইতে, কোর্টে শেখ হত্যায় বিভিন্নজনের জবানবন্দী থেকে (পৃ: ৯০-৯৫)। ল্যাগেসি অব ব্লাড এবং তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পাতায় পাতায় এক দুধর্ষ জিয়ার পরিচয়।

শফিউল্লাহ বিগ্রেডকে কমান্ড দিতে ব্যর্থ হলেন। তিনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন। এই কথার মানে কী? জিয়া শান্ত ছিলো, মানে কী! সশস্ত্রবাহিনীকে কোন নির্দেশও সে দেয়নি। এই কথারই বা অর্থ কী? বরং খুনিদের হেডকোয়ার্টার ৪৬ ব্রিগেডের শাফায়েত জামিলকে সন্দেহজনক নির্দেশ, তাৎক্ষণিক কাউকেই যোগাযোগ করলো না। গ্রেফতার তো নয়ই-ই। বিদ্রোহ দূরের কথা। সেনাপ্রধানের কথা উপেক্ষা এবং বিতর্ক। [দ্র: তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃ: ৭১-৭৫।] অত্যন্ত মূল্যবান সময় নষ্ট করার অভিযোগ। হত্যা সংক্রান্ত কাজে জিয়া এবং শাফায়েত চক্রান্ত এবং হত্যা রহস্য ও ৪৬ বিগ্রেডের ভূমিকা পড়ার অনুরোধ।

এইরকম মুহূর্তে যে কোন উপসেনাপতিরই কি উচিত নয় সেনাপ্রধানকে যোগাযোগ করে বিদ্রোহ দমন? জিয়া হুকুম দিলো, "তাতে কী? ভাইস তো আছে।" এবং সে চলে গেলো সেনাভবনে। এর মানে খুব স্পষ্ট।

জিয়া, শান্ত। সে উগ্র নয়। ক্ষিপ্ত নয়। বিষন্ন নয়। হতবাক নয়। পাল্টা ক্যু সে করলো না। আর বৈধ রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ বাসী হলো ৩২ নম্বরে। জাতির এরকম জরুরি মুহূর্তে একজন উপসেনাপ্রধানের কর্তব্য কী? খুনিরা যখন মুক্ত চলাফেরা করছে, সেনাকোড অধীন জিয়ার দায়িত্ব কী? সুতরাং জিয়াই কি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান আর্কিটেক্ট? এবং অন্যান্যরা তার তল্পিবাহক? তার ক্লাইভ হাজার হাজার মাইল দূরে! সে নাকি বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত? হ্যালো! এই পদক কি শেখ সাহেব, সেরদরে বিক্রি করেছিলেন? নাকি জিয়ার ভয়ে তাকে বীরউত্তম দান করেছিলেন যেমন করেছিলেন জিয়ার জন্য ডেপুটি চিফ অব স্টাফের পদ সৃষ্টি। তাই কী? বঙ্গবন্ধু ভয়ের চোটে তাকে বীরউত্তম দিয়েছিলেন? জিয়া নাকি ২৫শে মার্চ রাতে বিদ্রোহ করেছিলো? সে নাকি বিদ্রোহ দমনে পারদর্শী! হ্যালো! ক্লাইভ কখন বিদ্রোহ করে? বিদ্রোহ! নাকি গোয়েন্দার ট্রেনিং? জিয়া, একা এই খুনের কতো সুফলভোগ করেছিলো, তার জবাব পাওয়া যাবে বাঙালির কলঙ্ক মোচন বইয়ের ৮৭ এবং ১১৬ পৃষ্ঠায়। পাওয়া যাবে, তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে

খুনিদের সাক্ষাৎকারে এবং '৭১-৮১ অব্দি জিয়ার সকল কর্মকা থেকে। ২৫শে মার্চ রাতে জিয়া যখন সাজানো বিদ্রোহ করেছিলো, তখন সে ধরা পরে আত্মরক্ষা করেছিলো। জিয়া কখনোই বিদ্রোহ করেনি। বঙ্গবন্ধু তাকে প্রাণের ভয়ে খেতাব এবং তিনবার পদোন্নতি দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন উপসেনাপ্রধানের পদ।

একথা সত্য যে, ১৫ই আগস্ট সকালে জিয়া শাফায়েত জামিলের মুখে প্রথম হত্যার সংবাদ শোনেনি। যে সংবাদ লন্ডনে, আমেরিকায় প্রচার হয়ে গেছে, পলাতক গোলাম আজমেরা যে সংবাদ নিয়ে লন্ডনে বসে উল্লাস করছিলো, মাওলানা মান্নান পর্যন্ত ঢাকা থেকে দেশে-বিদেশে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে, সকাল ৬টায় মেজর রশিদ তার স্টেনগানসহ শাফায়েত জামিলের বাসায় সুসংবাদ দিতে হাজির, রেডিওতে মুহুর্মুহু প্রচার হচ্ছে উর্দুগান এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার মধ্য দিয়ে খুনি ডালিমের স্পর্ধা... ক্যান্টনমেন্টে থেকেও সকাল ৭টা পর্যন্ত জিয়া কিছুই জানতো না?

জিয়া বাথরুমে সেভ করছিলো, সকাল ৭টায়। বঙ্গবন্ধু খুন হয়েছে ৫:২০ মিনিটে। ততক্ষণে যে সংবাদ সারা দেশবাসী জেনে গেছে, প্রচ গুলির শব্দ যখন কয়েক মাইল জুড়ে, এতোবড় হত্যার সশস্ত্র আওয়াজ, ক্যান্টমেন্টে থেকেও ভোররাতে এতো গোলাগুলির শব্দ, ডেপুটি চিফের কাছে পৌঁছায়নি একথা যে ডাহা মিথ্যা, তা বোঝা যায় তার সকাল ৭টার কর্মকান্ড দেখে। এরপরেও উত্তেজনাহীন, ক্লিন সেইভ এবং ইউনিফর্মড জিয়া ফিটফাট তৈরি হয়ে চলে গেলো সেনাভবনের পথে। সকাল ৭টা অব্দি ক্যান্টমেন্টে থেকে একজন উপসেনাপ্রধান জিয়া, গুলির শব্দ শোনেনি, পাগলও শুনলে হাসবে। কারণ ততক্ষণে প্রায় ২ ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে, অর্ধেক বিশ্ব জেনে গেছে খুনের খবর। সারা শহর গুলির শব্দে ক্ষতবিক্ষত। পাগল, প্রতিবন্ধী, পঙ্গুরাও জেনে গেছে। গুলির বিকট শব্দে পাখিগুলো পর্যন্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন! রেডিওতে স্বরব খুনিদের চিৎকার। ৪৬ ব্রিগেডের ট্যাঙ্ক চলে গেছে তার নাকের ডগা দিয়ে। জিয়া এই হত্যার কথা কক্ষণো শাফায়েত জামিলের মুখ থেকে প্রথম শোনেনি। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, শাফায়েতের জবানবন্দী]। জিয়া, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান আর্কিটেক্ট। বাকীরা, তল্পিবাহক। জিয়া কখনোই বিদ্রোহ করেনি, ভান করেছিলো এবং সে আইএসআই। তার বীরউত্তম বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর দায়। না হলে জিয়া তাকে '৭২-এই খুন করতো। তাহের, খালেদ, রশিদ, সায়েম, মোস্তাক, বঙ্গবন্ধু... '৭৫ থেকে এসব দুস্কৃতির ট্রেইল, কী ইঙ্গিত করে? বঙ্গবন্ধু কি তার ভয়ে '৭২-এই ডেপুটির পদ সৃষ্টি করেছিলেন? '৭৫এ জিয়া কি সেনাপ্রধান হয়ে প্রতিশোধ নেয়নি, '৭২এর! '৭৬এ প্রধান সামরিক শাসক। সায়েমকে অর্ধেক বুটআউট করে '৭৬এর ২৩শে নভেম্বর প্রতিশোধ নেয়নি '৭৫? নিয়েছে। জিয়া, স্বাধীন বাংলাদেশের ১নং শত্রু।

'৭১-এর রণাঙ্গনের আরেক মোশতাক এই জিয়া, ছদ্মবেশি সেক্টর কমান্ডার '৭৩ থেকে এইসব হত্যাকা শুরু এবং নিশ্চিত করেছিলো, প্রতিশোধ এবং জিঘাংসায়।

অন্যদিকে হত্যার সংবাদ শুনে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ, ক্রোধে চিৎকার করেছে, কিন্তু কমান্ড দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বা তার কমান্ড কেউ শোনেনি বরং জিয়ার কমান্ড শুনেছে, যা ৪৪নং সাক্ষীর জবানবন্দীতে স্পষ্ট। একথা শফিউল্লাহ নিজে, সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "৪৬ বিগ্রেড সেদিন আমার কথা শোনেনি। তারা সব জিয়ার কথা শুনেছে।" সুতরাং কী এই হত্যা রহস্য? একজন সেনাপ্রধান কেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির খুনের সংবাদ শুনে, কমান্ড না দিয়ে কাঁদবে! সেকি শিশু? মেরুদণ্ডহীন? অসুস্থ? পাগল? আসলে সেনাবাহিনীর কলঙ্ক এরা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খুনি। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, জিয়া কক্ষনো সকাল ৭টায় কাপুরুষ শাফায়েত জামিলের মুখ থেকে এই সংবাদ শোনেনি। বরং তারা সবাই একটি প্যাক্ট। এবং সে সারারাতের সব ঘটনার হোতা। আর খুনের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অপর সমর্থক, শফিউল্লাহ্কে সারারাত ধরেই কৌশলে নিষ্ক্রিয় রেখেছিলো জিয়া। যার প্রমাণ, ১০ দিনের মাথায়, তার বিরুদ্ধে ক্যু। মাত্র ১০ দিনের মাথায় নিজেই সে সেনাপ্রধানের পদটিকে বেমালুম দখল করে নিলো, যার পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে "তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যূত্থান এবং "ল্যাগেসি অফ ব্ল্যাড" বই থেকে। এই বই বেছে বেছে নয়, জানতে হলে, পুরোটা পড়তে হবে।

জিয়ার ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা অসমান্তরাল। ষড়যন্ত্রের নীল নকশা নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে, পড়া হয়নি। জিয়ার ক্যু পতাকার বিরুদ্ধে, '৭১–'৮১। যদিও শফিউল্লাহ এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত, তবুও সে জিয়ার হাতে ১০ দিনেই পর্যুদস্ত। এর কারণ, '৭২ থেকেই জিয়ার চাই শফিউল্লা'র পদ। নাখোশ সে, বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তে। জিয়া ক্যু করলো বঙ্গবন্ধুর পর শফিউল্লাহর বিরুদ্ধে। সেনাপ্রধানকে ১০ দিনের মাথায় জিঘাংসায় পদ হারাতে হলো। জাতি জানলো, জিয়া, অক্ষম এবং দায়িত্বহীন শফিউল্লাহ্কে তাড়িয়ে জাতিকে আরেকধাপ বাঁচিয়ে দিলো। জিয়া সংহতির হিরো। জিয়া ঈশ্বর! সিন্দবাদের দৈত্য সে। বাকীরা পুতুল খেলা। ফলে সুযোগ পেলেই অথর্ব, অক্ষম শফিউল্লাহ, জিয়ার বিরোধিতা করে কিন্তু যথেষ্ট করে না। অপুরুষ সে। তবে যে কথা অপুরুষ শফিউল্লাহ কক্ষনো বলবে না, যে সৎসাহসও নেই, তাকেই অলিখিত গৃহবন্দী রেখে ১৫ তারিখে জিয়ার হাতে তার সব ক্ষমতা সিজ। সুতরাং পরের নয়দিন, অপুরুষ শফিউল্লাহ ছিলো দুধর্ষ জিয়ার হাতের পুতুল নাচ। সুতরাং '৭১এর এইসব বিশ্বাসঘাতক এবং পাইথন সেক্টর কমান্ডারগুলো কি একেকটা জাতীয় কলঙ্ক নয়? কিংবা, আসলেই এরা অযোগ্য, বিবেকহীন এবং মিথ্যেবাদী! আসলেই তারা কোন কমান্ডারই নয়। থাকলে, তাদের মেরুদ টি কোথায়? কিসের সেক্টার কমান্ডার! এইসব সেক্টর কমান্ডারগুলো সত্যিই কি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো? নাকি তারাও জিয়ার মতো– ভাগ্যবান!!!

জিয়ার গিভ এ টেক পলিসি। অর্থাৎ দেয়া-নেয়ার সংস্কৃতি। তুমি উপকার করলে, আমিও উপকার করবো। বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে জিয়া সেটাই করেছিলো। পুনর্বহাল! পদোন্নতি! দূত! আসলেই– নির্বাসন। তারাই সৃষ্টি করেছিলো – জিয়া! সুতরাং তারা

দেশে ফিরে এসে দু'বার ক্যু করলেও, তাহেরের মতো ফাঁসি না দিয়ে ফের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হলো যার কারণ, জিয়া, তাদের কাছে অত্যন্ত ঋণী। এরাই তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। তাহেরের মতো এদের একজনকেও ফাঁসি দিলে, খুনি জিয়ার হাড়ির খবর বেরিয়ে যেতো। এর কারণও ব্যাখ্যা করা আছে বাঙালির কলঙ্ক মোচন বইয়ের ১১৬ পৃষ্ঠায়, কর্নেল মহিউদ্দিনের জবানবন্দীতে। "জিয়া খুনিদের প্রতি দুর্বল ছিলো।" [দ্র:বাঙালির কলঙ্ক মোচন]। দুই খুনি ক্যু করলে জিয়া, তাদের বিরুদ্ধে কেন কোর্ট মার্শাল করলো না, তাহেরের মতো ফাঁসিও দিলো না, সেটাও তার খুনি চরিত্রের প্রমাণ। এরাই তাকে জিয়া বানিয়েছিলো। অথচ ১৯৭৭-এর ২রা অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর মাত্র দু'মাসে জিয়া সরকারি হিসেবে ১১৪৩ জনকে ফাঁসি দিয়েছিলো। (দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড)। বেসরকারী হিসেবে ১০,০০০। কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দিয়েছিলো, সভ্যতার সকল প্রথা ভঙ্গ করে। জিঘাংসায় পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতা প্রত্যাশী জিয়া তখন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ থেকে সেনাপ্রধান। যখন তার হাতে সেনাবাহিনীর অসীম ক্ষমতা। তা সত্ত্বেও সে ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের খুনিদের জন্য বিচারের ব্যবস্থা না করে, পুরস্কৃত করেছিলো। এদিকে ১৯৭৭-এর ২রা অক্টোবরের পর, ৯ই অক্টোবর থেকে মাত্র ২ মাসে সরকারি হিসেবে ১১৪৩ জনকে ফাঁসি দিয়ে দিলো। তার ভিকটিমদের পরিবারের ডকুমেন্টারি আমি দেখেছি। ছবিতে তারা এই খুনের প্রমাণ দিয়েছে। জিয়া সব পারে, হিটলারের সন্তান সে, ক্ষমতার জন্য যা প্রয়োজন। জিয়া ফাঁসি দিতে পারে, যত দ্রুত দরকার। এমনকি ৩০ সেকেন্ডে বিচার, ৩০ সেকেন্ডে ফাঁসির হুকুম, ৯ ঘণ্টায় ফাঁসি শেষ। উকিল নেই, বিচার নেই, ক্যাঙ্গারু কোর্ট এবং জেলখানায় কামান এবং ঘেরা লোহার ছাউনির মধ্যে বিচার, মানব সভ্যতার যে কোন নিয়ম বহির্ভূত উদাহরণ সে সৃষ্টি করেছিলো। জেলখানার মধ্যে বন্দী সিপাইদেরকে লক্ষ্য করে কামান। বন্দীদেরকে অতিরিক্ত লোহার জালে বন্দী। ২৪ ঘণ্টাই তাদের জন্য খাঁচা এবং লোহার হাতকড়া। নিজের মলমূত্রে শোয়া-বসা মূত্রপাত করে তৃষ্ণা বিমোচন। জেলের মধ্যে সব অধিকারহরণ। টেনে হিঁচড়ে প্রত্যেকদিন ডজন ডজন ফাঁসি। ড্রেনের মধ্যে মু আর পচা দুর্গন্ধ রক্ত। শতশত লাশ নিয়ে গুম করে ফেলা! আত্মীয়স্বজনকে লাশ না দেয়া! সাজানো কোর্টের নিষ্ঠুরতা। ভিডিওতে ধারণ করা জবাবনবন্দী ৬নং ট্রাইবুনাল কোর্টের চেয়ারম্যানকে জিয়ার নির্দেশ, "জবাই করে দাও।" অপরদিকে খুনিদের ১২ জনকে বিচারের বিরুদ্ধে বরং বিদেশে পদোন্নতি। তাহেরের ফাঁসি এবং ফারুকদের নির্বাসন দিয়ে ইনডেমনিটির দূর্গের মধ্যে নিজে বিপদমুক্ত থাকা। এসবই ভিডিওতে প্রমাণ হয়ে আছে। জিয়া, পালাবে কোথায়? জিয়া সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত এবং অপব্যবহার করে হাজার হাজার খুন শেষে, সেক্টর কমান্ডারদের লাশের অবমাননা এবং বঙ্গবন্ধুকে ৫৭০ সাবানে গোসল দিয়ে পুরো সেনাবাহিনীকে করেছে ঘৃণ্যবাহিনী। ৬নং ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের জবানবন্দী আমদের সংগ্রহে।

প্রমাণ আর কতো দিলে তা যথেষ্ট একজন সেনাপ্রধানের নৈতিক দায়িত্ব তখন সীমাবদ্ধ যখন সে নিজেই খুনি। যখন রাষ্ট্রপতি খুন হলে ডেপুটি সেনাপ্রধানের ক্ষমতার পথ আরো উন্মুক্ত হয়ে যায়। নিজের বিরুদ্ধে ক্যুর প্রতিশোধ নিতে জিয়া ঐতিহাসিক মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ২ মাসে সহস্রাধিক ফাঁসি কার্যকরী করতে সক্ষম। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার না করে, দুই দুইবার বিচারের সব প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিলো। লন্ডনের উকিলের ভিসা বন্ধ। তিন বিচারকের গঠিত বেঞ্চের ফাইলে নিষেধাজ্ঞা। সাংবাদিকদের অবৈধ ঘোষণা। এ কোন উদাহরণ? বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে তার ক্ষমতার লোভ কক্ষনো পূরণ হতো? বঙ্গবন্ধু জীবনের ভয়ে তাকে ডেপুটি চিফ এবং বীরউত্তম বানিয়েছিলো। এবং সেই পথ ধরে তার এতো রক্তের ট্রেইল। জিয়া বিদ্রোহ করেনি, ভান করেছিলো। জিয়া '৭১-এই ক্ষমতা চেয়েছিলো। সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারক পর্যন্ত জানে না, কেন ফাঁসি? এই কলঙ্কমোচন কার দায়িত্ব? এই সেনাবাহিনী কি, পাকিস্তানি?

জিয়ার অপছন্দ বিদ্রোহী সৈন্যদের ফাঁসির কিছু রোম জাগিয়ে তোলা কথা লিখেছেন, সাংবাদিক 'এন্থনী' তার "ল্যাগেসি অব ব্লাড" বইতে। "জিয়ার কিছু আভ্যন্তরীণ শত্রু এবং ভয়ের কারণ যারা...। প্রতি তিন থেকে চার মাসে একটি করে ক্যু... প্রকৃত জিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ, অসভ্য এবং স্বৈরাচার... একথা সত্য যে কোন জেনারেল এতো ক্যু এর শিকার হননি...। ১৯৭৫-এর নভেম্বরে সিপাহী বিপ্লবকালে যেসকল সৈন্যরা কাঁধে করে তাকে ক্ষমতাসীন করেছিলো, পরবর্তীকালে সেই সৈন্যরা তাকে হত্যার চেষ্টা করে।"

"দেখা যায় পরবর্তীকালে জিয়া অবিশ্বাস্য বর্বরতার মাধ্যমে তাদের প্রতিদান দিয়েছেন। ১৯৭৭-এর অক্টোবর মাসের ২ তারিখে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরপর জেনারেল জিয়া তার নিজস্ব সেনাবাহিনীতে ব্যাপক হত্যা করেছে, তেমনিভাবে উপমহাদেশের অন্যকোন জেনারেল তা করেনি। যদিও প্রথমেই আমি তার প্রমাণ দেখেছি, কিন্তু আমার তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে কারণ প্রকৃত জিয়া ছিলো– শান্ত, মিষ্টিভাষী, অমায়িক। ...জিয়ার একজন ঘনিষ্ঠজনের সাথে আলোচনাকালে জিয়ার প্রকৃত পরিচয় পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জিয়া কেমন লোক ছিলো? আমার সংবাদ প্রদানকারী তার পরিচয় দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কানে কানে বললেন, জিয়া এমন লোক ছিলো যে একহাতে খুন করতে পারতো, অন্য হাতে খেতে পারতো।" এরকম বহু বহু লেখা পাওয়া যাবে, অসমাপ্ত বিপ্লব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষণা বিজয় অতঃপর, রক্তাক্ত অধ্যায় '৭৫-৮১, ঘাতক দালালেরা কে কোথায়, বইগুলোতে। তবে সবচেয়ে যে বইটি উল্লেখযোড্য তাহলো, ল্যাগেসি অব ব্লাড, যেখানে জিয়ার, রক্ত পিপাসার বিশ্বকোষ। এই বইয়ের দুই অধ্যায়, "ক্যু মিউটিনি এক্সিকিউশন এবং জিয়া দ্যা ম্যান দ্যা মিথ", এই দু'টি অধ্যায় অবশ্যই পাঠ্য যা বাংলার এই হিটলারকে চিহ্নিত করবে, করবেই।

'ল্যাগেসি অব ব্লাড' বই থেকে, "...বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত সৈন্য ও বিমান বাহিনীর লোকদের প্রতি জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ। সরকারী হিসেবে সে ১৯৭৭-এর ৯ই অক্টোবর হতে দু'মাসে ১১৪৩ জনকে ফাঁসি দিয়েছিলো। কয়েক হাজার সেনাকে ১০ থেকে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলো। আইনগত পদ্ধতি ও ন্যায় বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অতি দ্রুত বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এবং ধ্বংসাত্মক শাস্তি প্রদানের দুষ্কর্ম বাস্তবায়ন করেছিলো। ৭/৮ জনের একটি দলের বিচার হতো। এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো ১ মিনিটের বিচারে। জিয়া সকল মৃত্যুদণ্ডই অনুমোদন করতো। নিজ হাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ফাঁসির আদেশ কার্যক্রম হতো। "জিয়া, একাধারে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান প্রশাসকের দ্বৈত টুপি পরে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা বিমর্ষ সময় ব্যয় করতো। নিজ হাতে লিখে দুর্ভাগা সিপাইদের মৃত্যুদ অনুমোদন করতো। সে ঢাকা-কুমিল্লা-বগুড়া জেলে একই সঙ্গে বিশেষভাবে বর্ধিত ফাঁসির কাষ্ঠে ফাঁসি দিয়ে হত্যার অনুমোদন দিতো। সেনা সদস্যদেরকে টানাহেঁচড়া করে ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে নেয়ার সময় চিৎকার করে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের রায় পাঠ করতো। ড্রেন ভরে থাকতো সারারাত ফাঁসির রক্তে। দুর্গন্ধে সুইপাররা পর্যন্ত চিৎকার করে উঠতো। যারা কিছুই জানতো না, তাদেরকে ধরে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিচার শেষে ফাঁসি। এই হচ্ছে– জিয়া! ...এ ঘটনা উপমহাদেশের বা বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানেও ঘটেনি। জিয়া, এক কলমের খোঁচায় দু'ডজনেরও বেশি ক্যাঙ্গারু কোর্টে এক সারিতে দাঁড়িয়ে বানানো বিদ্রোহীদের বিচার করেছে– আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছাড়াই। এবং তা কার্যকরও করেছে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টায়। জেনারেল জিয়া, কয়েক হাজার সৈন্য মুক্তিযাদ্ধাকে হত্যা করেছে। ...প্রকৃত জিয়া ছিলেন, প্রতিহিংসারপায়ণ, অসভ্য এবং স্বৈরাচারি। ...জিয়া এমন লোক ছিলো, যে এক হাতে খুন করতে পারতো, অন্য হাতে খেতে পারতো।" [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, পুরো বই]। জিয়ার নিষ্ঠুরতাকে অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরা, জনাব আনোয়ার কবিরের ডকুমেন্টারি দেখলে, জিয়ার খুনের কালপঞ্জিকা নিয়ে আর কারো সন্দেহ থাকবে না।

কে খুন করেছে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতাকে? মাস্টার মাইন্ডারটি কে? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারক তার পর্যন্ত রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, "মৃত্যু দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মহিউদ্দিনের জবানবন্দী থেকেই বোঝা যায় যে, ১৫ই আগষ্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জিয়ার সংশ্লিষ্টতা ছিলো।" একথা তিনি বলেছেন, রায়ের ১৩৬ পৃষ্ঠায়। তিনি বলেছেন, মৃত জিয়াকে চার্জসীট দেয়ার জন্য। আমার অবাক লাগে যে, সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উঠে এসেছে জিয়ার নাম। তার ষড়যন্ত্র এবং সংশ্লিষ্টতা। তা সত্ত্বেও তাকে তোলা হলো না কাঠগড়ায়? কার ভয়ে? কে সেই ক্লাইভ? কতোদূর সেই ক্লাইভ?

আজ আমাদের বোঝার সময়, '৭৩, '৭৪ এবং '৭৫এ রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ বঙ্গবন্ধুকে খুন করে দেশের কি কি উপকার করেছিলো জিয়া? এই খুন কতটুকু প্রয়োজন

ছিলো? বাকশাল বানচাল করে দেশে কি ফল এলো? দেশ কি এতোই নৈরাজ্য হয়ে গিয়েছিলো? এই নৈরাজ্য কি সত্যিই নৈরাজ্য? নাকি সৃষ্টি করা নৈরাজ্য? কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি যে এই খুনের ফসল নিরঙ্কুশ ভোগ করলো, জিয়া, যার অভিসন্ধিতে খুনিরা '৭৩ থেকেই সংঘবদ্ধ, এই খুনিরাই বা শেষ পর্যন্ত কি পেলো? চাকরির নামে নির্বাসন? জেল এবং ফাঁসির দড়িতে ঝুলে মৃত্যু! বিদেশের ফেরারি জীবন! দুর্নাম! কলঙ্ক! জাতীয় ঘৃণা! কি পেল, অপুরুষ সব খালেদ-তাহের-শাফায়েত-জামিল-ওসমানী-শফিউল্লাহ...? সুতরাং বঙ্গবন্ধুর আসল খুনি – জিয়া।

মোশতাককে জিয়ার ষড়যন্ত্রে ক'মাসের মাথায় ক্ষমতা ছাড়তে হলো? হাজার হাজার সর্বহারা, বিপ্লবী, জাসদের ষড়যন্ত্রকারী গু বাহিনীরই বা কি পরিণতি? ডালিম-নূর-রশিদ-পাশা-হুদা... ১৭ খুনিকে কিভাবে ও কি পরিস্থিতিতে নির্বাসনে যেতে হলো? কর্নেল তাহেরকে ক'মাসের মাথায় জীবন দিতে হলো? শফিউল্লাহ, শাফায়েত জামিল, খালেদ মোশাররফ... কোথায় গেলো, অর্জন? এ সবই সম্ভব হলো ৮৩ দিন থেকে ১১ মাসের মধ্যে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য। আর স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়, আবার সেই পূর্ব পাকিস্তান। আবার আইয়ুবের সামরিক শাসন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে একই লুটপাট। মৌলবাদ এবং নির্যাতন। মাইনরিটিদের বিরুদ্ধে '৪৭এর অবিচার। এই জন্যই কি '৭১? সাভার স্মৃতিসৌধে এ কোন দৃশ্য? '৭১ এর শীর্ষ রাজাকার, নিজামীর পাশে দাঁড়ানো বেগম জিয়া! (তারিখ ১৩/১০/২০০১)। সংসদে রাজাকার সাঈদীর সঙ্গে জিয়া! জিয়ার পাশে– '৭১ এর গণহত্যাকারী বদর নেতা– মওলানা মান্নান। আমি একি দেখলাম? এসবই পাকিস্তানপন্থী জিয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যেন বাংলাদেশ ফের পাকিস্তান হয়ে যায়। '৭১ এর ব্যর্থতার প্রতিশোধ তারা হাড়ে হাড়ে নিয়েছিলো। ফলে নিজামীর পায়ের তলায় অপমানিত হয়, ৩০ লক্ষ শহীদের হাড়গোড়। তারা স্যালুট মারে, নিজামীর পদযুগলে। হা-হা-হা...।

বিগ্রেডিয়ার (অব:) জনাব এম. সাখাওয়াত হোসেন, তার লেখা বই, "বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১" এবং জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদের লেখা– "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" এই বই দু'টি এবং বঙ্গবন্ধু খুনিদের প্রমাণের জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। লাইনের পর লাইন, বলতে গেলে একটি বাদী এবং অন্যটি বিবাদী পক্ষের কণ্ঠস্বর। সিংহভাগ ঘটনার সাক্ষী, ১৫ই আগষ্টের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি, মুখে কুলুপ মারা সত্ত্বেও, এই বই লিখে জিয়ার অপরাধের কথাই বারবার স্বীকার করে গেছেন জনাব সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বরং বিবাদীপক্ষ হতেই সচেষ্ট ছিলেন। তবে জনাব সিরাজউদ্দিনের দেয়া তথ্য সাপেক্ষে, জনাব সাখাওয়াত হোসেনের ঘটনাপঞ্জির বিবরণ, সব মিলে, খুনি জিয়াকে অতি সন্দেহাতীতভাবে দুজনেই খুনি বলে প্রমাণ করেছেন। এবং বলতেই হয়, জনাব সাখাওয়াত হোসেন স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, বলেছেন যা বলতে চেয়েছেন। লুকিয়ে গেছেন যা বলতে চাননি। বর্তমানে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন

কর্মকর্তা। তিনি '৭৫-'৮১র প্রত্যক্ষদর্শী এবং ব্রিগেড কমাণ্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিলের আন্ডারে, এবং সবজ্যান্তা ও মুখে কুলুপ, শেখ হত্যায় অনেকের সন্দেহজনক ভূমিকার তথ্য এইসব বইয়ের পাতায় পাতায়। 'র‍্য'-এর চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে জিয়া, মোস্তাক, রশিদ, ওসমানীার নাম প্রকাশ। আসল কথা, শেখ হত্যার একচুল সত্যও আমরা জানি না। এবং এইসব সাক্ষী যারা এখনো জীবিত, তাদের অনেকেই হত্যাকান্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যারা জাতির কাছে ভালোমানুষের মুখোশ পরে আছে। এবং এইসব মিথ্যেবাদী, মেরুদ হীন, সো-কলড জেনারেল, ব্রিগেড কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, অনেকের লেখা বই পড়েই আমি এটুকু বুঝেছি যে, এরা অনেকেই খুনের সঙ্গে জড়িত এবং ভেজা বেড়াল। ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়ির পার্টনার। এইসব উন্মাদ সেনাকর্মচারী যারা '৭১ শেষ হতে নিজেরাই শুরু করলো, পাকবাহিনীর আচরণ। এরাই একসঙ্গে হয়ে খুন করলো বঙ্গবন্ধুকে। এদের মধ্যে ভণ্ডবীরের উপস্থিতি কি নিশ্চিত করে না, জগৎ শেঠগুলো– যুগে যুগে? পরবর্তীতে রক্তের ট্রেইল, একের পর এক। এরা কি আসলেই যোগ্য? নাকি অযোগ্য সেনাবাহিনীর যোগ্য খুনিদের পিঠা ভোজের অংশীদার!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বইয়ের লেখকের বিশ্লেষণ এবং প্রজ্ঞা অবশ্যই বঙ্গবন্ধু ঘেষা। জিয়াকে তিনি খুনি বলতে চেয়েছেন একজন আওয়ামী লীগার বা সমর্থক হিসেবে, আইনের মারপ্যাঁচে নয় বরং আবেগতাড়িত। তবে তার দেয়া তথ্যাবলী একজন আইনজ্ঞের জন্য অত্যন্ত অনিবার্য এবং উপযুক্ত। এইসব তথ্য মনগড়া নয়, বরং রাষ্ট্রের নথিপত্রে মুদ্রিত। আমি "রক্তাক্ত অধ্যায়" থেকেও কিছু বিশেষ তথ্য তুলে ধরবো, যার বিশদ রেফারেন্স 'ল্যাগেসি অব ব্লাড'-এও পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে এসব তথ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন লেখকের চিন্তায়, তাদের ক্ষেত্র বুঝে। তবে তাদের দেয়া তথ্য থেকেই জিয়াকে খুনি প্রমাণ করতে সমস্যা নেই। রক্তাক্ত অধ্যায় বইয়ের লেখক, গা বাঁচিয়ে কথা বলেছেন। কিসের ভয়ে তিনি উন্মুক্ত সমালোচনা করলেন না, আমি জানি। শতবর্ষ আগের প্রবাদ– 'একজন জ্ঞানপাপীর অর্থ, যখন তার বেতন নির্ভর করে, না বোঝার উপর'। এবং এইসব সেনা কর্মকর্তাগুলো এককেটি, পেশাগত মিথ্যেবাদী।

জনাব সাখাওয়াত হোসেনের বইতে বিস্তারিত বিবরণের মধ্যেও কিছু কিছু স্বব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য চোখে পড়ার মতো। বেড়িয়ে এসেছে জিয়ার '৭৫ থেকে '৮১ সাল, যা অত্যন্ত রক্তাক্ত, এতো রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ কি অর্জন করলো? কি হারালো? আদৌ কি মুক্তিযুদ্ধের দরকার ছিলো? এদেশ কি বাংলাদেশ? নাকি পাকিস্তান? পাকিস্তান ফেরত কিছু ব্লাডি কিলার, কিছু মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত সেক্টর কমান্ডার এবং একজন আইএসআই রিক্রুট জিয়া ও খালেদা জিয়ার জন্য '৭১! ফলে যাদের জন্য পাকিস্তান, কখনোই আমাদেরকে ছেড়ে যায়নি তারা। আইয়ুব-ইয়াহিয়া গেছে, জিয়া এসেছে পেছন পেছন। তার পেছনে, খালেদা আইএসআই। জিয়া ফিরে এসেছিলো মাত্র সাড়ে তিন বছর পর। মোশতাক তার ফেরি। সে, ফেরির যাত্রী। মোস্তাকের হাতে বৈঠা।

আইএসআই জিয়া ফেরিতে বসে নদী পার হয় বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা হত্যা করে; মোস্তাক চালায়, ৮৪ দিনের নৌকা। এর মধ্যখানে সেক্টর কমান্ডার খুনের কলঙ্ক। তাদেরকে হত্যা। খুনিদের দূতাবাসে নির্বাসন। মার্শাল ল'। ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং সৌদির আশ্চর্য স্বীকৃতি। জাতিসংঘে ভুট্টো সেকথাই তো বড়ো দম্ভ করে বলেছিলো, "পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনবো আমরা।" বলেছিলো, "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে হোক, কিন্তু যত সময় লাগে, এদেশ আমরা ফিরিয়ে আনবোই। ...প্রয়োজন হলে আমরা ১০০০ বছর যুদ্ধ করবো... ওরা নিয়ে যাক ৫-১০ বছরের জন্য, আমরা আবার ফিরে আসবো... ৫-১০ বছরের জন্য পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে যাও, সোনার বাংলা, ভারতের নয়– আমাদের সম্পত্তি। আমরা শেষ মানুষটি পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।" [দ্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃঃ ৪৫৫, ৪৫৬]। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র অর্জন কি জিয়া নয়?

প্রত্যক্ষদর্শী বিগ্রেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনের কথা। "১৫ই আগস্ট ভোর ৬টা। "হ্যালো" বলার সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে, রেডিও খুলুন, ব্রডকাস্ট শুনুন।" একজন অজ্ঞাত বক্তির কণ্ঠ। অপরপ্রান্ত থেকে, "আমি ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী মুজিবকে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল 'ল জারি করা হলো।"

"সকাল ৬:৩০ মিনিট। আমি তৈরি হতে থাকলাম আর রেডিওতে একটানা মেজর ডালিমের ঘোষণা শুনতে থাকলাম।" সকাল ৭টা। শাফায়েত জামিল তখন জিয়ার বাসায়।

জিয়া সেভ করছিলো। খবর শুনে জিয়া বললো, "তাতে কী? প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে।" এখানে জিয়ার খুনের মোটিভ কেন খুব স্পষ্ট তার কারণ হলো, "ল্যাগ্যেসি অব ব্লাড" এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক বলেছেন, "বিশেষ করে ফারুকের সাথে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে জিয়ার বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের সাথে আলোচনা, সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের সাথে খুনিদের কয়েকটি সাক্ষাৎ এবং '৭৫-এর শুরুতেই তাদের মধ্যে এ অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা।" ...ইত্যাদির কথা বিস্তারিতভাবেই লিখেছেন, বিগ্রেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিল ১৫ই আগস্ট ভোরে সর্বপ্রথমে যখন খবরটা উপ-প্রধানকে গিয়ে জানান, তখন মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন, নিরুত্তাপ অভিব্যক্তি। শাফায়েত জামিলের মুখে রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার খবর শুনে বলেছিলেন, 'তাতে কী'? প্রেসিডেন্ট মারা গেছে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট তো আছে। এ উক্তিটি কর্নেল শাফায়েত জামিল ভোরের কাগজে ১৯৯৪-এর ১৫ আগস্ট হতে ধারাবাহিক নিবন্ধে উল্লেখ করেন। "...তবে ভোরের কাগজে সেদিনের অভিব্যক্তি করতে গিয়ে হয়তো তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি আমাদেরকে আরো বলেছিলেন, কথাটা প্রায় এরকম, জিয়া কেমন করে এতো শান্ত ছিলো, এরকম একটি হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনেও কোনরকম প্রতিক্রিয়াহীন। কথাটি সেদিনকার প্রেক্ষাপটে সত্যই কারণ

এরকম একটা অপ্রত্যাশিত খবর শোনামাত্র স্বভাবত প্রত্যেকের আশ্চন্বিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং পরবর্তী রিয়েকশন হওয়াটাও স্বাভাবিক। টু দ্য পয়েন্ট হওয়াটাও অস্বাভাবিকই মনে হয় বিশেষ করে জিয়াউর রহমানের মতো একজন সিনিয়র অফিসারের। কাজেই ডালিমের কথায়, অনেকের জড়িত থাকার যৌক্তিকতা থাকতে পারে। এ বিষয়ে অনেক প্রশ্নই উঠেছে।" কি বলতে চায় এরা আভাসে-ইঙ্গিতে? মুখ খুলে জিয়াকে খুনি বলতে কি অসুবিধে? পেট ভর্তি মল, ছিদ্রবিহীন। তাই কী? শুধু জিয়া কলঙ্গে আজ বিশাল কলঙ্কের বোঝা তাদের সেনাবাহিনীর চরিত্রে দাগ হয়ে আছে। তার কারণে সেনাবাহিনীর বিশাল গণহত্যায়, মানুষ এই সেনাবাহিনীকে মনে করে শত্রু, কলঙ্ক,অসৎ, খুনি এবং পাকবাহিনী। এই সেনাবাহিনীতে থেকে জিয়া তার ফায়দা লুটেছে। পরবর্তীতে এর সব ফল ভোগ করেছে গডমাদার এবং তার দুই হেরোইন-কোকেইন। অহেতুক দুর্নাম হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। এখন সেনাবাহিনীর দায়িত্ব কী? তাহেরের মতো তারাও কি জিয়ার বলদ?

রক্তাক্ত অধ্যায়ের এই প্রশ্ন আমি আগেই তুলেছিলাম। এবং আশ্চর্য যে এই বইটিও তখন প্রকাশিত, যখন হত্যা মামলাটি চলছিলো। আমার সন্দেহ, মামলাটি একদমই ঠিকমত পরিচালনা হয়নি। অনেক তথ্য তারা এড়িয়ে গেছেন। ছিলো তাড়াহুড়ো এবং আবেগ। অশোক রায়না ও এন্থনীর বইটিতে স্পষ্টই হয়ে গেছে যে, জিয়ার বাসভবনে ভণ্ড বীর ওসমানী ও অণ্ডকোষহীন ফারুকের সঙ্গে তার বেশ ক'বার হত্যা সম্পর্কিত বৈঠক এবং নীল নকশা- পরবর্তীতে আরো অনেককেই জড়ো করেছিলো জিয়া। বিগ্রেডিয়ারের এই বইটি অত্যন্ত তথ্যবহুল যা পড়লে, যে কেউ বুঝবে, কে খুন করেছে জাতির পিতা? পলাশীর আম্রকাননে সকলেই সেদিন অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলো, আর ১৫ই আগষ্টে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো, ১৭৫৭-১৯৭৫। সালমান রুশদীর ভাষায়, "এই জাতি, জংলী জাতি। এরা একে অপরকে চাকু মারে।"

'র‍্য' এর তথ্য মাফিক জিয়ার বাড়িতে মেজর রশিদ, ফারুখ, জিয়া এবং জে: কর্নেল ওসমানীর দফায় দফায় খুনের পরিকলল্পনার মিটিংয়ের পরেও কি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান আসামী নিয়ে কারো মনে সন্দেহ? '৭৪এ ভুট্টো-কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফর এবং তার সঙ্গে বোস্টার ও রশিদের মুলাকাত, দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ ও গুপ্তহত্যা, নৈরাজ্য এবং সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ? এদেরকে সামাল দিতেই রক্ষীবাহিনী এবং বাকশাল গঠন নিয়ে সন্দেহ? বঙ্গবীর নামের ভ বীরের সঙ্গে জিয়ার বাসভবনে খুনের নকশা নিয়ে সন্দেহ? জিয়ার ১০ বছরের রেজ্যুম নিয়ে সন্দেহ? বই পড়া কি পাপ? জ্ঞানের বিকল্প কি- গুপ্তচর জিয়া? তাহলে আসুন সকলে মিলে '৭৫এর পশু হত্যা করি।

রক্তাক্ত অধ্যায়, (পৃ: ৫২, ৫৩) (র্য এর রিপোর্ট এর অংশ)

"The war liberation was over. Bangladesh was established as a sovereign state with Sheikh Mujibur Rahman as head. Raw agents continued to keep an eye on the developments in the newly born country. By the end of 1973, the reports began to indicate unrest in the country. By the end of February 1974, the reports turned to be correct, as two major general strikes were followed by a massive demonstration of hungry marchers. The growing unrest forced Mujib to establish a one party government on February 24, 1974. According to a RAW services the situation in Bangladesh had become critical.

Reports indicated that western intelligence agencies were becoming very active. Nair, who by now was regarded as respected figure by Mujib Government, met Mujib along with tiger Siddiqi and apprised him of the situation Mujib preoccupied with other events that engulfed his country shrugged off the warning that a coup was imminent.

Four months later, RAW agents received, information of a meeting between major Rashid, major Farooq and Ltcol. Usmani at Zia-ur-Raman's residence. The discussion among other things, had centered on the coup during the three hour meeting one of the participants had doodled on a scrap of paper, which had been carelessly thrown into waste paper basket. The scrapped paper had bee collected from the Rubbish pile by a clerk and passed on to the RAW operative. The information finally reached New Delhi.

Kao, convinced that a coup was in the offing, flew into Dacca, under cover of a pan exporter. After his arrival at Dacca, he was driven to a rendezvous arranged before hand. Mujib is reported to have found the exercise highly dramatic and just could not understand why Kao could not have come to see him officially. But having known him personally, he went along with the charade. The kao-Mujib Meeting lasted one hour. Kao was unable to convince Mujib that a coup was brewing and that his life was threatened, inspite of being given the names of those suspected to have been involved. The euphoria that, "These are my children and they can do no harm" proved to be death knell. **Reference: 'Inside RAW the story of India's secret service' by Asoka Raina. Vikas publication, New Delhi, India."**

অশোক রায়নার বই থেকে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের অনেক কথাই সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাস্টার প্ল্যানিং, আইএসআই জিয়ার বাড়িতেই হয়েছিলো এবং জিয়াই ছিলো সেই মাস্টার প্ল্যানার। যেকথা পরবর্তীতে ফারুকও তার এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেছিলো ১৯৭৬-এর বিবিসির সাক্ষাতকারে। "ল্যাগেসি অব ব্লাড"-এও এসব তথ্য পরিষ্কার। 'র‍্যা' এর তথ্য এবং খুনি ফারুকের ইন্টারভিউ হুবহু মিলে যায় যে এই হত্যার সঙ্গে জিয়ার রোল যা ১৯৯৮-র ৯ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারক তার রায়ের বিবরণীর ১৩৬ পৃষ্ঠায় ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মহিউদ্দিনেরই জবানবন্দী থেকে রেফারেন্স টেনেছেন। কোর্টে সেদিন জবানবন্দীর তোপানলে জিয়ার নাম বারবার উচ্চারিত। বিচারক একই কথা তুলে ধরে বললেন যে, "জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এই হত্যার সংশ্লিষ্টতা ছিলো। তাকে মৃত উল্লেখ করে চার্জশীট দেয়া যেতো। সুতরাং এতোগুলো বিজ্ঞ লোকের কনসার্ন বা অনুসন্ধান রিপোর্ট বা বই বা মতামত কি সবই মিথ্যা? বিরোধী নেত্রী বেগম জিয়ার চরম বিরোধিতার মুখে, এই বিচারের নাম কি প্রহসন নয়? এন্থনীর সঙ্গে ফারুকের সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়ার উৎসাহ এবং তার সঙ্গে খুনিদের বৈঠক এবং অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, 'র'-এর কাছে জিয়ার বাড়িতে নীল নকশা তৈরির একটি রাফ চিরকুট হস্তগত এবং বিচারকের কলমে খুনি মহিউদ্দিনের রেফারেন্স? তাহলে, জিয়াকে কেন আসামী করা হলো না? তার কারণ কি বিচার চলাকালীন সময়ে বিরোধী দলের গডমাদার সেই আইএসআই-এর শক্তি– খালেদা? এই বিচারকে প্রভাবিত করেছিলো কারা? এরাই সেই '৭১র আইএসআই-সিআইএ শক্তি, যারা খালেদার ক্লাইভ!

রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখক আর ক্যান্টমেন্টে জিয়ার বাসা কয়েক মিনিটের পথ। তিনি লিখেছেন, সেদিন সকাল ৬টা, ৬:৩০, ৭টা, এবং ৭:৩০ মিনিটের রেফারেন্স টেনে নিজের এবং শাফায়েত জামিলের কথা। তিনি বলেছেন সকাল ৬ টায় তিনি দুঃসংবাদের ফোন পেয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। সকাল ৭টায় শাফায়েত জামিল, মৃত্যু সংবাদে ভঙ্গুর সেনাপ্রধানের কাছ থেকে কোন নির্দেশনা না পেয়ে সরাসরি জিয়ার বাসায় গেলেন। সেনাপ্রধানের কাছে না গিয়ে শাফায়েত গেলো ডেপুটির বাসায়? শফিউল্লাহর কমান্ড সেদিন অগ্রাহ্য করা হয়েছিলো যা তার জবানবন্দীতে। সেদিন খুনিরা সব জিয়ার কথাই শুনেছে। তারা কেউ শফিউল্লাহর কথা শোনেনি। জবানবন্দীতে আছে। অপুরুষ শাফায়েত জামিলের নিয়ন্ত্রণে ৪ হাজার সৈন্য, তবু কেন সে মুভ করলো না এর বিস্তারিত বর্ণনা এম.এ. হামিদের "তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান" বইতে অত্যন্ত নিন্দা ও সমালোচনার সঙ্গে মিলবে ৭ই নভেম্বর চ্যাপ্টারে। লেখক বিস্তারিত বলেছেন, ধূর্ত শাফায়েত ও জিয়ার শঠতা। ১৫ই আগস্ট তাদের শঠতা ও হঠকারিতা, ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়িতে সব সেক্টর কমান্ডার বীরদের সমকামী আচরণ?

সকাল ৬টায় বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে গেছে রণদামামার তালে তালে মুহুর্মুহু প্রচারিত হচ্ছে উর্দু গান, উর্দু কথা রেডিও থেকে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও সামরিক শাসন ঘোষণা। এর মানে কী? অথচ একজন ডেপুটি সেনাপ্রধান জিয়া ক্যান্টমেন্টে থেকেও রাষ্ট্রপতি হত্যার সংবাদটি শোনেনি যা তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পেয়েছিলো, এবং বিস্মিত হয়নি যা শাফায়েত জামিল বলেছিলো এই লেখককে যে, কি করে জিয়া এতো ঠাণ্ডা থাকলো... এবং সংবাদটি শোনামাত্র তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ দমনের কোন ইচ্ছা বা হুকুম প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ না করে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হত্যাকান্ডকে এতো ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ, কি ঈঙ্গিত করে? আমার প্রশ্ন, 'তাতে কী', মানে কী? বঙ্গবন্ধু খুনের সময় তার ঘরে উর্দুভাষী লোকগুলো কারা? এর ব্যাখ্যা কী?

শাফায়েত জামিল কেন সৈন্য মুভ করালো না? সুতরাং অনেক জায়গাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বই এবং রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখকের তথ্য হুবহু মিলে যায় বলে কখনো কখনো জিয়াকেই এই খুনের ড্রাইভ এবং খন্দকার মোশতাকসহ বাকীদেরকে মীরজাফর বললে ভুল হবে না। মোশতাক এবং ১৭ খুনি সব জিয়ার হাতের- বাদর খেলা! সেদিন এই লোকগুলো সব যারা বই লেখে, একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই, সব ব্লাডি লায়ার এ কিলার, অল। [দ্রঃ রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ৫০]। এরা কি করে সেক্টর কমাণ্ডার? নাকি, লায়িং-কমাণ্ডার? অধিকাংশ সেক্টর কমান্ডারগুলোর চরিত্র পাকিস্তানিদের মতো কেন? জাতির পিতাকে খুন করে দেশ রক্ষা? নাকি ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়ি?

ভণ্ড বীর ওসমানী, বঙ্গবন্ধু হত্যায় যার সন্দেহজনক ভূমিকা, যে বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠনের প্রতিবাদে ১৯৭৫-এর ৬ই জুন ইস্তফা দেয়, জিয়ার বাসায় খুনিদের মধ্যে যার উপস্থিতি, যা অশোক রায়নার বইতে উল্লেখিত। জাতীয় চার নেতা মোস্তাক কেবিনেট যোগ না দিয়ে পদত্যাগ করে জেলে গেলেও পরবর্তীতে, মোশতাক কেবিনেটের অবিশ্বাস্য জগৎশেঠ ওসমানী এবং পর্যায়ক্রমে জিয়ার কেবিনেটেরও শেঠ। ওসমানী নামের বিশ্বাসঘাতক শেঠ। এই বইয়ের লেখক অনেকবারই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্ন তুলেছেন এইমর্মে যে, "সেদিন প্রতিবাদ হিসেবে এমারজেন্সি সংসদ অধিবেশনের ডাকও তো দিতে পারতো উপ-রাষ্ট্রপতি। বরং বেশির ভাগ সদস্যই স্বল্প সময়ের মধ্যে খন্দকার মোশতাককে সমর্থন দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।" আমার প্রশ্ন, লেখক কি জানেন যে, এই অভ্যুত্থানের পর কোন কোন মীরজাফর, মোশতাকের কেবিনেটে যোগ দিয়েছিলো? কোন কোন জগতশেঠ আনুগত্যের ভাষণ পড়েছিলো? "আর কোন কোন মন্ত্রীকে আনুগত্যের অনীহায় কেন্দ্রীয় জেলে পাঠানো হলো?" ভণ্ডবীর ওসমানী কি তাদের মধ্যে ছিলো? জগতশেঠ ওসমানী সেদিন কাদের সঙ্গে ছিলো? বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি আনুগত্য? বঙ্গবীর? নাকি ভন্ডবীর? ২৩শে আগষ্টে জেল এবং ৩রা নভেম্বর কোন চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হলো? সুতরাং উপ-রাষ্ট্রপতি কিভাবে সেদিন সংসদ ডাক দেবে? ভন্ড বীরের মতো তারা তো আনুগত্যই দেননি। উল্টো জিয়া সেদিন ৪৬ বিগ্রেড

কমান্ডার, খুনিদের অন্যতম শাফায়েত জামিলকে প্রথম কমান্ডটি করেছে এই মর্মে যে, ১ম বেঙ্গলের দিকে যাও! ১ম বেঙ্গল, যা ছিলো অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী দু'টি ইউনিটের একটি এবং নেতৃত্বদানকারী প্রধান ইউনিট (রক্তাক্ত অধ্যায় পৃঃ ১২১) যা, লেখকের ইউনিটের এক মাইলের মধ্যে। এই ইউনিটের প্রধান, শাফায়েত জামিল নামের এক ব্লাডি কিলার, যার অন্য পরিচয় শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সে একজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী এবং সমর্থক। সব ব্লাডি, লায়ার এ কিলার। আসুন, আপনাদেরকে আমি 'এক্টিভিজম' শেখাই। হ্যালো!

রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখকই অবচেতনে প্রমাণ করেছেন, তাদের অনেকেই এবং জিয়া, সমষ্ঠিগতভাবে সকলের উদ্দেশ্য জিয়াই হবে সেনাপ্রধান। তিনি বলেছেন, "আনুগত্য জানানো শেষ হলে, সেনাপ্রধান, উপসেনাপ্রধান, সিজিএস খালেদ মোশাররফ, সকলেই চলে আসেন তাদের ৪৬ বিগ্রেডের হেড অফিসে। এই বিগ্রেডেরই তিনটি পদাতিক ইউনিট এবং জয়দেবপুরস্থ অন্যটিকেও সতর্ক রাখা হয়েছে। তাদেরকে কোন নির্দেশ না দিয়ে 'ডিফেন্সিভ' করে রাখা হয়েছে।" ডিফেন্স? হ্যালো! রক্তাক্ত অধ্যায়ের পাতায় পাতায় সেক্টর কমান্ডারদের দুর্বৃত্তগিরির পরিচয়। এরা কি আসলেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো? নাকি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে শুধু ভারতের সৈন্যদের দিয়ে। এরা সব আইওয়াশ, রাজনৈতিক কারণে।

অথচ, ৪৬ ব্রিগেডেরই কমান্ডার শাফায়েত জামিল! তার অধীনে ৪ হাজার সৈন্য! একজন বিগ্রেড কমান্ডার, খুনিদের প্যাক্ট না হলে, এই পরিস্থিতিতে সে কি করে? তার কি করা উচিত? এরাই কি সেই সো-কলড বীর মুক্তিযোদ্ধা? নাকি আইওয়াশ মুক্তিযোদ্ধা! নাকি নামে মুক্তিযোদ্ধা? নাকি ভারতের সৈন্যবাহিনীর জুতা পালিশ? বঙ্গবন্ধু খুনের পর কোন জায়গা থেকেই কোন অফেন্স ছিলো না কেন? ব্রিগ্রেডের বাকী ইউনিটগুলোও নিষ্ক্রিয় কেন? রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখক বলেছেন, "একটু পরেই এলো মেজর ফারুক রহমান। সিজিএস খালেদ মোশাররফকে দেখামাত্র উল্লাসি রশিদ শুনালো তার ট্যাংকে গোলাবারুদ নেই, রাজেন্দ্রপুর থেকে আনতে হবে। এবং সেজন্য রসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিজিএস খালেদ মোশাররফের অনুমতি প্রয়োজন। সিজিএস সব শুনে তক্ষুণি রাজেন্দ্রপুরে ট্যাংকে গোলাবারুদ দেয়ার হুকুম দিলো।" [রক্তাক্ত অধ্যায়, পৃঃ ৪০-৪১] সুতরাং ৪৬ বিগ্রেডের শাফায়েত জামিল এবং খালেদ মোশাররফ যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত তা এই প্রসঙ্গ থেকেই কি পরিষ্কার না? আসলকথা, পরবর্তীতে জিয়ার সঙ্গে ক্ষমতার, জুতা কামড়াকামড়ি। খালেদ চায় সেনাপ্রধান হতে। শাফায়েত জামিল চায়, জিয়া। সুতরাং ৭ই নভেম্বরের অসংহতির খেসারত বাংলাদেশ হাড়ে হাড়ে দিচ্ছে। এরা সকলেই সেনাপ্রধান হতে চেয়েছিলো। জিয়া একাই সব হয়ে, বাকিদের দিলো পরকালের ঘর।

রক্তাক্ত অধ্যায়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন– "তৎকালীন সিনিয়র আফিসারগণ সকলেই মুক্তিযুদ্ধে সমকক্ষ থেকে যুদ্ধ করেন, এবং বিশেষ অবদান রাখেন। ...সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও মেজর জেনারেল শফিউল্লাকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয় যা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সহজভাবে নিতে পারেনি।" এবং জেনে রাখা উচিত, এজন্যেই বঙ্গবন্ধু প্রাণের ভয়ে সৃষ্টি করেন, ডেপুটির পদ। না হলে, জিয়া তাকে '৭২-এই খুন করে ফেলতো।

৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে প্রাথমিক উৎসাহিত দেখা গেলেও, ক্রমে তিনিও অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের কার্যকলাপ মেনে নিতে পারেননি। আমি তার এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম, শফিউল্লাহ্‌র স্থলে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করার পর থেকে।" আসল কথা, ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়িতে– খুনিদের পরাজয়। যুদ্ধ ফেরত এইসব সেক্টর কমান্ডারদের প্রায় সবাই আইএসআই-এর কাছে বিক্রি হয়েছিলো। ৪৬ বিগ্রেড যা সর্বনাশের মূল হেড কোয়ার্টার। অপুরুষ শাফায়েত জামিল একজন পক্ষভ্রষ্ট এবং মিথ্যোবাদী। সাখাওয়াত হোসেন, মাছ চুরি করা বেড়াল। বানরের পিঠা খাওয়ার মতো, বঙ্গবন্ধু খুনের সব পিঠা, জিয়া একাই খেয়েছিলো। খালেদ, তাহের, মোস্তাক... এরা সব জিয়ার খপ্পরে পড়ে সর্বনাশের চরম মূল্য দিলো।

এখানে একটি কথা না উল্লেখ করলেই নয়, রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখক, সতর্কতার সঙ্গে কথা লুকিয়ে যেতে মাস্টার। যেমন, "করার পর থেকে।" করার পর থেকে? জিয়াকে কে সেনাপ্রধান করেছিলো? [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পৃঃ ৬৯। এখানে পাওয়া যাবে জিয়ার সেনাপ্রধান হওয়ার পথে মেগা সিরিয়াল।] শফিউল্লাহ্‌ তার জবানবন্দীতে কি বলেছে? এম.এ হামিদ তার 'তিনটি ব্যর্থ সেনা অভুত্থানে' বিস্তারিত বলেছে, জিয়াই ক্যু করে শফিউল্লাকে সরিয়ে দিলো! ঘটালো, সাজানো ৭ই নভেম্বর! [পুরো বই]। যার মূলে খালেদ, সে চেয়েছিলো সেনাপ্রধান হতে। আর খুনি শাফায়েতের, জিয়া প্রীতি। দু'জনেরই অপছন্দ, খুনিদের বঙ্গভবন দখল এবং মোস্তাককে কাবু করা। সকলেই চেয়েছিলো, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পতাকার ভাগাভাগি। জিয়া হত্যা কালো, সব পতাকা। সব '৭১। সব মুক্তিযুদ্ধ।

মোশতাক-সায়েম... এরা সব কেন জিয়ার পাপেট– আমি তা আগেও বলেছি। সুতরাং করা হয়নি, জিয়া নিজেই সেনাপ্রধানকে পদচ্যুত করে '৭২ এর প্রতিশোধ নিয়েছে যা শফিউল্লাহর জবানবন্দীতেও স্পষ্ট। আরেক জায়গায় লেখক লুকিয়ে গেছেন, ১৯৭৭-এর ২রা অক্টোবরের অভ্যুত্থানের প্রতিশোধে জিয়ার দেয়া ফাঁসির ব্যাখ্যা। যেমন, তিনি প্রায় এক ডজনবার ব্যবহার করেছেন, "ল্যাগেসি অব ব্লাড" বইয়ের রেফারেন্স। এবং তিনি তা করেছেন যথার্থভাবে। কিন্তু যথেষ্ট নয়। যেমন ১২৩ পৃষ্ঠায় সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছেন, ফাঁসির ভিকটিম "১১৪৩ জনের সংখ্যা" যা "ল্যাগেসি" থেকে

সহজেই নেয়া যেতো। বরং লিখেছেন, "ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত বিচার করে অনেককে ফাঁসি দেয়া হয়, এখানে তার সঠিক সংখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।" সঠিক সংখ্যা দেয়া সম্ভব নয়? নাহলে, আনুমানিক? তার বারবার কোট করা "ল্যাগেসি অব ব্লাড" বইতে তো এই রেফারেন্সটি স্পষ্ট। সুতরাং একথা সহজেই বোঝা যায়, এই লেখকও কৌশলে এড়িয়ে গেছেন যা লিখতে চেয়েছেন, যা চাননি। সোজা কথা, এরা সকলেই একেকটা ব্লাডি লায়ার।

বঙ্গবন্ধু খুনের পর, দেশে কোথাও কোন সংঘাত হয়নি! সবইকিছুই নিয়ন্ত্রণে, খুনিরা বরং সারাদিন ধরে ৪৬নং বিগ্রেড হেডকোয়ার্টার এবং ১ম ও ২য় বেঙ্গলের অফিসেই যাতায়াত করছিলো, যা প্রকৃতপক্ষে– খুনিদের অফিস! দেশে, বিশেষ করে, ঢাকায় তখন কোন ছোটখাট যুদ্ধও ছিলো না বরং সব শান্ত, ৬টার মধ্যে খুনিদের সব কিলিং অপারেশন সমাপ্ত, হত্যা মামলার ২য় সাক্ষী আব্দুর রহমান শেখ রমা আদালতে তার জবানবন্দীতে জানান, "সব হত্যাকাণ্ড প্রায় সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই শেষ, বজলুল হুদা চিৎকার করে বললো– "অল আর ফিনিশড।" সুতরাং সত্য যে,এরপর খুনিরা আর কোন যুদ্ধ বা হত্যাকান্ডের মধ্যেই যায়নি যেজন্য [জনাব সাখাওয়াতের বর্ণনা মাফিক], সশস্ত্রবাহিনীকে "ডিফেন্সিভ পজিশন নিতে হতে পারে।" অর্থাৎ যারাই অফেন্সের হুকুম জারি করবে, রাষ্ট্রপতি মোস্তাক যে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান, সেনা বা উপসেনাপ্রধান বা বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ, তারাই যখন 'বন্ধুসুলভ' আলোচনা করছে খুনিদের সঙ্গে, সেখানে সশস্ত্রবাহিনীর মতো খুনিদের সমন্বয়ে ভরপুর এতোবড় একটি শক্তি তো খুনিদের বিরুদ্ধে নিরব থাকবেই! তারাই যে খুনি, কেউ ছোট, কেউ বড়ো! কিংবা পাপেট। জিয়া, সকলকে ধোকা দিয়ে একা জেগে রয়েছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সে মোস্তাক ও খালেদের পর, সায়েমকে দুই দফা বুট মেরে তার হাত থেকে দুটো ক্ষমতাই ছিনিয়ে নিয়েছে। এইসব বিচারপতিদের মেরুদ টি কোথায়? জিয়া কাকে ধোকা মারেনি? জিয়া বিচারপতিদের ধোকা মেরে, জিয়াউদ্যানে শুয়ে আছে, স্বাধীনতার কলঙ্ক হয়ে।

সকাল ৬টার পর আর কোন গুলিগালাজ নেই। লেখক তার রক্তাক্ত অধ্যায় বইতে ৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, "১০:৩০ মিনিটের পর মেজর কর্নেল ফারুক এসে ব্রিগেড অফিসে হাজির হলো। তার পরনে কালো ট্যাংক পোষাক। খালেদ মোশাররফকে সে শাফায়েত জামিলের উপস্তিতিতেই জানালো তার ট্যাংকে কোন এম্যুনিশন নেই। এবং যেহেতু সিজিএস খালেদ মোশাররফ এসব রসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি তখন খুনি ফারুকের খালি ট্যাংকটিকে ভরিয়ে দিতে রাজেন্দ্রপুরে জানিয়ে দেন এবং সেদিন অফিস ছেড়ে চলে যাবার আগে নিশ্চিত করেন যে ট্যাংকটি ভরা হয়েছে।" এইসব প্রমাণ কোথায়ও যায়নি বরং আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। লেখকের বইতেই আছে। খালেদ মোশররফকেও খুনের ফসল না পেয়ে কেন জিয়ার বিরুদ্ধে যেতে হলো, তার কারণ, ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়ি! খালেদ ভেবেছিলো সেই-ই সেনাপ্রধান হবে এবং এই

অভিশপ্ত পদটি বাংলাদেশের যতো অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু। সেনাবাহিনীর মধ্যে, জিয়ার সৃষ্ট উত্তেজক বিশৃঙ্খলা, সেনাবাহনীকে করেছিলো গুণ্ডাবাহিনী। সেনাবাহিনীর প্রতি মানুষের ঘৃণা তখন চরম। এখনো তা শুদ্ধ হয়নি। হবে না, যে পর্যন্ত না জিয়ার বিচার হবে এই বাংলার মাটিতে। তার হাড়গোড় তুলে গণআদালতে ফাঁসি দেয়া হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আরো বলা দরকার যে, খালেদ মোশাররফ যখন খুনি ফারুকের মুখ থেকেই জানতে পারলো যে, মধ্যরাতে গোলাবারুদ ছাড়াই তারা রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলেছিলো এবং তা কেউই টের পায়নি, খালেদ মোশাররফ তক্ষুনি তাদেরকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা না করে বরং রাজেন্দ্রপুরে ট্যাংকের গোলাবারুদ দেয়ার জন্য ফোন করলো। এইসব উন্মাদ যুদ্ধ ফেরত মুক্তিরা কি সকলেই ক্ষমতার রক্তলোভে, একেকটি হায়েনা হয়ে উঠেনি? এবং এইখানেই তার কিছুক্ষণ পর এসে উপস্থিত হলো অক্ষম-অপুরুষ শফিউল্লাহ ও বিশ্বাসঘাতক জিয়াসহ তিনবাহিনীর প্রধান। কয়েকজন স্টেনগান সজ্জিত মেজর, কর্নেল ও নিম্নপদধারী অফিসারদের সামনে গোটা সশস্ত্রবাহি-নী কি এতোই দুর্বল যে তাদেরকে ডিফেন্সিভ পজিশন নিতে হয়েছিলো? ডিফেন্স, কোন প্রেক্ষিতে? যারা কোন রকম, যুদ্ধ করছে না, তাদের বিরুদ্ধে? তারা কারা? যারা খুনিদের সঙ্গ দেয়? এরকম সময়ে সেনাপ্রধান কেন ভেঙ্গে পড়লো? তখন খালেদ মোশাররফ ও শাফায়েত জামিল এবং জিয়া এবং অন্যান্য বাহিনীর প্রধানেরা আক্রমণের ভয় না থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ করলো না কেন? খুনিদেরকে নিরস্ত্র সত্ত্বেও গ্রেফতার করলো না কেন? অপুরুষ শফিউল্লাহকে পদচ্যুত করেছিলো জিয়া মাত্র ১০ দিনের মাথায়। জিয়ার সম্পর্কে বিভিন্ন বইতে আছে কর্মজীবনে সে অফেন্সিভ! সে '৬৫এর যুদ্ধে বীরত্বের পুরস্কারও পেয়েছিলো। সুতরাং এরা কেন বিদ্রোহ না করে নীরব ছিলো? ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিলের ভূমিকা কী? তার ব্রিগেড কি খুনিদের হেডকোয়ার্টার নয়?

খালেদ মোশাররফ কি উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি, ফারুকের ট্যাংক ভরিয়ে দিলো? খালেদ মোশাররফ কি জিয়াকে টপকে নিজে সেনাপ্রধান হতে চেয়েছিলো? শাফায়েত জামিলও কি একই স্বপ্ন দেখেছিলো? তাই-ই যদি না হবে, তাহলে– বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে একটি খুনিকেও কেন গ্রেফতার করা হলো না? বরং উল্লাস এবং ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়ি। আসল কথা, সেক্টর কমান্ডারগুলো অধিকাংশই, চরিত্রহীন। ক্ষমতালোভী এবং মিথ্যেবাদী। এবং আদৌ এরা সেক্টর কমান্ডার নয় এরা সব আইওয়াশ। এদের দৌড় দেখেছি।

জিয়াউর রহমান বহু আগে থেকে পুরো সেনাবাহিনীকেই ব্যবহার করেছিলো নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে। পরবর্তীতে তারাই তাকে হত্যা করতে ১৯টি ক্যু করেছিলো। এক কথায়, অনন্য-অপুরুষ শফিউল্লাহ সেনাপ্রধান হওয়ার পর থেকেই জিয়া, গোটা সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ভাঙ্গার সুযোগ করে দিলো। এবং হত্যাকাণ্ডে তার সঙ্গে যারা, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শীর্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত, ডিফেন্স নয়, অফেন্সও নয় বরং থেকেছিলো

অনির্বাচিত সরকার এবং খুনিদের জন্যে মদতদাতার হেড কোয়ার্টার হয়ে। এদের শীর্ষ দু'জনের মধ্যে জিয়া এবং খালেদ মোশাররফ, লোভের পাপে দু'জনেই খুন হয়ে শোধ দিয়েছিলো, পাপ। ১৭ই আগষ্টে সেনাসদরে যে কনফারেন্সটা হয়েছিলো, সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে সেখানে খুনি ফারুক এবং রশিদের কন্ডাক্ট, উপস্থিতদেরকে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর, প্রয়োজনীয়তার ব্রিফিং, ১৫ই আগস্ট থেকেই বোঝা গেছে অথর্ব শফিউল্লাহ্ পুরোপুরি ক্ষমতাহীন। ২৩শে আগষ্টে চার জাতীয় নেতাকে জেলে পাঠিয়ে ২৪শে আগষ্টে শফিউল্লাহ্র বিরুদ্ধে ক্যু, এইসবই কি প্রমাণ করে না, পাকিস্তান একাডেমির এই ঝানু গোয়েন্দা জিয়া ছাড়া, পুরো ঘটনার মূল নায়ক আর কেউ নয়! বঙ্গভবন এবং রাষ্ট্রপতি মোশতাককে ঘিরে থাকা খুনিদেরকে গ্রেফতার না করে তাদের নিরাপত্তা দান, ২৪শে আগস্ট থেকে জিয়া কি আরো একবার প্রমাণ করেনি তার খুনের মোটিভ? শফিউল্লাহকে হঠিয়ে '৭২এর প্রতিশোধ? বঙ্গবন্ধু হত্যা করে– '৭১এর প্রতিশোধ? জিয়ার চাই সর্বময় ক্ষমতা। ভাঙ্গা স্যুটকেস আর ছেঁড়া লুঙি-গামছার অন্তরালে সিন্দবাদের ক্ষমতা। জিয়া, বাংলার চেঙ্গিস খান। কিংবা, টেরোরিস্ট ওসামা বিন লাদেন। কোনটা সে? ইয়াহিয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু খুনের দিনক্ষণ বাতিল করে দিয়েছিলো। ভুট্টো পর্যন্ত কবর খুঁড়ে ফাঁসি দিলো না। যে দুঃসাহস দস্যুরাও করেনি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে ৩৩৪৭৪ জন '৭১এর যুদ্ধাপরাধী বন্দী ছিলো। জিয়া সবাইকে মুক্ত করে দিলো।

১৬ই অক্টোবরে ডাকা জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিশাল শূন্যতা প্রমাণ করেছে, ১৫ই আগষ্টে কারা বাধ্য হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলো। কারা করেনি। যারা করলো না, তারা জেলে যেতে বাধ্য হলো। আর যারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিলো, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে শুধু একমাত্র জিয়া বাদে কারোই কোন উদ্দেশ্য সাধন হয়নি; ৪৬ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডারকে বিশ্বাস করতে না পারায়, তাকে কাউন্টার করতেই সেপ্টেম্বর মাসে গঠন করা হলো, ৭৭ নং ব্রিগেড, যার অধিনায়ক করা হলো কর্নেল মান্নাফকে, আর তার অধীনে ট্যাংক অফিসারের কাজ করতো খুনি ফারুক। মাকড়সার জালের মতো এবং এর সব কানেকটেড। জিয়া, '৭১ এর দুধর্ষ এবং অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলো বঙ্গবন্ধুকে খুন করে। জিয়া মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করে দিলো '৭১ এর প্রতিশোধ নিতে। '৭৫এর পট পরিবর্তন, '৭১ এর গণহত্যার চেয়ে বিভৎস ও দুঃখজনক।

জিয়াই একমাত্র ব্যক্তি, সায়েমের হাত থেকে দুই দফায় মাত্র ১৮ মাসে তার দুটো ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে সৃষ্টি করলো রেকর্ড – "হ্যাঁ-না" ভোটের। শফিউল্লাহ ও মোশতাকের পর ১ম দফায় প্রধান সামরিক শাসকের পদ এবং ২য় দফায় রাষ্ট্রপতি, মোস্তাক-শফিউল্লাহ- বঙ্গবন্ধুর পর, সায়েমের অপসারণ এবং ক্ষমতা অপহরণ, ২৯-১১-৭৬এ প্রধান সামরিক শাসক এবং ২০-৪-৭৭এ জোর করে এবার রাষ্ট্রপতির পদ। 'হ্যাঁ-না' ভোটের প্রতারক সে, **জাতির উপরে একটার পর একটা ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ এবং সর্বনাশের আইওয়াশ, 'হ্যাঁ-না' ব্যঙ্গ ভোট করে ক্ষমতার চূড়ান্ত দুর্বৃত্তায়ন। শেষ খেলায় সায়েমকে ক্যু করে, হ্যাঁ-না ব্যঙ্গ ভোট। হিন্দুদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রের**

বাইরে রেখে, তাদের ভোট দান। আমার বাবা ও মা এবং মৃত ঠাকুরদা'র ভোট দান। বাংলার ভালো মানুষগুলো এভাবেই সর্বনাশকে ভালবাসতে শিখেছিলো। আজ এতোবছর পর, 'হ্যাঁ-না' ভোটের কথা মনে পড়ে। সেন্টারে যাওয়ার পথে বাধা, ভোট দেয়া হয়ে গেছে। এমন কি যারা মৃত। জিয়া একাই সেই সার্কাস যা গল্প করার মতো। সার্কাসের বাদর যা দেখার মতো। তখন আমি ছাত্রী, বেশ মনে আছে। দেশ জুড়ে রাজকুমার জিয়া, তার পক্ষে জনমত গড়ে উঠেছে, জিব্রাইল সে, মহান সে, বীর সে, নবী সে, খুনি নয়– দরবেশ! তার দুই ডানায় জিব্রাইল এবং অন্যান্য ফেরেস্তাগণ। তার ছবি ছাড়া কোন ছবি নেই– টেলিভিশনে, রাস্তাঘাটে। সর্বত্রই জিয়া। খালকাটা জিয়া। ইটভাঙ্গা জিয়া। মাটিকাটা জিয়া। বঙ্গবন্ধু সব ছবি নামিয়ে সর্বত্র এবার জিয়ার ছবি প্রদর্শন। তাকে বঙ্গবন্ধু করার জেহাদী আন্দোলন। তার পেছনে মৌলবাদের বিপুল শক্তি যারা তাকে জিয়া হতে সাহায্য করেছিলো। জিয়া দেশের উপর জুলুমবাজি করে, দেশকে সর্বনাশের ঘরে পৌঁছে দিয়ে খুন হলো। তার মৃত্যু কি আরো আগে হলে জাতির জন্য তা মঙ্গলজনক হতো না?

রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখক ৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত সেনাপ্রধান একরকম নিস্ক্রিয়ই ছিলো। ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, জীপ চালাতে চালাতে ডালিমের কাছে ১৫ই আগষ্টের সকালেই জানলো, "এ অভ্যূত্থান বহুদিনের ফসল। ...আপনি কি করে জানেন, এ বিষয়টি নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা এবং প্ল্যানিং হয়নি?" এখানেই লেখক বলেছেন, 'ল্যাগেসি অব ব্লাড' বইতে উল্লেখিত কথা, "বিশেষ করে ফারুকের সঙ্গে অভ্যূত্থানের পরিকল্পনা পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের আলোচনা, সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং তাদের মধ্যে এই অভ্যূত্থান নিয়ে আলোচনা।" এখানেই অপুরুষ শফিউল্লাহ আরো যা বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার মাস্টার মাইন্ডার– জিয়া। এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মোস্তাক ও সায়েমের ক্ষমতা অপহরণ প্রমাণ করেছে, স্বাধীনতা হত্যার মাস্টার মাইন্ডার– জিয়া।

১৫ই আগষ্টের খবর শুনে জিয়া বলেছিলো, "তাতে কী?" লেখকের রিমাইন্ডার, ভোরের কাগজে তার কমান্ডার কাপুরুষ শাফায়েত জামিল, বলতে ভুলে গিয়েছিলো, হত্যার খবর শুনে জিয়া ছিলো সম্পূর্ণ শীতল এবং প্রতিক্রিয়াহীন, যে কথাটি সে বলেছিলো– লেখককে। লেখক জানিয়েছেন, কমান্ডারের স্মৃতির ঘাটতির কথা। এবং "ল্যাগেসি অব ব্লাড" থেকে যে উদ্ধৃতিটি দেয়া হলো, তা হুবহু মিলে যায় অশোক রায়নার বই "ইনসাইড র দ্য স্টোরি অব ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস" এর সঙ্গে। জিয়া তার নিজভবনে বসে ফারুক, রশিদ, ও ভন্ডবীর ওসমানীর সঙ্গে হত্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতো। নীলনকশা আঁকতো। একবার নয়, বহুবার। নিজ বাড়িতে বসে জিয়া তাদের থেকে ক্যু'র ধারণা নিতো। রেফারেন্স এবং প্রক্রিয়া ইত্যাদি। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, পৃঃ ৮৮-৯০, ১০২, ১১৮]। এইসবই এখন জাতির সামনে বিচারের অধীন এবং আসামীর কাঠগড়ায়।

জিয়ার ষড়যন্ত্রের নীল নকশাসহ অন্যান্য প্রমাণ নিয়ে আসা 'র‍্য'-এর পরিচালক মি. কাও'কে বঙ্গবন্ধু সেদিন অবিশ্বাস করেছিলেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকিকেও অবিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জিয়া তার সন্তানের মতো। একাজ সে করবে না। এবং '৭১এর ছদ্মবেশী আইএসআই এজেন্ট জিয়া সেই কাজটাই করেছিলো। এবং রক্তাক্ত অধ্যায়ের লেখকও গোপনে সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন, যেমন ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এরকম ঘটনায় তার আশান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক। এবং টু দ্য পয়েন্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক। সুতরাং ডালিমের কথায় অনেকের জড়িত থাকার ব্যাপারটায় যৌক্তিকতা থাকতে পারে।" এইখানেই চলে আসে– আইএসআই ও সিআইএ থিওরি। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে এই লেখক, অনেকে বলতে বুঝিয়েছেন, ডালিম-জেনারেল ওসমানী-ফারুক এবং জিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক চক্রটির কথা। বোস্টার এবং ভুট্টো চক্র। যে চক্রটির কথা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামও বলেছেন খুব পরিষ্কারভাবে। লেখক সেটা গোপনে বোঝালেও, পরিষ্কার। তিনি কেন তা গোপনে বুঝিয়েছেন সেটাও পরিষ্কার। কে চায়, আমার মতো নিজের বিপদ এবং সমস্যার জঞ্জাল? সেই সঙ্গে বলতে হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈন্যগুলোর মধ্যে অধিকাংশই চায়নি বাংলাদেশ। এরা চেয়েছিলো, অখণ্ড পাকিস্তান। ফলে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে, এদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ষড়যন্ত্র। এরাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দেশে-বিদেশে সিআইএ এবং আইএসআই, এদের হয়ে শুরু করে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক এবং দেশী কর্মকাণ্ড। এমনকি রণক্ষেত্রের সেক্টর কমান্ডার ছদ্মবেশেও। বঙ্গবন্ধু খুনিদের অধিকাংশই এই গ্রুপের, যারা বাংলাদেশ চায়নি। সুতরাং '৭১ এবং পরবর্তী '৭৫ এর সকল কর্মকা যা, এইসব সৈন্য পরিচালিত এবং পরিকল্পিত, প্রমাণের আর বাকী রাখে না যে, এরাই সেই ষড়যন্ত্রবাদী চক্রটি যারা জিয়া, রশিদ, ফারুক, এরশাদ... যারা বাংলাদেশকে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য দায়ী। আজকের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নয়। স্বাধীনতার বদলে অর্জন জিয়ার মতো সর্বনাশ। বেগম জিয়ার মতো গডমাদার। হেরোইন ও কোকেইন জিয়ার মতো দুর্বৃত্ত।

কোন মুক্তিযোদ্ধা, ঘাতক-দালাল আইন বতিল করবে? কোন পিতা তার কন্যাকে ধর্ষকের হাতে তুলে দেবে? একথা ঠিক নয় যা রক্তাক্ত অধ্যায়ের ৯ম পৃষ্ঠায় আছে। "শেখ মনির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে ৬০টি জেলায় গভর্নর নিয়োগ কিংবা বাকশাল করা অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা ঠেকাতেই ১৫ই আগষ্টের জন্ম।" একথা ঠিক নয়। কারণ '৭৫-এর ২৮ আগস্ট তারাই নিয়োগ করলো ৬১ জন গভর্নর। সুতরাং শেখ হত্যার যেকোন থিওরিই বাতিল। শেখ হত্যার একমাত্র কারণ, '৭১এ জিয়াকে অর্জন। এদেশ স্বাধীন হয়েছিলো, জিয়া পরিবারকে স্বাধীনতার সুফল খাওয়াতে। স্বাধীনতার একমাত্র অর্জন– জিয়া পরিবার!

১৫ই আগষ্টের জন্ম কেন হয়েছে– 'তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে' পরিষ্কার যে, ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ প্রো-পাকিস্তানি জিয়া, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রটির খলনায়ক। হত্যার নীলনকশা তৈরি করতে '৭৪এ খুঁজে পেয়েছিলো, একই সঙ্গে '৭১ এ ব্যর্থ বোস্টার ও ভুট্টোর হাত। '৭৪ এ কিসিঞ্জার-ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরকালে হত্যার সকল রসদ রেখে যাওয়া। আইএসআই এবং সিআইএ যারা করবে হত্যাকান্ড। যার হাত, যাদের হাতে, খুন হবে মুজিব, তারাই কি রশিদ-ফারুকের সঙ্গে মিলিত হওয়া, জিয়াউর রহামন নয়? রশিদ-ফারুক-জিয়া এরা কারা? এরা কি সব সিআইএ রিক্রুট নয়? সারারাত হত্যাকান্ড পরিচালনা শেষে, সকাল বেলায় যে জিয়া প্রতিক্রিয়াহীন, যারা বলে, মোশতাকই খুনি, তারা ষড়যন্ত্রকারী জিয়ার ষড়যন্ত্রের কতোটুকু জানে? তারা স্বেচ্ছায় জ্ঞানপাপী। জিয়া একজন– '৭১ এর সর্বনাশ শুধু তার কারণেই সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশ আবার পূর্ব পাকিস্তান। ফের সামরিক শাসন এবং আইয়ূবের অত্যাচার। সে জন্ম না নিলে, বাংলাদেশের বুকে '৭১ এর শত্রুপক্ষ স্বাধীনতা বিরোধী বাংলার নাৎসী রাজাকারেরা কক্ষনো মন্ত্রী, এম.পি হতো না। স্মৃতিসৌধে নিজামীর কলঙ্ক হাতের ফুল পড়তো না। পায়ের তলে শহীদের লাশ চিৎকার করতো না। এই প্রক্রিয়ার শুরুই হতো না। এসব তথ্য বইপুস্তকে বিস্তর লিখেছে অনেক লেখক। কিন্তু যারা রাজনীতি করে, তারা এসবের একটি লাইনও পড়ে না। তাই তারা রাজনীতির বদলে আজেবাজে তর্কবিতর্ক করে। জিয়া না জন্মালে, এদেশ সোনার বাংলা হতো। সুতরাং জিয়ার মৃত্যুতে কেন এদেশ সোনার বাংলা নয়, সেখানেই প্রশ্ন, কে এই খালেদা? এরাই সেইসব স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যারা '৭১এর ২৪শে মার্চ থেকে বারবার প্রমাণ করছে, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায় নি। তারা চেয়েছে পাকিস্তানের আদর্শে আমাদের সংবিধান, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সামাজিক জীবন-ব্যবস্থা। তারা '৭১ থেকে '৯৬ অব্দি একটানা প্রমাণ করে গেছে এরাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র, বারবার যারা মুক্তিযুদ্ধকে ঘৃণা করেছে। তারাই, পুনর্বাসিত করেছে '৭১ বিরোধী শক্তিগুলোকে দেশের সবখানে। তারা '৭১এর প্রতিশোধ নিয়েছে উলঙ্গভাবে। আজ স্বাধীনতা বিরোধী চক্রটিই সবচেয়ে শক্তিমান। মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষে করে, রিক্সা চালায়, যৌনকর্মীও হয়েছে। জিয়াউর রহমান, সব সেক্টর কমান্ডারদেরকে জাতির কাছে কলঙ্কিত করেছে। সব সেক্টর কমান্ডারগুলো জিয়ার অপরাধে নির্বাক কেন? সব ষড়যন্ত্রকারী জাতীয় বেঈমান, মীর শওকত, শফিউল্লাহ...।

স্বাধীনতার ঘোষক কে? "আমি কেন স্বাধীনতার ঘোষক নই" এই বইটিতে মেজর (অব:) সুবেদ আলী ভূঁইয়াও পরিষ্কার বলেছেন, "কেন জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক নয়।" তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, "ঘোষণা দিয়ে মার্শাল ল' জারি করা যায়, দেশ স্বাধীন করা যায় না।" ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "জনাব হান্নান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালের অপরাহ্নে ২টায় সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ...এম.এ হান্নানের সেই

ঘোষণার ২৯ ঘণ্টা পর, ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটে কালুরঘাটের রেডিও স্টেশন থেকে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। এই ঘোষণাটি প্রচার হয়েছিলো ২৭ তারিখের সন্ধ্যা থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত। মেজর জিয়া তার প্রথম দিনের (২৭ মার্চের) ঘোষণায় নিজেকে "হেড অব দ্য স্টেট" অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। কিন্তু পরের দিন, অর্থাৎ ২৮, ২৯, ৩০শে মার্চ তার কণ্ঠে যে ঘোষণা প্রচারিত হয়, তাতে "শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে" স্বাধীনতার কথা বলেন। ...যতবার না ঘোষণাটি জিয়াউর রহমান পড়েছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি পড়েছেন শমসের মবিন চৌধুরী (বর্তমানে এক্স পররাষ্ট্র সচিব)।"

তার মানে কি এই যে, জনাব চৌধুরীকেই বরং বলবো, "স্বাধীনতার ঘোষক?" না। জনাব মবিন, জিয়ার মতো এই কলঙ্কে নিজেকে জড়াননি। স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে প্রোপাগান্ডা যা, বাংলা নাৎসী দলের শ্লোগান, জিয়াকে যারা খুশি করতে প্রস্তুত, তার বেগমকে যারা আত্মহারা করতে বদ্ধপরিকর, সেইসব জামাত রাজাকারপন্থী এবং অমুক্তিযোদ্ধাদের সৃষ্টি এসব বিশেষণ। দুর্নীতিবাজদের পদলেহন, বিনিময়ে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার বাণিজ্য। স্বাধীনতার ঘোষক নামের বিভ্রান্তি, পুরো মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করেছে। বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতে, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলে, বেগম জিয়ার পায়ের উপরে তার বুদ্ধিদাতা ব্যাস্টিারদের তৈলমর্দনের জন্য জিয়ার নাম সংযোজন আর হিটলারের মৃত্যুকূপকে অভিনন্দন? স্বাধীনতার ঘোষক শব্দটিকে জিয়াই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলো, বঙ্গবন্ধু ইমেজ নষ্ট করতে ও নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে।

৬৬ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, "মেজর জিয়া প্রথম দিনের ঘোষণার পর দ্বিতীয় দিনের ঘোষনায় বঙ্গবন্ধুর নামটি সংযোজন করেন।" সুতরাং একটি কথা স্পষ্ট যে মেজর জিয়া তার ১ম স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেছিলো, "...আমি মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিনশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মির চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।" ৬৮ পৃষ্ঠায় "তারপরও যদি কাউকে তর্কের খাতিরে একান্তই 'স্বাধীনতার ঘোষক' হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে তার প্রথম দাবীদার হিসাবে উচ্চারিত হবে, এম.এ. হান্নানের নাম।" স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বেলাল মাহমুদেরও একই কথা। সুতরাং শুরু থেকেই সব ক্ষেত্রে জিয়ার বঙ্গবন্ধু হওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পরিষ্কার। তার অত্যাচারের কারণে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন উপসেনাপ্রধানের পদ। তাহেররা বাধ্য হয়ে দোষী করলো উপসামরিক প্রশাসক। ৭ই নভেম্বরে সে রেডিওতে প্রথমেই নিজেকে ঘোষণা করেছিলো প্রধান সামরিক শাসক। জিয়ার ক্ষমতার দুর্দান্ত লোভ, ভুট্টোকেও হার মানায়। '৭২এ সেনাপ্রধান পদের জন্য ষড়যন্ত্র এবং নীরব বিদ্রোহ। এরপর থেকে ক্রমাগত হত্যার পর হত্যা করে ক্ষমতা ভোগ। বাংলার প্রতিটি ইঞ্চি থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার সব প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন। বিস্ময়কর যে, বেগম জিয়া ২০০৪ সনে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৩য় খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায়

মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার নামে, বঙ্গবন্ধুর নামটি তুলে দিয়ে যোগ করেছে সেই ঘোষণাটি– "প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা, আমি মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ... ।" এবং এই জঘন্য কর্মকাণ্ড বারবার বাংলার বুকেই ঘটে। মীরজাফর। জিয়া। বেগম জিয়া। মুক্তিযুদ্ধ? কিসের মুক্তিযুদ্ধ? কিসের জেড ফোর্স? এস ফোর্স? সব ভূয়া। সব অপ্রয়োজনীয়। বেগম জিয়ার অপপ্রচার, বাংলার মানুষ জিয়ার ঘোষণায় যুদ্ধ করেছে। [দ্রঃ ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া, পৃঃ ৭৯-৮২, ১ম সংস্করণ]।

বিশ্বাসঘাতক জাতির, চরিত্রহীন ও মিথ্যাবাদী '৭১-এ পাকিস্তানিদের লোলিটা, আইএসআই বেগম জিয়া, উলঙ্গ হয়ে তার স্বামীর নাম প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে দলিলভুক্ত করলো। মীরজাফরের উদাহরণ এবার পলাশী থেকে ঢাকা। দলিলপত্রে এই বাণীর সংযোজনের তীব্র প্রতিবাদে লেখক বলেছেন, "এই মিথ্যা ভাষ্য কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না" (পৃষ্ঠা নং-১০)। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" বইটিতে লেখক সিরাজউদ্দিন আহমেদ অবশ্য ৩৪১ পৃষ্ঠায় ইতিহাস শুদ্ধ করতে বলেছেন, "২৭শে মার্চের পর জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘোষণাটি সাবেক মন্ত্রী আব্দুল কাসেম খান তাকে সঠিকভাবে লিখতে বাধ্য করেন।" সুতরাং এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, জিয়া একজন ঘোর পাকিস্তানবাদী আইএসআই এবং কেন বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে পারে। জিয়ার প্রভিশনাল হেড বলে দলিলপত্র নিবন্ধীকরণ আর গোয়েবলসকে সম্বর্ধনা দিয়ে মিত্রবাহিনীর কামান স্যালুট – এক। জিয়া এবং তার বেগম, '৭১এর সেইসব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রো-পাকিস্তানিদের ক্লাইভ। এরাই রণক্ষেত্রের মীরকাসিম। মুক্তিযুদ্ধের অভিশাপ ছাড়া এরা পার কিছু নয়। জিয়ার ক্ষমতার লোভ, ভুট্টোকেও উৎরে গেছে। যে ভুট্টোর জন্য '৭১এ ৩০ লক্ষ শহীদ, ল্যাগেসি অব ব্লাড-এ জিয়ার লোভের একটি নকশা প্রমাণ দেবে, জিয়া ভুট্টোর চেয়ে নোংরা ও দুধর্ষ।

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানে ক্ষমতা দখল (স্বাধীনতার ঘোষণা-বিজয় অতপর, লেখক: সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, পৃঃ ২২৩-২২৪)

"নির্বাচনের ফলাফল ছিল পূর্ব নির্ধারিত। জেনারেল জিয়ার অভূতপূর্ব বিজয়। কিন্তু অতীত এবং বর্তমানে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ১৯৭৮ সালের এপ্রিলের নির্বাচনে জিয়া বিধিগতভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হননি। তার প্রার্থিতা যে বৈধ ছিল না সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ১৯৭৮ সালের ১৮ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৭৮ অধ্যাদেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার জন্য বৈধ হইবেন না, যদি তিনি–

১. পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন, অথবা

২. সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন, অথবা

৩. কখনও এই সংবিধানের অধীনে অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

সংবিধানে বলা আছে যে, আইনের দ্বারা পদাধিকারকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

জিয়া সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন যে কারণে সংবিধান তার ওপর অযোগ্যতা আরোপ করেছে। এ বাধা অতিক্রম করার জন্য ১৯৭৮ সালের ২৯ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয় ঘোষণা (ত্রয়োদশ সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৭৮ জারি করেন।

দ্বিতীয় ঘোষণায় বলা হয়েছে

১. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে।

২. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবেন না।

এ আদেশ দ্বারা তিনি মুক্তি পাননি। পরিষ্কারভাবে তিনি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। নির্বাচনে তিনি অযোগ্য ছিলেন, সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জেনারেল জিয়া ১৯৭৮ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেননি। এ সময় তিনি ৮ মা পিছনের তারিখ– এপ্রিল ১৯৭৮ দেখিয়ে জেনারেল এরশাদকে ডেপুটি সিএএস নিয়োগ করেন। সংবিধান বাধা অতিক্রম করার জন্য জিয়া হাতে লিখে পিছনের তারিখ দেন।

১৯৭৯ সালে জিয়া কতকগুলো ভুল গেজেট প্রকাশ করেছিলেন।

২৮-২-১৯৭৯ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা নিজেকে লেঃ জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেন।

০৯-৪-১৯৭৯ তারিখে পূর্বের নোটিফিকেশন বাতিল করে ২৮-৪-১৯৭৮ তারিখ হতে লেঃ জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়।

০৯-৪-১৯৭৯ তারিখে আর এক আদেশে জিয়াকে ২৯-৪-৭৮ তারিখ হতে অবসর গ্রহণ দেখানো হয়েছে।

এত সুস্পষ্ট কুকর্ম, বেআইনী কাজ আর হতে পারে না। কার্যকরী তারিখ হলো যে তারিখে আদেশ জারি হয়েছে– যথা ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৯ এপ্রিল ১৯৭৯। উভয় তারিখ প্রমাণ করে যে, জিয়াউর রহমান স্বীকার করেন যে, ১৯৭৮ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত কর্মরত সামরিক অফিসার ছিলেন– বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাই ছিলেন। জিয়া পিছনের তারিখ দেখিয়ে পদোন্নতি ও অবসর গ্রহণ করেছেন। কারণ সিএমএল হিসেবে তিনি

সবকিছুই করতে পারতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার জন্য তিনি পিছনের তারিখ দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না। নমিনেশন দাখিলের শেষ দিন চলে যাবার পর সিএমএলএ হলেও পিছনের তারিখ দিয়ে যোগ্য হতে পারেন না। সুতরাং ১৯৭৮ সালের জুন মাসে তার নির্বাচন ছিল বেআইনী এবং অসাংবিধানিক। নির্বাচনকালে জেনারেল ওসমানী ও তার দলগুলো সেনাবাহিনী হতে জিয়ার পদত্যাগ দাবি করেছিল।"

এই প্রমাণ, কি প্রমাণ করলো?

নির্বাচন নিয়ে জিয়ার ঐতিহাসিক কারচুপি, পদ দখল এবং পদ বদল।

আজ ইতিহাস শুদ্ধির বড়ো প্রয়োজন। জিয়া মারা যেতে পারে, কিন্তু তার দানব এই প্রমাণ, কি প্রমাণ করলো? ইমেজ মরেনি। স্বৈরাচারের মহা-অভ্যুত্থানের ইমেজ। তার গড়া একটি বিশাল নাৎসী বাহিনী রয়ে গেছে যারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী এবং একাধিকবার ক্ষমতায় গেছে। এই পার্টি গড়ে উঠেছিলো এবং বড়ো হয়েছে, জিয়ার আওরঙ্গজেব চরিত্রকে কেন্দ্র করে এবং ভিত্তি করে। মৃত জিয়ার সততা এবং ভাঙ্গা স্যুটকেস রাজনীতি। যার ভেতরে রাজাকারী মেশিনপত্র আর নাটবল্টু। আমার কথা আওরঙ্গজেব মহৎ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষমতার লোভ পরিষ্কার না হওয়া যায়। পিতাকে বন্দী করে ভাইকে খুন? জিয়াও সেই দিল্লীরই আওরঙ্গজেব, যার অর্থ নয়, চাই ক্ষমতা। জিয়া, ভাঙ্গা স্যুটকেস নিয়ে চলাফেরা করলেও ক্ষমতার স্যুটকেসটি তার ভরা। সে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অটুট রাখতে, হাজার হাজার অভ্যুত্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাকে দুই হাতে খুন করেছে। (দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড; ক্যু এক্সিকিউশন মিউটিনি)। ইতিহাস কথা বলবে। কেন বলবে না? আওরঙ্গজেব ক্ষমতার লোভে সহোদর দারাশিকোর মুণ্ডুকর্তন করে পিতা সম্রাট শাহজাহানকে একটি থালায় করে সেই মাথা উপহার দেয়ার ইতিহাস তো জাতি ভুলে যাবেই। এই জাতি যে মীরজাফরের বংশধর! জিয়া, '৭১এই তার লম্পট আওরঙ্গজেব চেহারাটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলো। এই জাতি মূর্খ এবং জ্ঞানপাপী। এরা রাজাকারদের রুটি হালুয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এরা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে উল্লাস করে। এরা তাহেরকে খুন করে, মুক্তিযুদ্ধকে করে অবৈধ সন্তান। এরা জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাকে ১ম ঘোষণা বলে প্রচার করে।

ক্ষমতা অত্যন্ত বাজে জিনিস। ক্ষমতা মানুষকে হায়েনা করে, আওরঙ্গজেব এবং জিয়া করে। পৃথিবীতে ক্ষমতা না থাকলে, অস্বাভাবিক জিয়াও হতে পারতো স্বাভাবিক। সম্রাট আওরঙ্গজেব জীবিকার জন্য সেলাই করতো কোরানের সূরা লেখা টুপি, হাতে লিখতো কোরান শরীফ। আবার প্রয়োজনে ভাইয়ের মুণ্ডু কেটে ক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং পিতাকে আমৃত্যু বন্দী। জিয়ার পাক-আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিলো– পাকিস্তানপন্থী বিএনপি দল। সুতরাং বিএনপি-তে বিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষের জন্য বাংলা ইদিআমীনের এই ইতিহাস শুদ্ধি আজ অনিবার্য কারণ, যতদিন তারা না জানবে

আসল জিয়ার চরিত্র, ততদিন এদেশ '৭১এর প্রেতাত্মা মুক্ত হবে না। ততদিন এদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কলুষিত করতে, বারবার ইতিহাস বিকৃত হবে লম্পট জিয়াইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। ততদিন এদেশ একটি ভুল থিমে চালিত হবে। অর্থাৎ "স্বাধীন দেশের পরাধীনতার আর্কিটেক্ট জোট সরকারে রাজাকার আলবদর থাকলে তাতে সাংবিধানিক সমস্যা নেই।" অর্থাৎ এদেশের সংবিধানে গণহত্যাকারীদেরকে বৈধ করা হয়েছে এবং তা স্বাধীনতাসমম্মত। এইসব ভুল শিক্ষা বিকৃত দলিলপত্র ভবিষ্যতে কি ধরনের নাগরিক সৃষ্টি করবে? এদেশের মানুষ '৭১ এর গণহত্যা কেন ভুলে গেছে? আমরা কি 'জু'দেরকেও বলবো, আমাদের মতো অতীত ভুলে যাও! হিটলারকে মেনে নাও? জিয়া এদেশের যুব সমাজকে বিপথগামী করেছে। জিয়া এদেশে স্বাধীনতার সুফল – ব্যর্থ করেছে।

দেশের সর্বোচ্চ আইন, সংবিধান, এতে কতোবার সন্ত্রাসী করেছে জিয়া? একে আজ জিয়ামুক্ত করার জন্য প্রয়োজন– সংবিধানে জিয়া শুদ্ধি অভিযান। সংবিধান টেরোরিস্ট জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে সংবিধান; যাকে, কলুষিত করবে না আর কোন জিয়া বা বেগম জিয়ার পাকিস্তানি মলম। জিয়া কখনোই বিদ্রোহ করেনি, সে ভান করেছিলো। না হলে, মুক্তিরাই তাকে খুন করতো ২৫শে মার্চ রাতে। জিয়ার কলঙ্ক উদ্ধার না করলে, '৭৭-এর গণহত্যার বিচার না করলে, আমরা এই সেনাবাহিনীকে বলবো, পাকবাহিনী। তারাও জিয়ার মতো নষ্ট, বলবো? একটা পুলিশের কুকুরকে যখন প্রোটকল অনুযায়ী দাফন করা হয়, খালেদের জন্য গর্ত? সে কি খুনি? বঙ্গবন্ধুর জন্য ৫৭০ সাবান এবং পুতে ফেলা! কে এই জিয়া?

প্রতিটি মানুষেরই একজন আদর্শ থাকে– জিয়ার আদর্শ আওরঙ্গজেব। যে নাকি প্রতিপক্ষ যেকোন কাউকেই দুই হাতে খুন করে বাকী সময় বসে বসে নিজ হাতে কোরান শরীফ লিখে অন্ন জোটায়। কি অদ্ভুত মোঘল থেকে ঢাকার ট্রেন! কি অদ্ভুত এই ভাঙ্গা স্যুটকেস থিম, যেখানে ক্ষমতার সব উপকরণ বন্দুকের নলে– ঠাসা। আজ জিয়া পরিবারের সম্পদ সারাবিশ্বে। আমার শহরে, টিনের ঘরের এক যুবক আজ ৪০০ কোটি টাকার মালিক। কারণ, তারেক জিয়া তার গডব্রাদার আর খালেদা গডমাদার। জিয়া পরিবার দেশজুড়ে সৃষ্টি করেছে ক্যাডারবাহিনী। দেশের যুবসমাজ, ক্যাডার। তাদের হাতে অস্ত্র, ড্রাগ, কালো টাকা।

এদেশ গোলাম আজমের জন্য নিষিদ্ধ সত্ত্বেও, কিভাবে সে এদেশে ফিরে এলো? এইসব গণহত্যাকারীর পুনর্বাসনের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজন, মৃত জিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করে মামলা তুলে তাকে খুনির লাইমলাইটে এনে এই বাংলা মীরকাশিমের ইতিহাস পুনরুদ্ধার। প্রমাণ করা, সে এককভাবে খুনের মাস্টার মাইন্ডার। তার ১০ বছরের ইতিহাসই সাক্ষী, জিয়া কি কি করেছিলো। অপরাধের দীর্ঘ তালিকা খুব সোজা। কেসটি সাজানো মোটেও কঠিন নয়। ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু করে '৮১ অব্দি

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা খুন। তার হাতে নিহত প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অনেকেই জীবিত। তাহের ও খালেদের স্ত্রীও জীবিত। তারা মামলা করতে পারে, 'ক্রাইম এগেইনেস্ট হিউম্যানেটি'র। সেজন্য সব জিয়া ভিকটিম পরিবারকে এক হতে হবে। এবং তা সম্ভব। দেশজুড়ে তৈরি হোক– জিয়া ভিকটিম পরিবার। আজ এক্টিভিজম বড়ো বেশি জরুরি। এইসব বিধবাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে, এক্টিভিজমে। কেন নয়? জিয়ার হাতে সৃষ্ট বধ্যভূমির একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করছে আনোয়ার কবির নামক একজন সাংবাদিক। আপনাদের উচিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ। মানবাধিকারভঙ্গকারী জিয়াকে মাফ করে দিলো মুক্তিযোদ্ধাদেরক ঘৃণা করা হবে। আমি বিশেষ করে সেক্টর কমান্ডার পরিবারকে বলছি, আপনারা সেনাপ্রধানের কাছে বিচার চেয়ে আবেদন করুন। প্রয়োজনে আন্দোলন করুন, খুনির বিচার চেয়ে।

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জিয়ার মানসিক জগৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আওরঙ্গজেবের মতো জিয়া, ক্ষমতা এবং একজন অত্যন্ত প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তি। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড]। '৭১-এর ২৭শে মার্চ সে নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে উল্লেখ করে যে ভাষণটি দিয়েছিন, তা তার নিজহাতে পরিবর্তন করা। অর্থাৎ একজন সেক্টর কমান্ডার হওয়ার পূর্বেই সামান্য মেজর সে, যুদ্ধক্ষেত্রে পালিয়ে বেড়ানো, তার উপরে যথেষ্ট সিনিয়র থাকা সত্ত্বেও, কারো সঙ্গেই যোগাযোগ না করে, ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির কাছে নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা। কোন সেনা অফিসারেরই এই ক্ষমতা নেই, স্বাধীনতার ঘোষণা করা। [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান]। মুক্তিযুদ্ধরত একটি জাতির জন্য সেটা হতো অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং নেতৃত্বের হঠাৎ এই পরিবর্তনের ঘোষণায় একটি যুদ্ধ ওলটপালট হয়ে যেতে পারতো। রণাঙ্গনে তারা অস্ত্র ফেলে দিতে পারতো। এরকম একটি যুদ্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের কমান্ড না থাকলে, সে যুদ্ধ কক্ষণোই সফল হয় না। সেনা অফিসার জিয়ার সেই ক্ষমতা না থাকলেও, ২৭শে মার্চ নিজেকে সে 'রাষ্ট্রপতি' প্রমাণের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। জিয়া সেদিন, পুরো যুদ্ধকে নষ্ট করতেই কি এই ঘোষণা দিতে প্রস্তুতি নিয়েছিলো? তার আগে, শুরুতেই রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমকে সিজফায়ারের হুকুম! ওপারে অন্যান্য ব্রি-পেট্রিয়েট পরাবৃত কনফেডারেশন ষড়যন্ত্রী মোশতাকের মতো, কালুরঘাটে সেকি যুদ্ধ নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করেনি? নাকি, পাকিস্তানের স্বার্থে, পাকসারজামিনসাদবাদ এর স্বার্থে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে অন্যপথে ধাবিত করে নিজেকে করতে চেয়েছিলো অখ পাকিস্তানের বঙ্গবন্ধু। জিয়া সেদিন তার মিশনে সফল হলে, মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা কোথায় দাঁড়াতো? পাকিস্তানের পক্ষে মোশতাক যদি পূর্ব ষড়যন্ত্র মাফিক উপদল করে জাতিসংঘে গিয়ে, সিআইএ'র হাত ধরে সত্যি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো, কি অবস্থা হতো! সুতরাং এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় দুই বাংলায় দুই জিয়ার মোটিভ। অর্থাৎ শুরু থেকেই যারা সিআইএ, যারা এদেশের রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলো। মোশতাক এবং জিয়া– একের মধ্যে দুই। অর্থাৎ

টু-ইন-ওয়ান। এবং দু'জনেই রাষ্ট্রপতি হয়েওছিলো, এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে খুন শেষে ইঁদুর মোশতাকের বিরুদ্ধে হায়েনা জিয়ার ক্যু। সাজানো ৭ই নভেম্বর এবং ৩রা নভেম্বরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নৈরাজ্যতা এবং ষড়যন্ত্রের কাজে, অপুরুষ তাহেরদেরকে অপব্যবহার। জিয়ার জন্য '৭৫ থেকে '৮১ এক বিশ্বাসঘাতক – পথ। এবং এই পথ প্রমাণ করেছে, জিয়া স্বাধীনতা বিরোধী, নিঃসন্দেহে। সে চেয়েছিলো অখ পাকিস্তানের সর্ব ক্ষমতা। ১৯৮১এর ৩০শে মে তার বঙ্গবন্ধু হওয়ার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। জিয়া বেঁচে থাকলে, বাংলা বাঁচতো কী?

যুদ্ধ শেষে, সেনাবাহিনীতে নম্বর যুক্তিতে জিয়ার টার্ন সত্ত্বেও শফিউল্লাহ্কেই সেনাপ্রধান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ফলে জিয়ার ষড়যন্ত্রবাদ এবং অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তিনি তৈরি করলেন, উপসেনাপ্রধান পদ। জিয়া যা কক্ষণোই সহজভাবে মেনে নেয়নি। [যেমন মেনে নেয়নি উপসামরিক শাসকের পদবী]। এবং সেনাপ্রধানের পদের জন্য জিয়া বারবার তাহের এবং অন্যান্যদেরকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নিকট লবি করেও ব্যর্থ হয়েছিলো। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন]। সেই প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতির লক্ষ্যে তখন থেকেই খুনিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে অভ্যুত্থানের জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিটিং। সাংবাদিক জনাব গাফফার চৌধুরী '৭৫এ তার সঙ্গে মার্কিনী এবং পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পেয়ে বঙ্গবন্ধুকে জানান। এবং এদের ষড়যন্ত্রের হাত ধরে জিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেনাপতি এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান সামরিক প্রশাসক, তিনটেই হয়েছিলো যা ২য় কোন মুক্তিযোদ্ধাই করেনি। জিয়াকে সমর্থন দিয়েছিলো বোস্টার, কিং ফয়সাল এবং ভুট্টো। সুতরাং একথা সহজেই বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধু যেদিন শফিউল্লাহ্কে সেনাপ্রধান করেছিলো, জিয়া মনে মনে সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, সম্রাট শাহজাহানের পরিণতি। জিয়া '৭১এর ২৫শে মার্চ রাতে প্রমাণ করেছিলো সে মুক্তিযোদ্ধা নয়। সে বিদ্রোহ করেনি, ভান করেছিলো। তার ভীষণ উত্তাপিত ফাঁপা বেলুনটা ফেটে গিয়েছিলো ৩০শে মে ১৯৮১তে।

আওরঙ্গজেবের চরিত্রধারী এই শাসক ছিলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর যাকে তুলনা করা যায় ইতিহাসের আরো অন্যান্য স্বৈরাচারদের সঙ্গে যারা ইদি আমীন ও হিটলার। হিটলার এবং ইদি আমীন, এই দু'জনেই মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অসুস্থ! অসুস্থ বলেই তারা যে সমস্ত কাজ করতে পেরেছিলো, সাধারণ মানুষ করবে না। ইতিহাসে তারা চিহ্নিত করা হয়েছে ঠান্ডা মাথার খুনি। আমার সংগ্রহে সেসব ইতিহাস রয়েছে। তবু জিয়ার বেলায় কেন সে মহৎ নেতার চরিত্র? জিয়া উদ্যানের নামে ঢাকার বুকে কেন মক্কা শরীফ? ঢাকার বুকে হজের মাঠ! কেবলা! তাকে নবী বানানোর পায়তারা! তার জন্য ২৫০ কোটি টাকার হেরেম শরীফ! এবং এদেশেরই মানুষ পথেঘাটে কুকুর বেড়ালের মতো অভাবে দুর্ঘটনায় মারা যায়? কিভাবে? জিয়াকে নবী বানানোর জন্য ঢাকার বুকে তার কেবলা তৈরির ২৫০ কোটি টাকার হিসেব রয়েছে তার দলের জঘন্য প্রবৃত্তির ব্যারিস্টাদের কাছে যারা তার ধূর্ত অশালীন স্ত্রী খালেদার

পদলেহন করে হাতিয়ে নেয়– রাষ্ট্রের গুদাম। স্খলন করে তাদের ক্ষমতার পাশবিক বীর্য। খালেদা জিয়া, ক্ষমতালোভী ব্যারিস্টারদের দুর্নীতির – বীর্যথলি।

হিটলারের মতো জিয়া নিজেকে করেছিলো মহা-দানব। আইনের উর্ধ্বে সে– খাল কাটা আইওয়াশ আন্দোলনের প্রবক্তা, রাজাকারদের খাল। এবং সে রাজাকারদেরকে সঙ্গে করে বারবার পদ বদল করে ক্রমান্বয়ে হতে পেরেছিলো সেনাপ্রধান, সামরিক শাসক প্রধান, রাষ্ট্রপতি, তিন মন্ত্রণালয়ের প্রধান। একাধিকবার দুটো তিনটে করে পদ দখল। যা ইতিহাসের অন্য কোন খলনায়ক করেনি। ইদি আমীনও করেনি। অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা তো নয়ই-ই। কেউ নয়। জিয়া ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ, অস্থির ও অসংলগ্ন। ভুট্টোর জারজ সন্তান। ভুট্টো পেয়েছে তার পাপের শাস্তি জিয়ার আগেই। জিয়া পেয়েছে অনেক পরে, জাতিকে রাজাকার দিয়ে বিনাশ শেষে, পুরো মুক্তিযুদ্ধের চেহারা পাল্টে দেয়ার কয়েক বছর শেষে। আজ নির্বাসিত খুনিরাও পরিতাপ করে, জিয়াকে বিশ্বাস করে। ৩০শে মে '৮১ আরো কতো আগে আসা উচিত ছিলো? সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন, আপনাকেও যদি চয়েজ দেয়া হয়, জিয়ার দৃষ্টান্ত কি আপনি রাখবেন? তাহের হত্যার মতো, আপনি কি পারবেন, নির্বিচারে মুক্তিযোদ্ধা খন করতে? আপনি কি জিয়াকে ঘৃণা করেন? সে তো আপনার সেনাভাই, যে তাহের-খালেদ-হুদা-হায়দার... খুন করেছে।

মোশতাক-শফিউল্লাহ্-খালেদ মোশাররফ-তাহের-রাষ্ট্রপতি সায়েম সকলকে, হয় হত্যা, নয়, পদচ্যুত করে নিজে একা কেড়ে নিয়েছিলো সবার পদ, এবং কৌশলে নিজেকে জাতির চোখে করেছিলো ভাঙ্গা স্যুটকেসের মালিক। জিয়া, একাধারে সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি। কিংবা প্রধান সামরিক শাসক এবং রাষ্ট্রপতি। অথবা ডেপুটি সামরিক শাসক এবং সেনাপতি। দলীয় প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি। বহুরূপী সে, একই অঙ্গে কতো ডজন রূপ! এবং একটি লোকের জন্য মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরে এতোগুলো বড়বড় ক্ষমতার আস্বাদন পাওয়ার সৌভাগ্য... জিয়া, বঙ্গবন্ধুই শুধু নয়, পরবর্তীতে অসংখ্য খুন এবং পরপর শফিউল্লাহ্ মোশতাক ও সায়েমকে পদচ্যুত করে তাদের সবার পদাভিষিক্ত হয়ে, নিজেই প্রমাণ করেছিলো বঙ্গবন্ধু খুনের নিরঙ্কুশ মাস্টার এবং মহা-স্বৈরাচারের চরিত্র সে। তবে অন্য একজনও যদি একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতো, তাহলে হয়তো একথা আমি বলতে পারতাম না। জিয়াই কি দেশের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি ছিলো? নাকি সে ছাড়া দেশে কোন মানুষই ছিলো না! কিংবা দেশজুড়ে সব চতুষ্পদী। আসল কথা, ডালিম-মোশতাককে সামনে রেখে, নিজে পেছনে থেকে সব খেলা খেলেছিলো জিয়া। গোয়েন্দাদের ট্রেনিং-ই তাই। আত্মগোপনতা। [দ্রঃবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]। জিয়া ডালিম এবং মোস্তাকেদেরকে অপব্যবহার করে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নিজেকে করেছে নবী! তার হেরেম শরীফ কথা বলে। কেবলা আজ ঢাকার বুকে ১০০০ কোটি টাকার– জিয়া উদ্যান। হ্যালো! দেশের মানুষগুলো কি সব চতুষ্পদী? তাই তারা বঙ্গবন্ধুর খুনিকে নবী করেছে? তার নবী উদ্যানে হজ্জ্ব হয় সারাবছর ধরে? আর

রেডক্রসের কাফন পড়া বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে থাকে অজপাড়াগাঁয়ে যেখানে একমাত্র রাজনৈতিক কারণ না হলে যাওয়া হয় না। মানুষ ভুলে গেছে এই বিশাল ব্যক্তিত্ব, এশিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা।

ক্ষমতা পেতে হলে আত্মীয়, বন্ধু এবং পিতাকেও খুন করা চাই। শুধুই কি তাই? ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে আরো চাই, দানবশক্তি। কারণ ক্ষমতা হলো অবৈধ সন্তানের মতো। ক্ষমতা মানুষকে অমানুষের চূড়ান্ত বিন্দুতে নিয়ে উন্মাদ করে ছাড়ে। ক্ষমতা, হিটলার তৈরি করে। জার কিংবা স্ট্যালিন সৃষ্টি করে। আর এই বাংলার অবৈধ সন্তানের বিরুদ্ধে ১৯টি ক্যু, এইসব বিপদ রুখতে হলে জিয়ার চাই আরো বেশি ক্ষমতার বিস্তার এবং যেকোন মূল্যে নিষিদ্ধ অপশক্তিকে এদেশে বৈধতা দান। চাই, মুক্তিযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব। যারা ১৬ই ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত জাতিসংঘে গলদঘর্ম হয়েছে। আমেরিকা চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরব। সুতরাং বঙ্গবন্ধু যাদেরকে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে অবৈধ ঘোষণা করেছিলো, সেইসব রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদেরকে এদেশে ফের রাজনীতির সুযোগ দিতে, সংবিধান খণ্ডনা করা কতোটা জরুরি ছিলো জিয়ার জন্য? খুনিদেরকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা, '৭৫-এর দালাল আইন বাতিল, '৭৯-এ তা আইনে রূপান্তর, তার জন্য কতোটা জরুরি! হ্যালো! ততোটা, যতোটা প্রয়োজন পার্টিকে নাৎসীর শক্তি দিতে। ...জিয়ার এসব কুকার্যকলাপই প্রমাণ করে তার মনোজগৎ কতো বেশি অসুস্থ। উম্মাদ কুকুরও তার চেয়ে সুস্থ। হয়তো সে আত্মকেন্দ্রীক একজন স্কিটজোফ্রেনিক– যার মনের জগত তাকে খুনের প্ররোচনা দিতো। মনোজগতের এই ধরনের রোগিরা কানে প্রেতপুরীর কথা শোনে। না হলে, সে নিম্নোক্ত নাৎসী তুল্য কাজগুলো কি করে সম্ভব করলো যেজন্য জিয়াসিফিলিসে ভুগছে দেশ, যা শুধু একজন উন্মাদ এবং ম্যানিক সাইকোটিক রোগির পক্ষেই সম্ভব! জিয়া কি হিটলারের মতো সাইকোসিসের রোগি নয়? না হলে, সে কেন দেশে এতো বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বাদ দিয়ে কিংবা দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে ভালো কাউকে বিবেচনা না করে ওয়ার ক্রিমিনাল শাহ আজিজকে করলো প্রধানমন্ত্রী? ঘাতক-দালাদেরকে মন্ত্রী বানালো? পাকিস্তানপন্থীদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে এলো? মোস্তাফিজুর রহমানের মতো পাক এজেন্টকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মারহাবা! মারহাবা! হ্যালো! গোলাম আজম, শাহ আজিজ, মাওলানা মান্নান, আব্দুল আলীম, আব্বাস আলী খান, খোন্দকার আব্দুল হামিদ, মন্ত্রী? সাকা চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদ এবং জুলমত আলী খানের মতো নিষিদ্ধ এবং বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হাতের পিশাচেরা বিএনপি'র মন্ত্রী-এমপি? একি সম্ভব? নাকি অসম্ভব? কিভাবে নিজামী সাভার স্মৃতিসৌধে রাখলো তার পাকিস্তানের মল ভরা পা? খালেদার বাম পাশে – নিজামী? এই খুনি নিজামীর প্রমাণ চাই? '৭১এর আর্কাইভ কি–নেই? সংগ্রাম পত্রিকা? হ্যালো! আর কতো বাঙালি খুন হলে, নিজামীর গাড়িতে বাংলার পতাকার যথেষ্ট অবমাননা হবে? এবং সেজন্য দায়ী জিয়া পরিবার। তারা দিয়েছে মায়ের

জড়ায়ুতে সন্তানের শিশ্ন। শুধু একজন উন্মাদ এবং পেশাদার খুনির পক্ষেই সম্ভব নিম্নোক্ত কর্মগুলো সম্পাদন।

'৭২এর সংবিধানের চারটি মূলনীতি – জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। জিয়ার অপকর্ম এবং দুস্কৃতিকারীর হাত যাকে রক্তাক্ত করেছিলো। জিয়া, সংবিধান টেরোরিস্ট।

দেখুন, জিয়া সিরিয়ালঃ– [সৌজন্য রাজাকার-আলবদর-আলশামস]।

১. ১৯৭২-এর ১৫ই ডিসেম্বরে জারিকৃত নাগরিকত্ব আইন বাতিল। দালালদের জন্য অবৈধ নাগরিকত্ব বৈধকরণ।

২. ১৯৭২-এর ৪ঠা নভেম্বর সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ, বিশ্বের একমাত্র ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দেশ বলে সুনাম অর্জন করে। এমন কি আমেরিকা ও ভারতেরও যা নেই। '৭৬এ জিয়া সেটাকে সংশোধন করে ধর্মীয় রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী দল রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে '৭১এর খুনি ইয়াহিয়ার প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানের মতো বাংলার "গিয়ারিং"ও ছিলো, '৭৯তে যারা ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারিভাবে বৈধ হয়েছে। [দ্রঃ গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট]। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে কার পায়ে তৈল মর্দন? মৌলবাদীদের জন্য বাংলাদেশ?

৩. ৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদে, দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচনের অধিকারকে বাতিল আইনকে আইএসআই জিয়ার সংশোধন। দালালদেরকে সব নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। ৩৬ হাজার বন্দী, দালাল, যারা আটক এবং বিচারাধীন। যারা চিহ্নিত এবং চিহ্নিত হওয়ার কার্যক্রমের আওতায়। জিয়া, ক্লাইভদের হুকুমে সংবিধানকে রক্তাক্ত করেছে এভাবেই। '৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বরের গেজেটের পর, সারা বাংলাদেশের ঠাসা জেল– শূন্য হতে শুরু করলো।

৪. '৭৩-এর সাধারণ ক্ষমার অধীনে যারা ক্ষমার অযোগ্য, সেইসব হাজার হাজার ধর্ষক, খুনি এবং অগ্নিসংযোগকারীদেরকে রাজনৈতিক বন্দীর পদবী দিয়ে মুক্তির জন্য '৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে গেজেট, '৭৬-এ পাইকারী হারে মুক্তিদান। (১২ হাজার আনুমানিক), যারা শাস্তিপ্রাপ্ত কিংবা বিচারের অপেক্ষায়, যার মধ্যে ড. শহীদুল্লাহ কায়সারের ঘাতক সাজাপ্রাপ্ত খালেক মজুমদার অন্যতম। খালেক মজুমদার জেল থেকে বেরিয়ে গেলো সরাসরি প্রো-পাকিস্তানি এবং মৌলবাদী জিয়ার কারণে এবং গণহত্যাকারী জেলখাটা খুনি আলীম চৌধুরী হলো জিয়ার রেলমন্ত্রী। **হ্যালো! আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। কিংবা আত্মহত্যা করি, নয়তো পতাকা পুড়িয়ে দেই।**

৫. '৭৩-এর ২৪শে এপ্রিলে নিষিদ্ধ খুনি যেমন– নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরি, গোলাম আজমদের নাগরিকত্ব বৈধ করার অপরাধ। গোলাম আজমকে জামাতের অদৃশ্য আমীর হতে দেয়ার অপরাধ। তাকে বিনা ভিসায় দেশে থাকতে দেয়ার অপরাধ। তাকে বিচার না করার অপরাধ।

৬. একদিকে '৭১এর মুক্তিযোদ্ধা খুনের সূচনা অন্যদিকে '৭১এর দালাল-ঘাতকদেরকে বৈধকরণ প্রক্রিয়া। জিয়া ১৮ই এপ্রিলে জারি করা ৪৪ নিষিদ্ধ নাগরিকের পক্ষে– সংবিধানে চাকু চালিয়েছিলো, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

৭. ১৯৭২-এ প্রণীত শাসনতন্ত্রের মূল অবকাঠামোতে পরিবর্তন করে '৭৬-এ ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সর্বনাশ। দেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব আমদানী। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ সংযোজন। সংবিধানে ইসলাম সংযোজন এবং ইসলামী শব্দাবলী দিয়ে একে মুসলমান বানানো। সংবিধানকে আল্লাহ এবং অন্যান্য ইসলামীকরণ। বাঙালির বদলে বাংলাদেশী। সমাজতন্ত্র যা সৌদি ও মার্কিনীদের শত্রু, ধর্মনিরপেক্ষতা যা সৌদি ও পাকিস্তানের শত্রু। পাকিস্তান ও আমেরিকা যারা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, '৭১ থেকে চীনের সঙ্গে পিং পং দূতিয়ালিতে নিবদ্ধ। চীন-আমেরিকা, '৭১কে কেন্দ্র করে এই প্রথম, শত্রু ফেলে, বন্ধু হলো। '৭৪এ কিসিঞ্জারের চক্রের সঙ্গে রি-প্রেট্রিয়েটসহ জিয়া গ্রুপের কিলিং ম্যাপ, সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র তুলে নেয়ার পূবশর্তই ছিলো ১৫ই আগস্ট, প্রকৃত অর্থে যা, '৭১এরই প্রতিশোধ। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সৌদির পূর্বশর্ত ১৫ই আগস্ট।

৮. '৭২-এর সংবিধানে গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশে সামরিক শাসন। যেজন্য মুক্তিযুদ্ধ, সেই স্বৈরাচারী আইয়ূব, ইয়াহিয়ার শাসনই ফিরিয়ে আনা। সামরিক আইন জারি করে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় নির্মূল করে ফেলা। বাংলাদেশে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার চেয়ে দীর্ঘ সামরিক শাসনের প্রবর্তক সে। ৩০ লক্ষ প্রাণের অর্জনকে অবৈধ করা। মুক্তিযুদ্ধকে জারজ করা। জারজ সন্তান দিয়ে স্বাধীন দেশে রাজাকার এবং মৌলবাদের চাষাবাদ। সাভার বধ্যভূমিতে নিজামীর পাকিস্তানি মলযুক্ত পায়ের তলে ৩০ লক্ষ শহীদের লাশ। সারা দেশজুড়ে জিয়ার সৃষ্ট নতুন বধ্যভূমির রাজাকারী রেনেসাঁস।

৯. ১৯৭৩-এর ১৫ই জুলাইতে প্রথম সংশোধনীর ৪৭ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে ৩৫ ও ৪৪ ধারাতে বর্ণিত যুদ্ধাপরাধীদের মৌলিক অধিকার ভোগের অনধিকারকে বাতিল করে অধিকারে পরিবর্তন, যা একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য সম্ভব।

১০. মুজিবকে রক্ষা না করা, খুনিদের সঙ্গে বৈঠক এবং অবৈধ রাষ্ট্রপতিকে গ্রেফতার বা হত্যা না করে, নিরাপত্তা দান। অবৈধ মোস্তাকের সেনাপ্রধান। সেনাবাহিনীকে বিষাক্ত করা। দেশজুড়ে নৈরাজ্যবাদ এবং নাশকতায়, বিষাক্ত জাসদ এবং নাশক গণবাহিনীকে

নৈরাজ্যের প্ররোচনা দান। লিফলেট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার। বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান করার ষড়যন্ত্র। সংবিধান ইঞ্জিনিয়ারিং। দেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর চিহ্ন মুছে ফেলার ঘোষণা। জেল ও শেখ হত্যার বিচার রহিত।

১১. সেনাপ্রধানকে নিষ্ক্রিয় রেখে ৯ দিনের মাথায় চার জাতীয় নেতাদের জেলে প্রেরণ, ১০ দিনের মাথায় সেনাপ্রধানকে পদচ্যুত করে পদ দখল। অবৈধ রেজিমকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান। বঙ্গভবনে, সেনাভবনে নিয়মিত মিটিং। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রোপ্রাগান্ডা প্রচারের জন্য সর্বহারা, জাসদ এবং তাহেরগংদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত। দেশের মধ্যে নৈরাজ্যবাদ, নাশকতা সৃষ্টি। বঙ্গবন্ধুকে বাকশালে বাধ্য করা। পরবর্তীতে এই দেশকে দুর্নীতিবাজ দেশে পরিণত করা।

১২. '৭৫এর মার্চের ২০ তারিখে সেনাবাসে বসে খুনি ফারুকের সঙ্গে গোপন বৈঠক এবং তারপর দীর্ঘ ৪ মাস ধরে লেঃ কর্নেল ওসমানীসহ অন্যান্য খুনিদের সঙ্গে নিজ ভবনে বৈঠক করে শেখ হত্যার নীলনকশা। [দ্রঃ অশোক রায়নার বই, ইনসাইড র্য।]

১৩. ২৪শে আগষ্টে নিজে সেনাপ্রধান হওয়ার পরেও খুনিদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। ৪ জাতীয় নেতাকে কেন্দ্রীয় জেলে প্রেরণের ১ দিন পর ডেপুটি থেকে সেনাপ্রধান হতে আবার ক্যু। সেনাপ্রধান হয়ে, সব ক্ষমতা সত্ত্বেও খুনিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীকে নিয়োজিত না করা এবং অবৈধ রাষ্ট্রপতিকে গ্রেফতার না করা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং অস্ত্র ভান্ডারে খুনিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি না করা। বঙ্গভবন থেকে খুনিদেরকে বিতাড়িত না করা। খুনিদের সঙ্গে মন্ত্রীসভার বৈঠক। সেনাষড়যন্ত্রের জন্য তাহেরগংদেরকে উস্কানি। লিফলেট রাজনীতি যা নৈরাজ্য কায়েমে সেনাবাহিনীতে অদৃশ্য হুলিয়া উস্কানি এবং নিরস্ত্র খুনিদেরকে দেখামাত্র গুলি না করে সেনাকোড ভঙ্গ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সেনাবাহিনীতে দুস্কৃতকারী রি-প্রেট্রিয়েট চরদের ষড়যন্ত্র জেনেও গ্রেফতার থেকে বিরত থাকা। ১৯৭৬এর ২৯শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল মালেকসহ ১০ হাজার আওয়ামী নেতাকর্মী গ্রেফতার এবং সায়েমের ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্যু করে সিএমএলএ হওয়া। অপ-আওয়ামী ভণ্ডবীর ওসমানীকে ব্যবহার করে ৭ই নভেম্বরকে সংহতির রূপ দেয়ার ভ্রষ্ট চেষ্টা। বোস্টার এবং ফারুকগংদের মাস্টার মাইন্ডার। ১৫ই আগস্ট, এবং ৩ ও ৭ই নভেম্বর সৃষ্টি। ক্ষমতা দখলের অভিনব ষড়যন্ত্রবাদ যা একমাত্র জিয়ার পক্ষেই সম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশকে মৌলবাদের দেশে রূপান্তর এবং অপরাধের সরকার বলে বিশ্বের কাছে এদেশের পরিচিতি। খুনিদের দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস পরিচালনার ধৃষ্ঠতা। এই গডফাদার যার ল্যাগেসি, রক্তপাত এবং গডফাদার এবং গডচাইল্ড সৃষ্টি করে দেশকে অপরাধের নরক করা।

১৪. ১৫ই আগষ্টের প্রত্যুষে সেনাপ্রধানকে কনসাল্ট না করে, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিলকে সন্দেহজনক নির্দেশ, "তাতে কী? ভাইস জীবিত। প্রথম বেঙ্গলে

চলে যাও।" সেনাপ্রধানের নির্দেশ অমান্য এবং অন্যান্যদেরকে নিষ্ক্রিয় রাখা। শফিউল্লাহকে সিজ, ৪৬ ব্রিগেড ষড়যন্ত্র, খুনিদেরকে অস্ত্রদান। পুরো সেনাবাহিনীকে কলুষিত এবং কলঙ্কিত করা।

১৫. খুনিদেরকে সূর্যসন্তান আখ্যা এবং সশস্ত্রবাহিনীতে গণহত্যার ক্ষেত্র সৃষ্টি। বারবার সাজানো ক্যু এবং ব্যাপক মুক্তিযোদ্ধা হত্যা। মোশতাক সরকারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার অন্তরালে, ফের ষড়যন্ত্রের নতুন অভিযান। দেশকে মুক্তিযোদ্ধাবিহীন এবং রাজাকারদের জন্য রাজনীতির প্রবর্তন।

১৬. নিজে সেনাপ্রধান হয়েও চার জাতীয় নেতাকে গ্রেফতারকারী অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাক এবং খুনিদের হাত থেকে রক্ষা এবং জেল থেকে মুক্তি না দেয়ার দেশদ্রোহীতা। খুনিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বৈঠকসহ অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সেনাপ্রধান থেকে সেনা কোড ভঙ্গ এবং খুনিদের হত্যার বিচারে প্রতিবন্ধক, হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন, ইনডেমনিটি বিল সমর্থন। খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে এই বিষাক্ত বিলটিকে নিষ্ক্রিয় না করা। আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। বিদ্রোহ না করা। বরং ৫ম সংশোধনীকে আইন বানিয়ে, খুনিদেরকে সশস্ত্র করা।

১৭. দুই পাপেট রাষ্ট্রপতিকে সামনে রেখে, পেছনে থেকে নিজে রাষ্ট্রপ্রধানের সকল কর্ম অবৈধভাবে সম্পাদন। সায়েমকে সামনে রেখে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেজেট সম্পাদনার সকল অপকর্ম। মোস্তাক, শফিউল্লাহ, সায়েম অপুরুষদেরকে অপব্যবহার। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ক্যু। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

১৮. সৌদি ও পাকিস্তানের সঙ্গে প্রাগ '৭১এর সম্পর্ক স্থাপন, তাদের আর্থিক সাহায্য নিয়ে সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করা। রাজাকার বৈধ করার শর্তাবলী। গোলাম আজমকে বাংলাদেশের ভিসা প্রদান। ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও, অবৈধ সত্ত্বেও দেশে রেখে, বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যা বিচারের লন্ডন টিমের ভিসা বন্ধকরণ। গোলামকে ভিসা এবং শেখ হত্যার বিচার বন্ধ করার জন্য ভিসা অস্বীকার, দু'টি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ।

১৯. জঙ্গীবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ করে একাধিক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি। সৌদি, চীন ও পাকিস্তান, যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী। তাদেরই স্বার্থে বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যাসহ জিয়া, ইনডেমনিটি বৈধ করণের মাধ্যমে পুরো জাতিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো টেরোরিস্ট জাতি বলে পরিচিত করানো। জিয়া, স্বীকৃতির পূর্বশর্ত ১৫ই আগস্টকে সৌদির কাছে নিশ্চিত করেছে ৩৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের শর্তাবলী গ্রহণ করে।

২০. জিয়াউল হকের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব। রাজাকার পুনর্বাসন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতাদর্শে চালানোর ষড়যন্ত্রের বিনিময়ে জিয়ার দ্রুত ক্ষমতারোহণের বাস্তবতা।

২১. সিজিএস খালেদ মোশাররফের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে প্রতারণার শুরুতে ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের পর, সিজিএসসহ অসংখ্য অভ্যুত্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণহরণ। বীরদের লাশের অমর্যাদা। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বদলে চোরের মর্যাদা। চার সেক্টর কমান্ডার খুন। সেক্টর কমান্ডারদেরকে জাতির কাছে মলমূত্র করা। সেনাবাহিনীকে ঘৃণা বাহিনীতে পরিণত করা।

২২. বিপ্লবী তাহেরের সঙ্গে ক্ষমতার প্রতারণার শুরুতে ২৪শে নভেম্বর '৭৫এ তাকে গ্রেফতার, প্রায় ১০ হাজার বিপ্লবী সৈন্য গ্রেফতার, ১৭ই জুলাই ফাঁসির রায়, ৪ দিনের মাথায় ২১শে জুলাইয়ের মধ্যে তাহেরের ফাঁসি দিয়ে সমাজতন্ত্র বিরোধী আমেরিকাকে তুষ্ট। কম্যুনিস্ট কিউবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ বন্ধুত্ব, চা ও পাট বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিআইএ'র ক্ষোভ, মেহেনতি মানুষের স্বার্থে সামাজিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে '৭১এর প্রতিশোধ এবং বাংলাদেশে সিআইএ'র দ্বিতীয় বিজয়। [দ্রঃ মুজিব হত্যায় সিআইএ। লেখক, লিফসুলজ ও কাইবার্ড।] '৭১এর নৌ-কূটনীতি এবং জাতিসংঘে চরম ব্যর্থতার প্রতিশোধ। সমাজতন্ত্রবাদী তাহের হত্যা করে সৌদিকে খুশি করা। ইসলামের শত্রু সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু হত্যার ১০ দিনের দিন নিজেকে সেনাপ্রধানসহ আড়াই মাসে ডেপুটি সামরিক প্রধান হিসেবে উন্নীত করা। অপুরুষ রাষ্ট্রপতি সায়েমকে দুই দফায় অর্ধেক অর্ধেক করে কেটে আলাদা করে, ব্যুটআউট। ক্যাঙ্গারু রাষ্ট্রপ্রধান সায়েমকে নিষ্ক্রিয় রেখে সেনাপ্রধান ও ডেপুটি সামরিক প্রধানের ক্ষমতাবলে দেশের বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করে তা বারংবার স্ব-স্বার্থে ব্যবহার এবং দেশ জুড়ে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা বা বিরোধীশক্তিকে গ্রেফতার। মিডিয়াকে অপব্যবহার। রাষ্ট্রের টাকা অপচয় করে নিজেকে আওরঙ্গজেব আদর্শ প্রতিষ্ঠা। খালকাটা এবং ভাঙ্গা স্যুটকেস রাজনীতি। দেশের সংবিধানকে ভারতের অনুকরণ বলে অপপ্রচার, দেশের অশিক্ষিত বা মৌলবাদীদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা। সেনাবাহিনীকে ভারত-বিরোধী করে তোলা। ভারত ঘৃণার বীর্য বপন। দেশের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে মৌলবাদী করে তোলার বীর্যপাত।

২৩. ১৫ই আগষ্টের পর, একটি খুনিকেও গ্রেফতার না করে বরং পদোন্নতি এবং ৭ই নভেম্বরের পর, পালিয়ে যাওয়া ১৭ খুনিকে বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশ দূতাবাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি দান করে খুনিদেরকে পুরংকৃত করার নামে দূতাবাসে নির্বাসন এবং নিজে বিপদমুক্ত থাকার অভিসন্ধিতে নিজের জন্য ইনডেমনিটির দূর্গ ও '৭৯ তে একে বৈধতা দানের ধৃষ্টতা। দেশকে ইনডেমনিটিকরণ এবং গোলামাজমকরণ। গোলাম ও ইনডেমনিটিকে বৈধ করে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বিচারবিভাগের বুকে ছুরি।

২৪.৭ই নভেম্বরের পর, পালিয়ে যাওয়া খুনিদেরকে দেশে ফিরিয়ে না এনে বরং দূতাবাসে চাকরির ছলে বিদেশে নির্বাসন দিয়ে বিচার বিভাগের সঙ্গে প্রতারণা, খুনিদেরকে বিদেশে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ করার প্রতারণা। খুনিদেরকে দিয়ে

দূতাবাস পরিচালনা করে দেশকে বিদেশের কাছে হেয় করার রাষ্ট্রদ্রোহীতা। মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়কের খুনিদেরকে দিয়ে বিদেশে দেশের পরিচিতি? খুনিদের দূতের মর্যাদা দিয়ে বিদেশের সঙ্গে সংবিধান সমঝোতার মতো মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করা? বিচার বিভাগকে বুট-বেটনের প্রতারণা?

২৫. বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত করে কুখ্যাত ক্যাঙ্গারু কোর্টের প্রতারণা। সামরিক ট্রাইবুনালের ঘৃণা। একবার সেনাপ্রধান। আবার ডেপুটি সামরিক প্রধান সেজে দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করে ৭ই নভেম্বরের পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ভবিষ্যতের পথ নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে ডেপুটি সামরিক প্রধানের ক্ষমতার অপব্যবহার, সায়েমকে সামনে রেখে, দেশদ্রোহী জিয়ার কোর্ট মার্শালের প্রতারণা। গোপন বিচার কার্য। চোরের মতো লুকিয়ে দেশজুড়ে ক্যান্টমেন্টে সশস্ত্রবাহিনীতে দুই মাস ধরে জঘন্য মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকান্ড। আইনজীবী নেই। ট্রান্সক্রিপ্ট নেই। বিচারক হাওয়া। ৪ দিনের মধ্যে ফাঁসির অবিশ্বাস্য নজির। ড্রেনের মধ্যে ছেঁড়া মাথা! রক্ত! বন্দীদের দিয়ে বন্দী ফাঁসি! ফাঁসি দেখতে বাধ্য করা! বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী ও বিদ্রোহীকে মিথ্যা ট্রাইবুনালে খুন করে নিজের ক্ষমতার পথ নিরঙ্কুশ নিষ্কন্টক করা। দেশের মধ্যে একমাত্র জিয়া ছাড়া এই দৃষ্টান্ত কোথায়? জিয়া, হিটলারকেও পরাজিত করেছে, সাড়ে তিন হাজার বধ্যভূমির সৃষ্টি ও হেয়, দুটোই করে। বধ্যভূমিকে অস্বীকার করে গোলামকে বৈধ করেছে। শহীদ জননীকে পিটিয়েছে তার স্ত্রী। জিয়া, ২৫শে মার্চ '৭১এ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে প্রমাণ করেছে সে রাষ্ট্রদ্রোহী।

২৬. বঙ্গবন্ধুর পর, শফিউল্লাহ্, মোশতাক, খালেদ মোশাররফ, তাহের এবং রাষ্ট্রপতি সায়েম সবাইকে এক এক করে পদচ্যুত বা হত্যা করে এককভাবে দেশের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ।

২৭. ১৫ই আগষ্টের পর, মাত্র ১০দিনে ডেপুটি থেকে সেনাপ্রধান, ১১ সপ্তাহে ডেপুটি সামরিক প্রধান এবং সেনাপ্রধান, ১৫ মাসে সেনাপ্রদান এবং প্রধান সামরিক শাসক, ২০ মাসে অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক এবং সেনাপ্রধান হওয়ার মতো নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ট্রেইল এবং মহা-স্বৈরাচারের উদাহরণ। স্বাধীন দেশে পরাধীনতার সামরিক শাসন? একমাত্র জিয়ার মতো লম্পটের পক্ষেই তা সম্ভব।

২৮. '৭৭-এর ২রা অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পর, সরকারি হিসেবে ১১৪৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মাত্র ২/৩ মাসে দ্রুত ফাঁসি দিতে পুনরায় ক্যাঙ্গারু কোর্টে অসম্ভব দ্রুত বিচারকার্য করে ফাঁসির হুকুম দান, যে বিচার সে, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বেলায় বাধা দিলো দুটো বিচার কার্যক্রমের। যে গণহত্যা, সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধা শূন্য করতে, '৭৭এর দ্বিতীয় গণহত্যা, পাকিস্তানের স্বপ্ন পূরণ করে, সৌদি ও পাকিস্তানের জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ আমদানীর লক্ষ্যে বারবার সংবিধান সন্ত্রাসী। পরবর্তী পদক্ষেপ, দেশে '৭১এর যুদ্ধাপরাধীদেরকে দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করে অথ পাকিস্তানের আদর্শকেই বাংলাদেশে

ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশের সংবিধান ভারতের থেকে কর্জ নেয়া, হিন্দু সংবিধান বলে– অপপ্রচার এবং সেনাবাহিনীকে ফেপিয়ে তোলা। ৬নং সামরিক ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের ভিডিও ভাষ্য, তার প্রতি জিয়ার নির্দেশ– সবাইকে জবাই দাও। এবং সবাইকে গণ ফাঁসি না দেয়ার অপরাধে, তাকে অপসারণ। চেয়ারম্যান নিজেই জানে না, কেন তাকে ফাঁসির হুকুম লিখতে হবে।

২৯. বঙ্গবন্ধুর খুনিদের গ্রেফতার না করে নিজেকে কোর্ট মার্শালের আওতাধীন করা। সেনাকোড ভঙ্গের রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

৩০. ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সংবিধানে বারবার অপ্রয়োজনীয় এবং ষড়যন্ত্রমূলক সংশোধন করে সংবিধানের বুকে বিভিন্ন টেরোরিজম। রাষ্ট্রকে বিকিয়ে দেয়া '৭১এর শত্রুশক্তির হাতে। সৌদির সমর্থন আদায়ের জন্য ১৫ই আগস্ট নিশ্চিত করা। ১৬ই আগস্ট সৌদির স্বীকৃতিদান।

৩১. দেশদ্রোহীতামূলক সংশোধন শেষে সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রকে ক্ষমতায় এনে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশকে ফের দীর্ঘ আইয়ুব-ইয়াহিয়া সামরিক আইনের অন্ধকারের পথে ঠেলে দিয়ে প্রাগ '৭১ পরিস্থিতির উদ্ভাবন।। '৭২এর সংবিধানে নিষিদ্ধদেরকে বৈধ করে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। গ্রেফতার হওয়া এবং জেলখাটা খুনিদেরকে মন্ত্রীসভায় এনে, দেশদ্রোহীতা। সেক্টর কমান্ডারদের লাশ মর্গে পচিয়ে পোকামাকড় দিয়ে খাওয়ানোর দেশদ্রোহীতা। এইসব অপরাধের জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল কি খুব বেশি চাওয়া? আর কতো প্রমাণ হলে মৃত জিয়ার ফাঁসি হবে?

৩২. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতির সঙ্গে ঘোরতর প্রতারণা। '৭১এর ৪৪ নিষিদ্ধ যুদ্ধাপরাধীদের বৈধতা। নাগরিক অধিকার। রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা নাগরিকত্ব। ১৯৭৩এর ১৮ই জুলাই-এর ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন ভঙ্গ করে গোটা জাতির সঙ্গে প্রতারণা। মৌলিক অধিকারের ৩৫ ও ৪৪ ধারার রাষ্ট্রের সকল সুযোগ, নিষিদ্ধদের জন্য খুলে দেয়া। দালালদের ভোটাধিকার, নাগরিকত্ব, নির্বাচনে অংশগ্রহণ... করন। অনুচ্ছেদ রহিত ১২, ৩৮, ৬৬, ১২২ সব অনুচ্ছেদে সন্ত্রাসীর হানা।

৩৩. ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ ঘাতক-দালাল আইন সংশোধন করে প্রায় ৩৬ হাজার দালালকে জেল থেকে মুক্তিদান, যাদের মধ্যে অসংখ্য খুনি-ধর্ষক-অগ্নিসংযোগকারী। মাওলানা মান্নান ও খালেক মজুমদারের মতো সাজাপ্রাপ্ত নৃশংস খুনি, যারা ড. আলীম চৌধুরী ও শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুন করেছিলো– তাদের মুক্তি [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৮ম খ পৃঃ ৬২৭ এবং ৫৭৬, ২০০৪ সংস্করণ]। জাতিকে বিপথগামী করা যুবসসমাজকে নষ্ট করে দেয়া এ জিয়া, জাতীয় কলঙ্ক। আসুন আমরা পতাকা পুড়িয়ে ফেলি!

৩৪. গণহত্যাকারীদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করে রাজনীতিতে সক্রিয় করতে, বহুদলীয় রাজনীতির নামে '৭২ এর নিষিদ্ধ দলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত। এদের মধ্যে মুসলীম লীগ,

মুসলিম উম্মাহ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী, আলশামস, আলবদর, নেজামে ইসলাম...। যারা '৭১ এ সৃষ্টি করেছিলো, হাজার হাজার বাংলা বধ্যভূমির হাহাকার। জিয়ারাজাকার, যার দৃষ্টান্ত সে একা। গোলাম, তার সমান অপরাধ করেনি। জিয়া, একাই '৭১ এর পুরো পরাশক্তির সমান অপরাধে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়েছে, ৩১/১২/৭৫এ। এখন তার জন্য ট্রাইবুনাল খুব জরুরি। আমরা তার ফাঁসি দেখতে উন্মুখ। কারণ সে পুরো জাতিকে ফাঁসি দিয়েছে। সে পতাকাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের এক কাতারে স্থাপন করেছে।

৩৫. বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার বিচারের জন্য গঠিত দুটো প্রক্রিয়াকেই পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। ব্রিটিশ পক্ষকে বাংলাদেশে আসার প্রয়োজনীয় ভিসা দিতে ৬ বার অস্বীকার, প্রতিবাদী সাংবাদিক এন্থনীকে ব্যান, নিজেও জেল হত্যার বিচার না করে, খুনিদেরকে ইনডেমনিটির মাধ্যমে রক্ষা এবং বিচার বিভাগকে অপব্যবহার। হাইকোর্টের তিন বিচারক গঠিত কমিশনকে সাড়ে পাঁচ বছর ধরে তদন্তের অনুমতি দিতে অস্বীকার। একই সময়ে গোলামকে দেশে ঢোকার জন্য ভিসা প্রদানের রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তার উত্তরসূরী খালেদার হাতে গোলামের নাগরিকত্ব এবং শহীদ জননীকে লাঠিপেটার সব প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর নাম এদেশ থেকে মুছে ফেলার সব পরিকল্পনা।

৩৬. ৩৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে, গণহত্যাকারীদেরকে রাজনীতিতে আনার চক্রান্ত। গোলাম আজমকে ফিরিয়ে আনার জন্য '৭৩ এর ২৪শে এপ্রিল জারিকৃত সংবিধানের ৩৫ ও ৪৪ ধারা বাতিল করার অপরাধে অপরাধী জিয়া।

৩৭. ধর্মনিরপেক্ষতা সংশোধন করে সংখ্যালঘুদেরকে হেয়, তাদের নাগরিক অধিকার সংবিধান থেকে উধাও। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের ধর্মীয়কে অস্পৃশ্য এবং বিতাড়নের ব্যবস্থা। তাদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার অধিকার ক্ষুন্ন, জ্বালাও পোড়াও এবং হাত ও পায়ের রগ কেটে ফেলার রাজনীতির প্রবর্তন। গুপ্ত হত্যার রাজনীতি। দেশের সেনাবাহিনী ও যুবসমাজকে লম্পট করে তোলা। এদেরকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট অস্ত্র ও ড্রাগ দেয়া।

৩৮. দেশে নীরব ইসলামী প্রজাতন্ত্র চালু করার পদক্ষেপ। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায় বিচার অন্তর্ভুক্ত করে সৌদি এবং মার্কিনী স্বার্থ রক্ষা। সমাজতন্ত্র যা, পুঁজিবাদের শত্রু। ইসলামের শত্রু। আমি তার ফাঁসি দেখতে আমৃত্যু অপেক্ষা করবো। সে অব্দি আমি এই পরাধীন দেশের নাগরিক নই।

৩৯. এদের পারিবারিক গোরস্তান পাকিস্তানে কেন?

৪০. বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যা খুনিদের বিচার বন্ধ করতে কুখ্যাত বাতিল ইনডেমনিটি আইনকে ১৯৭৯'র ৫ই এপ্রিলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আইনে অন্তর্ভুক্ত। ইনডেমনিটির আগেই, অবৈধ মোশতাককে সেনাপ্রধানের ক্ষমতাবলে গ্রেফতার না করা, ইনডেমনিটির

পর ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যার মাধ্যমে মোস্তাকের অন্তরালে জিয়ার, ইনডেমনিটির উদ্দেশ্য এবং ষড়যন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট। ১৫ই আগস্ট, ৩রা এবং ৭ই নভেম্বরের ষড়যন্ত্রের জন্য ৪৬ ব্রিগেডকে সন্ত্রাস ব্রিগেড বানানো। হিটলারের প্রেতাত্মা, ক্যান্টমেন্টের বাঙ্কারে লুকিয়ে থেকে বাংলার হিটলার চালায় মুক্তিযোদ্ধা হত্যাযজ্ঞ। ক্যান্টমেন্টের গোপন মঞ্চে, জিয়ার হুকুমে ফাঁসির দড়ির গর্জে ওঠা আযানের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিউগলের নীরবতায় অপমৃত্যু, তাদের, যাদের অপরাধ, তারা মুক্তিযোদ্ধা। তাদের লাশ মর্গে পচে আর জিয়ার লাশ রাষ্ট্রের ১০০০ কোটি টাকার জমিতে। যেখানে বেগম জিয়ার বানানো কেবলা শরীফ। কিংবা জিয়াতাজমহল ২৫০ কোটি রাষ্ট্রের টাকায়, রাজনীতির দুর্নীতিবাজদের স্টুডিও বানানো যেন এইখান থেকেই জিয়াসন্ত্রাসীরা তাদের উপযুক্ত প্রেরণা পায়। জিয়ার প্রধান শত্রু মুক্তিযুদ্ধ। প্রথম শত্রু বঙ্গবন্ধু। প্রথম অপছন্দ, মুক্তিযোদ্ধা।

৪১. ৬ অনুচ্ছেদে বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশী পরিচয় প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি। হিন্দুদেরকে বাংলাদেশী আর ভারতীয় বিভাজনে ঠেলে দেয়া। মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঙালি ও বাংলাদেশীর সিলমারা।

৪২. দেশে তালেবানী শাসনের প্রাগ-সূচনা। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত।

৪৩. ১৯৭২-এর ১৫ই ডিসেম্বরের নাগরিকত্ব আইনের আওতার বাইরে, গোলাম আজম, নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরিসহ ৪৪ দালালদের বাতিল হয়ে যাওয়া নাগরিকত্ব যা ৭৩এর ২৪শে এপ্রিলে কার্যকর করা হয়, পুনর্বহাল করতে জিয়া কর্তৃক '৭৮-এর ৫ই এপ্রিল নিষিদ্ধদের জন্য নাগরিকত্ব আইনটিকে কুপ্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে সংশোধন এবং মন্ত্রণালয়কে নির্দেশদান এবং '৭৯ এর ৫ই এপ্রিলে আইন, গণহত্যাকারীদেরকে নাগরিকত্ব দান করে নিজেকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শনাক্ত করা। '৭৮এর ১১ই জুলাই গোলাম আবার বাংলাদেশের মাটিতে রাখলো তার রক্তভরা রাজাকারী পা। অর্থাৎ, গোয়েবলস এর প্রত্যাবর্তন। জার্মানীরা কি করতো? মৃত জিয়ার জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল না হলে, বাংলাদেশ মিথ্যা। পতাকা মিথ্যা। এবং যেদিন তার ফাঁসি হবে, বাংলাদেশ অতঃপর স্বাধীন হবে।

৪৪. আবারো আরেক ধাপ ভণ্ড এই পীর তার লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে '৭৭-এর ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েমকে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতাহীন করে অবসরে বাধ্য করে নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে এবার সেনাপ্রধানসহ একাধারে প্রধান সামরিক শাসকসহ অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ দখল, ক্ষমতার সর্বোচ্চ নম্বর রেকর্ড, ২২শে এপ্রিলে শুরু হলো তার সংবিধানে টেরোরিজম এবং '৭৭-এর ৩০শে মে তারিখে প্রহসনের "হ্যাঁ-না" রাষ্ট্রপতির ভোট গ্রহণের নির্দেশ দান করে যেকোন ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হ্যাঁ এবং না! হ্যাঁ? না? হ্যালো! এজন্যই কি মুক্তিযুদ্ধ? কিসের মুক্তিযুদ্ধ? মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, অপেক্ষা করছে। একটি নতুন দেশে জিয়ার এই ক্ষমতার অভিলাষ এবং দেশকে

রাজাকারের সুন্দরবনে রূপান্তরিত করে, দেশজুড়ে শুধু মানুষ খেকো রাজাকার-বাঘ। কেমন বাংলাদেশ? নাকি– জংলীদেশ? লেখক রুশদীর কথাই কি ঠিক? 'বাঙালিরা সব জংলি'!

৪৫. দেশকে পরিপূর্ণ ভারত বিরোধী বাংলাদেশ গড়ে তোলা। দেশে মাইনরিটির সংখ্যা কমে ৩৭ থেকে আজ ৭ ভাগ কেন?

৪৬. ২য় দফায় সায়েমকে বুট-আউট করার ৩০ দিনের মধ্যে 'হ্যাঁ-না' রাষ্ট্রপতির জোক, দেশজুড়ে 'হ্যাঁ-না' সার্কাসের ভোট, নিজেকে নিরঙ্কুশ বিজয়ী ঘোষণার ভাওতা, ভণ্ডবীর অপুরুষ খুনি ওসমানীকে বিরোধী পার্টি থেকে দাঁড় করিয়ে বিরোধীদলের নামে আই-ওয়াশ নির্বাচন। '৭৮-এর ৩রা জুনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ভোটকেন্দ্রে নিজের বিজয় সুনিশ্চিত করতে সব ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য দেশজুড়ে ক্যাডারবাহিনী সৃষ্টি। ছাত্রসমাজকে নষ্টকরণ। দারিদ্রের সুযোগ গ্রহণ করে জাতির মাথায় পচনের বিষ পোতা। বিএনপি নামের রাজনৈতিক দলের প্রথম লগ্নে, রাজাকার আলবদর-আলসামস মন্ত্রীসভা। গোলামকে দেশে ঢোকানোর আগে, ৫ই এপ্রিল '৭৮এ কু-প্রবৃত্তি তাড়িত এই টেরোরিস্টের হাতে আগাম নাগরিকত্ব সংশোধন। সব অপরাধ একত্রিকরণ। ৪৬ ব্রিগেডকে সন্ত্রাসীর হেড ব্রিগেড করে, দেশজুড়ে নাশকতা।

৪৭. সামরিক শাসক থেকে বেসামরিক হওয়ার চক্রান্তের সময় জাতিকে ধোকা দিয়ে এইবার এই বঙ্গ-আওরঙ্গজেব, যুদ্ধাপরাধীদেরকে নিয়ে করলো প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা গঠন। এদের মধ্যে শীর্ষ আলবদর-রাজাকার ও আলশামস যারা ১৯৭২-এর ২৪ জানুয়ারীতে জারীকৃত দালাল আইন পো নো ৮, ১৯৭২ অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. পো নো-৮, ১৯৭২ বাতিল করে দালালদেরকে নাগরিকত্ব, ভোট, সংসদের নির্বাচনের অধিকারসহ মুক্তিদান।

৪৯. মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের নির্বিচারে ফাঁসি এবং প্রহসনের জন্য ক্যাঙ্গারু কোর্ট স্থাপনের অপরাধ। সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধা নাম মুছে ফেলার আইএসআই ষড়যন্ত্রের অপরাধ। জেনেভা কোড ভঙ্গের অপরাধ। দেশদ্রোহীতার অপরাধ। সেক্টর কমান্ডারদের লাশ অবমাননার অপরাধ। তাদের লাশ পচানো। গণঘৃণা এবং লাশের মুখে থু-থু। জুতোপেটা। তাহের এবং খালেদের লাশ নিয়ে রাজনীতি। বীরউত্তম এবং বীরবিক্রমদেরকে খুনির মর্যাদা। মানবাধিকার ভঙ্গের চরম অপরাধ। সেনাবাহিনীকে জাতির কাছে খুনি বাহিনী করার অপরাধ। সেক্টর কমান্ডারদের ইমেজ মুছে ফেলার অপরাধ।

৫০. ফাঁসির রায় দেয়ার পর, কোনরকম উকিলের সুযোগ না দিয়ে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি কার্যকরের অপরাধ। ভিকটিমদের লাশ উধাও করার অপরাধ। ভিকটিমদের পরিবারের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার ভঙ্গের অপরাধ। সাক্ষীরা এখনো জীবিত। 'শ নয়, হাজার হাজার। [দ্রঃ '৭৭এর গণহত্যার ভিডিও প্রমাণ, সংরক্ষিত]।

৫১. '৭৫-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর জারিকৃত কুখ্যাত ইনডেমনিটিকে আইন করার অপরাধ। ১৫ই আগষ্টের খুনিদেরকে ইনডেমনিটির প্রটেকশনে রেখে তাদেরকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মচারি করে নির্বাসনের অপরাধ এবং দেশদ্রোহীতা। বদ্ধভূমি অবমাননার অপরাধ। স্মৃতিসৌধ অবমাননার অপরাধ। বিদেশে খুনিদের দ্বারা দেশকে মিসরিপ্রেজেন্টেশনের অপরাধ। নিজামীকে সাভারে পাঠানোর দেশদ্রোহীতা। ৪৬ ব্রিগেডকে নিজের অপরাধের ব্রিগেড করতে পুরো ব্রিগেডকে নষ্ট করা। সব হত্যকা র মূল এই ৪৬ ব্রিগেডকে "খুনিদের ব্রিগেডে" রূপ-দেয়া।

৫২. ৩ ও ৭ই নভেম্বরের ষড়যন্ত্রে ৪৬ ব্রিগেডকে অপব্যবহার।

৫৩. সেনাপ্রধানের ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতে খুনিদের সঙ্গে আপোষমূলক ব্যবহারের রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ। গণহত্যাকারীদের দিয়ে সাভার পরিদর্শন সম্ভব করে, সাড়ে তিনহাজার বধ্যভূমিকে নিজামীদের টয়লেটের মর্যাদা দানের অপরাধ।

৫৪. ৭৬-'৭৭-'৭৮-'৭৯-'৮০তে ক্যু'র অজুহাতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত অফিসারকে আপীলের সুযোগ দান না করে দ্রুত ফাঁসির অপরাধ। আপীলের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপরাধ। দ্রুত ফাঁসি দিয়ে ঘটনা লুকানোর অপরাধ। আপীলের অধিকার হরণের অপরাধ।

৫৫. মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের লাশ, কুকুরের লাশের মতো কবরের অপরাধ।

৫৬. ৭৭-এর ২২শে এপ্রিলের অধ্যাদেশ বলে শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে পাকিস্তানের আদর্শে পরিবর্তনের অপরাধ। দ্বিতীয় প্রক্লেমেশন জারীর মাধ্যমে ৩৮ অনুচ্ছেদে হামলার অপরাধ।

৫৭. জঙ্গীবাদকে দেশে প্রবর্তনের সুযোগ দিতে, চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা জুড়ে দেশ বিদেশের মৌলবাদীদের সুব্যবস্থার লক্ষ্যে রাজনীতির খৎনা এবং রাজাকারদের স্বার্থে রাজাকারী মৌলবাদীদের রাজনীতি প্রচলনের অপরাধ।

৫৯. (এক) ১৯৭৯-এর ৫ই এপ্রিলে সংসদে ৫ম সংশোধনীর নামে রাজাকার আলবদর এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের স্বার্থে এতোদিনের সকল বাতিল অধ্যাদেশগুলোকে অনৈতিকভাবে আইনে প্রণয়ন। দুই) গণহত্যাকারীদের পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রে ৫ম সংশোধনী। তিন) নিজেকে বিচারের উর্দ্ধে রাখতে ৫ম সংশোধনী। চার) জাতির সঙ্গে দেশদ্রোহীতার ৫ম সংশোধনী। পাঁচ) জাতির সঙ্গে ৫ম সংশোধনীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভাঙা স্যুটকেসের অপরাজনীতি। ছয়) জেলহত্যা ও বঙ্গবন্ধু খুনের দুটো তদন্তকারী টিমকে আমৃত্যু প্রতিহত করা। '৭৮এ বৃটেনের রানীর আইনজীবী টমাস উইলিয়ামসের ভিসা ৬ বার আটকানো।

৬০. খালকাটা আন্দোলনের নামে জাতির সঙ্গে আইওয়াশ-ব্রেইনওয়াশ প্রতারণা। মিডিয়ার অপব্যবহার। তিনটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হয়ে ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ব্যভিচার। '৭১

এ কিসিঞ্জার ভুট্টোর ব্যর্থতা, '৭৩এর নৈরাজ্যতা, '৭৪ এর ষড়যন্ত্র, ১৫ই আগষ্টের মাধ্যমে পাকিস্তানকে আবার ফিরিয়ে আনা। সামরিক শাসন জারি এবং সংবিধান রহিত। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং উর্দু সঙ্গীত বাজিয়ে ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান কায়েম। রাওফরমান আলীর স্বপ্ন পূরণ। যে সকল সচিত্র প্রতিবেদন আমরা '৭১এর সংগ্রাম, অবজারভার, ইত্তেফাকে দেখেছি, রাও ফরমান আলীর সঙ্গে নিজামী ও মাওলানা মান্নানসহ গোলামের যেসব বৈঠকের ছবি আমাদের কাছে আছে, তাদেরই '৭১এর অসম্পন্ন কাজে আবার নিয়োজিত হওয়ার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এই নরপশু।

৬১. চার দলীয় জোট, ক্ষমতা দখলের পর যে সকল দুর্বৃত্তগিরি করেছিলো, আইয়ুব-ইয়াহিয়া কি এর চেয়ে বড়ো অপরাধী? খালেদা জিয়া জোট সরকার করে বাংলাদেশকে অস্বীকার করেছিলো। আর কতো প্রমাণ চাই? জিয়ার অপরাধের তালিকার জন্য যথেষ্ট শক্তি আমার নেই। যতোটুকু করলাম, এর বিনিময়ে আমি তার মৃত্যুপরবর্তী ট্রাইবুনালে ফাঁসির নির্দেশ আশা করছি। ততোদিন আমি পরাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। ততোদিন এই সেনাবাহিনী ঘৃণাবাহিনী। ততোদিন এই পতাকা, জারজ পতাকা। ততোদিন এই মুক্তিযুদ্ধ, গোলামদের দাস।

জিয়া, বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করলেও ৭ম শ্রেণী থেকে পাকিস্তানে মানুষ। তার পিতা দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানকে বেছে নিলো কর্মক্ষেত্র হিসেবে। পাকিস্তান মিলিটারি গোয়েন্দা জিয়া, মুক্তিযুদ্ধে তার সন্দেহজনক ভূমিকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাদেশ যার অনুভূতিতেই নেই। পাকিস্তানে বড় হওয়া জিয়া, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো, গোপন অভিসন্ধিতে। একথা আমি বারবার বলছি। এরাই সেই প্রো-পাকিস্তানি গ্রুপ, যারা এরশাদ, ফারুক, রশিদ...। জিয়া কখন মুক্তিযোদ্ধা ছিলো? বরং সে গোপনে মুক্তিযোদ্ধা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত ছিলো! ১০ বছরে জিয়া, '৭১এর সব কারণ বিলুপ্ত করেছিলো। বঙ্গবন্ধুকে সে শারীরিক ও সংবিধানেও হত্যা করেছিলো। তাকে রাজাকার, গুন্ডা, ইত্যাদি উপাধী দিয়েছিলো।

সুতরাং দেশের এই পাকিস্তানিইজমের জন্য জিয়াকে এককভাবে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন সাপেক্ষে, কেন তার বিরুদ্ধে মৃত উল্লেখ করে মামলা হবে না? আমি দাবী করবো, ইতিহাস শুদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধের মমতার দিকে চেয়ে– জিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করে ফের তাহের ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। জেল হত্যার বিচার। গণ হত্যার বিচার। আমার এই বইটাই তো চার্জশীটের জন্য যথেষ্ট। জিয়াউর রহমান, যে নাকি বাংলাদেশকে করেছিলো রাজাকারদের চারণভূমি। যে দেশ বঙ্গবন্ধুকে চোরের দাফন-কাফন দিলো, আমি সেদেশের নাগরিক হয়ে, লজ্জিত।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারা যায় না। বিশ্বের অন্যান্য স্বৈরাচারী এবং খুনি শাসকদের মধ্যে একধরনের সাইকোটিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাদের ছোটবেলা

সম্পর্কে নানান ব্যতিক্রমী গল্প শোনা যায়। তাদের এই সর্বনাশা কার্যকলাপের পেছনে থাকে ছেলেবেলায় তাদের অস্বাভাবিক জীবন। বঞ্চিত, অত্যাচারিত বা সঙ্কট ও জিঘাংসার সংসার। জিয়াউর রহমানের ছেলেবেলা সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই। তবে, স্ট্যালিন হিটলার কিংবা পিনোশের মতো ঠাণ্ডা মাথার খুনিদের ছেলেবেলার ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, তাদের শৈশব কৈশোর ছিলো ভয়ংকর। ফলে এর প্রতিফলন, পরবর্তীতে আমরা তাদের সাইকোটিক ব্যবহারের মধ্যে দেখেছি যা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে, ম্যাসাকার। জিয়াউর রহমানের মধ্যে সাইকোটিক ব্যবহার কার্যত তেমন প্রকাশ না পেলেও 'ল্যাগেসি অব ব্লাড'-এ তা পরিষ্কার। লেখকের একটিমাত্র বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট। যেমন– "একাধারে জিয়া প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক শাসকের দ্বৈত টুপি পরে, প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা সময় নির্মমভাবে ব্যয় করতেন, নিজ হাতে লিখে এসকল দুর্ভাগা মানুষদের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতেন। ...এ ঘটনা ইতিপূর্বে উপমহাদেশের কোথাও ঘটেনি। এভাবে জিয়া, এক কলমের খোঁচায় দু'ডজনের বেশি ক্যাঙ্গারু কোর্ট প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতপক্ষে এক সাড়িতে দাঁড় করিয়ে অসংখ্যা সিপাইদের বিচার, দ্রুত শেষ করে তা কার্যকর করেছে। সামরিক কোর্টগুলো একজন অফিসার, একজন সুবেদার, একজন নায়েক সুবেদার, দুইজন হাবিলদার নিয়ে গঠিত। অথচ সামরিক মার্শাল কোর্ট সামরিক আইন অনুসারে ক্যাপ্টেনের নিচে কোন কর্মকর্তা সাক্ষ্য হতে পারে না। এভাবে জিয়া কয়েক হাজার সৈন্য হত্যা করেছে। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড]। "ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া" বইটেতেও বলা হয়েছে সে ছিলো নিঃসঙ্গ এবং বন্ধুহীন। কারো সঙ্গে কথা বলতো না। স্কুল শেষে সোজা বাড়ি। সেনাবাহিনীতে অত্যাচারী এবং ব্যভিচারী। বিশ্রি ব্যবহার। এবং এইসব চিহ্ন তার অস্বাভাবিকতার পরিচয় বহন করে। একজন সুস্থ মানুষ কি একাজ করতে পারে? দশ বছর ধরে লাগাতার খুন?

দিনের কয়েক ঘণ্টা এক নাগাড়ে একলা বসে লাল টুপি মাথায় একাএকা মানুষের মৃত্যুদ অনুমোদন, একজন সাইকোটিক রোগির ব্যবহারেরই পরিচয় বহন করে। অন্ধকারে বাঙ্কারে লুকিয়ে, হিটলারও এসবই করতো। বাঙ্কারে বসে জু'দেরকে পাঠাতো জ্বলন্ত চুল্লীর উদ্দেশ্যে– হাজারে হাজারে। মা ও সন্তান আলাদা করে হত্যা। মৃত্যুর আগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে সেগুলো পণ্যজাতকরণ। সোনার দাঁত থাকলে জ্যান্ত উৎপাটন। জ্যান্ত পা কেটে নিয়ে হাড় দিয়ে বাসন উৎপাদন। জ্যান্ত চর্বি কেটে নিয়ে সাবান। সুগন্ধি। জিয়ার বেলায় দ্রুত মৃত্যুদ অনুমোদনের জন্য একাএকা প্রতিদিন এতোটা সময় ব্যয় করার প্রয়োজন কী ছিলো? অন্যের মৃত্যু কি তার খুব ভালো লাগতো? যৌন সুড়সুড়ি? বীর্যপাতের মজা? অন্যের কষ্ট দেখে সেকি আনন্দ উপভোগ করতো? একা বসে, অন্যের মৃত্যুদণ্ড লেখার সময় তার ভাবমূর্তি বা আবেগহীনতার গভীরত্ব কতখানি? কেন সে দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করতো মানুষের মৃত্যুদ লিখে? তার কি তখন যৌন পুলক হতো? সিপাহী বিদ্রোহীদের স্বাভাবিক বিচারে কী সমস্যা? তাহের বিচারের ৪ দিনেই

ফাঁসি কেন? খালেদ, হুদা এবং হায়দারকে খুন করে লাশগুলো মর্গে পচিয়ে রাষ্ট্রকে অপমান কেন? বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে এতো অপুরুষ কেন? তাহের, খালেদ কি তাদের সেনাভাই নয়?

বর্ধিত ফাঁসির মঞ্চের জরুরি কিসের? জেলের মধ্যে কোর্ট কেন? কামান দিয়ে তাহেরকে পাহারা কেন? এমনেস্টির অনুরোধ উপেক্ষা কেন? লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা কেন? [দ্রঃ অসমাপ্ত যুদ্ধ]। একজন পঙ্গু তাহেরকে ফাঁসির তাড়াহুড়ো কেন? সুতরাং জিয়া কি এমন একজন দুর্দান্ত ক্ষমতা লোভী উন্মাদ, যার মনস্তাত্ত্বিক জগৎ জুড়ে ছিলো ছিলো শুধু খুনের পিপাসা! খুন এবং ক্ষমতার তৃষ্ণায় সেকি ছিলো ইয়াহিয়ার মতো সাইকোটিক রোগি! ইয়াহিয়া, সেও ছিলো একজন অস্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক জগতের মানুষ! জিয়া কেন "একহাতে খেতে, অন্য হাতে খুনের পরোয়ানা লিখতো?" ইয়াহিয়ার মতো, জিয়া কেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসির হুকুম দিলো? জিয়া একজন প্রমাণিত কিলিং মেশিন। জিয়া, চিলির আঁলেন্দের মতো বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা খুনের 'কিলিং মেশিন'। [দ্রঃ ল্যাগেসি অব ব্লাড, পুরো বই]।

'৯০-এর দশকে, ফ্লোরিডাতে একজন মৃত্যুদ প্রাপ্ত সিরিয়াল কিলার মহিলার কথা মনে পড়ছে। জবানবন্দীতে খুনি কার্লা ফেটাকার বলেছিলো, "মানুষ খুন করার সময় সে সেক্চ্যুয়াল অর্গাজম অনুভব করতো। প্রতিটি কোপ, একটি অর্গাজম।" জেফরি ডামার নামের এক সিরিয়াল কিলার, মরা মানুষের স্যুপ বানিয়ে খেতো। তার কাছে মনে হতো, গরুর মাংসের স্যুপ। আদালতে জানালো, কৈশোর ও শৈশবে সে প্রায় প্রতিদিন লাঞ্ছিত। ১৪টি ফস্টার হোমে কেটেছে তার ১৬ বছরের জীবন। বাবা মা পরিত্যক্ত, ছেলেবেলায়, সেক্চ্যুয়ালি লাঞ্ছিত, গ্রুপ এবং হোমোসেক্চ্যুয়াল কর্মকান্ডে তাকে ব্যবহার করতো মানুষ। সুতরাং জিয়ার বেলাতেও নিশ্চয়ই এধরনের কিছু ব্যাপার ছিলো, না হলে, সে কেন মৃত্যুদণ্ড লিখে নিষ্ঠুর সময় কাটাবে? জিয়া কি ম্যানিক সাইকোটিক রোগে আক্রান্ত আওরঙ্গজেব? সেকি একজন লোনার, সাইকোটিক-স্ত্রিটজোফ্রেনিক? সেকি নিষ্ঠুর কিশোর বেলার ভুক্তভুগি? অনুপ্রাণিত কোন কিলার চরিত্রের? অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে যারা ঠা া মাথার খুনি তারা, লোনার। একাকী এবং আত্মকেন্দ্রিক তারা। তারা সাধারণত বন্ধুহীন এবং নিষ্ঠুর জীবন-যাপন করে। জিয়ার জীবনীতেও আমি দেখতে পেয়েছি, আত্মকেন্দ্রিক এবং বন্ধুহীন জীবন-যাপন। সে কারো সঙ্গে গল্পগুজব করতো না, ভেতরে ভেতরে সে সবসময় একজন মিলিটারি টাইপের, কখনোই বন্ধুবৎসল নয়, গৃহেও নিষ্ঠুর, সব সময় একটি কালো চশমায় চোখ ঢাকা, কারো সঙ্গে চোখাচোখি বন্ধ রাখতো, একাএকা সময় কাটানোর প্রবণতা, হঠাৎ একলা হয়ে যাওয়া, আবেগ প্রবণতাহীন। কখনো, কারো সঙ্গে বসে আনন্দের সময় কাটাতে অনিচ্ছুক। দু'দণ্ড গল্পগুজব, পার্টি, আনন্দ বিবর্জিত। একা একা ফাঁসির তত্ত্ব নিয়ে সময় ব্যয়। আবেগবর্জিত, কথার মধ্যে হুকুম বা কমান্ড বা অত্যাচার। পরিবারের সঙ্গে সময়

কাটানো বা পরিবার নিয়ে ভেকেশন ইত্যাদি বিবর্জিত জীবন। খালেদাকে মারধোর এবং গৃহে তাকে কষ্টে রাখা যেজন্য খালেদাও পরে, জিয়ার চেয়ে অধিক স্বৈরাচার হয়ে উঠেছিলো। লোনার এবং আত্মকেন্দ্রিক জিয়া এভাবেই ক্রমশ প্রমাণ করেছে তার মধ্যেকার হিটলার। সে কেন এতো দ্রুত এতোলোকের ফাঁসির হুকুম লিখতে তৎপর? সে কেন এতো দ্রুত এতোলোকের বিচার করতে তৎপর? সে কেন এতো দ্রুত এতোলোকের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে তৎপর? সেও কি হিটলার বা জেফরি ডামার বা ফ্লোরিডার সেই মহিলা সিরিয়াল খুনিদের মতো– খুন করে যারা একধরনের সেক্স্যুয়াল বা মানসিক বা জৈবিক তৃপ্তি পেতো? আমি কোন বিশেষজ্ঞ বা মনস্তাত্ত্বিক নই। সামান্য কমনসেন্স তাড়িত এবং বাস্তববাদী।

প্রশ্ন, সিরিয়াল কিলারের মনে কি উদয় হয়? কিসের প্রবণতা? কেন ডিস্টার্বেন্স! জিয়াউর রহমান নিষ্ঠুর হাতে খুন করেছে, নিশ্চয়ই তা নিতান্তই দেশের নিরাপত্তার কারণে নয়। তাহেরকে সে যতো দ্রুত এবং যেভাবে জগৎ থেকে বিদায় করলো নিশ্চয়ই তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার খাতিরে নয়! তাই-ই যদি হতো, তাহলে বঙ্গবন্ধু তো 'র‍্য'-এর রিপার্টের পর– তাকেসহ অনেককেই দেশদ্রোহীতার অভিযোগে '৭৫-এই ফাঁসি দিতে পারতো! বরং সে তো সর্বনাশা জাসদ, গণবাহিনীর অনেককেই বরখাস্ত বা অবসর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে চাকরির ব্যবস্থা করে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধার উপযুক্ত সম্মান দিয়েছিলো। জিয়ার ঘানিটানা বলদ এক উন্মাদ তাহেরকে সে তো সব জানার পরেও একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদটিই দিয়েছিলো, বরং যেখানে বসে বসে বারবার সে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো। জিয়া কি, অ কোষহীন বলদ তাহেরকে কারাবন্দী করে বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না? সেদিন তাকেও তো সাজানো ক্যুর ভগ্নাংশে জেলহত্যা করতে পারতো অপুরুষ খালেদ মোশারফের অনুরাগিরা! সেক্টর কমান্ডার তাহের, জিয়ার বলদ সেজে তার মালামাল পার করেছে '৭২–'৭৬। একজন পঙ্গু বন্দীকে সর্বোচ্চ নিরাপদ কারাগারে রাখলে কী ক্ষতি হতো জিয়ার? নাকি জিয়া সত্যি সত্যিই একজন উন্মাদ এবং ম্যানিক সাইকোটিক রোগি যার মাথায় খুনের উগ্র পিপাসা! গোপনে গোপনে, তাহেরকে ৪ দিনের দিন খুন করা কোন সুস্থ লোকের পরিচয়! জিয়া কি আদৌ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো? নাকি উল্টো, মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো! তাহের জিয়ার ঘানিটানা বলদ। এবং বলদও একদিন জবাই হয়ে যায় যখন সে অকর্মণ্য– তাহেরও তাই।

সুতরাং জিয়াও একজন সিরিয়াল কিলারের জগতের লোক। "ল্যাগেসি অব ব্লাড" বইতে ১১৪৩ জনের ফাঁসির উল্লেখ থাকলেও সে সময়কার একজন ডিজিএফআই কর্মচারির মতে এই সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের উর্ধ্বে। আনোয়ার কবিরের ডক্যুমেন্টারিতে ভুক্তভোগির সাক্ষাৎকার থেকেও বোঝা যায়, জিয়া সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধা শূন্য সেনাবাহিনী তৈরি করতে, যাকে পেয়েছিলো ফাঁসি দিয়েছিলো।

দেশজুড়ে জেল-হাজত থাকতে জিয়া কেন দূর-দূরান্তে এতো মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি দেবে? কী লুকাতে চেয়ে এতো মৃত্যুকূপের ব্যবস্থা? খুনের সঙ্গেও মানুষের একধরনের জৈবিক আনন্দের ব্যবহার সংযুক্ত বলেই কি জিয়া, একাএকা বসে খুনের হুকুমনামা নিয়ে যৌনপুলক বা বীর্যপাতের আনন্দ অনুভব করেনি? একেকটি সই, একেকটি অর্গাজম? একেকটি সই, একেকটি বীর্যপাত! কিংবা তাহেরের ফাঁসির হুকুম লিখে সিন্দবাদের দৈত্য অনুভূতি।

মানুষ, নিজনিজ আবেগের কাছে শিশু। হতে পারে তা খুনের আনন্দে এক অন্য রকমের আবেগ যা তার কাছে অন্য যেকোন চূড়ান্ত পর্যায়ের আবেগের সমতুল্য। নিজ হাতে সন্তান হত্যা করে পিতা। পিতা হত্যা করে সন্তান। জগৎ জুড়েই এক দৃষ্টান্ত। একেকজনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ একেকরকম। জিয়ার প্রকাশ ছিলো, ব্যাধিযুক্ত। সুতরাং জিয়া কি একজন দুর্দান্ত ষড়যন্ত্রবাদী ছিলো না যাকে '৭১ এই বন্দী করে, ২৭শে মার্চের দেশদ্রোহীতার কারণে শাস্তি দেয়া উচিত ছিলো ? কিংবা জেলে তার আজীবন চিকিৎসার ব্যবস্থা! তাহলে দেশ আজ আর রাজাকারদের চারণভূমিতে রূপান্তরিত হতো না। জিয়া কক্ষনো জনতার জন্য নিরাপদ ছিলো না বলেই ৩০শে মে '৮১-এর শুভ সকালের উদয় হয়েছিলো। সমকামী জিয়া কক্ষণোই বিদ্রোহ করেনি, প্রতারণা করেছিলো।

জিয়ার কারণে দেশ আজ রাজাকারদের চারণভূমি, তার চাষ করা রাজাকার আলবদর এরা। তার বীর্যপাতের সন্তান এরা। যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা মাইনরিটি। মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখেনি জিয়া। সত্যি সত্যিই সে তার ওয়াদা পূরণ করতে রাজনীতিকে ভালো মানুষের জন্য কঠিন করে তুলেছে, অমুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে। যেজন্যে দেশে আজ আইয়ুব শাসনের চেয়ে অধিক লুটপাট এবং দুঃশাসন। দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি আজ সর্ববৃহৎ রাজাকার সুসজ্জিত দল। হিটলারের নাৎসী বাহিনী যেখানে মুসোলিনী, বোরম্যান ও হিমলারের মুখোশের মধ্যে গোলাম আজম, নিজামী ও মাওলানা মান্নানেরা। দেশের জোট সরকারের মন্ত্রীসভায় সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উপস্থিতি। এদেশের রাজাকার সরকার, '৭১-এর সাড়ে তিন বছর পর হতে, আজ, সর্ব দীর্ঘ সময়ের সরকার। আইয়ুব-ইয়াহিয়ার চেয়ে দীর্ঘ। জিয়ার অবৈধ সন্তানদের মধ্যে রাজাকার এবং ভ্রষ্ট যুবসমাজ। জিয়ার বীর্য, সারাদেশের রাজনীতিকে রাজাকারদের চাষাবাদের কাজ সম্পন্ন করছে।

পেন্টাগনের ব্রেইনওয়াশড যুবকের থেকে কি আশা করতে পারি, যখন, তার শেকড়ের দেশে, শত্রুর স্বার্থ জড়িত? মাতৃভূমির কি দাম, শত্রু যখন মুনিব? সুতরাং পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির গোয়েন্দা জিয়া, মুনিবের বিরুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে তার থেকে আমরা কেন মুক্তিযুদ্ধ আশা করবো? বাংলাদেশ তার হৃদয়ে কতখানি? দেশপ্রেম

কতখানি? কেনই বা আশা করবো মাতৃভূমির টান যখন সে শৈশব থেকে পাকিস্তানে? এসবই সাইকোলজিস্টদের গবেষণার বিষয়। একটি কিশোর যখন অন্য দেশের মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের চাকরি করে এবং ব্রেইনওয়াশড, দেশপ্রেম তার জন্য গল্পের মতো। বিশেষ করে যে দেশ ৬ বছর থেকেই তার কাছে বিদেশ। জিয়ার বাবা-মায়ের কবর পাকিস্তানে। তারা সব পাকিস্তান প্রেমিক। জিয়ার মধ্যে দেশপ্রেম? তার দেশ পাকিস্তান। কেন নয়? নাহলে সে কেন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, পাকবাহিনীর আচরণ করবে?

আমার সন্তান বাংলাদেশ চেনে না। তার দেশ আমেরিকা। জিয়াও তাই। সুতরাং যে জিয়া, মতিউর রহমান নিজামীকে স্মৃতিসৌধে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, তার মধ্যে দেশপ্রেম শূন্যতা- কোন বিষয়? সুতরাং প্রশ্ন একটাই কে এই জিয়া যার প্রশ্নবোধক কর্মকা সত্ত্বেও জাতির কাছে সে মহাত্মা গান্ধী! যে লোক স্মৃতিসৌধের তলে গণকবরের আর্কিটেক্ট নিজামীদেরকেই পাঠায় স্মৃতিসৌধ অবমাননার কাজে! কে সে?

সুতরাং জিয়াকে আমি অতীত, বর্তমান বহু স্বৈরাচারের সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই তাকে নাম দিয়েছি- 'সব স্বৈরাচারের এভারেস্ট'। তা সত্ত্বেও তার নামে দেশের প্রথম গেট- ঢাকা এয়ারপোর্টে জ্বলজ্বল করছে। তার নাম সারাদেশের সব ছাদ, সব দেয়াল, সব স্টেডিয়ামের জন্য আজীবন বুকড। তার নাম জিয়া উদ্যানের ১০০০ ফুট গভীর থেকে ব্রিজ করে স্থায়ী যেন, বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেলেও তার মক্কাটি বাংলাদেশের শেষ চিহ্ন হয়ে থাকে। যেন কবর নয়, মক্কা শরীফের মতো বড় হয়ে থাকে। সুতরাং টুঙ্গিপাড়ার এক কোণায় পড়ে থাক স্বাধীন বাংলার স্থপতি শেখ মুজিব। পড়ে থাক অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের লাঞ্ছিত, অপমানিত জুতোপেটা বা খুনের অপমানিত দেহ, বাংলার অজ্ঞাত কিংবা নামহীন কবরে মিশে যাক বীরদের অপমানিত লাঞ্ছিত লাশ। না জানুক মানুষ তাদের শেষ নিদ্রার ঠিকানা, না শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করুক তাদের কবরে তাদের বীরত্বের শ্রদ্ধায়। তাদের কবরের নামফলকে না থাকুক কোন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর নাম। যতোদিন জিয়া এবং তার পরিবার পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করে যাবে, ততোদিন বিশ্বাসঘাতক সবুর খানের কবরের উল্টোদিকে এই বাংলা মীরকাশেমের কবর জ্বলজ্বল করবে স্বাধীনতার ঘোষকের পরিচয়ে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের এই আওরঙ্গজেব পরিবার, মৃত্যু পরবর্তী জিয়া, তার ছেঁড়া লুঙ্গি ও ভাঙ্গা স্যুটকেস... পাকসারজামিনসাদবাদ মুখোশ, যারা চর, 'আইএসআই এবং সিআইএ', আওরঙ্গজেবের সাজসজ্জা তারাই সব ঠিক করে দেয়। আফটার অল, যারা আন্ডার কভার, তাদের প্রত্যেকেরই কয়েকটি ছদ্মবেশ। যেমন জিয়ার বেলায় ছেঁড়া লুঙ্গি ও ভাঙ্গা স্যুটকেস। সিআইএ, আইএসআইয়ের লোকেরা ছদ্মবেশেই কার্য সম্পাদন করে। যেমন, নরিয়েগা, সাদ্দাম, পিনোশে। সব সিআইএ'র মানসপুত্র। যেমন প্রতিটি দেশের মার্কিন দূতাবাস। প্রতিটি দেশের বড়ো বড়ো সংবাদপত্রের সম্পাদক, যারা সিআইএ'র মানসপুত্র। প্রতিটি দেশের বিশেষ কিছু বুদ্ধিজীবী। এসবই কমনসেন্স। মেইকসেন্স? নো? পশ্চিমারা এখন

পর্যন্ত কবর খুড়ে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া থেকে তুলে নিচ্ছে সৈন্যদের লাশ। কবর দিচ্ছে নিজেদের দেশে। আর আমরা আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের লাশ পচিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি বহুদূরে লোকচক্ষুর আড়ালে। বঙ্গবন্ধুকে ৫৭০ সাবান দিয়ে গোসল দিয়েছি, জিয়াকে দিয়েছি ১০০০ কোটি টাকার কবর। আমরা কি মানুষ? আমরা কি পশু নই? আসুন আমরা একে অপরকে হত্যা করি। কারণ আমরা হলাম, '৭৫এর পশু সন্তান কিংবা আমরা সবাই রাজাকারের বীর্যে চাষ করা সমকামীর দল যাদের জীবনে দুঃসংবাদ ছাড়া সুসংবাদ নেই। কিংবা বেশ্যার চিৎকারে ভাঙ্গে না ঘুম কোন সমাজবাদী ব্রাহ্মণের, জাগে না জ্বালা, যখন মুক্তিযুদ্ধের বিধবারা সাভার গণকবরে নিজামীর রক্তভরা পা দেখে হায় হায় শব্দে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে...।

আসুন দেখি পূর্বকথা। জিয়াউর রহমান কেন পাকিস্তানের চর

জিয়াউর রহমানের জন্ম ১৯৩৬ সনে হলেও ১৯৪৭ সন থেকে সে পাকিস্তানে। তারও আগে অর্থাৎ, জিয়ার জন্মের পর, তারা ভারতে। তার প্রথম স্কুল কলকাতার "হেয়ার স্কুল।" এরপর সে করাচি থেকে মেট্রিক পাশ করে সরাসরি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে। সেখানে থেকে ১৯৬৩ সনে সেনাবাহিনীর "গোয়েন্দ বিভাগ", ডিএফআই-তে পদোন্নতি ছাড়াও ১৯৬৫ সনে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৬৬ সনে সরাসরি মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষকসহ ইনটেলিজেন্সের শীর্ষপদে পদোন্নতি। ছয় বছর বয়সে বাংলাদেশ ছাড়ার পর '৬৯ তে তার প্রত্যাবর্তন। ততোদিনে সে পুরোপু-রি দক্ষ আইএসআই। পাকিস্তনের সবচেয়ে বড়ো শক্তি তার সেনাবাহিনী এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তারা সিআইএ পার্টনার। তাদের দক্ষতা, তাদেরকে সিআইএ'র মতো শক্তিমান করেছে। সিআইএ এবং আইএসআই একসঙ্গে কাজ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। রাশিয়াকে সামাল দিতেই সিআইএ-এর সৃষ্টি ৭০এর দশকের যারা তালেবান। এবং আইএসআই ও সিআইএ সমান ক্ষমতাবান। '৬৯ এ তাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জিয়াকে বাংলাদেশে প্রেরণের সঙ্গে পাকিস্তানিদের গণঅভ্যুত্থান ঠেকানোর অদ্ভুত যোগাযোগ। যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির রশিদ-ফারুক-জিয়ারা এসেছিলো বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে যা মুক্তিযোদ্ধার নয়। মুক্তিযুদ্ধ যখন সূচনার পথে তখন থেকেই পাকিস্তানে কিছু বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু। আর এই প্রো-পাকিস্তানি জিয়া, যার কাজ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু সৈন্যকে যুদ্ধের টেনিং, অদ্ভুত যে, '৬৯-এই হঠাৎ তাকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পাঠানো হলো ৪ মাসের উচ্চতর প্রশিক্ষণের কাজে। '৬৯এ সারা বাংলাদেশ যখন উত্তাল, সেই সময়ে হঠাৎ আগমন এবং জিয়ার জার্মানীতে ৪ মাসের ট্রেনিংয়ের নামে সে কি করলো, এখনো সেই রহস্য উদ্ঘাটন না হলেও, চট্টগ্রামে তার অদ্ভুত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড পরিষ্কার। যার প্রমাণ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে খুব

পরিষ্কার। নিজেকে "প্রভিনশনাল হেড" হিসেবে ঘোষণা করে ২৭ শে মার্চ '৭১এ মুক্তিযুদ্ধ নষ্ট করে দেয়ার পায়তারা, সিআইএ যখন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তৎপর, যখন মার্কিন অস্ত্রবাহী জাহাজ "সোয়াত" চট্টগ্রাম বন্দরে বেশ ক'মাস ধরে তৎপর, জিয়াকে পোষ্টিং দেয়া হলো '৭০এর সেপ্টেম্বরে যখন কমলা ও মাল্টা নামে অস্ত্র আসছিলো চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম পোর্ট, যেখানে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র এবং সৈন্য আসা অব্যাহত ছিলো, '৭০ থেকে মাল্টা এবং কমলার এই প্রসঙ্গটি লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও বেশ ভালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন ডকের একটি সাধারণ সৈন্য এই কমলা আর মাল্টা জাহাজের সমালোচনা করে গণহত্যার জন্য আনা অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেখানে '৭০ থেকে জিয়া হাজার অস্ত্র চোখে দেখেও কি ২৫শে মার্চে বোঝেনি মাল্টা? নাকি মেশিনগান?

'৭০এ চট্টগ্রামে জিয়ার পোস্টিং কোনক্রমেই স্বাভাবিক নয়। যার কারণ, পরবর্তী তার সকল কর্মকা ই প্রমাণ করেছে এই অস্বাভাবিকতা, কার লোক– জিয়া? সুতরাং "সোয়াতের" অস্ত্র খালাস নিয়ে জিয়ার সম্পর্কে যে সকল সন্দেহ জনমনে রয়ে গেছে তা অত্যন্ত যথোপযুক্ত। জিয়া, পাকিস্তানি ইনটেলিজেন্সের লোক, যাকে '৬৯এ ঢাকায় পাঠানো হয়েছিলো, '৭০-এ চিটাগাঙে যেখানে তার দায়িত্ব অস্ত্রের জাহাজগুলো এবং সৈন্যদের ট্রেনিং। সুতরাং জনমনে সোয়াত সন্দেহ সত্য। এবং চট্টগ্রামে সে পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারদের সঙ্গে সেনাকোড মেনে যে আচরণ করেছিলো, ১৫ই আগস্ট সে সেই সেনাকোডই ভঙ্গ করলো।

জিয়া কেন মুক্তিযোদ্ধা নয়, প্রমাণের কি শেষ আছে? মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি ও চীনের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ? মার্কিন অস্ত্রগুলো চায়নার মাধ্যমেই বাংলাদেশে এসেছিলো, সন্দেহ? জাতিসংঘে তাদের বারবার ভেটো এবং নির্বিবাদে গণহত্যা ঘটতে দেয়ার মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ? মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাডের ওয়াশিংটনকে '৭১এর ৬ই এপ্রিলে টেলিবার্তা, "এদেশে গণহত্যা চলছে, বন্ধ করো।" এবং এই বার্তার পরেই, আর্চার ব্লাডকে ফিরিয়ে নিলো ওয়াশিংটন। তাকে 'শোকজ'। আমেরিকার মূল ব্যবসা গণহত্যা। গণহত্যা হলে অস্ত্র বিক্রি হয়। যেজন্যে তারা সারাবিশ্বে গণহত্যা বাধিয়ে রাখে। আজ অবধি একমাত্র আফ্রিকাতেই আমেরিকার বিক্রি করা অর্থে গণহত্যা হয়েছে ২৭ মিলিয়ন। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা, ইরাক, আফগানিস্তান, প্রাক্তন যুগোশ্লোভিয়া, বুরুন্ডি, হেইতি, পানামা, সুদান, ইথিওপিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া, সেরালিওন... কোথায় হয়নি মার্কিন অস্ত্রে গণহত্যা? কলঙ্কিত "ইরানকন্ট্রা" চুক্তির মাধ্যমে রোনাল্ড রেগ্যান ইরানকে অস্ত্র বিক্রি করে ইরাক-ইরানের যুদ্ধে মানুষের রক্তের বন্যায় মার্কিন অর্থনীতির উন্নতি সাধন করেছিলো দীর্ঘ ১২ বছর ধরে। সোভিয়েত ও আফগানের যুদ্ধের পর, সাদ্দামকে দিয়ে আবার সেই অস্ত্র দিয়েই আক্রমণ করালো– কুয়েত। এরপর নিজেরা আক্রমণ করলো আফগানিস্তান ও ইরাক। আত্মরক্ষার নামে সারা মধ্যপ্রাচ্যের সব মুসলিম দেশগুলোকে অস্ত্র কিনতে বাধ্য করা।

সৌদির সঙ্গে মাত্র শেষ করলো ৩০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তি। ইস্রায়েলের সঙ্গে ৩০ বিলিয়নের অস্ত্র ঋণ। উদ্দেশ্য, মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলকে সশস্ত্র করা। আমেরিকা, গণহত্যা বাধিয়ে রাখে, নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থে। অন্যান্য দেশের বেলায় যা দারিদ্রের অতি নিকৃষ্ট জীবনযাত্রা, আমেরিকার বেলায় সেটা পুঁজিবাদ, যার মূল ব্যবসা, অস্ত্র। যার পুঁজি, গণহত্যা। অস্ত্র বিক্রি না হলে, ডিফেন্স স্টকের মূল্য বাড়ে না। অর্থনীতির সূচক বাড়ে না। সুতরাং গণহত্যার জন্য অস্ত্র বিক্রি মার্কিনীদের অর্থনীতির জন্য অনিবার্য। '৭১এর গণহত্যার সব অস্ত্রই ছিলো আমেরিকার তৈরি। আমি স্টক মার্কেট বুঝি, বহু গণহত্যাও পড়েছি। সবই দুয়ে+দুয়ে=চার।

মুক্তিযুদ্ধে কিসিঞ্জারের ভূমিকা এবং পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের কুটনীতি বিষয়ে বাঙালি কতোটুকু জ্ঞানী? কতটুকু জানে মোশতাককে প্রবাসী সরকার থেকে রিক্রুট করে তাকে দিয়ে জাতিসংঘে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র! এসবই রয়েছে 'লিফসুলজের' বইয়ের প্রথম খণ্ডের নাম, "অসমাপ্ত যুদ্ধ।" মুক্তিযুদ্ধ নস্যাৎ করতে চীন ও আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে বাঙালি এতো অজ্ঞ কেন? নৌ-কুটনীতি? বঙ্গোপসাগরে 'সেভেন ফ্লিটের' মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ নস্যাতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাঙালি কতটুকু জ্ঞানী? তারা কতটকু জানে, যুদ্ধ বিরতির নামে জাতিসংঘে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রাশিয়া, চীন, মার্কিনের দরকষাকষি? রাশিয়া এবং ভারত ও পোলান্ড সেদিন বাংলাদেশের পক্ষে না দাঁড়ালে, দুই সপ্তাহে রাশিয়া তিনবার ঐতিহাসিক ভেটো না দিলে, বাংলাদেশের জন্মই হতো না। সপ্তম নৌবহর ফেরাতে, ভারতের আন্দোলন, নিকোবর কমিউনিকেশন সেন্টারের রাডার থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাগ্রত করে দিলে, ২০টি সোভিয়েত জাহাজ দিয়ে ৭ম নৌবহরকে তাড়িয়ে দেয়া। ৭ম নৌবহর না ফেরালে, বাংলাদেশের জন্ম হতো না। এ সম্পর্কে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ '৭১এর ১০ই জানুয়ারী লেখে, "১০ই ডিসেম্বর হোয়াইট হাউজে জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নৌবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজের' নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র টাস্কফোর্স মালাক্কা প্রণালীতে একত্রিত হবে।" ১২ই ডিসেম্বর ৭ম নৌবহর বঙ্গোপোসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলো। খবর পাওয়ামাত্র, রাশিয়ার ২০টি জাহাজ, ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করে। ভারত-রাশিয়া সেদিন বাংলাদেশের জন্য দেবদূত হয়ে এসেছিলো। ভারত আমাদের জন্য তার সব দুয়ার খুলে দিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে লবি করেছিলো গণহত্যার বিরুদ্ধে। হাজার হাজার শরণার্থী তারা আশ্রয় নিয়েছিলো। এইসবই ইতিহাসের বিষয়। তবে– বাঙালির পড়াশোনা এতো কম হলে চলবে কেন? তারপরেও '৭৫ থেকে দেশে যে প্রচ রুশ-ভারত ঘৃণা ছড়নো হলো, এর মূলে– জিয়া। জিয়াকে এতো কম চিনলে চলবে কি করে? নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ এতো ক্ষুদ্র হলে, চলবে? সত্যকে বর্জন করে মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকা! জাতির জনককে যারা সংসদে লাঞ্ছিত করে, পুড়িয়ে দাও পতাকা!

ফজলুল কাদেরীর "বাংলাদেশ জেনোসাইড এ ওয়ার্ল্ড প্রেসের" পাতায় পাতায় গণহত্যার যে বিশ্বকোষ এবং বিশ্বপ্রেস – হলোকস্ট কি শুধুই 'জু'দের বেলায়? আমার

প্রশ্ন, গায়ের রঙ সাদা আর গোত্রে 'জু' না হলে কি সেটা গণহত্যা নয়? বাংলার মানুষের গণহত্যা কি গণহত্যা নয়? নামে নাৎসী না হলে সেটা হিটলার নয়? আজ এই বিশাল গণহত্যা জিয়ার কারণে হয়ে উঠেছে প্রশ্নবোধক। ইয়াহিয়া এবং জিয়ার গণহত্যা কেন আলাদা? এই নরপশুদের বিচার হবে না কেন? জিয়া, যে নাকি মার্কিন ও পাকিস্তানিদের '৭১এর ব্যর্থতা পূর্ণ করেছিলো, শেখকে খুন থেকে ৫ম সংশোধনী। যে জিয়া, দুই শত্রু দেশের শক্তিতে ৭ই নভেম্বর প্রত্যুষে নিজেকে ঘোষণা করলো, প্রধান সামরিক প্রশাসক, কিন্তু অপুরুষ ঘানির বলদ তাহেরদের আপত্তিতে উপ-সামরিক প্রশাসক। বিশ্বাসঘাতক জিয়া, একের পর এক তার পাক-চরিত্রের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছিলো, ২৪শে মার্চ '৭১ হতে। ৭ই নভেম্বর '৭৫এ ঘোষণা করলো, সকল যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি। নিজেকে ঘোষণা দিলো প্রধান সামরিক শাসক এবং সংহতির বীর। একজন মীরকাসিম না হলে, একাজগুলো কার পক্ষে সম্ভব? মীরজাফর, যারা ক্ষমতার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোলাম। জিয়া ব্যতীত এতো কলঙ্কের সাক্ষর, বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীতে আছে? দ্বিতীয় কোন মুক্তিযোদ্ধার এই ধৃষ্ঠতা আছে? সে সেনাবাহিনীর বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপুরুষ করেছিলো। দেশের পতাকার মেরুদন্ডে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলো। গণহত্যার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ নয়, '৭১এ গৃহযুদ্ধের কলঙ্ক, কার দান?

আমরা জানি, সামরিক শাসন আমেরিকা বরদাস্ত করে না। সামরিক শাসনের দেশে বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকা সাহায্য করে না। কিন্তু জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরে আমেরিকাসহ ৩০টির অধিক দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য দিয়ে প্রমাণ করেছে এই সামরিক শাসক জিয়া অন্যান্য সামরিক শাসক থেকে আলাদা। সামরিক সত্ত্বেও, জিয়ার অবাধ যাতায়াত ছিলো গণতান্ত্রিক সরকারের মতো। বিশ্বব্যাংক থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চীন ও সৌদির সঙ্গে অস্ত্রচুক্তিতে বাধা নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে ১১টি চুক্তি নির্বিবাদে ঘটে। এবং কার্টার সামরিক শাসক জিয়ার প্রশংসা করে বলেছে, "শুধু মুসলিম দেশ ও সমাজের মধ্যেই নয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব সমাজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ," কৃতজ্ঞ? উত্তরে জিয়া বলেছে, "একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণকে যে নৈতিক সমর্থন ও সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা করেছিলো, জনগণ তার জন্য এই মহান দেশটির কাছে বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ।" নৈতিক সমর্থন? কৃতজ্ঞ? থামুন?

বাংলার জনগণ আমেরিকার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞ, জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভেটোর জন্য? কৃতজ্ঞ, পাকিস্তান ও চীনে কিসিঞ্জারকে পাঠিয়ে গণহত্যা ত্বরান্বিত করার জন্য। ৭ম নৌবহর পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাধা দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞ? জিয়া কি উন্মাদ? নাকি গবেট? কোনটি? এবং মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত সোয়াত জাহাজ, বস্টন হার্ভারে 'পদ্মায়' যখন মার্কিন অস্ত্র উঠছিলো, আটলান্টিক সমুদ্রতীরে মার্কিন এক্টিভিস্টদের তুখোড় প্রতিবাদ! জিয়া কাকে বোকা ভাবে? অস্ত্র পাঠানোর বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসে

সেনেটর টেড কেনেডির বিতর্ক সে শোনেনি? সে নাকি মুক্তিযোদ্ধা? জিয়া কি কৃতজ্ঞ, "সোয়াত" জাহাজে মার্কিনী অস্ত্রের জন্য? যে জাহাজগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জিয়াকে চট্টগ্রামে নিয়োগ করেছিলো ইয়াহিয়া খান? '৭১এ গণহত্যার জন্য চট্টগ্রামে তাদের পাঠানো জাহাজ বোঝাই অস্ত্রের সমাগমে বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ? মার্কিন অস্ত্র দিয়ে গণহত্যার জন্য কৃতজ্ঞ? মারহাবা। মারহাবা। মারহাবা। এবং '৭১এর গণহত্যার প্রতিটি অস্ত্রই মেড ইন আমেরিকা। জিয়া কৃতজ্ঞ, কারণ, সিআইএ এবং আইএসআই মিলে তাকে জিয়া বানিয়েছে। আসুন আমরা পতাকা পুড়িয়ে দেই!

কিসের কৃতজ্ঞতা? ৪/১২/৭১ থেকে ১৬/১২/৭১ পর্যন্ত জাতিসংঘে আমেরিকার ৫/১০৪১৮ নম্বরের প্রস্তাবে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধ ধ্বংসের লক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের জন্য? ১৩/১২/৭১এ বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রস্তাবে, চীন ও মার্কিন ভেটোর জন্য? যে প্রস্তাবে ছিলো, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। সুতরাং '৬৩ থেকে পাকিস্তানের "সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের" কর্মচারী জিয়া, যে নাকি '৬৯ তে ইয়াহিয়ার গোয়েন্দা হিসেবে ঢাকা এসেছিলো দেশ যখন সংগ্রামে উত্তাল, যখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড জিয়া, পাকিস্তানি কমান্ডের পক্ষে বাংলার মানুষের বুকে গুলি চালানোর হুকুম দিয়ে যাচ্ছিলো, '৬৯-৭০এ...। এসবই বোঝার বিষয়। সংগ্রাম নস্যাৎ করতে ছাত্র মিছিলের উপর গুলি... যদি কেউ ভুলেও দাবী করে জিয়া, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে '৬৯ এ হঠাৎ বাংলাদেশে এসেছিলো, তার ১০ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে, তারা মূর্খের স্বর্গে আছে। যদি কেউ মনে করে জিয়া, ইয়াহিয়ার গোয়েন্দা হয়ে বাংলাদেশে ঢোকেনি- জিয়ার ১০ বছর প্রমাণ করে, মূর্খের স্বর্গে আছে। যদি মনে করে, '৭০ এ তার হঠাৎ চট্টগ্রামের পোস্টিং-এর সঙ্গে পোর্টে বারবার মাল্টা এবং কমলার নমে অস্ত্র আগমনের কানেকশন নেই, তারা সত্যিই মূর্খের স্বর্গে আছে। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা কমন হিসেব মিলিয়ে দেখুন। কমনসেন্স এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। ল্যাগেসি অব ব্লাড এবং লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে কি লেখা আছে, পড়ুন। জিয়া কক্ষনো বিদ্রোহ করেনি। এলায় কেমুন বুঝতাছেন? আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র অর্জন- জিয়া। তার প্রমাণ, বঙ্গবন্ধুর খবর নেই, জিয়ার কেবলা শরীফ দেশের সবচেয়ে দামী জায়গায়। খুঁজতে হয় না। দেখতে বাধ্য হই। মিডিয়ার অন্যতম খাদ্য জিয়া পরিবার। দেশের একমাত্র ছবি জিয়া পরিবার। দেশের একমাত্র পরিবার – জিয়া।

জিয়াউর রহমান যে ব্যাটেলিয়ানে চাকরি নিয়ে '৬৯ এ দেশে এলো, তার কমান্ডিং অফিসার একজন পাকিস্তানি যার নাম লেঃ কর্নেল আব্দুল কাইয়ূম যার হুকুমে ১৯/৩/৭১এ জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্য নিধনের ঘটনা ঘটেছিলো, জিয়া সেই বেঙ্গলেরই দ্বিতীয় কমান্ড, '৭০এ তার হঠাৎ জার্মানীতে ৪ মাসের কিসের সামরিক প্রশিক্ষণ? ফিরেই চট্টগ্রামে পোস্টিং। মার্চের তিন তারিখ থেকে বাংলাদেশ যখন যুদ্ধের তরঙ্গে উত্তাল, যখন বাংলার বুকে গুলি শুরু হয়ে গেছে, যখন ২৩ শে মার্চের ঘোষণার

পর সারা বাংলাদেশ চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে, যখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে... তখন, ২৫শে মার্চ রাতে কার নির্দেশে জিয়া "সোয়াতে" অস্ত্র খালাসের জন্য রওনা দিলো? যখন ২৩ শে মার্চ থেকেই চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো, জিয়া, অন্যান্যদের মতো রিভোল্ট না করে অস্ত্র খালাস করতে গেলো কেন? এই সেনাকোড সে কি ১৫ই আগস্টে দেখিয়েছিলো? এই সেনাকোড আনুগত্য সেকি '৭৫এর ১৫ই আগস্টে দেখাতে পারতো না? না দেখালে, সেদিন কে তাকে বাধা দিয়েছিলো? সেকি তার নিজের লেখা 'উই রিভোল্ট'-এ বলেনি, অস্ত্র আসার কথা?

সুতরাং জিয়াকে অমুক্তিযোদ্ধা ঘোষণার দাবি অনেকের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ব্যক্তিগত দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া। সেজন্য হাজার হাজার ঘণ্টার নিরন্তর শ্রম। চিলি, কম্বোডিয়া, হেইতি, পানামা, মধ্যপ্রাচ্য... কোথায় নেই এই ষড়যন্ত্রীরা! স্বাধীনতার ঘোষণা সে যতোবারই পড়ুক না কেন, জিয়া, '৭২এর বিচিত্রায় যে সাক্ষাতকারটি দিয়েছিলো এবং ছোটদের প্রিয়মানুষ জিয়া বইতে 'দুর্লভ সাক্ষৎকার' নামের চ্যাপ্টারে ২৫৭ পৃষ্ঠায় জিয়ার যুদ্ধ বর্ণনার যে সব তথ্য, তার প্রায় সবটাই বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মনগড়া। জিয়ার প্রোপাগান্ডার জন্য লেখা এই বইটির ২৫৭ পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে দেয়, সোয়াত জাহাজে জিয়ার গমনের কথা সত্য। আরো বলছে, যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, জিয়া রাত ১১:৩০ মিনিটে সোয়াতে গেছে। জিয়াবাদীরা এর ব্যাখ্যা করে– বিদ্রোহ বলে। বলে, সে বাধ্য হয়েছিলো সোয়াতে যেতে। আমরা কি সবাই– মূর্খ? জিয়া– বাংলাদেশের একমাত্র বুদ্ধিমান। একথাই সত্য হলো, "বাংলা হবে আফগান, আমরা সব তালেবান।"

এবার আসা যাক বেগম জিয়ার বই "ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়া"র কয়েকটি পাতায়। এই বইতে তার একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকারেও বলা হয়েছে যে, জিয়া সোয়াতে গিয়েছিলো অস্ত্র খালাস করতে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিকৃত ব্যাখ্যাও দেয়া হয় যে, সে, বাধ্য হয়ে গিয়েছিলো।

বলা হয়েছে, তাকে ষড়যন্ত্র করে পাঠানো হয়েছিলো। পাঠক, লক্ষ প্রাণের বিনিময় পড়ে দেখুন, বিস্তারিত জেনে যাবেন। ২৫শে মার্চে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জিয়ার সম্পর্ক। জিয়ার বিভ্রান্তিকর পরামর্শ, ২০ বালুচের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়া। বইয়ের লেখককে ২৪শে মার্চে রাতে তার পরামর্শ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না যাওয়ার। ২৪শে মার্চ, যেদিন সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস শুরু, চট্টগ্রাম জ্বলছিলো গণবিদ্রোহে, বাঙালি নিধনের অস্ত্র এসেছে জেনে, ক্ষুদ্র ডক শ্রমিকরা পর্যন্ত অস্ত্র খালাসে আপত্তি জানিয়ে দিলো, আর এই শিশু জিয়া চললো বিগ্রেডিয়ার আনসারীর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানিদের নিয়ে অস্ত্র খালাস... সেখানে, ২৫শে মার্চ রাত ১১টায় যখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে চলছে বাঙালি নিধন, জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে, বিদ্রোহে অমত জানিয়ে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে যায় অস্ত্র খালাস করতে যার

লোমহর্ষক বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের ষষ্ঠ মুদ্রণ বইতে সরাসরি পাওয়া যাবে। [দ্রঃ ৮৮, ৮৯, ১০৪–১০৯, ১৩০, ১৫৮ এবং ২২-২৫ পৃষ্ঠা]। ২২-২৫ পর্যন্ত গোপন সাংকেতিক বার্তা চ্যাপ্টার এবং ১৫৮ পৃষ্ঠায় "এইসব রাজনৈতিক সমস্যা। এ বিষয়ে সমস্যা রাজনীতিবিদদের থাকুক। আমরা সৈন্য, এ নিয়ে আমাদের করার কিছু নেই। তুমিও এসব থেকে দূরে থাক।" ১৮ই ফেব্রুয়ারী '৭১এ খালেদ মোশাররফের সঙ্গে যুদ্ধ পূর্ববর্তী অবস্থা জানতে, জিয়ার এই মন্তব্য কী প্রমাণ করে? ডক শ্রমিকরা যেখানে দুইদিন আগেই অস্ত্র খালাসে আপত্তি জানিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, জিয়া যায় সেই অস্ত্র খালস করতে?

২৫শে মার্চ রাতে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে গণহত্যা এবং ঠিক সেই সময়েই জিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যসহ সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য যাত্রা, ২০ বালুচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিরুৎসাহ এমন কি সাধারণ বাঙালি ডক শ্রমিকদের আপত্তির পর, সোয়াতের অস্ত্র খালাসে জিয়ার অতি উৎসাহ, সঙ্গের পাকিস্তানিদের দিয়ে ব্যারিকেড পরিষ্কার করিয়ে জীপ চালিয়ে পোর্টের দিকে তার অদম্য যাত্রা যখন ...চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গণহত্যা চলছিলো, বুলেট মেশিনগানের শব্দে যখন সমস্ত চট্টগ্রাম তোলপাড় এবং তার দুইদিন পর নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণার পায়তারা, মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত জিয়া, বইয়ের লেখককে ২৪শে মার্চ রাতে পরামর্শ, "চিন্তা করো না, এই মুহূর্তে তোমার এ ধরণের কিছু করা উচিত নয়... ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস পাবে না, বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে এমন কিছু ওরা করতে পারবে না... ।" লেখকের শেষ প্রশ্ন, "আমরা কি আমাদের উপর আঘাত হানার সুযোগ করে দিচ্ছি না?" জিয়াও জানতো, চট্টগ্রাম বন্দরে গণহত্যার প্রস্তুতির লক্ষ্যে পোর্টে, জাহাজ বাবর, সোয়াত, তিনটি ডেস্ট্রয়ার, গানবোট, এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক সমরাস্ত্রের তথ্য। তারপরেও ২৫শে মার্চ তার সোয়াতে গমন? '৭১ থেকে '৮১ জিয়া, এমন একটি কাজও করেনি যেখানে বিতর্ক ছিলো না। দেশের আমরা সব সমকামী কিংবা অপুরুষ হয়ে গেছি। আমরা সব রাজাকারের বীর্যথলের ঘানির বলদ হয়ে বেঁচে আছি। জিয়া কি চাইলে দুই জোয়ানকে ব্রাশফায়ার করে উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ করতে পারতো না? সেদিন তাকে প্রতিহত না করলে, জিয়া কি গণহত্যার জন্য আনা অস্ত্র খালাস করতো না? তাকে প্রতিহত করতে খালেকুজ্জামানের হুমকি এর ব্যাখ্যা কেন করবে না সেনাবাহিনী? কেন সে ২৫শে মার্চও পাকবাহিনীর অনুগত?

২৪/৩/৭১এ জিয়ার উত্তর, "ভাবনার কিছু নেই, ওরা এমন কিছু করবে না।"

ক'ছটাক মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো জিয়া? কি তথ্য আছে তার বীরউত্তমের? যুদ্ধ শুরুর এক মাস পর, ভারতে প্রস্থান। গোপনে গোপনে সেখানে একত্রিত রি-পেট্রিয়টদের ষড়যন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধ নস্যাৎ করতে, একদিকে মোশতাক, অন্যদিকে জিয়া, মাত্র সাড়ে তিন বছর পর বঙ্গবন্ধুকে খুন। মৌলবাদের পক্ষে পিপিআর জারি পরে দেশকে ইসলামীকরণ?

এতোগুলো দেশীবিদেশী বই, এতো তথ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও জিয়া, বীর? মনে রাখবেন নিজামীরা কখনো সংবিধান সংশোধন করে রাস্তায় নামেনি। জিয়াউর রহমান, নিজামীদেরকে বের করে এনেছিলো, সাভার স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত। গোলামের কি সাধ্য প্রত্যাবর্তনের যদি না জিয়ার জন্ম হতো। মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমরা কি পাকিস্তান না বাংলাদেশ? বাঙালি না বাংলাদেশী? জিয়া কি এই দেশের জন্য পাকিস্তানের সব আদর্শ নিশ্চিত করে যায়নি?

হলোকস্ট কি ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নাৎসীদের কাছে ট্রেড করেছিলো? ষাট বছর পর আজও যখন হলোকস্ট নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ৬০ বছর হয়ে ওঠে ইউরোপ-আমেরিকার সেই মুহূর্তের ঘটনা, সেখানে মুক্তিযুদ্ধ কি করে অতীত হয়ে যায়? হলোকস্ট আর আমেরিকার স্বাধীনতা যখন এক পদভারে উচ্চারিত, বাংলার গণহত্যা কি সত্যিই অতীতের ঘটনা? হলাকস্টের ওয়্যার ক্রিমিনালেরা যখন ৬০ বছর পরেও বিচারের সম্মুখীন, নিজামীরা কি করে জোট সরকারে গেলো? এই বিচার যারা করবে, বাংলার সেই শিক্ষিত সমাজ যখন লোভী হয়ে ওঠে ক্ষমতার, নিজামীরা যখন জোট সরকারে, সেই ছাত্রসমাজ যারা বিএনপি'র ক্যাডার, সেই তৃণমূল মানুষ যারা গরীব বলে, অস্ত্র, ড্রাগ এবং মদের টাকায় বিএনপি'র নাৎসী আদর্শের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে... হলোকস্টের বেলায় আমরা কি এ কথা বলতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর কেন দেবে না সেনাবাহিনী? জিয়া তো তাদের লোক। সুতরাং সেনাবাহি-নীর গায়ে যে পাপের দুর্গন্ধ, যে রক্তের কলঙ্ক, সেক্টর কমান্ডারদের পচা লাশের যে আঁশ তাদের শিখা অনির্বাণে জ্বলছে, এর বিচার কি করবে না সেনাবাহিনী?

ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ যখন প্রতিদিন পুনর্জীবিত করেছে হলোকস্টের বিভৎসতা, জিয়াউর রহমান গণহত্যাকে অবৈধ ঘোষণা দিল ৩১/১২/৭৫এ। এমনও দিন আসছে, যখন, '৭১এর স্বপক্ষের সব শক্তি বিলিন হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পরিকল্পনাই '৬৫ থেকে সিআইএ'র। আর '৬৭ থেকে এই পরিকল্পনাতে যোগ দিলো আইএসআই। আর তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে যেসকল ব্লাডি লায়ার বাঙালি প্রো-পাকিস্তানিরা মিলিটারিতে ছিলো, অধিকাংশই চায়নি বাংলাদেশ, তারাই সৃষ্টি করেছে রক্তাক্ত অধ্যায় '৭৫-৮১...]। এইসব রি-পেট্রিয়েট যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অদ্ভুত জায়গায়, মুক্তিযুদ্ধ নয় বরং '৭১এ তাদের সব অদ্ভুত ডেস্টিনেশন! পাকিস্তান থেকে ফারুক চলে এলো আবুধাবী হয়ে কোলকাতায় যেখানে মোস্তাক। রশিদ এলো অদ্ভুত সময়ে, ডিসেম্বর মাসে। ফারুক-রশিদ ছিলো ভায়রা-ভাই। খুনি নূর ছিলো ওসমানীর এডিসি। ১২নং থিয়েটার রোড থেকেই তাদের পরিচয়। এরাই সেইসব রি-পেট্রিয়েট যাদের মধ্যে এরশাদ ফিরে এলো যুদ্ধ শেষে। খুনি ফারুকের শিক্ষক জিয়া। মোস্তাক, রশিদ– আত্মীয়। আর এইসব অখ পাকিস্তানবাদী রি-পেট্রিয়টগুলোকেই সময়মত শক্ত হাতে ধরেছিলো, জিয়া। '৭১এ জিয়া, পরিপূর্ণ সেনাকোড পালন করে তার পাকিস্তানি কমান্ডারের, কিন্তু '৭৫এ সেনাকোড ভঙ্গ করে একের পর এক।

ইসলামাবাদ চালায় দেশ। আমাদের জন্য শুধু পতাকা ছাড়া আর কি আছে? সংবিধান তো কবেই গেছে। পতাকাও যাবে, আজ না হোক কাল। ফের গাইবো পাকসারজমিনসাদবাদ। যে সত্য উদ্ঘাটনে প্রাণ দিতে হলো প্রফেসর হুমায়ূন আযাদকে। দেশভরা মৌলবাদীদের ট্রেনিং ক্যাম্প এবং অস্ত্রপাতি। ক্যাডার এবং বিএনপি'র 'ইয়েস'। মুক্তিযুদ্ধের যেকোন কণ্ঠকে নিস্তব্ধ করে ফেলতেই জিয়ার জন্ম। গডফাদার জিয়া, যার ল্যাগেসি অব ব্লাড, খালেদা জিয়া। গডমাদার খালেদা জিয়া যার ল্যাগেসি গু াবাহিনীর হেড– হেরোইন এবং কোকেইন – জিয়া। সন্দেহ? হ্যালো! আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। জিয়া বিদ্রোহ করেনি বরং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সৌদি স্বীকৃতি আদায় করে নিলো। বঙ্গবন্ধুকে দিলো ৫৭০ সামান আর রেডক্রসের সাদা কাপড়। তাকে পাঠিয়ে দিলো, গ্রামে যেখানে মানুষ যাবে না ফলে তার কথা বাংলাদেশ ভুলে যাবে– সেই অভিসন্ধি।

এবার আসা যাক জিয়ার ল্যাগেসি অব ব্লাড, খালেদা জিয়ার কথায়। তার জন্ম ভারতে এবং ১৫ বছর বয়স থেকে সে পাকিস্তানে চলে যায়। দেশের একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারির স্ত্রীর দায়িত্ব বিশেষ। সেই অর্থে সুন্দরী খালেদার দায়িত্ব এবং পরিধিও বিশেষ। পাকিস্তান আর্মির মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তার উচ্চাভিলাষী সুন্দরী স্ত্রী– খালেদা। '৬৫ থেকে জিয়া সামরিক একাডেমির শিক্ষক এবং ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদকপ্রাপ্ত। ভারতের বিরুদ্ধে "আলফা কোম্পানির" কমান্ডার সে, যুদ্ধ শেষে আইএসআই-এর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ। '৬৩ থেকেই গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারি, বাঙালি সৈন্যদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। গালাগাল এবং নির্যাতন। অন্যান্য বাঙালি সৈন্যদেরকে হেয় করলেও, পাকসেনারা জিয়াকে ক্রমাগত পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলো। '৬৫তে পুরোপুরি দক্ষ আইএসআই যা একজন বাঙালি অফিসারের জন্য অসম্ভব। আর সেই সুবাদে তার বেগম, বেগম খালেদা জিয়া, যার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, পরিবারের একজন যখন সিআইএ, তখন পুরো পরিবার সিআইএ বলে বিবেচিত। তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং কর্মকান্ড সবকিছুই তখন সিআইএ'র দায়িত্বে পড়ে। এবং সেই যুক্তিতেই পুরো জিয়া পরিবার যখন আইএসআই-এর হেফাজতে... পাকিস্তান আর্মিতে উচ্চাভিলাষী এবং মাদকাসক্ত খালেদার বিশ্বস্ত স্বামীর কলিগ ও বসদের সঙ্গে তার একান্ত ঘনিষ্ঠ পর্ণো যোগাযোগ ও জনপ্রিয়তা যার নযির আমরা দেখেছিলাম '৭১এ। খালেদা জিয়া পাকিস্তানি জেনারেলের হেফাজতে ক্যান্টনমেন্টে কাটিয়েছে, পুরো ৯ মাস। সে প্রত্যাখ্যান করলো, ভারতের নিরাপদ আশ্রয়। লোলিটা খালেদার রঙ্গ বুঝতে কি পিএইচডি লাগে? আমি মহামূর্খ কিন্তু সজাগ।

যখন সব সেক্টর কমান্ডারের স্ত্রী ভারতে, খালেদা জিয়া রয়ে গেলো পূর্ব পাকিস্তানে। অস্বীকার করলো সে ক্যান্টমেন্ট ছেড়ে কিছুতেই ভারতে যাবে না। খালেদা থেকে রয়ে

গেলো ক্যান্টমেন্টে পাকিস্তান থেকে তার পুরোনো বন্ধু জানজুয়ার হেফাজতে। লোলিটা সে, এখনো তারা জীবিত যারা সেদিন হতাশায় ফিরে এসেছিলো খালেদার অসহযোগে। এবং পুরো নয় মাস সে পাক-কর্মকর্তার ঘরে থেকে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কিভাবে চক্রান্ত করেছিলো, যার প্রমাণ আমরা হাড়ে হাড়ে দেখতে পাই '৯১ তে। তার মন্ত্রীসভায় জানজুয়ারদের লোক যারা তার নিহত স্বামীর হাত ধরে '৭৯তে ক্ষমতায় এসেছিলো। খালেদা জিয়ার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপকর্মের শেষ কোথায়? তার সরাসরি পাকিস্তানি কর্মকা তার নিহত স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতা লোভী খালেদা জিয়া উলঙ্গ হয়ে স্বাধীনতার সকল পক্ষের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত রেখেছে। ইতিহাস ধ্বংস করা থেকে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে পর্যন্ত তার দুস্কৃতকারি হাত। রগকাটা এবং ক্রশফায়ার রাজনীতির বীজবপন। খালেদা জিয়া, ভোট চুরি করে ক্ষমতায় গেছে যে ভোট বুড়িগঙ্গায় ভেসে বেরিয়েছে। খালেদার লোলিটা হওয়া সর্বজনবিদিত। এ নিয়ে কোন সমালোচনা নেই। একজন হেরোইন খেলে, তার ১০ বছরের জেল হয়। খালেদার '৭১ এর গুপ্তচরবৃত্তির বিরুদ্ধে তদন্ত কোথায়? খালেদা জিয়া, জানজুয়ারের হেফাজতে কি করছিলো? জিয়া নয়, মুক্তিযুদ্ধের ১নং সুফলভোগী খালেদা। ১৩ই অক্টোবর ২০০১ সনে সে নিজামীকে নিয়ে গেছে সাভারে এবং বিশ্বাসঘাতক বাঙালি সেটা সহ্য করেছে। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুকে বলি জাতীয় বেঈমান! নিজামীকে দেই বীরউত্তম! আসুন, আমরা নিজামীদের পায়ের তলে, শহীদের হাড়গোড় ছিটিয়ে দেই যেন চূড়ান্ত অপমান তাদের সম্পন্ন হয়। নিজামীই যদি সাভারে গেলো, পতাকার অস্তিত্ব কী? ভারতে যেতে তার অনীহা কেন? জোট সরকার? কেন? মেইক সেন্স? ইয়েস!

আইএসআই খালেদা জিয়া, নিজামী-সাঈদী ও আল-মুজাহিদীকে সঙ্গে নিয়ে সাভার স্মৃতিসৌধে গেছে যা তার স্বামী জিয়া পর্যন্ত সাহস করেনি। গোলামকে সে নাগরিকত্ব দিয়েছে যা জিয়াও করেনি। সুতরাং এসব দেখে একটি কথাই ঠিক, আইএসআই যে কি, তা সে স্বামীর চেয়ে ভালো বুঝতো এবং স্বামীর চেয়ে শক্তহাতে দেশকে পাকিস্তানি আদর্শে পরিণত করেছে এবং এর সুফল খেয়েছে স্বামীর চেয়েও দীর্ঘদিন। সেই অর্থে স্বাধীনতার সুফল ভোগী জিয়ার চেয়েও বেশি, খালেদা। খুনি ফারুক তার '৭৬এর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলো, জিয়া সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতার সুফলভোগী। ইতিহাস নতুন করে লেখা হলে প্রমাণ হবে, দুশ্চরিত্র খালেদা জিয়া স্বামীর চেয়ে বড় গুপ্তচর এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার সবচেয়ে সুফলভোগী। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সংসদে জেহাদ, হরতাল, ইতিহাস বদল, কি নেই? চক্রান্তের সুষ্ঠু তদন্ত হলে জিয়া ও খালেদার আইএসআই চেহারা বের হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। অন্ধ জাতি, দেশপ্রেম নয়, ক্ষমতা ও দারিদ্রের হাতে বন্দী। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের শ্রেণী বিশেষে। অসামাজিক সাজকাজের বিধবা একজন খালেদা জিয়া, গোলাম আজমকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট প্রদান করে, শহীদ মাতা জাহানারা ইমামকে পেটায়। তাকে ঘোষণা করে, দেশদ্রোহী। গোলামকে '৯২তে আমীর

হতে দিয়ে, '৯৪তে দিয়েছে পাসপোর্ট। গোলামের সকল বইপত্র এবং প্রচার প্রোপাগান্ডা সবই রাষ্ট্রের খরচে। খালেদার চরিত্র নিয়ে চরিতামৃত কই? খালেদা জিয়া গোলাম আজমের বিচার না করে, শহীদজননীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা করেছিলো। গোলামের জন্য তার এই পীড়িতের উৎস কি? তার বইয়ের পুনর্মুদ্রণ– উৎস কে? বাঙালি জানে না, আন্দোলন। জানে না এক্টিভিজম। জানে না ভাষা। খালেদা জিয়া, গোলামকে বৈধ করে, শহীদজননীকে কবরে পাঠিয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহির মর্যাদায়! হ্যালো! আসুন আমরা সবাই আত্মহত্যা করে মূল্য দেই।

এবার বলবো আমার নিজের বিএনপি অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি কিশোরী। স্বাধীনতার সময় আমাদের বাড়িটি ছিলো আলবদরের ক্যাম্প। সেই বাড়িতেই ছিলো জামাত সেক্রেটারি কামরুজ্জামানের কর্মক্ষেত্র। সেখানে থেকেই কামরুজ্জামান চালিয়েছিলো তার হত্যাকান্ড। ফিরে এসে দেখি, বাড়িতে চাপ চাপ রক্ত। তখন বুঝিনি, আজ কল্পনা করি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প যার ইতিহাস আমরা পড়ি, তা আমার নিজেরই বাড়িতে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সারারাত টর্চার শেষে সেরিঘাটে নিয়ে গুলি করা হতো। আমাদের বাড়িটি বাস্তবিক অর্থেই হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। আর এই কামরুজ্জামানকে এদেশে বৈধ করলো কে? গেজেট ছাপালো কে? নিজামীরা কি জেল ভেঙ্গে রাস্তায় এসে রাজনীতি শুরু করেছিলো?

কামরুজ্জামান, যার বাড়ি শেরপুর, যুদ্ধের সময় আলবদর বাহিনীর প্রধান ও ছাত্র সংগঠক এবং সংগ্রাম পত্রিকার এজেন্ট কামরুজ্জামান একজন বাংলার 'রুডলফ হেস্' খালেদা যাকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশাল করেছে। আমার গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছে কামরুজ্জামান যার সাক্ষীও জীবিত। আমার গ্রামের অপর যুদ্ধাপরাধী খোন্দকার আব্দুল হামিদ যার কাজ ছিলো দেশে-বিদেশে লবি, ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো ও স্পষ্টভাষণের লেখক... জিয়া কেবিনেটের মন্ত্রী এবং বিএনপি'র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল পরামর্শদাতা। খোন্দকার আব্দুল হামিদ সারাজীবন মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানের পক্ষে প্রচুর কাজ করেছে যার মধ্যে জিয়াকে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার মর্দে মোমিন কলাম... তার জাতীয়বাদের কলামের জোরে খোন্দকার আব্দুল হামিদের মতো ঘৃণ্য জঘন্য মানুষকে জিয়া মন্ত্রী বানিয়েছিলো, '৭১এ যাকে জেলে পাঠিয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর সরকার। কে. এ. হামিদের পাকিস্তানপন্থী অবস্থান নিয়ে কারো সন্দেহ না থাকলেও পরবর্তীতে জিয়ার কারণে সকলেই ভুলে গেছে যে এই হামিদ, আর খুনি মওদুদীর মধ্যে পার্থক্য নেই। ভুলে গেছে ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম শেয়ার হোল্ডার শত শত কোটিপতি কামরজ্জামান, যার হাতে খুন হয়েছিলো শেরপুর ও জামালপুরের মুক্তিযোদ্ধারা... ষড়যন্ত্রবাদী এই ইসলামী ব্যাংক শেয়ারহোল্ডার যার উদ্দেশ্য দেশকে ইসলামী ঋণের মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকরণ, মৌলবাদী কামরুজ্জামানের মতো একজন যুদ্ধাপরাধী

ইসলামী ব্যাংকের সহায়তায় চালিয়ে যাচ্ছে ঋণের অজুহাতে দরিদ্র মানুষগুলোকে কিনে ফেলার কাজ। আমার গ্রামে তার সাহায্যকেন্দ্র। নও-মুসলিম আশ্রয়কেন্দ্র। ভাতা। কামরুজ্জামান এবং কে.এ. হামিদ, বাংলার রুডলফ হেস্ এবং গোয়েবলস... বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের পরিচয়? কে.এ হামিদের রাজাকারি কর্মকান্ডের সাক্ষী আমি নিজে। এই জিয়াউর রহমানই এদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদেকে হালাল করেছে। খালেদা জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যার কঠিন অবস্থান। বঙ্গবন্ধুকে গু া এবং ডাকাত রূপ দিতে সংসদে যে ছিলো মুখর। তার হত্যার বিচার বন্ধ করতে– তৎপর। খুনির বিচার হলে, খালেদা জিয়ার সমস্যা কী?

আমি '৭৭এর "হ্যাঁ-না" ভোটের সাক্ষী। আমি '৭৮ দেখা মানুষ এবং '৭৫ও, যখন আমি ঢাকা ডেন্টালের ছাত্রী। '৭৫এর ১৫ই আগস্ট এবং ৭ই নভেম্বরের হত্যাকান্ডে যখন থমথমে বাংলাদেশ, আমি দেখেছিলাম, ইতিহাসে পাঠ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেইসব শাসকগোষ্ঠির বীভৎসতা। রেডিও, টিভিতে দেখেছি তাদের উপস্থিতি এবং ঔদ্ধত্য। দেখেছি স্বৈরশাসন। '৭৬এ দেখেছি তাহের হত্যা বিস্ময়, ৭৭এর সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা, '৭৯তে এ. কে. খোন্দকারের মন্ত্রী গাড়িতে চড়ে বেরিয়েছি দেশী হওয়ার কল্যাণে, দেখেছি শাহ আজিজের মতো বোরম্যান প্রধানমন্ত্রী... '৭৯র ৫ম সংশোধনীর মতো অবিশ্বাস্য আইন। দেখেছি সংবিধানের মুসলমানী এবং হিন্দু নিধন এবং অত্যাচার। হিন্দুপ্রধান শেরপুর প্রায় হিন্দুবিহীন। হিন্দুদের অনিরাপত্তা এবং বিএনপি'র হাতে হিন্দুদেরকে জ্বালাও-পোড়াও কার্যক্রম। জিন্নাহ'র দ্বিজাতি তত্ত্বের ল্যাগেসি। হিন্দু-মুসলমান ভিত্তিতে, জাতি-দেশ ও মানুষকে বিভক্তিকরণ। দেখেছি বিএনপি'র ক্যাডারদের হাতে রাম দা, বন্দুক, ছুরি। সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বিএনপি'র অত্যাচার। সুতরাং বাংলাদেশের নাৎসী বাহিনীর পুনরুত্থানের জন্য জিয়াউর রহমানের যে ভূমিকা, আর কতো দু'চোখ বন্ধ করে রাখবে এই বঙ্গবন্ধু অভিজ্ঞতার বাংলার মানুষ? স্বৈরাচার জিয়াউর রহমানই কি সব? দেশ কি, কিছুই নয়? জিয়া কখনো বিদ্রোহ করেনি, আত্মরক্ষা করেছিলো। আমাদের প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর পুনরুত্থান। চাই আরেকটি '৭১, '৭৫এর পশু তাড়াতে। চাই আবার মুক্তিযুদ্ধ, বিএনপি তাড়াতে।

বাংলাদেশের গণহত্যা কিভাবে অপরাধের সীমানা এড়িয়ে নিরপরাধ হয়ে গেছে, তার উত্তর খুব পরিষ্কার। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যা '৭১ থেকে সক্রিয়, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের ব্যাখ্যা মাফিক, সেই আইএসআই চক্র এবং তার পার্টনার সিআইএ, বিজয়ের আগেই তাদের পরবর্তী ফ্রন্ট স্থির করে রেখেছিলো। জাতিসংঘে ১৫ই ডিসেম্বরের ভুট্টোর শেষ ভাষণ থেকে পাওয়া যা এই ফ্রন্টের অস্তিত্বের আভাস। "...ঢাকার পতন হলে কি আসে যায়? পূর্ব পাকিস্তানের ৫ বছর বা ১০ বছরের জন্য নিয়ে যাক, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনবো। সোনার বাংলা আমাদের, ভারতের নয়।" নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টোর চিৎকার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, অন্য আরেকটি

ফ্রন্ট, আইএসআইয়ের সহায়তায় যারা, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতেই তৈরি। এরাই রি-পেট্রিয়েট বা প্রো-পাকিস্তানি, বাঙালি সৈন্য। বিশাল চক্রের মধ্যে রশিদ, ফারুক এরা যারা সন্দেহজনকভাবে একদম শেষভাগে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। এর আগে তারা সন্দেহজনক স্থানে অবস্থান করছিলো। সন্দেহজনক দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলো। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বারবার বলেছেন, মোহাম্মদী বেগ তো শুধু হত্যার কাজটি সম্পন্ন করেছিলো। কিন্তু যারা ক্লাইভ, তাদেরকে আমরা কি শনাক্ত করেছিলাম? তার পর্যবেক্ষণে, শীতল যুদ্ধের সময় থেকে সিআইএ আর আইএসআই-এর কো-পার্টনারশীপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদি তৎপরতায় এই দুই গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য সহযোগিতা, যার প্রথম ভিকটিম "বাংলাদেশ" এই জেহাদী তৎপরতা যার বিরুদ্ধে পশ্চিমে আজ "ওয়ার অন টেরর।" এই গ্রুপটিই ভুট্টোর নেতৃত্বে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে সৌদিদের ষড়যন্ত্রের অংশীদার। '৭৪এ ভুট্টো, সৌদিকে জানিয়েছিলো, খুব শিঘ্রই বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কথা। ১৫ই আগস্ট সকালে ভুট্টো ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছিলো। সৌদি আরবের অর্থ ও মদদে ভুট্টো অপশক্তির সঙ্গে জড়িত, সেইসব সন্দেহজনক প্রো-পাকিস্তানি বাঙালি সৈন্য যারা, যুদ্ধের সময় ঢুকে পড়েছিলো সৈন্যের ছদ্মবেশে। এরাই রশিদ, ফারুক গং, যারা শুধু মোহাম্মদী বেগ। সম্পদ বণ্টনের দিন ধার্য করার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুকে ভুট্টোর উত্তর, ১৫ই আগস্টের পর। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের মন্তব্য, এসব তথ্যের নাগাল কখনো পাওয়া গেলে, ষড়যন্ত্রের অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার ভিডিও সাক্ষাৎকারে '৭৫এর অনেক আগে থেকে অন্য ফ্রন্টের মাধ্যমে কিসিঞ্জার এবং ভুট্টোর বঙ্গবন্ধু হত্যা ও মৌলবাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাখ্যাটি খুব পরিষ্কার। সেনাবাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সৈন্য হত্যা এবং বিরোধীদের দিয়ে সেনাবাহিনী গঠনের তথ্যও পরিষ্কার। তাছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন এবং মৌলবাদীদের দিয়ে রাজনীতি, যে নজির নাৎসী ইতিহাসেও নেই, পাকিস্তান ফেরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে মোহাম্মদী বেগের কাজটি করেছিলো, পরবর্তীতে যাদেরকে নির্বাসিত রেখে একা ক্ষমতা ভোগ করেছে জিয়া– খুনিদের সাক্ষাৎকারে একটি কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, জিয়া ২০০ বছর পর আরেক মীরকাসিম। মৃত্যুদ প্রাপ্ত খুনি, কর্নেল খোন্দকার ফারুক চ্যানেল আই সাক্ষাৎকারে বলেছে, '৯৫ ভাগ বাঙালি সৈন্য চেয়েছিলো, সমঝোতা। অর্থাৎ অখণ্ড পাকিস্তান।

বিভিন্ন বইতে জিয়ার ইতিহাস পাঠ করলে,পদে পদে পরিষ্কার হয়ে যাবে, আসল জিয়া কে? জিয়ার পূর্ব পরিচয় এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ যোগাযোগ। মেজর রশিদ, যার আপন চাচা খোন্দকার মোশতাক, যুদ্ধের সময় হঠাৎ তাকে এক বছরের 'হোমলিভ" দিয়েছিলো ইয়াহিয়া সরকার কি উদ্দেশ্যে তারাই জানে। তারপর থেকে সে একবার পূর্ব আরেকবার পশ্চিম পাকিস্তান। জিয়া এসেছিলো '৬৯এ। অর্থাৎ একটি বিশাল বাঙালি

সৈন্যের অংশ– যারা চেয়েছিলো অখ পাকিস্তান। আর কতো প্রমাণ দিলে জিয়াকে সামরিক ট্রাইবুনালে আনা যাবে? জিয়া কি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকবাহিনীর মর্যাদা দেয়নি? জিয়া কি ক্যান্টমেন্টকে তার জল্লাদখানা বানায়নি?

ড. শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সে (জিয়া) যে মুক্তিযোদ্ধা সেকথা ভাবতে আমার লজ্জা হয়। তার বিশ্বাস, জিয়া মুক্তিযোদ্ধা নয়, কারণ, একজন মুক্তিযোদ্ধা কখনো তার স্বামীর ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত খুনি খালেক মজুমদারকে অধ্যাদেশের মাধ্যমে মুক্তি দেবে না। তার সন্দেহ, জিয়া একজন ষড়যন্ত্রকারী। তার উস্মা, যুদ্ধাপরাধীরা কি করে 'রাজবন্দী' হয়? বীরবিক্রম নূরন্নবীর উচ্চারণ, জিয়া একজন প্রো-পাকিস্তানি, আইএসআই-এর চর। হাসানুল হক ইনুর বক্তব্য হলো, জিয়া একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি, একজন ভয়ানক মৌলবাদী, ধর্মের নামে মৌলবাদ আমদানিকারক, ধর্ম বেচে দেশের মানুষের কাছে পৌছানো...। প্রফেসর কবীর চৌধুরীর মতে, জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত। আমি সারা বাংলাদেশে কোন জরিপে যাইনি, সময় হয় না, তবে বিস্তর কর্মক্ষেত্রে ২০ বছরে যতো কিছু জেনেছি, জিয়া নিঃসন্দেহে ইয়াহিয়ার লোক, বঙ্গবন্ধু যাকে চিনতে ভুল করেছিলো, নবাব সিরাজের মতো। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের মতে, জিয়ার চেয়ে বড়ো আইএসআই এবং স্বাধীনতার ১নং সুবিধাভোগী বেগম জিয়া। তার সন্দেহ, বড়ো চরকে আমরা ধরতে পারিনি। বিধবা পান্না কায়সারের মতে, বেগম জিয়ার সাজসজ্জা দেখে তার সন্দেহ, আদৌ সে তার স্বামীর অভাব বোধ করে কিনা। লজ্জা হয় বিধবার এই নির্লজ্জ সাজসজ্জা দেখে, ক্রোধ হয় নিজামীর পাশে দাঁড়ানো তার স্বামীর রক্তে রঞ্জিত বাংলার পতাকার সামনে খালেদাকে দেখে। আমার এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের হলোকস্টকে 'ইহুদি' হলোকস্টের মতো সমান উচ্চতায় তুলে ধরে জিয়াসহ সকল অপরাধীদের বিচার করা যারা নাৎসী সত্ত্বেও নাৎসীদের মতো শাস্তিভোগ করে মূল্য পায়নি গণহত্যার, আমি আশা করবো যে, এরপর মানুষের বিবেক জেগে উঠবে, মাতৃভূমির প্রতি প্রচ ভালবাসায়। আসুন আমরা বাংলাদেশকে জিয়ামুক্ত করি। জিয়াবাদ, পাকসারজামিনসাদবাদের চেয়ে ভয়ঙ্কর।

এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরো একটি তাপর্যপূর্ণ গংফ্রন্ট গোলাম আজমদের দুস্কৃতি সম্পর্কে বই থেকে আলাপ করবো। এই ফ্রন্ট যে কি পর্যায়ের দুস্কৃতিকারী, সেটার অন্যতম দলিল, গোলাম আজমের জীবনী– "জীবনে যা দেখলাম।" বইটির শুধুমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ খ আমার হাতে পৌছেছে। এই বইটিতে আরো রয়েছে মেজর ডালিমের লেখা "যা দেখেছি–যা বুঝেছি–যা করেছি" বইটি থেকে, খণ্ড খণ্ড অংশের উদ্ধৃতি। বইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, শুধু শেখ হত্যাকান্ডই নয়, তারও আগে বাংলাদেশের জন্মের বিরুদ্ধে গোলাম আজমদের যে শ্বাসরুদ্ধকর ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়, সৌদি-পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে এই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠির

চক্রান্তের যে যোগসূত্র, সৌদির একক অপশক্তির যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত... '৬৯ থেকেই মওদুদী ও গোলাম আজমের মাধ্যমে এই অঞ্চলের রাষ্ট্র এবং মানুষগুলোকে ধর্মভিত্তিক তাবুর তলে একত্রিত করে এদেশে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র খাড়া করার লক্ষ্যে এই অপশক্তির অশেষ ভূমিকা যা, বাংলার বেঈমানেরা বারবার উপেক্ষা করে গেছে। তাবৎ বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সবাই। যাদের প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। কারো প্রয়োজন, উচ্চ পর্যায়ের পে-ব্যাক। কারো হা-অন্ন, হা-বস্ত্র, হা-বাসস্থান। সুতরাং বাংলাদেশের জ্ঞানপাপী এবং নিরক্ষরদেকে কিনে নেয়া কতোটা সহজ তার প্রমাণ, দেশের সর্বত্রই আজ এক বুলি। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মেলানো। বিনিময়ে কেউ পায় মন্ত্রীত্ব, অন্যরা ক্যাডারের কাজ। এছাড়া আর কি আছে? বাংলাদেশ তাই রাজাকারদের চারণভূমি। 'একজন মানুষ কিছুই বুঝবে না যখন তার বেতন নির্ভর করে না বোঝার উপর'। পল সিনক্লিয়ার – ১৯০১।

'৭১এর পর, বিজয়কে প্রতিহত করার জন্য মওদুদী ও গোলাম আজমদের সঙ্গে সৌদি-পাকিস্তান যোগাযোগ, সৌদি-বাহারাইন-কাতার এই সমস্ত জায়গায় গোলাম আজমের একক প্রচেষ্টায় নেটওয়ার্ক গঠন, তহবিল সংগ্রহ করে তা বাংলাদেশে প্রেরণের অস্থির তৎপরতা, হজ্বের অজুহাতে বাংলাদেশ থেকে জামাত নেতাদেরকে টিকেট দিয়ে এনে '৭৫ ঘটানোর নীলনকশা, সৌদিতে থাকা অবস্থায় ওমরাহ এর অজুহাতে জেহাদীদেরকে একত্র করে '৭১ বিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া, নিষিদ্ধ যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে সৌদি এবং লন্ডনে গোলামের বারবার বৈঠক, '৭৪এ লন্ডন থেকে বারবার ওমরাহ করার অজুহাতে সৌদিতে '৭১ বিরোধী জেহাদীদেরকে পুনর্গঠন, বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় কিং ফায়সলের সম্মতি, সেক্যুলারিজম এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিং ফয়সালের অসন্তোষের সঙ্গে গোলাম আজমদের একাত্মতা, সৌদি বাদশাহকে ভুট্টোর বার্তা, 'দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দেরী নেই।' বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা না দেয়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি কিং ফয়সালের প্রকাশ্য ক্ষোভ এবং হিন্দুরাষ্ট্র ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় ঘোরতর অসন্তোষ... '৭৫ এর ১৫ই আগষ্টে বাংলাদেশকে মোশতাকের ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও ১৬ই আগস্ট বাংলাদেশকে পূর্ব ওয়াদা মাফিক সৌদির প্রথম স্বীকৃতিদান এবং মোশতাক সরকারকে পাকিস্তানেরও ২ বার স্বীকৃতিদান, ১৫ই আগষ্টে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সংবাদে গোলাম আজমদের স্বস্তির নিঃশ্বাস, বাংলাদেশকে শক্তিশালী ইসলামী প্রজাতন্ত্র করতে মোশতাককে সৌদির আশ্বাস, ভারতের অঙ্গরাজ্য হওয়া থেকে মুক্ত হওয়ায় কিং ফয়সালের ১৫ই আগস্টকে সমর্থন, খালেদ মোশাররফের বানোয়াট রুশ-ভারত বিপ্লবের বিরুদ্ধে, হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে, মওদুদী গোলামদের মিথ্যা ঘৃণা ছড়ানো এবং ৭ই নভেম্বর উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার পেছনে সৌদি-পাকিস্তানের হাত। গো-আজমের বইতে সব হিসেব খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ। এবং এই বই থেকে খুব স্পষ্ট

বোঝা যাবে যে, '৭৫ ঘটানোর জন্য অর্থাৎ জামাতকে সৌদিতে বসে সুসংগঠিত করা, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং লন্ডন-সৌদি-লন্ডন করে সকল যুদ্ধাপরাধীদেরকে পুনর্গঠনের চরম ব্যবস্থা যেন পাক মার্কিন ও সৌদি চক্রের '৭১এর পরাজয়, দীর্ঘস্থায়ী না হয়... '৭৪এ বারবার বিভিন্ন মৌলবাদী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দেশ সফর, হজ্বের অজুহাতে জেহাদিদের সঙ্গে বৈঠক, কিং ফয়সালের সঙ্গে মুজিব সরকার সম্পর্কে ৬বার বৈঠক, তার সঙ্গে সংবিধান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ এবং জেহাদিদের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য '৭২ থেকে দফায় দফায় ইস্তেহার পেশ, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই বইটিতে পাওয়া যাবে– প্রমাণ করে জিয়া একজন আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলো যারা '৭১এর অপশক্তি।

'৬৯ থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মওদুদী গোলাম আজম গংদের কার্যক্রম এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে কিং ফয়সালের অসন্তোষ, জাতিসংঘে কতক বৃহৎ শক্তির ভেটোর সঙ্গে সৌদির স্বার্থরক্ষা এবং যুদ্ধবিরতির ষড়যন্ত্র করে চীন-পাকিস্তান-সৌদি এদের সঙ্গে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রির সম্পর্ক। গণহত্যা ছাড়া অস্ত্রের ব্যবসা হয় না। সুতরাং মওদুদী ও গোলাম আজমদের জন্য '৭৫এ জিয়ার চাকু দিয়ে হত্যা এবং সংবিধানকে মুসলমানী করা কেন জরুরি ছিলো, যার উত্তর– সৌদি আরব, বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিলো মোশতাকের ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। পাকিস্তানও দিলো একই দিনে। চীন দিলো ৩১শে আগস্ট। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ২২শে ফেব্রুয়ারী '৭৪এ ষড়যন্ত্রকারী ভুট্টো আরেকবার মুজিব সরকারকে ষড়যন্ত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, শুধু বাংলাদেশে ঢোকার জন্য। এবং সেখানেই প্রমাণ '৭৪এর ষড়যন্ত্র। মোশতাকের আগামসি লেনের বাসভবনে বসে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বোস্টার এবং জিয়া গংদের ষড়যন্ত্র। সেখানেই উপস্থিত থাকতো রশিদ-পাশা-ডালিম-ফারুক-চাষী-মোশতাক-হুদা গং...।

বইয়ের ভাষ্য, সংবিধানে যখন "ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র" ঢোকানো হলো তখন থেকেই মুজিবের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেলো। এর মধ্যে এসে যোগ হলো, ডালিমের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে গাজী গোলাম মোস্তাফার কেলেঙ্কারি এবং মুজিব বাহিনীর অত্যাচার। সেই সুযোগে তৈরি হতে থাকলো দেশি বিদ্রোহীরা।

ডালিমদের লাস্ট হোপ 'জিয়া', একদিকে '৭৪ থেকে তলে তলে দেশের ভেতরে প্রো-পাকিস্তানিদেরকে পুনর্গঠন, তাদেরকে রাজনীতিতে অনুর্ভূক্ত করতে বিদেশী নেটওয়ার্কের সবরকম নির্দেশনা, অন্যদিকে জাসদ ও গণবাহিনীকে দিয়ে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা বাধিয়ে রাখা।

'৭৪এর অনেকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন কিসিঞ্জার ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বহারাদের খুন খারাবি, দেশে নৈরাজ্যবাদ এবং সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা। বিদেশে গোলাম আজমদের বারবার কুয়েত-বাহারাইন-লন্ডন-সৌদি ভ্রমণ। হজ্বের

অজুহাতে হজ্ব মাঠে মওদুদীর পরামর্শমত জেহাদিদেরকে টাকাপয়সা খর্চ করে জেদ্দায় পাঠিয়ে সৌদি এবং লন্ডনের মুজিব বিরোধীদের সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠক। বাংলাদেশে একটি স্থায়ী ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করার বিলম্বে নাখোশ সৌদি বাদশা এবং কিং ফয়সালের সঙ্গে গোলামের বৈঠক, বাদশার সরাসরি ক্ষোভ, বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র যা নিশ্চয়ই হিন্দুয়ানী এবং রাশিয়ানী। বাদশার মতে এর অর্থ হলো, ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, দুই স্বাধীনতার পক্ষের দেশ, একটি বৃহৎ ইসলামী শক্তিকে বিভক্ত করেছে '৪৭এ, যে দেশ সৃষ্টি হয়েছিলো জিন্নাহ তত্ত্বের সাম্প্রদায়িকতার ফলাফল, হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের ভিত্তিতে। '৭১এ ফের জিন্নাহদ্বিজাতিতত্ত্ব, যা ভেঙ্গে গেলো ভারত ও সোভিয়েতের সহায়তায়, তাকেই ফিরিয়ে আনতে কিং ফয়সালের সঙ্গে গোলাম আজমের ষড়যন্ত্র। যা তার বইয়ের ৪র্থ খ ে র পাতায় পাতায়। গোলাম প্রেমী বেগম জিয়ার আমলে এসব বই তারই প্রয়াসে লেখা এবং মুদ্রিত। আর দেশবিদেশে জামাতি নেটওয়ার্কিংয়ের এই সুসময়ে '৭৪এ তাদের হাতে ধরা পড়লো জিয়া-ডালিম-রশিদ গং, যারা মুজিব হত্যার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। এবং জামাতের বিপুল লোকবল ও অর্থবলের কাছে নৈরাজ্যবাদীদের তৎপরতায় নাস্তানাবুদ মুজিব, ইতোমধ্যেই দুর্বল। '৭৩ এবং '৭৪এ মওদুদীবাদের গং মর্দে মোমিনের ছদ্মবেশি জেলখাটা জিয়ামন্ত্রী কে.এ. হামিদ নামের রাজাকারের মুসলমান জাতীয়তাবাদের পক্ষে মুজিব বিরোধী তুখোড় কলাম। জিয়াউর রহমান সেই বিশাল নেটওয়ার্কের মধ্যমণি। একদিকে ডালিম-রশিদদের 'লাস্ট হোপ', অন্যদিক দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধূলিসাৎ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র, বিছমিল্লাহ এবং ইসলাম ধর্ম... বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আসলেই যা মুসলমান জাতীয়তা, ইত্যাদির সংযোজন করতে সৌদি ও গোলাম আযমের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক জেহাদি শক্তিদের নজর কেড়ে নেয়া। এবং ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে সৌদির সঙ্গে মৌলবাদের সমঝোতা। এইসব কিছুর মধ্যেই '৭১ থেকে মওদুদী ও গোলাম আজমের ছুরিকাঁচি। জিয়া না হলে এসব কিছুই হতো না। না গোলাম আজমের নাগরিকত্ব, না মাওলানা মান্নাদের মতো যুদ্ধাপরাধীর মন্ত্রীত্ব লাভ। '৭৯তে আব্বাস উদ্দিন খানের মতো ঘৃণ্য ব্যক্তির রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ। একথা কি আমরা নাৎসীদের বেলায় বলতে পারি? একই সঙ্গে যে জাতি জ্ঞানপাপী এবং দরিদ্র, সে জাতির ভাগ্যে যারা ক্রিমিনাল তারা ছাড় পেয়ে যায়। আর যারা নিরপরাধ তারাই হয় ভুক্তভোগী। আজ যারা '৭১এ সপক্ষের শক্তি, তারাই আজ গোলাম আজমদের নীরব ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কাছে ঋজু। সাভারে সাঈদীর পায়ের তলে শহীদের লাশ চিৎকার করে। বধ্যভূমিগুলো ওদের টয়লেট। মুক্তিযুদ্ধ আজ সমকামী।

আমেরিকাতে পার্ল হার্বার আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলে কি ভুল করেছিলো পেন্টাগন? সেই বোমা না ফেললে, ২য় বিশ্বযুদ্ধে আরো কতো বেশি লোক

প্রাণ হারাতো? দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ২০০০ মাইল দূরে একটি ভুয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তাকে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ কি ভুল? ভুট্টোকে ফাঁসি না দিলে পাকিস্তানের পরিণতি কী হতো? ভুট্টোকে ফাঁসি দিয়ে পাকিস্তান কি ভুল করেছিলো? ভুট্টো এবং জিয়া বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের ভাগ্যে পাকিস্তানের পতাকা নিশ্চিত।

কোন কোন মৃত্যু যেমন দেশ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলজনক তেমনিই, কোন কোন মৃত্যু দেশ ও মানুষের কল্যাণের প্রতিবন্ধক। ভুট্টোর মতো, জিয়ারও ফাঁসি যেমন কাম্য, তেমনিই ইরানের স্বৈরাচার শাহ্ কিংবা ইরাকের সাদ্দামের উৎখাত, জগৎজুড়ে অকল্যাণ বয়ে এনেছে। এর পর থেকে ইরান ও ইরাকে চলছে মৌলবাদীদের উত্থান। একদিকে আয়াতোল্লাহর পুনরুত্থান, অন্যদিকে হিযবুল্লাহদের বিস্ফোরণে পর্যুদস্ত ইরান-ইরাক। এসবই সিআইএ'র চক্রান্ত। তারাই আনে, তারাই তাড়ায়। গণহত্যার প্রয়োজন এসব। একটির চাহিদা ফুরিয়ে গেলে প্রতিপক্ষকে সামনে তুলে আনা। ইরান-ইরাক-আফগানিস্তানের বেলায়, একই অঙ্ক। ইথিয়োপিয়া, চিলি, উগান্ডা, রুয়ান্ডা সব এক হিসাব। শুধু বাংলাদেশের হিসাবটা ভিন্ন। এখানে দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত জাতির বিরুদ্ধে জিন্নাহ রাজনীতির স্তম্ভকে কামানের নল দিয়ে গুড়িয়ে দিতে যার জন্ম হয়েছিলো সেই বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিপক্ষ, একই মৌলবাদী শক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে সৃষ্টি যার– জিয়া এবং এই জিয়া রাজনীতি, যাকে কেন্দ্র করে এদেশে পুনরায় উত্থান হয়েছে দু'টি দুর্ধর্ষ অপশক্তির। এক, মৌলবাদ। দুই, নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। মৌলবাদ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, দুই অপশক্তির কাছে পর্যুদস্ত বাংলাদেশ, যা মীরজাফর বা হিটলারের শক্তির চেয়ে বিশাল। মীরজাফর বা হিটলারের ছিলো না মৌলবাদ, যা ইস্ট ইন্ডিয়ার চেয়েও ভয়ানক। বিদেশীরা শাসন করে অন্যের দেশ। আর মৌলবাদ শাসন করে বাংলার মানুষের মাথা। কোন কোন মৃত্যু সত্যিই খুব মঙ্গলজনক। যেমন ৩০শে মে ১৯৮১'র সুবেহ সাদেকে নেমে আসা মৃত্যু সংবাদ। যা– সুসংবাদ!

গোলাম আজম তার বইতে লিখেছে, ছাত্রদের ৫ম শ্রেণী থেকেই ধরতে হবে যেন কলেজে গেলে তারা ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের সৈনিক হয়। গোলাম আজম এবং মওদুদীদের টার্গেট, যারা কিশোর। মৌলবাদীরা আকড়ে ধরে কিশোরদের বুদ্ধিবৃত্তি, নষ্ট করে দেয় মানবিকতা, মৌলবাদের নকশায় তাদেরকে দীক্ষিত করতে আশ্রয় নেয় ধর্মের জেহাদীর ছদ্মবেশে কিশোর সমাজ, মাথায় জিঘাংসার উম্মাদনা, কম্পিউটারের বদলে হাতে তুলে নেয় বোমা। আর যখন এইসব জিয়াউর রহমানেরা এসে যোগ দেয় জিহাদীদের দলে, তখন বাংলাদেশের মতো উদাহরণের সৃষ্টি হয় যেখানে কিং ফয়সাল, ভুট্টো, গো-আজম, মওদুদী, নিজামী সব এক হয়ে সৃষ্টি করে তাদের মনের মতো দেশ, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নামে মৌলবাদীদের বাংলাদেশ। অন্ততঃ এই উদাহরণ আমরা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে দেখতে পারবো না। ভুট্টোর মতো বারবার দেশদ্রোহীতার

অপরাধে জিয়াকেও যদি সময়মত বঙ্গবন্ধু বা খালেদ মোশাররফ ফাঁসি দিতো, আজ স্মৃতিসৌধে খালেদা জিয়ার পাশে নিজামীকে দেখতে হতো না। আজ হিটলারের লোক যদি হলোকস্ট মেমোরিয়াল উদ্বোধন করে জার্মানীর অবস্থা কি দাঁড়াবে? খালেদ মোশার-রফ যদি তাহেরের মতো নভেম্বরের ২ তারিখে জিয়াকে ফাঁসি দিতো নৈরাজ্যতা এবং দেশদ্রোহীতার অভিযোগে! বাংলাদেশ আজ সত্যিই সোনার বাংলা হতো। গোলাম আজমের বইয়ের প্রতিটি পাতায়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের গন্ধ। তারপরেও ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ খালেদা জিয়া, তার দানব ক্ষমতাবলে মুক্তিযুদ্ধের পেটে লাথি মেরে '৯৪তে গো-আজমকে ফিরিয়ে দিয়েছে নাগরিকত্ব। কারণ, গোলাম দিয়েই সম্ভব হয়েছে বিশ্বাসঘাতক '৯১ এবং ২০০১এর সরকার। [পৃঃ ১৬৮ জীবনে যা দেখলাম ১৫৭, ১৯৭৪]। কেন '৭১? কিসের '৭১?

প্রোবের সঙ্গে ২৮শে জুলাই এক সাক্ষাৎকরে মতিউর রহমান নিজামী বলেছে, "আমরা যুদ্ধ করিনি, সুতরাং যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নই আসে না।" কথাটি নিজামী এমন ধূর্ততার সঙ্গে প্রকাশ করেছে যা বাংলাদেশ বিরোধী জামাতের দেশদ্রোহীতার উদাহরণ। তাহলে, '৭১এর সংগ্রাম পত্রিকায় তার বক্তব্য কি মিথ্যা? শতশত বক্তৃতার অংশবিশেষ, মিথ্যা? দৈনিক সংবাদে তার উক্তির কোটেশন- মিথ্যা? নিজামী, যুদ্ধ করেনি? হ্যালো! আইনের একটি উদাহরণ, যে, আইনে আমেরিকাতে অনেককে মৃত্যুদণ্ডে দ তি করা হয়, নাম- "ল অব পার্টি।" অর্থাৎ একটি ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তি যদি সংযুক্ত থাকে, সে যদি খুন নাও করে থাকে তবু শুধু সহযোগিতার জন্যও সে সমান অপরাধী।

সুতরাং মতিউর রহমান নিজামী কেন শুধুমাত্র "ল অব পার্টির" অধীনে একজন যুদ্ধাপরাধী তার প্রমাণ '৭১ এর সব পত্রিকা জুড়েই নিজামীর দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড। '৭১এর আর্কাইভ জুড়ে, নিজামী গংদের গণহত্যার প্রমাণ রয়েছে আমারও সংগ্রহে। এবং গডমাদার খালেদা তাকে মন্ত্রী করেছিলো। আমরা কি মানুষ? আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করতে নিজেদেরকে আগে হত্যা করি। কারণ, আমরা সবাই জিয়ার জারজ পুত্র-কন্যা। আমরা সবাই সমকামী। আমাদের পতাকা '৭১ এবং সেনাবাহিনী... আমরা সবাই সমকামীর মর্যাদাপ্রাপ্ত- '৭৫এর পশুসন্তান।

দৈনিক সংগ্রাম ১৯৭১এর ১৪ই নভেম্বরের সংখ্যায় রয়েছে নিজামীর অদ্ভুত বক্তৃতা। "...আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এদেশের প্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে।" ২৩শে সেপ্টেম্বরে আলবাদর বলেছে, "যারা ইসলামকে ভালবাসে, তারাই পাকিস্তানকে ভালবাসে।" বদর দিবসে তার লেখা প্রবন্ধ, "বদর দিবস পাকিস্তান ও আলবদর" ১৯৭১এর ১৪ই নভেম্বর সংগ্রামে সে যে ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বদরদেরকে প্ররোচনা করে আলবদরকে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলো, নিজামীর যুদ্ধাপরাধের আরেক প্রমাণ "ল অব পার্টির" আওতায় পড়ে। যেমন, মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন তার

"ম্যাসাকার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "বুদ্ধিজীবী হত্যার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, আলবদর নামের ধর্মোন্মত্ত দলকে দিয়ে।" মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট গবেষক ড. হাসান বলেছেন, "নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশজুড়ে বেছে বেছে যে হত্যাকান্ড চালানো হয় তা করেছে, জামাত ও ইসলামী ছাত্র সংঘের বাহিনী আলবদর গোষ্ঠি। পাকিস্তানের সেনারা এসময়ে তাদের সহযোগি মাত্র।" পাকিস্তানিরা কি বাংলাদেশ চেনে? তাদেরকে এদেশ চিনিয়েছিলো যারা, তারাই নিজামী, গোলাম আজম। এখানেই প্রমাণ হয়ে যায়, নিজামী কেন যুদ্ধাপরাধী। পাকসেনার চেয়ে বেশি খুন করেছে যারা– কোলাবরেটর। আমার সংগ্রহে রয়েছে রাজাকারদের বক্তব্য। তাদের পর্যবেক্ষণ, পাকসেনারা দেশ ভাষা কিছুই চেনে না। তাদেরকে চিনিয়েছে, যারা স্থানীয়।

'৭১এর আর্কাইভে মওদুদীবাদী নিজামীর এইসব ভয়ঙ্কর সংবাদ কি মিথ্যা? শুধুমাত্র নাৎসী ক্যাম্পের সামান্য পাহারাদার হলেও যাকে যুদ্ধাপরাধী অভিযোগে ইউরোপে বিচার করা হচ্ছে, হোক তার বয়স ১০০ বছর, সেখানে সরাসরি বদরবাহিনীর প্ররোচক, পাক সেনাদের সহযোগী এইসব বাংলানাৎসীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা? খালেদা কি উন্মাদ? গোলাম আজম-নিজামী-কামরুজ্জান-আলমুজাহিদীর সংবাদ তো '৭১ এর প্রতিদিনের সংবাদপত্রে! তারপরেও এইসব উদাহরণ! গণহত্যায় নাৎসীদের উদাহরণ কিংবা "ল অব পার্টি" ইত্যাদি আইন কেন এদের বেলায় প্রযোজ্য নয়? এবং এরা কেন জেলের বাইরে সেই রহস্যও কেন ভাঙ্গা হবে না? '৭৫এর মানে কী? এই কোড কেন ভাঙ্গবে না সেনাবাহিনী?

"ল অব পার্টি" আইনে শাস্তিযোগ্য এই নিজামি, যে নাকি উচ্চারণ করেছিলো, "পাক সেনারা আমাদের ভাই।" সংগ্রাম ৩রা আগস্ট ১৯৭১। আমাদের পুরো দেশ আজ সমকামীদের পর্যায়ে পৌছে গেছে। কারণ, নিজামীকে তারা সাভারে পাঠিয়ে গণকবরকে করেছে গণটয়লেট।

পাক সেনারা নিজামীর ভাই! শুধু এই কথাটির জন্যই তো ল' অব পার্টির সদস্য নিজামীকে কোলাবরেটর বলা যথেষ্ট, যে আইন জিয়া বাতিল করেছিলো। আজ আমি যদি ক্যাপিটল হিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমেরিকাকে বলি তালেবানরা আমাদের ভাই। কি অবস্থা হবে? আজ যদি নাৎসী বোরম্যানের ছবি ক্যাপিটল হিলে লাগানো হয়– কি হবে?

রবার্ট পেইনের "ম্যাসাকার" গ্রন্থটিতে আলবদরের সঙ্গে নিজামীর সম্পর্ক এবং গণহত্যায় আলবদরের ভূমিকা সুস্পষ্ট। আলী আকবর টাবীর লেখা আলবদর থেকে মন্ত্রী, মতিউর রহমান নিজামী, এই বইয়ের পাতায় পাতায় নিজামীর উক্তি ও দিনক্ষণসহ পত্রিকার দ্রষ্টব্য বিদ্যমান। জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া, যথাক্রমে– মেট্রিক ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ। সুতরাং এই জাতির ভাগ্যে গোলাম ও নিজামী নেমে আসবে না, তো কে নেমে আসবে? হ্যালো! আসুন আমরা '৭৫এর পশু হত্যা করি। একে অপরকে হত্যা করি, কারণ আমরাই পুষে রেখেছি '৭৫এর পশু!

বিএনপি'র হাতে '৭১ নিহত। পান্না কায়সার নিহত। কবির চৌধুরী নিহত। শ্যামলী চৌধুরী নিহত। বধ্যভূমিগুলো নিহত। সাভার স্মৃতিসৌধ নিহত। শহীদ মিনার নিহত। সংবিধান নিহত। পতাকা নিহত। আসুন আমরা সারা দেশজুড়ে কালো মোমবাতি জ্বালাই। আসুন আমরা বেগম জিয়ার মুখের সামনে কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে '৭১কে গডমাদারমুক্ত করি।

'৭১এর ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তানের আদিবাসিদের অনুষ্ঠনে গোলাম আজমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলো নিজামী। সেই অনুষ্ঠানে গোলাম আজম বলেছিলো, "আল্লাহ যেন করেন, যদি পাকিস্তান না থাকে, তাহলে বাঙালি মুসলমানদের অপমানে মৃত্যুবরণ করতে হবে।" দৈনিকসংগ্রাম ১৬/৮/৭১, এর পরেও কি আমরা বলবো, গোলামেরা যুদ্ধাপরাধী নয়? এই অনুষ্ঠানে নিজামীর বক্তব্য, "ইসলামের আদর্শ প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখবে।" ইউরোপ যদি একজন সাধারণ নাৎসীর বিচার করে, তাহলে এতো বড়ো অপরাধে কেন আমাদের চক্রটার বিচার হলো না? কেন জিয়ার বিচার হবে না? জিয়া এবং গোলাম আজম এরা সব এক মর্যাদা। এরা ব এক পক্ষের এজেন্ট।

ইসলাম যাদের জন্য একটি অজুহাত, বদর যুদ্ধকে ব্যবহার করে বদরবাহিনী যাদের অজুহাত, '৭১ থেকে বাংলাদেশে সেই গোলামেরা অস্তিত্বহীন। '৭২ থেকেই 'হজ্জ্ব' অজুহাতে মওদুদীবাদীদের সৌদিতে সংঘবদ্ধ হওয়ার সব প্রমাণ গো-আজমের বইতে। পরবর্তীতে প্রো-পাকিস্তানি ক্ষমতাবিলাসী সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপের সঙ্গে আতাঁত। ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম হলে বাংলাদেশ পরিপূর্ণ শক্তিশালী হবে, সেই প্রতিজ্ঞা। বঙ্গবন্ধুর সংবিধান যারা নাখোশ জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েমের নায়ক-নায়িকা। পাকিস্তান না হলে যারা অস্তিত্বহীন। '৪৭ এর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে '৭৬এর সংবিধানকে আবার জিন্নাহবাদের নিয়ন্ত্রণে এনে মওদুদীবাদীদের ক্ষমতা দখল। এই বাংলাদেশ কেন এসেছিলো? '৭১ কি একমাত্র জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়ার জন্য? আসুন আমরা কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে আরেকবার এই '৭৫এর ইয়াহিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। দেশকে আরেকবার স্বাধীন করি, বাংলাজিয়ানাৎসীবাদের কব্জা থেকে। নিজামী, গোলাম, মওদুদী, জিয়াউর রহমান এরা কেউ ধর্মভীরু নয়, বরং ধর্মের লেবাসে সব এরা সব ছদ্মবেশি। এরা সব ইসলামের বোরখা গায়ে, সিআইএ'র দাসানুদাস। '৭৫এর বাংলাদেশ যা জিয়ার বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ আমরা চিনি না। এই বাংলাদেশের সব কিছুই জিয়ার দানব হাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া '৭১।

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পর থেকে বাংলাদেশ একটি বিপরীত সন্ধিক্ষণে আটকে গেছে। পলাশী এবং জার্মানীর সন্ধিক্ষণ। মীরজাফর আর নাৎসীদের সন্ধিক্ষণ। পলাশীতে ছিলো না কোন নাৎসী শত্রু। জার্মানীতে ছিলো না কোন মীরজাফর। তবে

এই বাংলার মাটিতে এসে তারাই একসঙ্গে মুখোমুখি জড়ো হয়েছিলো, ১৫ই আগস্টের জার্মানী ও পলাশীর প্রান্তরে যারা হিটলার এবং মীরকাসিম। ঐতিহাসিক এই দুই দানবকে সামাল দেয়া দুর্বল বাংলাদেশের পক্ষে কি সম্ভব? পলাশী এবং জার্মানী যখন মুখোমুখি, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ছাড়া উপায় কী? '৭৫ পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে মৌলবাদের অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে সৌদির আরব কেন স্বীকৃতি দেয়ার দিন ধার্য করেছিলো ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫। থলের বেড়াল দিয়ার আত্মপ্রকাশ।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসীবাহিনী যখন ইহুদি হত্যার পরিকল্পিত মৃত্যুকূপে নিমগ্ন, তখন তার সঙ্গে ছিলো শুধু নাৎসীবাহিনী যাদের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ছিলো সারা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে। তাদের টার্গেট, ইউরোপকে ইহুদীমুক্ত করা। আর পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাবের বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতক চক্রটি কাজ করেছিলো তাদের টার্গেট, সিরাজকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল। হিটলার এবং মীরজাফর চক্র, যে যার নিজস্ব বিশেষণে ভূষিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এরা দু'টি ঐতিহাসিক নিকৃষ্টদের উদাহরণ, যাদের উপমা ব্যবহার করা হয়, ঘৃণার ভাষায়। এরা যার যার একক অর্থে, চিহ্নিত। এদের অলঙ্কার, এরা যার যার জায়গায় হিটলার এবং মীরকাসিম। কিন্তু বাংলাদেশ? এখানে কি হলো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, জার্মানীতে আর কোন জায়গাই দেয়া হয়নি নাৎসীদেরকে। কিংবা যাদের নামের সঙ্গে নাৎসী গন্ধটুকু পর্যন্ত রয়েছে, জায়গা পায়নি জার্মানীর এক ইঞ্চি মাটিতেও। বাংলাদেশ কেন এর ব্যতিক্রম! তার উত্তর জানে জিয়া। জানে বেগম জিয়া। বেগম জিয়া, যে জিয়ার চেয়ে বড়ো আইএসআই। আসুন আমরা এবার '৭৫ এর পশু হত্যা করি, যার হাত দিয়ে ৩১/১২/৭৫এ দালাল আইন রহিতকরণের গেজেট সৃষ্টি হয়েছে।

'৭৫এর ১৫ই আগষ্টে যে ঐতিহাসিক অপ-বিপ্লব ঘটে গেলো ঢাকার আম্রকাননে, এর পেছনে ছিলো দুটো পরাশক্তিরই হাত। এক, আন্তর্জাতিক বেনিয়াগুলো। দুই, দেশের বেনিয়া। এবং দেশের মধ্যে যারা, তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বেনিয়াশক্তিগুলোর যোগাযোগ পাকিস্তান থেকে যাদের একটি বড় অংশ পাকিস্তান আর্মিতে চাকুরিরত বাঙালি। অপর বৃহৎ অংশটি ছিলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দল যাদের গুরু পাকিস্তানবাদী মওদুদী, যার টেরোরিস্ট নেটওয়ার্ক, সারাবিশ্বে হলেও যার মূল বুদ্ধি এবং অর্থ শক্তি, সৌদি আরব। বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র দেখতে সৌদির খোলামেলা প্রস্তাব, মুজিব উৎখাত খুব স্বাভাবিক। কারণ সে ভারতবাদী-রুশবাদী-হিন্দুবাদী। সিআইএ নাখোশ, মুজিব সমাজতন্ত্রবাদী। সে ক্যাস্ট্রোর বন্ধু। মুজিব তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছে। '৭১এর প্রতিপক্ষ আমেরিকার পরাজয়ের মূল এই মুজিব। সুতরাং তাকে হত্যা করো। সৌদি নাখোশ, মুজিব ধর্মনিরপেক্ষ। মুসলমানদের সংবিধানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়াও সমাজতন্ত্র মানে, কম্যুনিস্ট। এরা আল্লা-খোদা বিশ্বাস করে না। তাই মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৌদির

খোলামেলা জেহাদ। মুজিব হত্যা হলে, স্বীকৃতি সম্ভব, হজকে অজুহাত করে মওদুদীদের হজ্ব চত্ত্বরে মিলিত হয়ে, গোলামকে কেন্দ্র করে মুজিব উৎখাতের পরিকল্পনায় কিং ফয়সালের সম্মতি। সৌদিতে যার লিয়ার্জো অফিসারটিই গোলাম আজম। এদিকে ভুট্টোর জেদ '৭১এর প্রতিশোধ সে নেবেই। বাংলাদেশের দুই বৃহৎ শত্রুশক্তি– চীন ও আমেরিকা। যারা '৭১এ বারবার জাতিসংঘে ভেটো দিয়েছিলো। যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবসহ শেষ মুহূর্তে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিলো বঙ্গোপসাগরে, মুক্তিযুদ্ধকে স্তব্ধ করে দিতে এইসব ইতিহাস।

মুজিবের ঘরের গোষ্ঠিকে জনাব গাফ্ফার চৌধূরী বলে থাকেন, 'মীরজাফরের গোষ্ঠি'। ১০ই আগস্ট ২০০৭ এর একটি লেখায় তিনি ৫৭ এবং ৭৫ এর এক তুলনামূলক লেখায় জানিয়েছেন তার অনুভূতি। সেখানে তিনি কয়েকটি চরিত্রের নামকরণ করেছেন। মোশতাককে তিনি মীরজাফরের অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। মীরকাশিম করেছেন জিয়াকে। উমিচাঁদের উপাধি দিয়েছেন তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে। জনাব গাফফার চৌধূরী, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, আদালতে না হলে ইতিহাসের কাঠগাড়ায় পলাশীর মীরজাফরদের প্রাণদণ্ডের কথা, যা আমাদের মীরজাফরদের বেলাতেও ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে একমাত্র জিয়াউর রহমান বাদে। আমাদের মীরজাফর, উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ, মহারাজ নন্দকুমার, মোহাম্মদী বেগ, রায়দুর্লভ... যথাক্রমে মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, রশিদ, ডালিম, ফারুখ, কর্নেল তাহের... সকলের বিচারই ইতিহাস ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলেছে যা বারবার অপশক্তি এসেও বিনষ্ট করতে পারেনি। বাংলার মানুষ এদেরকে ১৭৫৭এর মতো প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে দুঃখের বিষয়, জনাব গাফফার চৌধুরীরা মীরকাসিমকে চিহ্নিত করতে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বাংলার ইতিহাস। যা আমি করে গেলাম। ওরা বিশ্বাসঘাতক মীরকাসিমকে মীরকাসিম না বলে, বলে– জিয়া।

ন্যুরেনবার্গ ট্রায়াল, যার সম্পর্কে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষেরই কোন ধারণা নেই, সে ট্রায়ালের কিছুটা নমুনা সংযোগ করে দিয়ে, এর সূত্র টেনে ধরে আমি কিছু কথা সংযোজন করতে চাই যে, ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে যাদেরকে মৃত্যুদ সহ বিভিন্ন কিস্তির শাস্তি দেয়া হয়েছিলো, তাদের সবাই কিন্তু নাৎসী পার্টি বা হলোকস্টের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত নয়। কিন্তু অনেকের জন্য প্ররোচনাই ছিলো যথেষ্ট। যাকে বলে ল' অব পার্টি। উদাহরণস্বরূপ কোলাবরেটর "জুলিয়াস স্ট্রিচার"। এই লোক ছিলো জার্মানীর "সংগ্রাম" জাতীয় পত্রিকা 'ডার স্টুমার'-এর সম্পাদক এবং হলাকস্টে এদের বর্ণবিদ্বেষী প্রচারণা যা হিটলারের সম্মতি পেয়েছিলো, 'জুলিয়াস স্ট্রিচারকে' সরাসরি ইহুদি খুনের দায়ে মৃত্যুদ দেয়া হয়নি। হয়েছিলো তার প্ররোচণা প্রোপাগা ার জন্য যা ইহুদি খুনের জন্য উদ্দীপনা জুগিয়েছিলো। আমি এই সূত্র টেনে ধরেই বলতে চাই যে, বাংলা নাৎসীদেরকে যারা পুনর্বাসিত করেছে, তাদের প্রথম সূত্রটিই হচ্ছে জিয়াউর রহমান যার চরিত্রের সঙ্গে

'জুলিয়াস স্ট্রিচার'কে এক করা যায়। তেমনিই নিজামী এবং গোলাম আজমকেও এক করা যায়, যারা পাকিস্তানিদেরকে গণহত্যায় সাহায্য করেছিলো কিংবা গণহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলো, গণহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্ররোচনা, পত্রিকা, কিংবা নেতৃত্বে ছিলো কিংবা যারা পাকনাৎসীদের গণহত্যার খবর জেনেও চুপ থেকে দেশের অভ্যন্তরে তাদের এই পৈশাচিকতাকে বাধা না দিয়ে, ঘটতে দিলো। এন্টিসেমেটিক মুভমেন্টকে ত্বরান্বিত করেছে, দল-সংগঠন বা পাকনাৎসীদের সঙ্গে মিটিং করে গণহত্যার নকশা করেছে। যেমন নিজামী, মান্নান, গোলাম আজম, কে.এ হামিদ, আব্বাস আলী খান... আবার আরেক গ্রুপ যারা '৭৫ পূর্ববর্তী সময় থেকেই এদের সঙ্গে সংযুক্ত, পরবর্তীতে এদেরকেই দেশের অভ্যন্তরে ঢোকানোর জন্য সংবিধান সংশোধন করেছে যে কারণে বাংলা গোয়েবলস, হিটলার, জুলিয়াস স্ট্রিচার, বোরম্যান, হারম্যান, রুডলফ হেস, আলফ্রেড জুডি, ফিটজ, গেরিং, স্যাকেল... ন্যুরেনবার্গ কোর্ট... কোর্ট যাদেরকে মৃত্যুদ দিয়েছিলো সেই গ্রুপ, যাদের মধ্যমনি জিয়া, যার একমাত্র অর্জন পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশে ক্ষেত্র তৈরি। যে দুঃসাহস নাৎসীদের বেলায় সম্ভব নয়, এইসব খুনের আসামীদেরকে মন্ত্রীত্ব দিয়ে জিয়াউর রহমান প্রমাণ করেছে সে মৃত্যুদ যোগ্য, একজন অপরাধী। নাৎসী বা নাৎসী সমর্থকেরা যদি 'হেগ'এর কোর্টে সমান অপরাধী হয়, তাহলে, সেই অর্থে জিয়াউর রহমান কেন যুদ্ধাপরাধী নয়? তাদের দোষ, এন্টি সেমেটিক প্রোপাগান্ডা এবং ইহুদি হত্যার সঙ্গে সংযুক্তি। ইহুদিদেরকে আলাদা করে, পুড়িয়ে মারা। তাদেরকে দিয়ে অমানবিক পরিশ্রম, শরীরে রোগের জার্ম ঢুকিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ত্বরান্বিত মৃত্যুর ডকুমেন্টারি করে সেগুলোকে দ্রুত গণহত্যার জন্য ব্যবহার। এই অর্থে গোলাম আজম এবং নিজামীদের অপকীর্তির প্রমাণের যেমন অভাব নেই, তেমনিই যে ব্যক্তি গোলামদেরকে পুনর্জন্ম দিলো, সেই জিয়াউর রহমানেরও বাংলা নাৎসীবাদের শেষ বলে কিছু নেই। মার্ডার একটি অপরাধ। একজন বা এক হাজার। প্ররোচনাও সমান অপরাধ, আগে যা বলেছিলাম ল' অব পার্টি। ভুট্টোর ফাঁসি হলো, প্রতিপক্ষকে খুনের দায়ে। জিয়া, অপরাধের সব ফ্রেমেই বন্দী। সুতরাং তাকে জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত করার সবরকম অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে জাতিকেই, যারা এদেশের মাটিতে স্বাধীন, শুধু ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানে। যারা জাতির জনক মুজিবের কাছে ঋণী। হিটলার বা হিমলার কাউকেই ক্ষমা করেনি ইউরোপ। কিন্তু আমাদের গণহত্যাকারীদের ক্ষমার ঘৃণ্য যে গেজেটটি ৩১শে ডিসেম্বরে জারি করে তাদেরকে ক্ষমা করেছে জিয়া, গণহত্যাকারীদের ক্ষমা, আমরা কি মানুষ? হ্যালো! আসুন আমরা '৭৫এর জিয়া হত্যা করি।

বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদের জিন্নাহ, এই কে.এ. হামিদ, যে নাকি জাতিসংঘসহ অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লবি করেছিলো, জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিদাতা, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের লবিষ্ট যার স্পষ্টভাষী কলাম এবং মর্দে মোমিন তাকে

'৭৯'র প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী করেছিলো, যার চরিত্রের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে হিটলারের প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী গোয়েবলস-এর। স্পষ্টভাষণ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষমা করো বা মর্দে মোমিনের ছদ্মবেশি লেখক তার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা! কে.এ হামিদ যাকে যুব মন্ত্রী করেছিলো জিয়াউর রহমান, জার্মানী যদি গোয়েবলস বা জুলিয়াস স্ট্রিচারকে ক্ষমা না করে থাকে তাহলে জেলখাটা মর্দে মোমিন এর মওদুদীবাদী অপরাধীদের থিঙ্কট্যাঙ্ক কে.এ হামিদ কি করে জিয়ার মন্ত্রী হলো? হ্যালো!

কে.এ হামিদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমার বাবাকে সে তার চাঁদাবাজির ভিকটিম করেছিলো। আমি তার চাঁদাবাজি, হিন্দু সম্পত্তি লুট এবং তার স্পষ্টভাষী কলামের সঙ্গেও পরিচিত। তার পতাকাবাহী গাড়িতেও চড়েছিলাম ১৯৭৯এ। তখন টের পাইনি, এই মর্মে মোমিনটির আসল চরিত্র এবং তার দুষ্টবুদ্ধি, যার বিনিময়ে বিএনপি'র জাতীয়তাবাদী কায়েদে আযমতত্ত্বের জন্ম হয়েছিলো যা, গোলাম আজমের লেখায় স্পষ্ট। আমেরিকা না গেলে বুঝতাম না, কে.এ. হামিদ কতো বড়ো মাপের একজন নাৎসী। যুদ্ধের পর একে রাজাকার অভিযোগে ধরে নিয়ে গেলে তার পুরো পরিবার আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। তখন বুঝিনি এই লোক কেন বাংলার পতাকাবাহী গাড়িতে মন্ত্রণালয়ে যায়? এখন বুঝি জিয়ার এই গোয়েবলস এর চরিত্রটি। আমেরিকা না গেলে এতো পরিশ্রম করে হলোকস্ট না ঘাটলে আমি এর কিছুই জানতাম না। আমার প্রশ্ন, যে লোক এতোবড় অপরাধ করলো '৭১এ, তাকে কোন যুক্তিতে '৭৯তে মন্ত্রী বানালো– জিয়া? হ্যালো! আসলকথা, '৭৯এ পৌছে এদেশ পরিপূর্ণ মুসলমান এবং মৌলবাদীর দেশ।

আলবদর কামরুজ্জামানের ভূমিকা শেরপুরের সবাই জানে কিন্তু বুক ফাটে না ভয়ে। মৃত্যুদূত কামরুজ্জামানের অপারেশন ক্যাম্প ছিলো আমাদের বাড়ি, '৭১এ যার নাম ছিলো– "আলবদর ক্যাম্প।" এই ক্যাম্পে সে তৈরি করেছিলো টর্চার ক্যাম্প এবং সেরিঘাটে তৈরি করেছিলো মৃত্যুকূপ। আজ এতো বছর পর ইতিহাস ঘাটতে বসে, বিক্ষত আমি, হলোকস্ট নিয়ে মাথা ব্যথা, অথচ নিজের ঘরে যে এতোবড় হলোকস্ট হয়ে গেলো, তার কোন খবর নেই। কেন নেই? কার দায়িত্ব ছিলো আমরা যেন গণহত্যা ভুলে না যাই? কার দায়িত্ব '৭১ সংরক্ষণ এবং বিশাল করা! বিশ্বকে জানান দেয়া, বাংলা গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি! জাতিসংঘ তো স্বীকারই করে না এদেশে গণহত্যা হয়েছে। আমেরিকা করে না। জিয়া বরং '৭১কেই নিভিয়ে দিলো। জিয়ার এই কুকীর্তি জাতি কি করে ভুলে গেলো? মানুষের অস্থি-মজ্জা-বুদ্ধি-চোখ থেকে সে কেড়ে নিয়েছে– বাংলা হলোকস্ট। তার কারণে আজ যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে রাষ্ট্রের এই নাস্তানাবুদ অবস্থা। যুদ্ধাপরাধীরা কেউই জোর করে মুক্তি পায়নি। দেশে-প্রবাসে সকল বাংলাদেশীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ বড়ো বিরল। গণহত্যার ইতিহাস তারা ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে জিয়ার কারণে। জিয়া, দলিলপত্র, সংবিধান, বই... কাউকেই ছাড়েনি। সবখানে তার রাজাকারী হাত। দানব আঙুল। কে এই জিয়া?

পাকবাহিনী কি বাংলা চেনে? পথঘাট এবং মুক্তিযোদ্ধা? আর এইসব বাংলা খুনিরা শহরে মাইক দিয়ে ঘোষণা করে, পাক সৈন্যদেরকে পথঘাট, মুক্তিবাহিনী সব চিনিয়েছে। এরাই পথ চিনিয়ে মুক্তিদেরকে হত্যা করিয়েছে। এক কথায় আমাদের বাড়িটি ছিলো নাৎসীক্যাম্প, যেখানে ছিলো 'আবুগারিবের' মতো টর্চার সেল। ছিলো মৃত্যুকূপ। কামরুজ্জামানের আরো ছিলো হিটলারের নাৎসী পত্রিকার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সম্পাদক, আলফ্রেড রোজেনবার্গের পিপলস অবজারর্ভার নামক প্রোপাগান্ডা পত্রিকার মতো 'সংগ্রাম' পত্রিকার স্থানীয় এজেন্সি। পরবর্তীতে নেপথ্যের সবকিছু। এই কামরুজ্জামানের ভিকটিম ও সাক্ষী পুরো শেরপুর-জামালপুর জুড়েই। তারপরেও কামরুজ্জামানদেরকে সংবিধানে বৈধ করে হিরো বানিয়েছে জিয়া এবং বেগম জিয়ার মতো দুই কুলাঙ্গার। হ্যালো! এইসব খুনিরা এখন দেশ চালায়, নিয়ন্ত্রণ করে দেশের ইঞ্জিন। এদের হাতে বন্দি বাংলাদেশ। এর মূলেও জিয়া।

ন্যুরেমবাগ ট্রায়ালে যাদের বিচার করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে ছিলো ২৪জন প্রধান আসামীসহ ৬টি নাৎসী সংগঠন। প্রধান নাৎসী পার্টি ছাড়াও ছিলো এসএস, এসডি, এমএ, ওকেডাবলু যার পরিপূর্ণ সম্পূরক– জামায়েত, আলবদর, আলশামস, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম...। সুতরাং ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালকে উদাহরণ করে, এইসব অপরাধীদের বিচার না করে মুক্তি আছে কি জাতির? অথচ! এরপরেও ওদের বিচার কতো দুঃসাধ্য। গণহত্যার বিচার হলো না। সেনাপ্রধানের কছে আবেদন, বিচার চাই! বিচার চাই!

১৭৫৭ সালের মতো, ১৯৭৫এ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে স্বাধীন বাংলার সূর্য আরেকবার অস্তমিত হয়েছিলো। সেদিন ছিলো সিরাজউদ্দৌলার বদলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আর ১৫ তারিখের ঘাতকদেরকে আমরা সিরাজের ঘাতকদের মতোই ঘৃণার শব্দে উচ্চারণ করি খোন্দকার মোস্তাক, আনোয়ার পাশা, বজলুল হুদা, ডালিম, রশিদ, ফারুক...। ইতিহাসের পাতায় মীরজাফর, মীর মদন, উর্মিচাঁদ, মীর কাশেম, মোহাম্মদী বেগ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁন, মহরাজা নন্দকুমার... এদের নামের সঙ্গে আমাদের মীরজাফরদের নাম ১৭৫৭ থেকে ১৯৭৫এ এসে একাকার হয়ে মিশে গেছে। '৫৭কে উল্টে দিলেই '৭৫। অদ্ভুত! সিরাজের বিরুদ্ধে কাশিমবাজার কুঠি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে গোপন পাকিস্তান কনফেডারেশনের ষড়যন্ত্র এক হয়ে গেছে। মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে খোন্দকার মোশতাকের আওয়ামী লীগ উপদলসহ বিদ্রোহ ঘটানোর যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হস্তগত, ওয়াশিংটন যা ডি-ক্লাসিফাই করলো, এতে আর কার সন্দেহ, '৭৫কে '৫৭ বলা যাবে না? আমরা বলি পলাশীর প্রান্তরে বাংলার সূর্য ডুবে, সেখানে উঠেছিলো বৃটিশের সূর্য। আর '৭৫এ যে পতাকা ডুবে গেলো, সেখানে উঠলো কার সূর্য? চোখে দেখা না গেলেই কি সেটা পাকিস্তানের সূর্য নয়? সংবিধানে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র না লিখলেই কি সেটা পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র নয়? তবে

আমাদের মীরকাসিমকে এখনো আমরা চিহ্নিত করিনি। বরং তাকে করেছি– বঙ্গবন্ধুর বিকল্প। জিয়া আমাদের নতুন বঙ্গবন্ধু। '৭১এ আমরা তাকে অর্জন করেছি। '৭৫এর আমরা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। '৭৯তে তাকে করেছি, বঙ্গবন্ধু। আমরা কি সবাই সমকামী নই?

নবাব হত্যাকাণ্ডের পর, ইংরেজরাও প্রথমে ধাপে ধাপে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলো মীরজাফরের বংশধরদেরকেই। মীরজাফর থেকে শুরু করে নবাব মনসুর আলী ফেরেদুন জাহ। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাংলার শেষ নবাব। নবাব হত্যাকারীদের বিচার আইন না করলেও ইতিহাস তাদের বিচার করেছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। আর এই বিশ্বাসঘাতকেরাই হয়েছে ইতিহাসের সর্বকালের উদাহরণ। তবে আমাদের মোহাম্মদী বেগরা, আহম্মদেরা তাদের কৃতকার্যের জন্য শুধুমাত্র ঘৃণিত হয়েছে, ইতিহাসের চরম উদাহরণ এখনো হয়নি। কেন হয়নি, তার কারণ, আমাদের মীরকাসিম নামের জিয়াউর রহমান। মোস্তাক নামের মীরজাফরদের আমাদের ইতিহাসে সে, মীরজাফর হতে না দিতে পাশ করিয়ে নিয়েছে ৫ম সংশোধনী। সে বলেছে মীরজাফরদের নাকি বিচার করা চলবে না। সে বলেছে মীজাফরদের বিচারের বিরুদ্ধে সকল আইন, কোর্ট, ট্রাইবুনাল, রহিত। সে বলেছে, মীরজাফরদের নিরাপত্তা দিতে ইনডেমনিটিকে আইনে গ্রহণ। এ দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোথাও নেই, ছিলো না।

জার্মানী, বসনিয়া, রুয়ান্ডা... তারা তাদের অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছে। বয়সে ছোট, সংখ্যায় ছোট কিন্তু আমরা কি করেছি? জোট সরকার? ৫ম সংশোধনী? ৩১শে ডিসেম্বরের দুস্কৃতকারী গেজেট? আমাদের গণহত্যা বিশ্বের মানুষ জানে না। জিয়া না জন্মালে এমন হতো না। আমরাও পারতাম গণহত্যাকারীদের বিচার করতে। আর কতো প্রমাণ চাই মৃত জিয়ার বিচারের জন্য – সামরিক ট্রাইবুনালের?

অপরাধীদের নিরাপত্তা দিতে বিশ্বের আর কোথায় আইন হয়েছে? বোরম্যান, গোয়েবলস, হিমলার, হিটলারদের জন্য ইনডেমনিটি? মীরজাফরের ভাগ্যবিধাতা ক্লাইভ ছিলো বলে তার জন্য প্রয়োজন হয়নি কোন ইনডেমনিটি। কিন্তু আমার '৭১এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, আমাদের দেশে ইনডেমনিটি তৈরি হলো নিরাপত্তা দিতে? কোথায় তাদের ভাগ্যবিধাতা যাদের জন্য '৭৫? সেকি ২০০০ মাইল পাকিস্তান, যাদের সঙ্গে :১ থেকে কনফেডারেশন সরকার ঘটানোর প্রস্তুতি? মোস্তাক ব্যর্থ হয়েছিলো জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর? আর এদের সঙ্গে জিয়ার সম্পর্কটাই ছিলো '৭৫এর ১৫ই আগস্ট। হ্যালো! ইতিহাস পড়ুন। জানুন। বলুন। ইতিহাস সব কথা বলে। কেন বলবে না?

মীরকাসিম জিয়া, '৭৫ থেকে '৮১ পর্যন্ত বাংলায় যে পাকিস্তান প্রেক্ষাপট সে সৃষ্টি করেছিলো, যার প্রমাণ আজকের ব্যর্থ দেশ, এরপরেও কি প্রশ্ন থাকে, '৭৫ই, '৫৭ ? মোস্তাক তো ৮৪ দিনের মীরজাফর। এরপর পর প্রথমে মীরমদন তারপর মীর কাসিম। এরপর বাংলার নাৎসীমতী পেয়েছিলো, নবাব নাৎসীমুদ্দৌলা, মীরজাফরের অপর পুত্র।

তারপর এলো নবাব সাইফুদ্দৌলা, মীরজাফরের তৃতীয় পুত্র, বাংলাদেশে পরপর যারা মোস্তাক, জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়া। এরাই ২০০০ মাইল দূরের পাকিস্তানের হেফাজত করা '৭১এর পাকিস্তানপন্থীদেরকে নিয়ে প্রত্যেকেই সরকার গঠন করে প্রমাণ করেছিলো এরাই '৫৭। '৭১এর খুনিদেরকে নিয়ে মোস্তাক সরকারের মধ্যে সো-কলড বঙ্গবীর নামের এক রাজদুর্লভের নাম করে বলতে হয়, ওসমানীর নাম, যাকে মানুষ আজ থেকে বলবে– ভণ্ডবীর। বিশ্বাসঘাতক রায়দুর্লভ এই ওসমানী। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে মুজিবনগর সরকারের বঙ্গবীর ওসমানী, তলে তলে রাজা রায়দুর্লভ, যে ছিলো নবাবের একজন বিশ্বাসী সেনাপতি। ভন্ডবীর ওসমানীর সঙ্গে সম্রাট খুনিদের প্যাক্ট। সেও নবাবের খুনিদের পরামর্শ দাতা যার প্রমাণ,' র‍্য'এর বইতে পরিষ্কার। রক্তাক্ত অধ্যায়ে। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের সঙ্গে নীরবে দাড়িয়েছিলো এই ভণ্ডবীর, নবাবের জীবন বাঁচাতে অংশ নিলো না। নিলো না মীরজাফর রায় দুর্লভের বাহিনী। নিলো না ইয়ার লতিফ খানের সৈন্যবাহিনীও। তারা চুপ করে দাড়িয়ে রইলো পলাশীর যুদ্ধ প্রাঙ্গণে। ওসমানী, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, শাফায়েত জামিল সকলেই এরা এক এক করে তাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলো এরই পলাশীর প্রেতাত্মা হয়ে ফিরে এসেছিলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধুর জীবনে। আর তার মৃত্যুর পর, এদের ক্ষমতার জুতা কামড়াকামড়ি, আর ১৫ই আগষ্টের ভাগ না পেয়ে ৩রা নভেম্বরের ক্যু। এবং ৭ই নভেম্বর। সব জিয়ার সাজানো ক্যু যার বলদ খেটেছে খালেদ মোশাররফ, তাহের, মোস্তাক, শাফায়েত জামিল নামের অপুরুষ এবং অণ্ডকোষহীন সেনাবলদ। যারা বঙ্গবন্ধুকে খুন করে, জিয়াকে করেছে জাতিরজনক। জিয়ার কু-বুদ্ধি অপুরুষগুলো বোঝেনি, যারা সব কলুর বলদ। তারা সব জিয়ার বলদ খাটা বিশাল অণ্ডকোষের ষাঁড়। যেমন– তাহের ষাঁড়। খালেদ ষাঁড়। মোস্তাক ষাঁড়।

'৭৫এর মোস্তাক এবং '৭৯তে জিয়ার মন্ত্রীসভায় এদের কার্যকলাপের মাধ্যমে এইসব ষাড় ওসমানীরা প্রমাণ করে গেছে তাদের রায়দুর্লভের সত্যতা। '৭৫এর মার্চে জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে বসে ফারুকের সঙ্গে ভ বীর নিজে অংশ নিয়েছিলো, বঙ্গবন্ধু হত্যার নীলনকশায়, যার প্রমাণ অশোক রায়না রচিত বইতে। এইসব রায়দুর্লভ, মীরকাসিম, ইয়ার লতিফ খান। '৭৪এ এদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের। ভুট্টো বাংলাদেশে এসেছিলো, কিসিঞ্জারও এসেছিলো '৭৪এ। বাংলার নবাব মুজিব হত্যার ফরমান সঙ্গে করে। কোলকাতার থিয়েটার রোড থেকে শুরু করে এদের বিস্তৃতি ছড়িয়েছিলো কুমিল্লার 'বার্ড' অফিস এবং ঢাকার আগামসি লেনের বাসায়। ছিলো ক্যান্টমেন্টে জিয়া বাসভবন এবং টেনিস কোর্ট যেখানে বসে এইসব '৫৭এর প্রেতাত্মাগুলো '৭৫ ঘটানোর জন্য '৫৭এর নীলনকশা সম্পন্ন করেছিলো। ১৫ই আগষ্টের রাতে জিয়ার বাসা থেকে হাঁটাপথ ৪৬ বিগ্রেডের হাজার হাজার সৈন্য থাকতেও আমাদের জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল এরা সব নিষ্ক্রিয় থেকে ১৫ই আগস্ট ঘটতে দিয়েছিলো নীরবে। খবর শুনে জিয়ার বলদ

শাফায়েত জামিল সেনাপ্রধানের বাসায় না গিয়ে বরং গাড়ি রেখে হেঁটে যায় জিয়ার বাড়িতে। এইটুকু সময় যখন জীবনমরণ, এইসব বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরগুলো তখন সব '৫৭এর মতো নীরব? এক পলাশী? এক রক্ত? শাফায়েত জামিলের হাতে সেদিন ৪০০০ সৈন্য ছিলো যার সিজিএস খালেদ মোশাররফ নামে বাংলার ইয়ার লতিফ খান? ছিলো আমাদের জিয়া মীরকাশেমের হাতে সর্বময় ক্ষমতা পাল্টা অভ্যুত্থানের? কিন্তু এই মীরকাসিমও অস্ত্র ফেলে নীরব দাঁড়িয়েছিলো। শাফায়েত জামিলের নাকের ডগা দিয়ে ট্রাঙ্ক চলে যায় তার ইউনিটের সৈন্যদের নিয়ে জিয়ার বলদগুলো, এরাই খালেদ, তাহের, শাফায়েত জামিল, যাদের প্রত্যেকেই দিয়েছে চরম মূল্য বলদ খাটার। কলু কখনো বলদকে মরতে দেয় না। ঘানির প্রয়োজন শেষে জবাই। এসব তথ্য 'রক্তাক্ত অধ্যায়' এবং 'তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে' বারবার বলা হয়েছে।

যাদেরকে বিশ্বাস করে বাংলার এই শেষ নবাব গঠন করেছিলো তার সরকার, এরাই সেদিন ৩২ নম্বরের বিরুদ্ধে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খানের বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছিলো। নবাব যখন শত্রু আক্রান্ত– রায়দুর্লভ, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, মীরকাসিম এরা সব যারযার সৈন্য নিয়ে দাড়িয়েছিলো, পুতুলের মতো। নবাব সেদিন চিৎকার করে সৈন্যদেরকে আহ্বান জানালো, ...আমি আক্রান্ত... বাঁচাও...। বিশাল অণ্ডকোশের এইসব কলুর বলদগুলো নড়লো না। সরলো না। তারা অস্ত্র ফেলে দিলো। অস্ত্র ফেলে নবাবের মৃত্যু ঘটালো। আমাদের বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে মিলে যাবে, সিরাজের আম্রকাননের ঘটনার দিন, আমাদের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে যারা ১৫ই আগষ্টের ভোরবেলায়, ধানমন্ডির ৩২নং বাসা থেকে টেলিফোনে নবাব সিরাজের চিৎকার শুনেও সাড়া দিলো না। বরং চিৎকারের বিরুদ্ধে হুলিয়া দিলো জিয়ামীরকাসিম। [দ্রঃ বাঙালির কলঙ্ক মোচন, শফিউল্লাহর জবানবন্দী]। "...যেও না, কিছু করো না।" যেমনটি বলেছিলো ২৫শে মার্চ '৭১এ "যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।" আসলেই এরা কি কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো?

সিরাজ পালিয়ে গিয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু পালাতে পারলো না। নবাবের চিৎকার শুনে কেউ তারা একটি সৈন্যও মুভ করালো না। একটিও না। না-না-না। চুপ করে পায়ে হেঁটে জিয়ার কাছে চলে গেলো অপুরুষ শাফায়েত জামিল যার বিগ্রেডে ৪০০০ সৈন্য! সেখান থেকে আরো সময় নষ্ট করতে চলে গেলো সেনাপ্রধানের কাছে টালবাহানা করতে। সেনাভবনে বসে জিয়া বুদ্ধি দিলো, সৈন্য মুভমেন্টের বিরুদ্ধে। পলাশীর আম্রকাননের হুবহু। নবাব মরে গেলো সপরিবারে, একটি সৈন্যও নড়ানো হলো না কোন ডিভিশন থেকে। সেনাভবনে বসে উপসেনাপতির মন্তব্য– "সিজিএস খালেদ মোশাররফকে বাইরে যেতে দিও না। তাহাকে বল 'অপ্স' অর্ডার তৈরি করতে, কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট গেট ইন।" [দ্রঃ তিনটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান, পুরো বই]। সবখানে বাধার সৃষ্টি করে এই মীরকাসিমজিয়া সৈন্যগুলোকে কব্জা করেছিলো ঠিক ২৫শে মার্চ রাতের মতো। ২,৫০০ সৈন্য নিয়ে পলাতক। ২৫০ বছর পর পলাশীর সঙ্গে ধানমন্ডির কত্তো মিল! ২৫শে মার্চ এবং ১৫ই আগষ্টের চিত্র এক। জিয়া মুক্তিযুদ্ধের শক্তির জন্য সদা প্রতিবন্ধক

এবং তার আইএসআই চেহারা জ্যান্ত। আমি আমার মতলবের সমর্থনে একটি তথ্যপ্রমাণ বঙ্গবন্ধু হত্যাকা ের বিচারের স্ক্রিপ্ট থেকে পড়ার অনুরোধ জানাই, যা ইয়ার লতিফ খান নামের খালেদ মোশাররফের বঙ্গবন্ধু হত্যার সংযুক্তি প্রমাণ করতে যথেষ্ট। মামলার ২নং আসামী বরখাস্তকৃত সুলতান শাহরিয়ার রশিদের জবানবন্দী। অপুরুষ খালেদ তাকে ১৫ই আগস্ট দুপুর ১২টায় পুনরায় চাকরিতে নিলো। [বাঙালির কলঙ্ক মোচন পৃ: ২৪]। বাংলার মীরকাসিমজিয়া '৭৫এ বারবার ভারত শব্দটি ব্যবহার করেছিলো বিভিন্ন প্রয়োজনে। অর্থাৎ কুঠি বাড়ির হুবহু। এরা কি না পারে? এরা ইতিহাস বিকৃতি থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তনে সফল। মুক্তিযুদ্ধের প্লাস্টিক সার্জন এরা প্রজন্ম পড়ে জিয়াবাদ। তারা বলছে– শেখ মুজিবের ঘোষণা, ভিত্তিহীন।

১৫ই আগস্টের দিন সেনাপতি শফিউল্লাহর প্রতি খুনিদের আচরণ এবং উপসেনাপতির প্রতি আচরণ, তাদের দু'জনের গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ড, ৪৬ ব্রিগেডের দিনলিপি, শফিউল্লাহকে স্টেনগান দেখিয়ে গাড়িতে তুলে রেডিওতে নিয়ে যাওয়া ভার্সাস ক্লিন সেইভড ইনিফর্মড জিয়া তার নিজ জীপে করে ডালিমের জীপের পেছন পেছন অতি উচ্ছ্বসিত হয়ে রেডিওতে গমন, আম্রকাননের কী বাকী ? ৯নং সাক্ষীর জবানবন্দী, স্টেনগানের মুখে ১ম গাড়িতে উঠলো শফিউল্লাহ, ২য় গাড়িতে স্বশস্ত্র মেজর ডালিম। ৩য় গাড়িতে জিয়া যা তার নিজের গাড়ি। ১৪ই আগস্ট সকাল বেলায় আমাদের মীরকাসিম, ইয়ারলতিফ খান এবং মহারাজ নন্দকুমার একসঙ্গে একটি 'এম্বুশ' প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলো ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্তান্ত পর্যালোচনায়। এই হচ্ছে পলাশীর নবাবের সঙ্গে বাংলার নবাবের হুবহু। যথাক্রমে অপুরুষ জিয়া–খালেদ মোশাররফ ও শাফায়েত জামিল নামের চক্রান্তবাদীরা সেদিন তাদের অস্ত্র নীরব রেখে নীরবে ঘটতে দিলো এই মহানায়কের তিরোধান। সিরাজ যেমনি চিৎকার করে একটি অস্ত্রও তোলাতে পারেনি। ভোর ৪টা থেকে চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুও পারেনি তার পক্ষে একটি সৈন্যকেও জাগাতে। শফিউল্লাহ, জিয়া, শাফায়েত জামিল... ক্যান্টমেন্টের অপুরুষগুলো নীরব। পলাশীর মতোই তারাও ২০০০ মাইল দূরের নির্দেশে চুপ। তখন ৩২ নম্বর বাড়িতে খুনিদের মধ্যে উর্দুভাষী। যাদের কথা শোনা গিয়েছিলো, বঙ্গবন্ধুর চিৎকারের সঙ্গে, কারা এরা? এরপর রেডিওতে উর্দু গান এবং দেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। ইতিহাসে '৫৭কে চিত্রিত করা হয়েছে কোন বাছবিচার ছাড়া। আমাদের ইতিহাসে '৭৫ কে চিত্রিত করা হয়েছে বাছবিচার করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের বিচারে মীরকাসিমকে আনা হলো না। অজুহাত, সে মৃত। বরং তাকে করা হয়েছে '৭৫এর বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে ৫৭০ সাবানে গোসল দিয়ে জিয়ার কবর রয়েছে, ১০০০ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল করে। গরীব দেশের ১০০০ কোটি টাকার অর্জন এই মীরকাসিম। তাহেরের কবর কোথায়? খালেদ মোশাররফের? হায়দারের কবর? হ্যালো! আমি একটু তাদের কবর দেখতে চাই। তারা কি মুক্তিযুদ্ধ করে পাপ করেছিলো? তারা কি পাপিষ্ঠ? আসুন আমরা কালো মোমবাতি জ্বালাই। খালেদ, তাহের হুদা, হায়দার... এরা সব পাপের মুক্তিযুদ্ধকরে, জিয়ার হাতে পাপের শাস্তি ভোগ করেছে। জিয়া কখনো মুক্তিযুদ্ধ করেনি। তাই সে ভোগ করেনি পাপের শাস্তি! জিয়া মুক্তিযুদ্ধকে করেছে, '৭১এর পাপ। এর মূল্য দিচ্ছে, জাতি।

মোস্তাক-রশিদ-ফারুকসহ সকল হত্যাকারী বা ষড়যন্ত্রীদের আশ্রয়, জিয়া। তাকে কেন্দ্র করেই খুনিরা গড়ে উঠেছিলো। জিয়া, তাদের শেষ ভরসা। ডালিমের কথা, সাজানো ৭ই নভেম্বরের মাধ্যমে জিয়ার ক্ষমতা দখল। সুতরাং জিয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা মিসট্রায়াল। এ ট্রায়াল কোন ট্রায়ালই নয়। আমি ট্রায়াল ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে প্রশ্নগুলোকে দেখে অতীব আশ্চর্য বোধ করেছি। আমি ছোটখাট মামলা দেখা মানুষ, আর এতোবড় মামলার প্রশ্নগুলো কতো ছোট! আমি এই মামলাকে মামলাই বলি না। কে বলবে, মৃতের বিচার হয় না? আইন কি অন্ধ? তবে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই অন্ধ। নাহলে এতোবড় বিচার সে এতো দুর্বলতার সঙ্গে ঘটতে দিলো? প্রয়োজনে সে অনেককিছু করতে পারতো। আর সাক্ষীদের মধ্যে অনেক মিথ্যেবাদী যারা ডাইনেবায়ে লুকিয়ে গেছে আম্রকাননে তাদের মীরজাফরী ভূমিকার কথা। মহারাজা নন্দকুমার, যার ভূমিকা সে বেমালুম লুকিয়ে গেছে। শাফায়েত জামিল এবং শফিউল্লাহ এরা দু'জনেই চরম মিথ্যেবাদী। খালেদ মোশাররফ এবং তাহের, এরা কলঙ্ক। মুজিবকে এরা অপব্যবহার করেছে। বরং ফারুক-রশিদ এরাই বলেছে সত্য কথা। এরা বলেছে, জিয়াই বঙ্গবন্ধুর খুনি। খুনের একক পুঁজিদার।

মীরকাসিমকে, মীরকাসিম না বলে বীরউত্তম বলার জায়গা কোথায়? এই জাতির '৭১ ব্যর্থ। যে ভুল ইতিহাসবিদরা করেছে, বাংলার শেষ নবাব বঙ্গবন্ধু হত্যার সিরাজকে চিহ্নিত করা। মনে রাখা দরকার '৪৭ ঘটেছিলো ১৭৫৭ কে কেন্দ্র করে। আর আমাদের '৭৫কে কেন্দ্র করে একদিন ঘটবে যে কোন '৪৭ যার মাধ্যমে আবার পরাশক্তি মুক্ত হবে বাংলার মানুষ। এবং সেজন্য হয়তো আবার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হবে। এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমেই '৭৫এর কলঙ্ক মোচন করবে জাতি, যেমন করেছিলো '৫৭ খণ্ডন করতে '৪৭। আমাদের সিরাজের প্রকৃত খুনিকেই শনাক্ত করতে হবে। না হলে, '৭১এর কোন প্রয়োজন নেই। আসুন তাহলে, কালো মোমবাতি জ্বালাই। আসুন আমরা সৃষ্টি করি নতুন বঙ্গবন্ধু। আরেকটি '৬৯ এবং আরেকটি ৭ই মার্চ। পশু হত্যার জন্য আরেকটি '৭১ চাই। বিগত '৭১ পাপ এবং পাপিষ্ঠ হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি কলঙ্ক মোচন করা প্রয়োজন তা হলো, এইসব তথ্য থেকে যা বুঝতে পারি যে, '৭১র জুলাই মাসে কোলকাতার থিয়েটার রোডে দেখা হয় খুনি নূর চৌধুরীর সঙ্গে খুনি শাহরিয়ার রশিদের, যেখানে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ভন্ডবীর ওসমানীর। কনফেডারেশনের অস্পষ্টতা এবং এরাই '৭৪এ মিলিত হয়েছে জিয়ার বাসায়। এবং '৭৫এর ১৫ই আগস্ট থেকে বঙ্গভবনে মোস্তাককে ঘিরে থাকা দলের মধ্যে জগৎশেঠ ওসমানী, যাকে দেখা গেছে মোস্তাক এবং জিয়ার মন্ত্রীসভায়। জিয়ার নির্বাচনের জন্য বিশাল অ কোষের অপুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীও এই কলুর বলদ খাটা ভন্ডবীর ওসমানী। সুতরাং বঙ্গবীর ওসমানী নামের সঙ্গে ভ বীরের কলঙ্ক সংযোজন ছাড়া উপায় আছে? তার রায়বল্লভের ভূমিকা, আম্রকাননে যে নিষ্ক্রিয় দাড়িয়ে নবাবের পরাজয় ঘটতে দিলো। বাঙালির কলঙ্ক মোচন হয়নি, হওয়া প্রয়োজন। ওসমানীর বঙ্গবীর উপাধি ভূয়া, যেমন– জিয়ার বীরউত্তম।। ওসমানী, বঙ্গবীরের বদলে একদিন বঙ্গকলঙ্ক বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হোক। জিয়ার বীরউত্তম প্রত্যাখান করুক

সেনাবাহিনী। জিয়া যদি বীরউত্তম হয়, তাহলে দেশের সকল বীরউত্তম খুনির মর্যাদা পাবে। খুনি কখনো বীর নয়। জিয়া খুনি ছাড়া বীর হতে পারে না।

আমি আমাদের '৭৫কে কিছুতেই '৭৫ বলতে চাই না। '৫৭ বলতে চাই। আমাদের প্রয়োজন '৪৭। আমি জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধা বলবো না। আমি তার নামের সঙ্গে হিটলার বা মীরকাসিম যুক্ত করে বাঙালির কলঙ্ক মোচন করতে চাই। আমি '৭১কে '৭১ না বলে '৩৯ বলতে চাই। আমি আমাদের গণহত্যাকে বাংলা হলোকস্ট বলতে চাই এবং ণ্যুরেনবার্গ ট্রায়ালের মতো বিচার চাই। আমি মৃত জিয়ার বিচার এই বাংলার মাটিতে দেখতে প্রস্তুত যেখানে জিয়ার নামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে গোলাম আজম, ভুট্টো, ফারুক, রশিদকে। যেখানে গোলাম আজমের টেরোরিস্ট কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য জিয়া, বেগম জিয়াসহ সকল অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে। বাংলার এইসব সন্ত্রাসী ওসামাদের শাস্তি হোক, একই সঙ্গে যারা বাংলার বোরম্যান, গোয়েবলস, হিমলার...। আব্বাস আলী খান, নিজামী, কামরুজ্জামান... যারা আমাদের জার্মানীর উদাহরণসহ '৭১এর সব পত্রিকা জুড়ে প্রমাণিত গণহত্যাকারী.. সেইসব আর্কাইভ তন্নতন্ন করা শেষে, প্রমাণসহ এদেরকে ন্যুরেনবার্গ ট্রায়ালের মতো '৭৩এর ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের আইনে বিচার করা হোক। আমরা জার্মানীর বিচারের দৃষ্টান্ত বাংলায় দেখতে চাই। আমরা এই সিরাজের নির্মম ইতিহাস, বাংলা ইতিহাসে পাঠ্য দেখতে চাই। তার নামের সঙ্গে খুনি এবং দেশদ্রোহীর অলংকার চাই। আমি দেশের প্রতি ইঞ্চিকে জিয়ামুক্ত দেখতে চাই।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, এই আইনটি যুদ্ধাপরাধী এবং গণহত্যাকারীদের বিচারের জন্য যথেষ্ট। ১৯৭৩এর এই আইনে বলা হয়েছে–

"Auxiliary forces includes forces under the control of the armed forces for operational administrative, static, and other purposes." [দ্রঃ একাত্তরের ঘাতক... ১৬৮-১৬৯; ১৭৩-১৭৪]।

১৯৭৩-এ এই আইনটি উত্থাপন করে আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের নানা বলেছিলেন– "জেনেভা কনভেনশনের এমন একটি ধারাও বাকি নেই যেটা এই পাক সেনারা ভঙ্গ করেনি।" আর এই পাক সেনাদের গুণাগুণ গেয়েছিলো কোলাবরেটরগুলো যার নথিপত্র সংবাদপত্রের আর্কাইভ জুড়ে। এরা না হলে, পাক সেনারা জেনেভা কনভেনশনের কোন কোডই ভঙ্গ করতে পারতো না। পাক সেনারা কি করে চিনবে, মুক্তি কে? রাস্তার নাম? কেস ফিনিশ। এবং ১৯৭৫এর ৩১শে ডিসেম্বরে জিয়াউর রহমান বিশ্ব ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে '৭২এর আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের আনা কোলাবেরটের ঘাতকদালাল আইনকে বাতিল করে প্রমাণ করলো সে, রাষ্ট্রদ্রোহী।

'৭২এর এই আইন এবং '৭৩এর ক্রাইম ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট যোগ করলে যা দাঁড়ায় সেটাই 'ন্যুরেনবার্গ ট্রায়াল'। জিয়ার জন্য এসব আইন নিষ্ক্রিয় বা বাতিল হয়ে গেলেও আমরা বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত বাংলা 'ন্যুমেরবার্গ ট্রায়াল'। বাংলাদেশের এত্তোবড় গণহত্যার বিচার করতে দিলো না জিয়া, অথচ কতো অল্প সত্ত্বেও রুয়াণ্ডা, বসনিয়া, লাইবেরিয়ার গণহত্যার বিচার! জিয়া '৭১এর সংগ্রামসহ সকল পত্রিকার

তথ্যপ্রমাণ অগ্রাহ্য করে বাংলার মাটিতে এদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলো – বাংলা নাৎসী বা বিএনপি নামের দল, যেখানে প্রায় ৪০ ভাগ শেয়ার গোলাম আজম এবং আইখ্‌ম্যান জাতীয় যুদ্ধাপরাধীদের। অপুরুষ ব্যারিস্টার এবং '৭১এর গুপ্তচরদের। স্বীকৃত টেরোরিস্ট ও যুদ্ধাপরাধী গোলামকে যারা জেনেশুনে দেশে বসবাসকরতে দেয়, তার বিচার করে না, যারা ফারুক আর ডালিমদের মতো খুনিদেরকে বিচার না করে তাদের জন্য ইনডেমনিটি আইনের ব্যবস্থা করে... এই জিয়ার বিচার কেন হবে না এই বাংলার মাটিতে? কেন তার নামের সকল প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা হবে না যুদ্ধাপরাধীদের গন্ধ থেকে! কেন তার কবর উঠিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের গোরস্থানে নেয়া হবে না! সেকি সকল আইনকানুন ভঙ্গ করে যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেনি! জিয়া করেছিলো যা ইতিহাসের কেউ করেনি। সে জার্মানীর হলোকস্ট আর আম্রকাননের ষড়যন্ত্রীদেরকে এক করেছে। সে মুক্তিযুদ্ধ শেষে গোয়েবলসগোলামআজম আর মীরজাফরমোস্তাককে এক মঞ্চে বসিয়েছে। জগৎশেঠওসমানী আর মোহাম্মদীবেগহুদাকে সে এক করেছে। বাঙালির কলঙ্ক মোচন আরো বহুদূরে লুকিয়ে আছে। এই কলঙ্ক মোচন, মোচনের বাইরে চলে গেছে। '৯৭এর হত্যা মামলা একটি অপক্ক হাতের ফসল। এতে সান্ত্বনা পাওয়া সম্ভব, বিচার নয়।

অতি আবেগে ভরপুর জাতি, অতি অবাস্তব মনের হাসিনা, অতিব অল্পবুদ্ধির উকিল সাহেবেরা। বিচারের নামে অবিচার। আসল ক্লাইভ লুকিয়ে। এই ক্লাইভ এখন ২৫০ কোটি টাকার কবরের ইনডেমনিটির দুর্গের মধ্যে শুয়ে। এই জিয়াক্লাইভ একটি দৃষ্টান্ত, একটি জংলি জাতি, যারা জংলিদের মতো ব্যবহার করে। বাঙালি অবাক জাতি, অতি দুষ্টবুদ্ধির এবং ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন জাতি। এরা অশিক্ষিত এবং জ্ঞানহীন। এরা বই পড়ে না, কান কথা শোনে। এরা সব অর্থপিশাচ। এরা বিক্রি হয়ে যায়, যেকোন মূল্যে। এবং এদের সরকার যখন মেট্রিকপাশ বা নন-মেট্রিক...। এতো কোটি মানুষের ভাগ্য যখন জিয়া এবং খালেদার মতো ন্যূনতম শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের হাতে জিম্মি, দার্শনিকদের চোখে, সেই জাতির কপালে দুঃখ পাওয়া ছাড়া কিছু নেই। তাইতো ভাগ্য বদলায় না ৯৯ ভাগ মানুষের যাদেরকে বোকা বানিয়ে ১ভাগ মানুষ লুটে নেয় দেশ। আর মূর্খ জাতি, ভোটের বিনিময়ে মাসে ১০০ টাকা ভাতার ভাগ্যের আশায় খালেদার ভরসায় থাকে। সুতরাং মূর্খ খালেদার কেশের তেলের পুতুল না হয়ে এদেশের ব্যারিস্টার বা ফকিরের নিস্কৃতি কী? পুতুল কথা বলবে না। তাকে চালায় যার হাতে বন্দী সে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পর, এই দেশ কবলিত হয়েছে '৭১এর মহাপ্লাবনে। গডমাদার, গডফাদার, গডচাইল্ড – এদের জন্য বাংলাদেশ? এদের জন্য– স্বাধীনতা? হা-স্বাধীনতা!

জিয়াউর রহমান পলাশীর আম্রকাননের সফল নেতৃত্ব দিয়ে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, সকল বিশ্বাসঘাতকদেরকে একে একে নির্বাসিত বা হত্যা করে, অবশেষে খুলেছিলো তার আইএসআই, সিআইএ মুখোশ। ইতিহাসে এই প্রথম, জেলখাটা যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা। জিয়ার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, যার মূল পরিচয় সে পিপিডি দলের হয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লবি করেছিলো, শাহ আজিজ একজন প্রকাশ্য পাকিস্তানপন্থী যার যুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ '৭১ এর সব সংবাদ মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও জিয়া তাকে প্রধানমন্ত্রী

করে বাংলার মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলো সেদিন। ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯। এবং ১৩ই অক্টোবর ২০০১। জিয়াদের এসব কার্যকলাপের মধ্যে কি কারণ লুকিয়ে ছিলো, ৩৬ বছর পরেও জাতি কি মুখ খুলবে না? খালেদা জিয়াকে সন্দেহ? হ্যালো!

মনে পড়ে কি ৭ই মে ১৯৭২ সনের আজাদ পত্রিকার কুখ্যাত ছবি? "এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন" ছবি! মনে পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারির পূর্বদেশে মাওলানা মান্নানের সঙ্গে নিয়াজীর ছবি? এ সেই মান্নান, নিয়াজীর সঙ্গে বৈঠকরত সত্ত্বেও এই নরপিশাচকে ধর্মমন্ত্রী? সেই মাওলানা মান্নান, যার কারণে শহীদ হয়েছে ড. আলীম চৌধুরী, সেই নরপিশাচকে যে লোক মন্ত্রী করে– কে সে? তার জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। আমার জিজ্ঞাসা, মান্নানকে যে মন্ত্রী করে, কে সে? বাঙালি হত্যার পুরোধা যারা, তাদের নিয়ে মন্ত্রীসভার মূলে, কে?

জিয়ার রেলমন্ত্রী, রাজাকার আব্দুল আলীম, যে নূরন্নবী খান বীরবিক্রমের ইউনিটের ৪০ মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করেছিলো, সাক্ষ্য দেবে। যুদ্ধের পর ধরা পড়ে খাঁচায় বন্দী করে গণপ্রদর্শনের পরে– জেল। আর জেল থেকে কৌশলে বের হয়ে যাওয়া এই গণহত্যাকারীদের জন্য গেজেট? তাকে নিয়ে জিয়ার মন্ত্রীসভার পর, জাতির জন্য আর কি প্রশ্ন থাকা উচিত? জিয়া নামের দুর্গন্ধ থেকে নির্মূল না হলে, এদেশ বাঁচবে না। দেশকে বাঁচাতে হলো জিয়ার মৃত্যু জরুরি! আসুন নামরা '৭৫এর জিয়া হত্যা করি।

আসুন আমরা প্রত্যেকেই কালো মোমবাতি জ্বালিয়ে জিয়াকে দেখাই। জিয়া, আমাদের গণহত্যাকে আলু-পেয়াজের মতো ট্রেড করেছিলো। স্বাধীনতার যুদ্ধে সে একজন গুপ্তচর। তার স্ত্রী খালেদা জিয়া, তার উপযুক্ত উত্তরসূরী, '৭১এ পাকিস্তানপন্থীদের জন্য খুলে দিয়েছিলো তার নিচ এবং উপরতলা। মানুষ জানে, প্রশ্ন তোলে না, খালেদার অতীত, তার তলা, নিজামী এবং সাকা চৌধুরীদের হাতে ফালাফালা, প্রমাণিত খুনিদের নিয়ে জোট সরকার...? [দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, ৮ম খ , পৃঃ ৬২৭।] আমার প্রবাসী সন্তানের জিজ্ঞাসা, মা এই মানুষদের মন-মানসিকতা কি রকম যারা জেনোসাইডারকে মন্ত্রী বানায়? আমি এর কোন উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, সেজন্যেই তো এই বইটি লেখা। আমার টিনেজ ছেলে বললো, আই হোপ সো।

মনে আছে ও জে সিম্পসন ট্রায়ালে, সবশেষে একটি বিষয় সবচেয়ে বড় হয়ে দাড়িয়েছিলো। ও জে সিম্পসন একজন খুনি, সকলেই তা জানে, কিন্তু সেকি সন্দেহাতীতভাবে খুনি? ও জে'র ডিফেন্সকে সেটাই প্রমাণ করতে হবে। এবং একটি দস্ত ানাই হলো সেই অস্ত্র। ডিফেন্সের প্রশ্ন, এই দস্তানা কার? যা পড়ে খুনি, জোড়া খুন করেছিলো? শেষ মুহূর্তে এই দস্তানা ফিট করলো না সিম্পসন হাতে। ফলে, ও জে, সন্দেহাতীত ভাবে খুনি বলে প্রমাণ না হওয়াতে একজন নিশ্চিত খুনি মুক্ত হয়ে গেলো। তবে জিয়ার বেলায়– "তাতে কী?" এই বাক্যটি, শুধু এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করেই প্রমাণ করা সম্ভব, জিয়া, সন্দেহাতীতভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনি!

জিয়া পরিবার – 'ক্রাইম এগেইনেস্ট হিউম্যানিটি'র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তৃতীয় খণ্ড

বইয়ের কাঠগড়ায় জিয়া

ইনডেমনিটি আইন

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৫ সাল শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, সংসদ বিষয়ক এবং বিচার মন্ত্রণালয়।

(আইন সংসদ বিষয়ক বিভাগ), প্রজ্ঞাপন ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

নম্বর ৫৯২ পিউবি-১৯৭৫ সালের ২৬ আগস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত নিম্নের অধ্যাদেশ জনসাধারণের **জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হলো:-**

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ১৯৭৫

অধ্যাদেশ নম্বর XLX ১৯৭৫

একটি অধ্যাদেশ

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য কতিপয় কর্ম বা কতিপয় কর্মসম্পাদনের অথবা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বা কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে সামরিক আইন জারির জন্য আইনগত বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা:

সেহেতু ঐতিহাসিক পরিবর্তনকালে কতিপয় কর্ম বা কতিপয় কর্ম সম্পাদনে অথবা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বা কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে প্রত্যুষে সামরিক আইন ঘোষণার জন্য আইনগত বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ;

যেহেতু সংসদের অধিবেশন চলছে না এবং রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করছেন যে, এমন পরিবেশ চলছে যা আকস্মিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত বাংলাদেশ গেজেট সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৭৫:

১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট তারিখের ঘোষণা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি নিম্নের অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং জারি করেছে:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এ অধ্যাদেশ নিরাপত্তা বিধান অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি) ১৯৭৫

২। কতিপয় কার্যাবলী এবং অন্যান্য বিষয় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত অথবা অন্য কোন বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

৩। প্রতিরক্ষা চাকুরি সম্পর্কীয় আইনসহ যে কোন আইনে যাই অন্তর্ভুক্ত থাক না কেন, আপাতত আইন বা শৃঙ্খলা-সম্পর্কীয় কোন মামলা, অন্য কোন বিচার অথবা সামরিক বিচার বা সুপ্রীম কোর্ট এবং কোর্টে প্রতিরক্ষা চাকরি সম্পর্কীয় প্রযোজ্য হবে না তাদের বিরুদ্ধে যারা জড়িত ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার পরিবর্তন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে সামরিক আইন জারির সাথে।

৪। এই অনুচ্ছেদের জন্য রাষ্ট্রপতি বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিবর্তন ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট প্রত্যুষে কোন কার্য, কোন বিষয় সম্পন্ন অথবা সনদে উল্লেখিত কোন ব্যক্তি কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তা এ আইনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। সেদিন প্রত্যুষে সামরিক আইন জারি ও সরকার পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অথবা পরিকল্পনা গ্রহণ অথবা বাস্তাবায়নে এ সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ যথেষ্ট প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হবে।

(জিয়া এই অপরাধকে বৈধ করেছিল)।

ঘাতকদালালদের নিঃশর্ত মুক্তির গেজেট ঃ

Justice F K M A Munim

Secretary

Bangladesh Gazette

Extraordinary

Published by Authority

WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE

(Law and Parliamentary Affairs Division)

NOTIFICATION

Dacca, the 31st December 1975

No, 871-Pub, -The following Ordinance and Proclamation order made by the President of the People's Republic of Bangladesh on the 31st December 1975, is hereby published for general information:-

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS)

(REPEAL) ORDINANCE, 1975

Ordinance No. LXIII of 1975

AN

ORDINANCE

to repeal the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.

WHEREAS it is expedient to repeal the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972, (P. O. NO.8 of 1972), and to provide for certain matters ancillary thereto;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamations of the 20th August, 1975, and 8th November, 1975, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

1. Short title. - This Ordinance may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975.

2. Repeal of P.O. No.8 of 1972. - (1) The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P O. No.8 of 1972), hereinafter referred to as the said Order, is hereby repealed.

(2) Upon the repeal of the said Order under sub-section (1), all trials or other proceedings there under pending immediately before such repeal before any Tribunal, magistrate or Court, and all investigations or other proceedings by or before any Police Officer or other authority under that Order, shall abate and shall not be proceeded with.

(3) Nothing in sub section (2) shall be deemed to affect-

a) the continuance of any appeal against any conviction or sentence by any Tribunals, Magistrate or Court under the said order; or

b) except to the extent provided in that sub-section, the operation of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897).

Abusadat Mohammad Sayem
President

Dacca;
The 31st December, 1975

A K Talukdar
Deputy
Secretary

কোলাবরেটরদেরকে পাকবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করার জন্য রাওয়ালপিন্ডির নির্দেশ ঃ

MINISTRY OF DEFENCE
Rawalpindi, the 7th September, 1971
Governmment of Pakistan

No. 4852/543/PS-1A-3659/D-2A. In excrcise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of Section 5 of the Pakistan Army Act. 1952 (Act No. XXXIX of 1952) the Central Government is pleased to direct that –

a) all the provisions of the said Act shall, so far as may be, apply to the Razakars raised under the East Pakistan Razakars ordinance, 1971 (East Pakistan Ordinance No. X of 1971);

b) the officer of the Pakistan Army under whose command any member of the Razakars is placed shall excercise the same powers in relation to theat member as he is authorised to excrcise under the said Act in relation to a member of the Pakistan Army placed under his command.

Badar Bahini: "This Bahini is mixed with Punjabi, Bihari and Bengalee. Almost all the persons are educated and well trained. The Bahini, most of the persons, selected from Razakars and Muzahids. Their dress is Miltitian. Their monthly salary is Rs. 150/-. This Bahini has been deployed with local Razakars in different districet."

একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায় বই থেকে
১৯৭৩-এর এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে–

'Auxiliary Forces includes forcs placed under the control of the Armed Forces for operaiton, administrative, static and other purposes.'

পূর্বে উল্লেখিত ঘাতকবাহিনী তথা চৌধুরী মঈনউদ্দিনসহ অভিযুক্ত আটজন অবশ্যই বাস্তবতা ও আইনগত দিক হতে পাকিস্তানের Auxiliary Forces-অন্তর্ভূক্ত হবে। ১৯৭১-এর "The East Pakistan Razakars Ordinance, 1971-এর ২ আগস্ট The East Pakistan Razakars Ordinance. ১৯৭১-এর মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় পরবর্তী সময়ে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের (No. 4852/583/PS-ly/3659-2A) মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে সরাসরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে আনা হয়। (এখানে গেজেট নোটিফিশেনের (b) Clause উল্লেখযোগ্য, যেখানে রাখা হয়েছে, the officer of the Pakistan Army under whose command any member of the Razakars is placed shall exercise the same powers in relation to that member as he is authorized to exercise under the said Act in relation to a member of the Pakistan Army placed under his command...). (পৃষ্ঠা: ১৭৩-১৭৫)।

পঞ্চম সংশোধনী (রাষ্ট্রীয় অপরাধসমূহের আইনীকরণ)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থান থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক যত ফরমান, সামরিক আ্ইন, প্রবিধান ইত্যাদি করে এর সবকিছু বৈধ করে নেয়ার জন্য আজিজর রহমান জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল, ১৯৭৯ শিরোনামেএকটি বিল উত্থাপন করেন ৪ এপ্রিল ১৯৭৯। জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৫ এপ্রিল ১৯৭৯ এটি গৃহীত হওয়ায় ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। পঞ্চম সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:–

ক. সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম' সংযুক্ত করা হয়।

খ. ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করা হয়।

গ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'বাদের ধারণা আনা হয়। এছাড়া 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দগুচ্ছের পরিবের্তে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশ করা হয়।

ঘ. পঞ্চম সংশোধনী সংবিধানের সংশোধন সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের সংকুচিত করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ ৮,৪৮, ৮০, ৯২ ও ১৪২ সংশোধনকল্পে সংসদে তৃতীয়াংশের ভোটের পাশাপাশি গণভোটের প্রয়োজন পড়বে এই মর্মে বিধান করা হয়।

ঙ. ১৯৭৫ সনের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' সংবিধানের পম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করে নেয়া হয়।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বই থেকে

লেখক: রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম

* আমরা ২৫ মার্চ রাত প্রায় ৮টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার তিন ঘন্টা পরেও অবশ্য কিছু বাঙালি সামরিক অফিসার পাকিস্তানিদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে কাজ করে চলেছিলেন একযোগে- এবং চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গরকৃত সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ এম.ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে আনার কাজ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তানিরা পরে এইসব অস্ত্র ও গোলাবারুদই ব্যবহার করেছিল লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যায়। তবে উল্লেখিত বাঙালি সামরিক অফিসারগণ নিতান্তই সৌভাগ্যবান যে, কঠিন সংকটের ঠিক ক্রান্তিলগ্নে, পাকিস্তানিরা তাঁদের হত্যা করতে পারে একথা চিন্তা করে তাঁরা আমাদের সাথে যোগ দেন। স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, সার্বিক অবস্থা এবং স্বীয় নিরাপত্তার বিবেচনাই তাঁদেরকে শেষমুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করে।

এসব বিষয় বিবেচনায় আনলে মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের কয়েকটি সুস্পষ্ট দলে ভাগ করা যায়:

১. স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং আক্রান্ত হবার আগেই পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ করার মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি ছিল- এমন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিগণ প্রথম পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথম অবস্থাতেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

২. দ্বিতীয় দলটিও স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু তাঁরা পাকিস্তানিদের প্রাথমিক আক্রমণের ব্যাপারে ততখানি সজাগ এবং প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও, যে মুহূর্তে এটা তাঁদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শুধুমাত্র চাকুরি নয়, তাঁদের জীবনও বিপন্ন- তখনই তাঁরা পাকিস্তানি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

৩. আর যারা জীবনের ঝুঁকি নেয়া তো দূরের কথা, কর্মজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন পদক্ষেপ সম্পর্কেও বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল- তাদেরকে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তাদের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশই কী, অবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানই বা কী! ব্যক্তিগত কর্মজীবন ও নিজের ভবিষ্যৎই ছিল তাদের কাছে মূল বিবেচনার বিষয়। স্বাধীনতাকামী

মুক্তিযোদ্ধাগণ আর শত্রু পাকিস্তানি– দু'পক্ষের সাথেই এরা অত্যন্ত সুকৌশলে সমান সম্পর্ক বজায় রাখছিলেন, যাতে যে পক্ষই বিজয়ী হোক না কেন তাঁদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এই দলভুক্তরা মাত্র তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন যখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের জীবনের ওপর কিছুটা হুমকির সম্ভাবনা আছে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দল পরিস্থিতির চাপে পড়েই অংশগ্রহণ করে, স্বেচ্ছায় নয়। (ভূমিকা)।

* আমার চিন্তায় বাধা পড়ে। একটা বেবী-ট্যাক্সি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আমার কাছে এসে থামলো। নেমে এলেন দু'জন বাঙালি সামরিক অফিসার– একজন লেঃ কর্নেল এবং অপরজন মেজর। আমরা সেই বাংলার সামনে একটা বিরাট জামগাছের নিচে গিয়ে বসলাম।

'এই মুহূর্তে তোমার এ ধরনের কিছু করা উচিত নয়,' অত্যন্ত চাপাস্বরে লেঃ কর্নেল আমাকে বললেন!

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাবে না। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করতে পারে না।'

'কিন্তু তারা বিশ্বজনমতের ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না। তাছাড়া আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছেছি যে, ওদেরকে আর কেনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারি না।' (পৃষ্ঠা–২২)।

* 'দেখো', লেঃ কর্নেল আবার বললেন, 'এই মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক আলোচনা চলছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করতে পারো না যা এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।'

'ধরুন আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল, তাহলে?'

'সেটা হবে বিদ্রোহ, বিপ্লব– তুমি যা খুশি তাই একে বলতে পার। তুমি যদি বিজয়ী হও ভালো কথা, কিন্তু যদি জয়লাভ করতে না পার তাহলে তোমার ভাগ্যে কি আছে তুমি নিশ্চয়ই জান।"

'কিছুটা বিপদের ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে,' আমি যুক্তি দেখালাম। 'আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার সময় এসেছে, ওরা আমাদের আঘাত করার আগেই ওদেরকে আঘাত করতে হবে। এটা হতে হবে এখনই এবং এই মুহূর্তে। তা না হলে আর কোনোদিনই পারব না। আমরা যদি তাদের আগে আঘাত করতে ব্যর্থ হই, তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে। এক ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করার জন্য ওরা প্রস্তুত হয়ে আছে।'

'অতখানি আশঙ্কা করার কিছু নেই, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না', মেজর বললেন।

'ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এদের বিশ্বাস করে আপনারা কি ভুল করছেন না?' আমি আবার লেঃ কর্নেল ও মেজরকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম, 'ওরা তো আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।' (পৃষ্ঠা–২৩)।

* 'কিন্তু যদি একটু বুঝে-সুঝে এই ঝুঁকিটুকু আমরা না নেই, তাহলে হয়ত আমরা এর চেয়েও বড় একটা বিপদ ডেকে আনব', আমি আবার তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম। 'তাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কেন তারা বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বদলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে এনেছে, কেন তারা 'জেটিতে' বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, কেন 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নামাতেই হবে? তাদের শত্রু কোথায়, সেটা কি আমরাই নই? আপনারা কি মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যেকে রাতে বিমানে করে ওরা অন্য কিছু নয় স্রেফ কমলা আর মাল্টা আনছে?' আমি কিছুটা বিদ্রুপের সুরেই কথাগুলো বললাম।

তারপর এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুটা সময় কাটল। আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে এদের সাথে আমার আলোচনা করা বৃথা। তাই এ দু'জন অফিসার আমাকে সশস্ত্র যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছিলেন। দ্রুতাবনতিশীল ঘটনাসমূহকে তাঁরা উভয়েই বিশ্লেষণ করছিলেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে এরা বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল। সেজন্যে দু'জনেই আমার মতো একটা চরম ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে ছিলেন না।

'আমি বিজয়ী হব। চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের সংখ্যা মাত্র শ'তিনেকের মতো হবে। আমার অধীনে ইপিআর-এ প্রায় পনেরশ' বাঙালি সৈনিক আছে। এদের নিয়ে আমি বেশ কিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম দখল করে রাখতে পারব। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বন্ধু-দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবেন',– আমি তাঁদের পুনরায় বোঝানো চেষ্টা করলাম।

'তা সত্ত্বেও তোমাকে সংযত হতে হবে। আমি আশাবাদী, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,' লেঃ কর্নেল নিম্নস্বরে আমাকে বললেন।

'আমাদের অনুপস্থিতি সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। চলুন যাই,' লেঃ কর্নেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মেজর।

আমি শেষ প্রচেষ্টায় আবার বললাম, 'আপনারা আমাদের উপর প্রথম আঘাত হানার সুযোগ করে দিচ্ছেন তাদেরকে।'

তখনও রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পোর্ট এলাকা থেকে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলির আওয়াজ আসছিল। কিন্তু পোর্ট এলাকা থেকে আমার রেলওয়ে পাহাড়ের অবস্থান এতদূরে যে, বাঙালিদের করুণ আর্তনাদ এখানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। রেলওয়ে পাহাড় ছেড়ে চলে এলাম। রাত গভীর হয়ে এসেছে। আমার কানে তখনও বাজছে ওদের দু'জনার আশ্বাসবাণী, 'তারা কোনো চরম ব্যবস্থা নেবে না।'

পৃথিবীতে এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা এরা করতে পারে না,' আমি আমার ডাইরীতে সেই রাতে লিখলাম, 'এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথমে আঘাত না হানার এই ব্যর্থতার দায়িত্ব ওরা কোনোদিনই এড়াতে পারবে না।'

নিয়তির কি বিচিত্র বিধান! তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সে ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ-এর রাত। সেই দু'জন অফিসারের একজন– লেঃ কর্নেল এম.আর. চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দি করল। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে বিশ্বাস করেছিলেন, ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিল। অফিসারদ্বয়ের অন্যজন মেজর জিয়াউর রহমান, রাত সাড়ে এগারটায় যাচ্ছিলেন চট্টগাম পোর্টে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টমেন্টে আনার কাজে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাহায্য করার জন্যে। (পৃষ্ঠা: ২৪–২৫)।

ব্রিগেডিয়ার আনসারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ২৪ মার্চ সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ নামানো শুরু হয়। যেহেতু ডক শ্রমিকরা আগেই এ কাজ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিল, তাই এবার সেখানে 'ইষ্ট রেজিমেন্টাল সেন্টারের' রিক্রুট'দের কাজে লাগানো হল। চট্টগ্রামের জনগণ প্রচ বিক্ষোভে নেমে আসল পথে, পোর্ট এলাকা থেকে ক্যান্টমেন্ট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেইড্ সৃষ্টি করল। পাল্টা ব্যবস্থায় আনসারী রাস্তা প্রতিবন্ধক মুক্ত রাখার জন্যে সেনাবাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিলেন। জনতার একটি বিক্ষুব্ধ ও জঙ্গী মিছিল চট্টগ্রাম পোর্ট এলাকার দিকে এগুতে থাকে দ্রুতবেগে। এদিকে আনসারী চিৎকার করে উঠলেন, 'যে কোনো মূল্যেই হোক, অস্ত্র নামিয়ে আনতেই হবে।' মিছিলে লোকসংখ্যা বেড়ে চলে মুহূর্তে মুহূর্তে। সেনাবাহিনী চুক্তিভঙ্গ করছে– কথা ছিল অস্ত্র, গোলাবারুদ রাখা হবে 'ট্রানজিট ক্যাম্পে।' কিন্তু সে চুক্তি ভঙ্গ করে আনসারী এসব নিয়ে যাচ্ছে ক্যান্টমেন্টে। জনগণ এই আস্পর্ধা সহ্য করতে পারে না, এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতেই হবে। হাজার হাজার লোকের মিছিল পোর্ট অভিমুখী। আনসারীর হুংকার, 'যে কোনো মূল্যে অস্ত্র নামাতে হবে।' সে মূল্য দিতে হবে বাঙালিকে, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। পশ্চিমা সৈন্যা নির্বিচারে জনতার উপর গুলি চালাতে থাকে। জেটি এলাকা পাকিস্তানিদের পরবর্তীকালের গণহত্যার মহড়ার ক্ষেত্রে পরিণত হল। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে সেদিন কতজন নিহত আর কত আহত হয়েছিল তার আর কোনোদিই জানা যাবে না। গণহত্যা শুরু করার সময় এতই নিকটবর্তী ছিল যে, ব্রিগেডিয়ার আনসারী অস্ত্র নামানোর ব্যাপারে আর বিলম্ব করতে পারছিলেন না।

সেদিন (২৪ মার্চ) রাতেই আমি চলে গেলাম রেলওয়ে পাহাড়ে– যুদ্ধ শুরু করলে সেখানে আমার 'হেডকোর্টার' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম আগেই। জনাব হক-এর বাসার টেলিফোন থেকে আমি হালিশহরে ইপিআর-এর লোকদের (বাঙালি) নির্দেশ দিলাম অয়্যারলেসে চট্টগ্রাম সেক্টরের সব এলাকায় সৈন্যদের সাংকেতিক বার্তাগুলো অবিলম্বে পাঠিয় দেওয়ার জন্য। বাইরের সমস্ত ইপিআর ঘাঁটিসমূহ আমার 'ম্যাসেজ'

পেয়েছে কিনা তা জানার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি– তখন পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে একটা বেবী-ট্যাক্সি এসে থামল আমার কাছেই। সে পাহাড়ের উপরে এক বিশাল গাছের নিচে আমি বসা– বাঁ দিকে বেশ দূরে বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী। সামনে আগ্রাবাদ এবং পোর্ট এলাকা। তারও দূরে দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোসাগরের বিপুল জলরাশি। বেবী-ট্যাক্সি থেকে নেমে আসলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান। তাঁরা চাইলেন আমি যে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সেদিন কোনো আক্রমণ পরিচালনা না করি।

'কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও পাকিস্তানিরা আক্রমণ করার আগেই যে তাদের উপর আমাদের আঘাত হানতে হবে,' আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। এবং সেটা এসময়েই না করলে পরে আর সে সুযোগ কখনোই পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানিরা গণহত্যার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন করে ফেলেছে। আমরা এখনই আকক্রমণ করে ওদের ধ্বংস না করলে ওরা আমাদের সবাইকে জবাই করে ফেলবে।'

'চিন্তা করো না,' মেজর জিয়া বললেন, 'ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না।'

'আমিও তাই মনে করি,' সায় দিলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী। 'তোমার সৈন্যদের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে তুমি এখনি থামিয়ে দাও।'

পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় আমি সে রাতের মতো সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেও স্থগিত করে ফেলতে বাধ্য হই। ওরা দু'জনে চলে গেলেন নিকটবর্তী এক বাসায়, যেখানে লেঃ কর্নেল চৌধুরীর একজন আত্মীয় বাস করতেন– যিনি ছিলেন রেলের একজন কর্মকর্তা। (পৃষ্ঠা: ৮৮–৮৯)।

রাত ১১:৪৫ মিনিটের আগেই রেলওয়ে হিলে পূর্ব নির্ধারিত যুদ্ধের টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টার-এ অবস্থান নিয়ে ফেললাম। এরপর আমি সীমান্ত এলাকাসমূহ থেকে আমার সৈন্যদের আসার অপেক্ষায় রইলাম। তাদের নিয়ে 'নেভাল বেইজ', পোর্ট এলাকা এবং বিমানবন্দর আক্রমণ করে দখল করে ফেলতে পারব। লেঃ কর্নেল চৌধুরীর নেতৃত্বে ই.বি.আর.সি-র সৈন্য এবং মেজর জিয়ার সঙ্গের ষোলশহরস্থ ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে দখল করে নিতে পারবে। ষোলশহর এবং ক্যান্টনমেন্টে পশ্চিমা সৈন্যসংখ্যা সর্বমোট ৪০০-এর মতো। ওদিকে এ দু'জায়গায় আমাদের বাঙালি সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২,৩০০-এর কাছাকাছি।

রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটের দিকে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে ই.বি.আর.সি-র বাঙালি সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। প্রথমেই তারা অস্ত্রাগার দখল করে নেয় এবং সেখানে গার্ড ডিউটিতে থাকা বাঙালি সবাইকে হত্যা করে ফেলে। অন্যান্য বাঙালি সৈন্যরা সে সময় ঘুমিয়ে ছিল। অস্ত্রাগার দখলের পর ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা হত্যার এক বীভৎস উন্মাদনায় মেতে উঠল। সেই রাতে তারা ১০০০-এরও বেশি বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করে। তারপর তারা বাঙালি সৈন্যদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার এলাকায় চলে যায় এবং সেখানে নাগালে পাওয়া সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে।

সেই রাতে পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছিল বাঙালি ক্যাপ্টেন এনাম। এনাম সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করে আমাকে বলছিলঃ 'রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ২০ বালুচের সৈন্যরা হঠাৎ করেই ই.বি.আর.সি দখল করে বাঙালি সব গার্ডকে মেরে ফেলে। ঐ একই সময়ে ২০ বালুচের বাকি সৈন্যরা বাঙালি সৈন্যদের ব্যারাকসমূহে এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের ফ্যামিলি কোয়ার্টারসমূহেও আক্রমণ চালায়। এক হাজারেরও বেশি বাঙালি সৈন্যকে তারা মেরে ফেলে। সৈন্যদের পরিবার-পরিজন, মহিলা, শিশু– কতজনকে যে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে মেরে ফেলে তার কোনো হিসেব নেই। কয়েক শ'ত হবেই। আর এই সবাইকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলে ২৫ মার্চ রাত ১১টা থেকে ২৬ মার্চ ভোর ৩টা– এ কয় ঘণ্টার মধ্যে। যেসব সৈন্য আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদের কয়েকজন দৌড়ে চলে আসে ষোলশহরে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং আমাদের সাহায্য করার জন্যে তাদের তাড়াতাড়ি ক্যান্টমেন্টে যেতে বলে।'

এরপর এনাম কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়েই বলতে থাকে, '৮ ইস্ট বেঙ্গল-কে যদি আমাদের সাহায্যের জন্যে পাঠানো হোত, তাহলে অনেক বাঙালি সৈন্য এবং তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষে বেঁচে আসা সম্ভব হোত। ৮ ইস্ট বেঙ্গল ক্যান্টমেন্টে গিয়ে ২০ বালুচকে আক্রমণ করারও দরকার ছিল না। তারা যদি ক্যান্টমেন্টের আশেপাশে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তানি সৈন্যগুলোর দিকে গুলি চালানো শুরু করত, তাহলেই ২০ বালুচের সৈন্যরা আক্রমণ বন্ধ রেখে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রতিরক্ষা অবস্থায় চলে যেতে বাধ্য হোত। আর সে সুযোগে ই.বি.অর.সি-র বাঙালি সৈন্য এবং তাদের পরিবারের লোকজন পালিয়ে আসতে পারতো।' (পৃষ্ঠাঃ ১০৪-১০৬)।

ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কথা ই.বি.আর.সি এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে লেঃ কর্নেল চৌধুরী ও মেজর জিয়ার। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে আমি সারসন রোডস্থ আমার বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডা. জাফর এবং কায়সারকে বলেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গলে গিয়ে বাঙালি অফিসাদের যেন আমার যুদ্ধ শুরু করার সংবাদটা পৌছে দেন। তাহলেই তারা তাদের করণীয় পদক্ষেপ নেবেন। সংবাদটা ৮ইস্ট বেঙ্গলকে সময়মতো পৌছানো হয়েছিল।

রাত ১১:৪৫ মিনিটের মধ্যেই সন্তোষজনক সফলতা অর্জন করার পর আমি ৮ ইস্ট বেঙ্গল এবং ই.বি.আর.সি-র বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের অভিযানের খবর পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। সীমান্ত এলাকাসমূহ থেকে কখন আমার বাকি সৈন্যর শহরে এসে পৌছবে– সেটা নিয়েও আমি যথেষ্ট উদগ্রীব। ঐ সৈন্যরা সবাই শহরে আসার পরই আমাকে 'নেভাল বেইজ' এবং বিমানবন্দর দখল করে ফেলতে হবে। (পৃষ্ঠাঃ ১০৭)।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম গাড়ির পেছনে পেছনে আরেকটি গাড়ি ছুটে গেল– একটু দ্রুত বেগে। তারপর প্রায় ১০ মিনিট কাটল অস্থির অপেক্ষায়। এবং গাড়ি দুটোই আগ্রাবাদ এলাকা থেকে ফিরে একই রাস্তায় চলে গেল, যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের আর কোনো দলই এইপথ দিয়ে আসলো না।

পরে জানতে পারি যে, প্রথম গাড়িটি মেজর জিয়াকে নিয়ে বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে তা ক্যান্টমেন্টে নিয়ে আসার জন্য তিনি চট্টগাম পোর্টে যাচ্ছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, চট্টগ্রাম নিউমার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন ডা. জাফর ও কায়সারের কাছ থেকে আমার 'মেসেজ'টি নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গলে গিয়ে পৌছেন, মেজর জিয়া ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন কর্নেল জানজুয়ার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে এবং তারপর রওনা হয়েছেন চট্টগ্রাম পোর্ট অভিমুখে। জনাব কাদের তখন 'মেসেজ' পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ ঘটনা জানাতে এবং সোয়াত জাহাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল মেজর জিয়ার সন্ধানে। রাত তখন সাড়ে এগারটার মতো (২৫ মার্চ)। ওদিকে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্টে এমনি সময়ে ২০ বালুচের সৈন্যরা ই.বি.আর.সি-তে বাঙালি সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাতে এগিয়ে চলছে। মেজর জিয়া চলেছেন অবাঙালি লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশমতো সোয়াত জাহাজে 'ডিউটি'র জন্য। বাঙালি ক্যাপ্টেন খালেক ছুটে আসছে জিয়াকে থামাতে। আর আমরা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে শহর দখল করে ফেলেছি। রেলওয়ে হিলের অবস্থানে বসে অপেক্ষায় আছি পরবর্তী পর্যায়ে এ্যাকশনের জন্য। প্রথম গাড়িটি জিয়াকে নিয়ে আগ্রাবাদ রোডের মুখে ব্যারিকেইডে পড়ে থামতে বাধ্য হয়। জিয়া তাঁর সাথের পাকিস্তানি সৈন্যদের দিয়ে ব্যারিকেইড পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছিলেন। এতে কিছুটা সময় লেগে যায়। আর এই সময়টুকু ব্যারিকেইডে অতিবাহিত হওয়ার ফলেই ক্যাপ্টেন খালেকের গাড়ি জিয়ার গাড়ির সন্ধান পায় ব্যরিকেইডের কাছে আগ্রাবাদ এলাকার প্রবেশমুখে। খালেক সেখানে মেজর জিয়াকে একপাশে ডেকে ইপিআর-কে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা জানায়। মেজর জিয়াকে খালেক এটাও বলে যে, এই পরিস্থিতিতে পোর্ট এলাকায় গেলে মেজর জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

তখন মেজর জিয়া রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের সাথে আলোচনা করে কী করা যায় সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফিরে যান। প্রথম যে গাড়িটিকে দেখে সুবেদার আইজুদ্দিন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে গাড়িতে মেজর জিয়াই যাচ্ছিলেন সোয়াত জাহাজে। আমরা গাড়ি দুটোকেই 'রেকি ডিউটি'তে নিয়োজিত মনে করে বড় টার্গেটের আশায় ধৈর্য ধারণ না করে রকেট লঞ্চারের গোলা ছুঁড়লে মেজর জিয়া'র প্রথম গাড়ি এবং কিছু পরে খালেক-কে নিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় গাড়ি দুটো টুকরো টুকরো হয়ে যেত, মারা যেত আরোহী সবাই। এমনি করেই দৈবক্রমে বেঁচে গেলেন মেজর জিয়া, খালেক ও গাড়ির আরোহীরা।

এদের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে যাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম সেই ডা. জাফর ফিরে এলে সব জানতে পারলাম। কিছুটা অধৈর্য হয়ে ডা. জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি এদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'আপনার খবর তো ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে পৌঁছে দিয়েছি। তবু তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি।' ডা. জাফর জবাব দিলেন।

'প্লিজ এক্ষুনি গিয়ে ওদেরকে থামান। এখন সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওদের সাথে সম্মিলিতভাবে বাকি জায়গাগুলোও আমরা মুক্ত করতে পারব। আজকের রাতই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।' (পৃষ্ঠা: ১০৮–১০৯)।

ইপিআর-এর দু'টি কোম্পানি নিয়ে সুবেদার মফিজ কক্সবাজার থেকে আমার সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগাম অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালুরঘাট ব্রিজ ক্রস করার আগে ব্রিজের পূর্বপ্রান্তেই তাকে থামিয়ে দেয়া হয় এবং মেজর জিয়া তাকে ই.বি.আর.সি ও ৮ বেঙ্গলের সৈন্যদের সাথে সেখানেই 'ডিফেন্স' নিতে বলেন। সুবেদার মফিজ পরে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি যে আপনার সাথে শহরে এসে যুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি ওতে আমার কোন দোষ নেই এবং আমি কোন আদেশ অমান্য করিনি। মেজর জিয়া আমাকে ব্রিজের ওপারেই থামিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে যেন শহরে এসে আপনার সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়া হয়, কারণ আমার উপর সেটাই ছিল আপনার নির্দেশ। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে, শহরে আর কেউই নেই। অথচ পরে আমি দেখলাম যে আপনি তখনও শহরে যুদ্ধ করছেন'। (পৃষ্ঠা: ১২২)।

গোমদন্ডী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে তাঁরা মেজর জিয়া, কর্নেল অলি, মেজর শওকত এবং আরও কয়েকজন বাঙালি অফিসারকে পেলেন। এই নেতৃবৃন্দ মেজর জিয়াকে অনুরোধ করলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শহরে ও অন্যত্র যুদ্ধ করার জন্য যেন তিনি আমার সৈন্যদের ছেড়ে দেন। মেজর জিয়া নেতৃবৃন্দকে বললেন যে, সৈন্যদের পুনর্গঠিত করে শহরে এসে আমাদের সাথে মিলিত হবেন। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ফিরে এসে আমাকে এসব কিছু অবহিত করলেন। মেজর জিয়া এবং তার সঙ্গের অফিসাররা অবশ্য শহরের যুদ্ধে আসতে পারেননি। ওদিকে ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বিধায় আমি শহরের বাইরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যেতে পারছিলাম না। আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দকে তখন আমি অনুরোধ করি তাঁরা যেন কালুরঘাট ব্রিজ এলাকা থেকে যে কোন একজন সিনিয়র বাঙালি আর্মি অফিসারকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটা বিবৃতি পাঠ করান যে, সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, জে.সি.ও. ও সৈন্যরা জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সেদিন অপরাহ্নেই তাঁরা কালুরঘাট ব্রিজের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেখেন মেজর জিয়া তখনও সেখানে আছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ২৭ মার্চ বিকেলবেলা মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখান থেকে বক্তৃতা দেন। (পৃষ্ঠা: ১৩০)।

...স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার কোনো অধিকার সামরিক অফিসারদের নেই। ...মেজর জিয়া তা বুঝতে পারলেন এবং নতুন করে তৈরি একটি বিবৃতি রেডিওতে পাঠ করে শোনান। এবার তাঁর ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করলেন যে, তিনি বক্তব্য রাখছেন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। (পৃষ্ঠা: ১৩১)।

...খালেদ পরে এ প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়েছিল যে, চট্টগ্রামে এইসব অফিসারদের দু'একজন তাঁকে বলেছিল, 'এই সব রাজনৈনিক সমস্যা এবং এ নিয়ে মাথাব্যাথা রাজনীতিবিদদেরই থাকুক। আমরা সৈনিক, এ নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। তুমিও এসব থেকে একেবারেই দূরে থাক'। (পৃষ্ঠাঃ ১৫৮)।

বাঙালির কলঙ্কমোচন বই থেকেঃ

শেখ রেহানা সম্পাদিত

* আসামী লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের নিকট আদালতের প্রশ্নের জবাবসহ তাহার বিবৃতিঃ-

আদালতের প্রশ্নের উত্তরঃ-

১. আপনি কখন সেনাবাহিনীর চাকুরি হইতে পদত্যাগ করেন?

উঃ ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগে আমাকে রিলিজ করা হয়।

২. কোন ক্ষোভের কারণে পদত্যাগ করেন কি?

উঃ হ্যাঁ, তৎকালীন সেনাপ্রধান ও সি.জি.এস এর উপর ক্ষোভোর কারণে পদত্যাগ করি।

৩. পুনরায় চাকুরিতে যোগদানের জন্য কখন আপনাকে আহ্বান জানান হয়?

উঃ ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে সি.জি.এস ব্রিঃ খালেদ মোশারফ আমাকে চাকুরিতে যোগদানের জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। এই খবরটি আমাকে মেজর ডালিম, মেজর নূর চৌধুরী, মেজর আজিজ পাশা ও ক্যাপটেন বজলুল হুদা দেয়। আমি ১৫ই আগস্ট ১২টায় যোগদান করি। (পৃষ্ঠাঃ ২৪)।

মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায় সরাসরি জেনারেল শফিউল্লাহর রুমে ঢুকে পড়ে। তখন আনুমানিক সময় সাড়ে আটটা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, জেনারেল শফিউল্লাহকে মেজর ডালিম স্টেনগানের মুখে রুম হইতে বাহিরে নিয়া আসে। পিছনে জেনারেল জিয়াসহ অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা ছিল। সেখানে অপেক্ষমাণ প্রথম গাড়িতে জেনারেল শফিউল্লাহ উঠিলেন। দ্বিতীয় জীপ গাড়িতে মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায় ছিল। তৃতীয় গাড়িতে জেনারেল জিয়া, ৪র্থ গাড়িতে মেজর ডালিমের সশস্ত্র লোকজন ছিল। (পৃষ্ঠাঃ ৬৫)।

প্রসিকিউশনের ৪৪ নং সাক্ষী কর্নেল সাফায়েত জামিল বলেন, ঘটনার সময় তিনি ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। ৪৬ ব্রিগেডের অধীনে ১, ২, ৪, ১৬ – ৪টি পদাতিক ব্যাটালিয়ান (বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ২ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং ৬টি সাপোর্টিং ও সার্ভিল্যান্স কোম্পানি ছিল।

১, ২, ৪ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ২-ফিল্ড আর্টিলারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিল। লেঃ কর্নেল মতিয়ুর রহমান ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের, লেঃ কর্নেল আজিজুর রহমান ২-বেঙ্গল রেজিমেন্টের, লেঃ কর্নেল আমিনুল হক ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের, লেঃ কর্নেল চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৬-বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ঘটনার সময় মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ ২-ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং অফিসার চিরেন। ঘটনা আগে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ৪৬-ব্রিগেডের অধীনে ছিল। ...১৯৭৩ সালের শেষদিকে পাকিস্তান হইতে রিপ্যাট্রিয়েটেড্ অফিসার আসা শুরু হইলে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের পদোন্নতি, বদলী ও সুযোগ-সুবিধা নিয়া মত বিরোধ দেখা দেয়। পাশাপাশি রক্ষীবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা, সরঞ্জাম বাছাই নিয়া নানা রকম অপপ্রচার চলিতে থাকে। ...মেজর ডালিমের এই উচ্ছৃংখল কার্যকলাপের দরুন তাহাকে সেনাবাহিনীর চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইহার জের হিসাবে মেজর নূর সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে। তখন মেজর নূরকেও চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মেজর ডালিম ও মেজর নূর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল। চাকুরিচ্যুতির কারণে তাহারা উভয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও তাঁহার সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। মেজর ফারুক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় তাহাকে ২ বৎসরের সিনিয়ারিটি দেওয়া হয় নি। সেই কারণে তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিলো। মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক পরস্পরের ভায়রা ছিল।

...ঘটনা ঘটার পর জেনারেল জিয়া বলিলেন– 'So what President is dead, Vice-President is there, up hold the Constitution. সেখান হইতে বাহির হইয়া ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ঢুকার মুখে একটি ট্যাংক আক্রমণাত্মক অবস্থায় দেখে। ট্যাংকের উপর মেজর ফারুক বসা ছিল। মেজর ফারুক তাহার সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সারিবদ্ধ গাড়িগুলির উপর হেভী মেশিনগান দ্বারা ফায়ার করে। ফলে কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকজন সেনাসদস্য আহত হয়। ১ম বেঙ্গল ইউনিটের লাইনের ভিতরের রাস্তার উপর আরো ৩টি ট্যাংক আক্রমণাত্মক অবস্থায় দাঁড়ানো দেখে। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ট্যাংকগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টে যাওয়ার আধাঘন্টার মধ্যে সি.জি.এম. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টে আসেন। তিনি চীফ অব আর্মি স্টাফের বরাত দিয়া ৪৬ ব্রিগেডের যাবতীয় অপারেশনাল কর্মকা নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানান। সকল অনুমান ৮টার সময় মেজর ডালিম ইউনিফরম ও সশস্ত্র অবস্থায় একটি জীপে হেভী মেশিনগন ফিট করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্যসহ মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়া আসে। পিছনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন। (পৃষ্ঠা: ৮৫-৮৭)।

...মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সতীর্থ ছিলেন। জিয়াউর রহমান সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু তাহাকে চীফ অব আর্মি স্টাফের পদ দেওয়া হয় নাই। ইহাতে দুই জনের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না।

...২৪শে আগস্ট জেনারেল শফিউল্লাহকে অবসর দেওয়া হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চীফ অব আর্মি স্টাফ করা হয়। জেনারেল খলিলুর রহমানকে চীফ অব ডিফেন্স করা হয়। ব্রিগেডিয়ার হোসাইন মো: এরশাদকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়া ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওসমানীকে প্রেসিডেন্টের ডিফেন্স এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। জেনারেল জিয়া চীফ অব আর্মি স্টাফ হইয়া সেনাবাহিনীকে চেইন অব কমান্ডে ফিরিয়া আনার কোন চেষ্টাই করে নাই। ফলে ১৯৭৫ সালে ৩রা নভেম্বর একটি অভ্যুত্থান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। (পৃষ্ঠা: ৮৮)।

...জেনারেল জিয়াউর রহমান ৭ই নভেম্বর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত অফিসারদেরকে বৈদেশিক মিশনগুলিতে চাকুরি দিয়া পুনর্বাসন করে। মেজর রশিদ, মেজর ফারুক চাকুরি নেয় নাই। ১৯৭৬ সনে তাহারা উভয়েই বাংলাদেশে ফিরিয়া আসে। মেজর ফারুক সাভার এবং বগুড়াতে মিউটিনি ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। মেজর রশিদ ২-ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারদের দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। জেনারেল জিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আবারও তাহাদেরকে বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। ১৯৮০ সনের শেষের দিকে ১৫ই আগষ্টের ঘটনাকারী অফিসারেরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। আবার তাহারা সকলেই চাকুরিচ্যুত হয় এবং বিদেশেই ফেরারি জীবন-যাপন করিতে থাকে।

প্রসিকিউশনের ৪৫নং সাক্ষী মেজর জেনারেল (অব:) শফিউল্লাহ বলেন– তাহার এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের একই রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাই নম্বরে জেনারেল জিয়াউর রহমান সিনিয়র ছিল। কিন্তু জেনারেল ওসমানীর পরে ১৯৭২ সনে জিয়াউর রহমানের স্থলে তাহাকে চীফ অব আর্মি স্টাফ করিলে তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে তিনি বলেন– 'তোমার কথা শুনিয়াছি, There is something called political decision জবাবে তিনি বলিয়াছেন, 'স্যার- From today and now on wards I am a victim of circumstances.

তিনি বলিলেন– তোমরা বড় বড় কথা বল, 'যাও কাল হইতে তুমি জেনারেল ওসমানীর নিকট হইতে দায়িত্ব বুঝিয়া নাও।'

তারপর তাহার অফিসে গিয়া প্রথমে কুমিল্লায় জিয়াউর রহমানকে ফোন করে। টেলিফোনে তাহার নিয়োগসহ বঙ্গবন্ধুর সহিত আলাপের বিস্তারিত জানায়। কথা শোনার পর জিয়া বলিলেন Ok শফিউল্লাহ– Good bye.'

ইহার সপ্তাহখানেক পর একটা নতুন পদ– 'ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ' সৃষ্টি করিয়া ঐ পদে জিয়াকে পোস্টিং দেওয়া হয়। এই পদ পাওয়ার পরও তাহার মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায়। রক্ষী বাহিনী গঠিত হওয়ার পর এই বাহিনী সম্বন্ধে কিছু মহল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসাবে রক্ষী বাহিনী গঠিত হয় বলিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এছাড়া অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অফিসার মেজর ডালিম তাহার ছাত্রজীবনের কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মীদের সহিত

কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়। এই অফিসারটি একজন উচ্ছৃংখল প্রকৃতির ছিল। ১৯৭৩ সনে এক বিয়েতে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সঙ্গে তাহার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইহার জের হিসাবে সে কিছু সেনা অফিসারকে নিয়া গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়িতে হামলা করে। এই জন্য তাহাকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এতে কিছু মহল সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে এবং সেই অপপ্রচারে সেনাবাহিনীর মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

রক্ষীবাহিনীকে কার্যকর করার জন্য গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হইলে এই ব্যাপারেও অপপ্রচার হয় এবং সামরিক বাহিনীতে একটা অসন্তোষ দেখা দেয়।

কর্নেল তাহের একদিন আমার অফিসে আসিয়া বলে– 'স্যার, এতোদিন তো চীফ অব আর্মি স্টাফ থাকলেন– এখন এই পদটা জিয়াউর রহমানের জন্য ছাড়িয়া দেন।' তাহার নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কথাগুলো শুনিয়া তখনই তাহাকে বলে, Do you know, you are down categorised তুমি এখনই সিএমএইচ-এ যাও এবং স্ব-সম্মানে মেডিক্যালি Board out হইয়া যাও তা না হলে তোমাকে চাকুরি হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হবো।'

বঙ্গবন্ধুকে এই বিষয়টি জ্ঞাত করলে তিনিও ইহা সমর্থন করেন। অবশেষে কর্নেল তাহের মেডিক্যালি অবসর গ্রহণ করে। ইহাতেও আর্মিতে কিছু প্রতিক্রিয়া ও অপপ্রচার হয়। তিনি কোন অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে ব্যবস্থা নিলে তাহারা জেনারেল জিয়ার নিকট Shelter নেয়। একবার বঙ্গবন্ধু তাহাকে বলিলেন– 'জিয়া আমাকে বার বার বলতেছে, সে বেটার সার্ভিস দিতে পারিবে তোমাকে সরাইয়া দেওয়ার জন্য।' (পৃষ্ঠা: ৮৯-৯০)।

জিয়া ও খালেদ মোশাররফকে ফোন করে তাড়াতাড়ি তাহার বাসায় আসার কথা বলেন। ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে তাহারা বাসায় আসিয়া পড়ে। জিয়া ইউনিফরম ও সেভ এবং খালেদ মোশাররফ নাইট ড্রেসে নিজের গাড়িতে আসে। ঐখানে দুইজনকেই ইতিমধ্যে জানা পরিস্থিতি জানাইলেন এবং খালেদ মোশাররফক ৪৬ ব্রিগেডে তাড়াতাড়ি যাইয়া সাফায়েত জামিলকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। কারণ তখনও পর্যন্ত তাহার পূর্বে দেওয়া নির্দেশের কোন তৎপরতা দেখিতে পাইতেছিলেন না। এক পর্যায়ে ডেপুটি চীফ জিয়া বলিলেন– 'Don't send him, he is going to spoil it.'

অনুমান সকাল ৭টার সময় রেডিও ঘোষণার মাধমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কথা শুনিয়াছে। অফিসে অবস্থানকালে ডেপুটি চীফ তাহার সামনেই বসা ছিলেন। এক পর্যায়ে ডেপুটি চীফ জেনারেল জিয়া বলিলেন, সি.জি.এস খালেদ মোশাররফকে আর বাহিরে যাইতে দিও না। তাহাকে বল– 'Ops order' তৈরি করতে, কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট গেট ইন– ইন দিস প্রিটেকট।' (পৃষ্ঠা: ৯১)।

...সময়মত বঙ্গভবনে গিয়া জেনারেল জিয়া এবং খলিলকে বঙ্গভবন হইতে বাহিরে যাইতে দেখেন। প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করার আগে জেনারেল ওসমানীর সাথে দেখা করার জন্য বললে তাহার সাথে দেখা করে। জেনারেল ওসমানী তাহার অনেক প্রশংসা

করে বলিলেন, 'তুমি দেশের জন্য অনেক কিছু করিয়াছ, এখন তোমার সার্ভিস বিদেশে দরকার। ইহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জেনারেল ওসমানীর সাথে প্রেসিডেন্টের অফিসে যায়।

প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোস্তাকও তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া বলেন, তোমার সার্ভিস এখন দেশের বাহিরে দরকার। তখন তিনি বলিলেন, Who is replacing me. তিনি বলিলেন, জিয়া। এই পর্যায়ে আমি বলিলাম, Donot think at his stage, Zia will misunderstand. তিনি বলিলেন, This will be taken cake off. তিনি বাহিরে যেতে রাজি নন– জানাইলে বলেন, Do not think staying in the country. তখন উচ্চবাচ্য না করিয়া ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আসেন। এখানে আসিয়া দেখেন জেনারেল জিয়া ইতিমধ্যে চীফ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অফিসারদের সাথে মিটিং করিতেছেন।

...তারপর তিন বাহিনীর প্রধানসহ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, ডি.জি.এফ.আই প্রধান আসেন। তাহারা তিনতলায় একটি মিটিং করেন। মিটিং শেষে খন্দকার মোস্তাক সাহেব রাষ্ট্রপতি হিসাবে জাতির উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ৭টার সময় রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দেন। ইহার পর প্রতিদিন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আর্মি অফিসাররা খন্দকার মোস্তাক সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য আসিতে দেখে। (পৃষ্ঠাঃ ৯৪-৯৫)।

৪৭নং সাক্ষী মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান ঃ দেখিয়া মনে হইত– খন্দকার মোস্তাক এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান এবং শাহ মোয়াজ্জেম একই গ্রুপের লোক। ২০ আগস্ট খন্দকার মোস্তাক মার্শাল ল' জারি করেন। ২৪ আগস্ট দুপুর বেলা রেডিওতে শোনেন জেনারেল ওসমানীকে ডিফেন্স অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরে বঙ্গভবন হইতে টেলিফোনে তাহাকে ৪টার সময় বঙ্গভবনে যাইতে বলা হয়। ৪টার সময় গিয়া দেখে চীফদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত এবং জেনারেল জিয়াও সেখানে উপস্থিত।

সেখানে মেজর রশিদ, মেজর ডালিম ও আরো একজন ছিল। জেনারেল ওসমানী তাহাকে চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ এবং জেনারেল জিয়াকে চীফ অফ আর্মি স্টাফ ঘোষণা দিলেন। এই সময় জেনারেল এরশাদকে পদোন্নতি দিয়া ডেপুটি চীফ অফ আর্মি স্টাফ এবং জেনারেল দস্তগীরকে বিডিআর চীফ করা হয়। অপরদিকে জেনারেল শফিউল্লাহকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়।

অক্টোবরের শেষদিকে মৌখিক রিপোর্ট পায় যে, চীফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল জিয়া এবং সি.জি.এস খালেদ মোশাররফের মধ্যে রেশারেশি চলিতেছে। এরা একজন আরেকজনের কাছে নিরাপদ বোধ করে না। তখন তিনি জেনারেল ওসমানীর অনুরোধে খালেদ মোশাররফকে বুঝাইবার জন্য যান এবং বুঝানোর চেষ্টা করনে। (পৃষ্ঠাঃ ৯৭)।

এরপর ৭ই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লরে মধ্যে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন এবং ব্রিঃ মোশারফ, কর্নেল হুদা এবং কর্নেল হায়দারকে হত্যা করেন। (পৃষ্ঠাঃ ৯৮)।

...পরে জেনারেল শফিউল্লাহ তাহাকে ৪৬ ব্রিগেডে আসিতে বলেন। তিনি ৪৬ ব্রিগেডের অবস্থান জানিতেন না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া সেখানে পৌঁছিয়া খুব বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে। শফিউল্লাহকে অনেক অস্ত্রধারী আক্রমণাত্মক হাবভাবে একটি রুমে ঘিরিয়া রাখে। (পৃষ্ঠাঃ ১০০)।

লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানের জবানবন্দির অংশবিশেষ ঃ ...ঐ সময়ে ঢাকা লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের স্ত্রীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের কতক অফিসার ও জওয়ানরা গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি তছনছ করে। তাতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে মেজর ডালিম, মেজর নূর ও আরো কয়েকজনের চাকুরি চলে যায়। ঐ সময় তৎকালীন ডেপুটি চীফ অফ আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মাঝে মাঝে পরিবারসহ আমার বাসায় হেঁটে হেঁটেই চলে আসতেন। তিনি দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করতেন এবং এক সময় বলেছিলেন, তোমরা ট্যাঙ্ক টুং ছাড়া দেশের আর খবরাখবর রাখ কি? আমি বলি যে, দেখতেছি তো দেশের অনেক উল্টাসিধা কাজ চলছে। আলাপের মাধ্যমে তিনি আমাকে instagate করে বললেন দেশ বাঁচানে জন্য একটা কিছু করা দরকার। আমি বিষয়টিকে তখন গুরুত্ব দেই নাই। ১৯৭৫ সনের প্রথম দিকে বাকশাল গঠন হয়। জেলায় জেলায় গভর্নর নিযুক্তির প্রক্রিয়া চলছিল। এ নিয়ে মেজর রশিদের সাথে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হতে থাকলে সিদ্ধান্ত হয় যে,একমাত্র শেখ মুজিবকে ক্যান্টমেন্টে এনে তাকে দিয়ে পরিবর্তন করা ছাড়া দেশে কোন পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। রশিদের বাসায় এসব আলোচনাকালে তার স্ত্রী জোবায়দা রশিদও উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সাথে আলোচনা হয় এবং Suggestion চাইলে তিনি বলেন, আমি কি করতে পারি তোমরা করতে পারলে কিছু কর। পরে আমি রশিদের বাসায় গিয়ে মতামত জানাই। রশিদ তখন বলে এই বিষয় নিয়া তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা Political ব্যাপার। আমি deal করব। রশিদ পরে জিয়ার সঙ্গে এবং খন্দকার মোস্তাক আহমদের সাথে যোগাযোগ করে। (পৃষ্ঠাঃ ১০২)।

...খন্দকার রশিদ জানায় যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারলে, জিয়াও আমাদেরকে সমর্থন দিবে। (পৃষ্ঠাঃ ১০৩)।

লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন (আর্টিলারি) কর্তৃক জবানবন্দীর অংশবিশেষ ঃ জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে পাঠানো সকল মেজরদেরকে কূটনৈতিক মিশনে চাকুরি দেন। কিন্তু মেজর রশিদ ও ফারুক চাকুরি নিতে অস্বীকার করেন। এবং আর্মিতে পুনঃবহাল হওয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। মেজর রশিদ, মেজর ফারুক ও মেজর ডালিম ১৯৭৬ সনে গোপনে হঠাৎ বাংলাদেশে চলে আসেন এবং মেজর ফারুক সাভার সেনানিবাসে গিয়ে বেঙ্গল কেভালরির কমান্ড হাতে তুলে নেন। বগুড়ায় অবস্থানরত বেঙ্গল কেভালরির অন্য ইউনিটের সৈন্যরাও ফারুক রহমান সেখানে না গেলে মার্চ করিয়া ঢাকা আসিবে বলিয়া হুমকি দিলে ফারুক রহমান বগুড়া চলিয়া যান এবং সেখানে গিয়ে ল্যান্সার ইউনিটের কমান্ড গ্রহণ করেন। জেনারেল জিয়া ফারুক রহমানকে ঢাকায়

ফেরত আনেন। পরে এই অপরাধে এই ইউনিটের অনেক সৈনিককে কোর্ট মার্শাল করে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেন এমনকি ইউনিটটিকে নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু মেজর ফারুককে সাজা না দিয়ে বিদেশে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মেজর ফারুকের সঙ্গে আগত মে. রশিদ এবং মেজর ডালিম ঢাকা ক্যান্টমেন্ট ২-ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ড ও কন্ট্রোল হাতে নেওয়ার চেষ্টা চালান এবং সৈনিক লাইনে গিয়ে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিতে থাকেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ৩/৪ দিন পরে বিদেশে ফেরত পাঠান, ইহাতে আমার মনে হয় যে ১৫ আগষ্টের ঘটনায় জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল, যার জন্য সে ফারুক এবং রশিদের কাছে খুবই দুর্বল ছিল। (পৃষ্ঠা: ১১৬)।

গত ১৪/৮/৭৫ তাং ১টার দিকে সবিচালয়ের অফিসে পৌছি। খন্দকার মোস্তাক বলেন যে, এই সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার জিয়া দুইবার এসেছিলেন। সে এবং তাহার লোকেরা তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় খন্দকার মোস্তাক জানান যে, বলপূর্বক ক্ষমতা বদলাইতে চায়। প্রয়োজনবোধে যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত। খন্দকার মোস্তাককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান যে, তিনি তার মতামত দিয়েছেন। কারণ এ ছাড়া অন্য আর কোন কিছু নাই আমাদের তাহাদের সঙ্গে থাকার জন্য বলেন। 'আমার ডাকের জন্য অপেক্ষা কর।' এই বলে তিনি চলে যান। (পৃষ্ঠা: ১১৮)।

***

তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা বই থেকে লেঃ কর্নেল (অব:) এম.এ. হামিদ,পি.এস.সি।

জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রদূত করে পূর্ব জার্মানী অথবা বেলজিয়ামে পাঠাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন জিয়া তার অফিসে আমাকে ডেকে বলল, 'হামিদ, তুমি ওসমানীকে ধরে এখনই কিছু একটা না করলে চিঠি বেরিয়ে যাবে। প্লিজ ডু সামথিং।' জনাব সাইদুর রহমান একজন প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধা। তার সাথে আমার পরিচয় ছিল। তোফায়েল ও রাজ্জাকের সাথে উনার ছিল গভীর সংযোগ। আমি জিয়াকে আশ্বাস দিলাম, তার মারফত আমি কিছু একটা করব।

হঠাৎ বহুবছর পর সেদিন জনাব সাইদ আমার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন করে বললেন, 'কর্নেল সাহেব, আপনার জন্যই ১৫ই আগস্ট, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বর সংঘঠিত হলো।' ব্যাপারটি আমি বুঝতে না পারায় তিনি এবার পরিষ্কার করে বললেন, 'আপনি সেই যে জিয়াউর রহমানের পোস্টিং ক্যানসেল করানোর জন্য আমাদের কাজে লাগিয়েছিলেন, সেটাইতো কাল হলো। জিয়া না থাকলে তো এ তিনটি অভ্যুত্থানের কোনটাই হতো না।' (পৃষ্ঠা: ১৫)।

জিয়াউর রহমানের সাথে শফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফের বনিবনা ছিল না। তবে শফিউল্লাহ ও খালেদের গ্রুপ ভারী হওয়াতে ঐ সময় জিয়াউর রহমানকে কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় থাকতে হয়। যে সব তরুণ অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাদের প্রতি জিয়ার সহানুভূতি ছিল। জিয়ার স্টাফ অফিসার ছিল মেজর নূর চৌধুরী। তার কামরাতে প্রায়ই এসব অফিসারদের আনাগোনা চলতো। (পৃষ্ঠা: ১৯)।

জিয়ার গদি দখল

জিয়াউর রহমানের গদি দখল ছিল আরো নাটকীয়। ২৪ তারিখ অনুমান বেলা ১২টায় জেনালের জিয়ার ফোন আসলো। তার উত্তেজিত কণ্ঠ, 'হামিদ Come here just now.'

আমি তার অফিসে ঢুকতেই মিলিটারি কায়দায় ডাঁট মেরে গর্জে উঠল, Salute properly you Guffy, you are entering Cheif of Staff's Office.

...জিজ্ঞাসা করলাম, 'শফিউল্লাহ চিঠি পেয়েছে? সে জানে?'

'না, এখনও কেউ জানে না।'

বললাম, 'তাহলে তো তার কাছেও কপি পৌছতে হবে। তারপর অফিশিয়ালি সে হয়তো কয়দিন সময় নিয়ে তোমাকে 'হ্যান্ডওভার' করবে। এখন একটু চুপ থাকো।

বললো, 'শাট-আপ, আমি কাল থেকেই টেক্ওভার করবো।' আমি চমকে গেলাম। আমি তাকে বুঝালাম, 'দেখো, এটাতো তুমি 'ক্যু' করতে যাচ্ছো না। সরকারের অফিশিয়াল চিঠি রয়েছে। তোমাকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়াই হয়ে গেছে।'

সে বলল, 'তুই এসব বুঝবি না। হি ইজ এ ভেরি ক্লেভার পারসন। তুমি আগামীকাল পুরো ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকদের মাঠে একত্র হওয়ার নির্দেশ পাঠাও।'

আমি দেখলাম, মহা সংকট। কিছুতেই তার দেরি সইছে না। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বললাম, 'ঢাকা স্টেশনের সবগুলো ইউনিট আমার অধীনে নয়...।

...পরদিন সকলে ঢাকা ক্যান্টমেন্টে মহা উত্তেজনা। অফিসার জওয়ান সবাই সিগন্যাল মেসের গ্রাউন্ডে সববেত হয়েছে। কেউ কিছুই জানে না, কি ব্যাপার! ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমান মঞ্চে এসে হাজির। সবাই অ্যাটেনশন। জিয়া মঞ্চ থেকে চিৎকার দিয়ে গর্জন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 'আজ থেকে আমি চীফ অব স্টাফ। আপনারা সবাই আপনাদের ডিসিপ্লিন ঠিক করেন। তা না হলে কঠোর শাস্তি হবে।' বলেই মঞ্চ থেকে নেমে দ্রুত আবার তার গাড়ি চড়ে প্রস্থান। মিটিং তিন মিনিটেই শেষ। সবাই হতবাক, একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমি হাসলাম।

প্রস্থানের পথে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার আঙ্গুল দিয়ে গায়ে টোকা দিল। 'Follow me' তাড়াতাড়ি আমি জীপ নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটে তাঁর অফিসে গিয়ে

ঢুকলাম। চেয়ারে বসে নব নিযুক্ত সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। বিরল দৃশ্য। বললো, 'কেমন হলো বল?' আমি বললাম, 'ঠিকতো হলো, কিন্তু প্রথম ভাষণটা এরকম চড়া গলায় ধমকের সুরে না বললে কি হতো না?'

'শাট আপ। এটাতো কেবল শুরু। দেখনা আমি কিভাবে সব ব্যাটাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়ে দেই।'

বললাম, 'দোস্ত একটু ধীরে চল্।'

'শফিউল্লাহর Reaction কি?' তার জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'এখনো কথা হয়নি। দেখি কি বলে।'

...ওদিকে শফিউল্লাহ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সে তখনও কোন চিঠিই পায় নাই। সে কিছুই জানে না। শফিউল্লাহ আমাকে টেলিফোন করল, 'হামিদ এসব কি হচ্ছে? কে এইসব নির্দেশ দিচ্ছে? কার হুকুমে সকালে স্টেশন অফিসার জওয়ানদের মিটিং ডাকা হলো?' আমি বহুকষ্টে তাকে বুঝিয়ে মাথা গরম না করতে অনুরোধ করলাম। সে দারুণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হলো। তবে পরিস্থিতির কারণে সে পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য হলো। ঐদিন থেকে শফিউল্লাহ আর অফিসেই আসলো না। এইভাবে সেনাবাহিনীর নতুন চীফ অব স্টাফের ঝটকা স্টাইলে গদি দখল পর্ব সম্পন্ন হলো। কোন বিদায় সংবর্ধনা, কোন আনুষ্ঠানিক ডিনার, কিছুরই আয়োজন করা হলো না।

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার সুবাদে ভবিষ্যতে তার আকাশে ওঠার সোপান তৈরি হয়ে গেল। আলাদিনের যে চেরাগটির স্বপ্ন এতদিন ধরে সে লালন করে আসছিল, আজ তা হাতে এসে ধরা দিলো।

১৫ আগস্ট জেনারেল জিয়ার জন্যে সৌভাগ্য কাঠি বয়ে আনলো। আগস্ট অভ্যুত্থান না হলে জিয়ার উত্থান হতো না। বাংলাদেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হতো। (পৃষ্ঠাঃ ৬৭-৬৯)।

...রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরাসরি হত্যাকারীর কাছ থেকে পেয়েও সেনাপ্রধানকে শাফায়েত জামিল ফোনে কিছুই জানায়নি। সেতো নিজেও তার কাছে দাবী করতে পারতো, 'স্যার অনুমতি দিন। ঘাতক রশিদ আমার ঘরে বসে আছে। আমি তাকে এ্যারেস্ট করতে চাই।' সেতো কিছুই করলো না। তাহলে কি মৌনং সম্মতি লক্ষণ! এরপর সে নীরবে হেঁটে হেঁটে ডেপুটি চীফের বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। প্রশ্ন হলো, এরকম দুর্যোগ মুহূর্তে যেখানে এক একটি সেকেন্ড মহামূল্যবান, সেখানে সে হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করবে কেন? সময় বাঁচাতে তার গাড়ি ব্যবহার করলো না কেন? সে এই মুহূর্তে তার চীফের দিকে না গিয়ে ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমানের দিকেই বা যাবে কেন?

সারা সকাল বেলা রশিদ, ডালিমরা, এমনকি পরে ফারুকও তার এরিয়াতে খোলামেলা হাসিখুশি ঘোরাফেরা করছিল। শাফায়াত তার এরিয়াতে চার হাজার সৈন্য নিয়ে কেন তাদের ঘেরাও করতে পারলো না? এসব রহস্যজনক নয় কি? (পৃষ্ঠাঃ ৭৩)।

বহুদিন পর জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে শফিউল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন। "ঐদিন ঢাকার ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার আমার কথা শুনেনি, সে জিয়াউর রহমানের কথা শুনেছে" এসব তথ্য বিশ্লেষণের দাবী রাখে।" (পৃষ্ঠাঃ ৭৫)।

জিয়া এবং কর্নেল তাহের একে অন্যের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। উভয়েই একই সাথে একই সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাহেরকে পঙ্গুত্বের কারণে অবসর দেয়ার পর জিয়া বারবার তার সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তাহের গোপনে জাসদের আর্মস উইং গণবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জিয়াকে সামনে রেখে চাইনিজ পদ্ধতির সেনা-বিপ্লবের একটা স্বপ্ন দেখছিলেন।

চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল ছিলেন প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠ। তারা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেজরদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বললেন। জিয়া কিন্তু মেজরদের কাছে ছিলেন কৃতজ্ঞ, কারণ তারাই তো তাকে চীফ-অব-স্টাফ বানিয়েছে। অতএব, জিয়া কৌশলে একূল-ওকূল, দু'কূল রক্ষা করেই চলতে থাকেন। যাকে বলে দুই প্রান্তের লোকজনদের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। একদিকে ফারুক-রশিদের পিঠ চাপড়ানো, অন্যদিকে শাফায়াত জামিলের কাঁধে হাত, দুই-ই করছিলেন। আসলে জিয়া বহুদিন গোয়েন্দা সংস্থায় চাকুরি করে এসব কাজে ছিলেন ভাল সিদ্ধহস্ত।

জিয়া তলে তলে আর একটি কাজ করছিলেন। তা হলো, তিনি সবার অজ্ঞাতে জাসদে কর্নেল (অবঃ) তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের আর্মস উইং ইতিমধ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শেখ সাহেবকে উৎখাতের জন্য ইতিপূর্বে তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জিয়া সবার অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সুহৃদ কর্নেল তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যান। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে একটি সেনা বিপ্লবের লক্ষে জিয়াউর রহমানের সাথে তাদের রীতিমত পাকাপাকি কথাবার্তা হয়। তার সাথে বেশ ক'টি গোপন মিটিং হয়। যদিও বিপ্লবের ব্যাপারে জিয়ার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের উর্ধ্বতন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়িতে তারা জিয়ার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। (পৃষ্ঠাঃ ৯২-৯৩)।

রশিদ তার সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছে, 'জিয়া এই সময় সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাকে কত বুঝালাম, স্যার, আপনি এখনও অনেক ইয়াং। এখন আপনাকে প্রেসিডেন্ট মানাবে না। একটু অপেক্ষা করুন। এখন 'চীফ' আছেন ভালই আছেন। কিন্তু জিয়া অস্থির। অগত্যা আমি তাকে বলি, তাহলে স্যার এটা আমি পারবো না। আপনাকেই আপনার পথ করে নিতে হবে। আমি যতদূর পারি আপনাকে সাহায্য করব।' (পৃষ্ঠাঃ ৯৬)।

...লেফটেন্যান্ট তৎক্ষণাৎ জিয়াকে একটি স্মার্ট স্যালুট দিয়ে বললো, 'Sir, I have come to present you dead body of Khaled Musharraf, Col. Huda and Hyder, Sir;' আমি অফিসারকে সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো কালো ট্রাকের পেছনে গিয়ে

উঠলাম। সেখানে দেখি ট্রাকের পাটাতনে খড় চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি মৃতদেহ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার। খালেদের পেটের ভূঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিল। তাকে পেটের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল, হয়তোবা বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিল। কি করুণ মৃত্যু! আমি জিয়াকে কামরায় গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, খালেদ, হুদা আর হায়দারের ডেডবডি।' সে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো এখন কি করা যায়?' আমি বললাম, 'আপাততঃ এগুলো CMH-এর মর্গে পাঠিয়ে দেই।' জিয়া বললো, 'প্লিজ হামিদ, এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।'

হায়, খালেদ মোশাররফ! তিনি ৭ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলেন বটে। তবে জীবন নয়, ফিরে এলো তার প্রাণহীন দেহ। (পৃষ্ঠা: ১৪১)।

প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এব আবু তাহের বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিএমএলএ হিসাবে জিয়া থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতাটি থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করেন। সুতরাং সায়েমই সিএমএলএ থাকলেন, জিয়ার অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডিসিএমএল-এর পোস্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপুত ছিল না, কারণ ভোরেই তিনি সিএমএলএ হিসেব রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন। (পৃষ্ঠা: ১৪৫)।

বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে আবার টু-ফিল্ডে গেলাম জিয়ার কাছে। বারান্দায় উঠতেই দেখি একটি কক্ষে বসে আছে কর্নেল তাহের। মুখ তার কালো, গম্ভীর, ভারী। তিন-চারজন অফিসার কর্নেল মাহতাব, কর্নেল আবদুল্লাহ, কর্নেল আমিন তার সাথে বসে। আমাকে সালাম দিলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার তাহের? তুমি এত গম্ভীর কেন? বললো, স্যার আপনারা কথা দিয়ে কথা রাখবেন না। মন খারাপ হবে না? তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কর্নেল আমিন মুচকিহেসে আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। বললো, বুঝলেন না স্যার! ব্যাপারটা তো সব তাহেরের লোকজনই ঘটিয়েছে, এখন জিয়াকে মুঠোয় নিয়ে বারগেন করছে। এখন তো সে জিয়াকে মেরে ফেলতে চায়। (পৃষ্ঠা: ১৪৮)।

৯ তারিখ দুপুরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশররফের এক চাচা শহর থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন, খালেদের লাশটি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভয়ে খালেদের পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত দুইদিন ধরে অবহেলায় লাশটি পড়ে আছে। কেউ আসছে না। আমি তাকে তখনই স্টেশন হেডকোয়ার্টারে চলে আসতে বললাম। তিনি ক্যান্টনমেন্টে আসতে রাজী হলেন না। অগত্যা বনানী স্টেশনের কাছে নিয়ে খালেদের লাশ তার হাতে পৌঁছে দেয়া হলো। তিনি সেনানিবাস গোরস্থানে খালেদকে দাফন করার অনুমতি চাইলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলাম। কিছুক্ষণ পর ফোন করে বললেন, তার কাছে কোন লোকজন নাই। যদি কবরটা খুঁড়ে দেয়া যায়। আমি তৎক্ষণাৎ ক্যান্টমেন্টে বোর্ড অফিসারকে ডেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের কবর খুঁড়তে ৩/৪ সিভিলিয়ান মালি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

বিকেলে আবার তিনি ফোন করলেন, খালেদের আত্মীয়-স্বজন সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা সন্ধ্যার দিকে খালেদকে দাফন করতে চান। তাই একটু সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, দেখুন আপনি কি সেপাই গার্ড চাচ্ছেন? তিনি বললেন, তওবা, তওবা। তখন আমি বললাম, আমি নিজে সন্ধ্যার সময় ওখানে হাজির থাকবো। আপনারা নির্বিঘ্নে খালেদকে নিয়ে আসুন। তিনি আশ্বস্ত হলেন। ধন্যবাদ জানালেন।

সন্ধ্যাবেলা ঘোর অন্ধকার। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। রাস্তায় লাইটের স্তিমিত আলোতে ক্যান্টনমেন্টের গোরস্থানে তড়িঘড়ি করে খালেদের দাফন কার্য সমাধান করা হল। উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪/৬ জন অতি নিকট আত্মীয় ও চাচা। আর শুধু আমি ও আমার ড্রাইভার ল্যান্স নায়েক মনোয়ার। (পৃষ্ঠাঃ ১৫৯)।

পরবর্তীতে কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হল। বিশেষ মার্শাল-ল' আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিয়ারই কোর্সমেট ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দার। ট্রাইবুন্যালের অন্যান্য সদস্য ছিল উইং কমান্ডার রশীদ, কমান্ডার সিদ্দিক আহমদ, মেজিস্ট্রেট আবদুল আলী ও হাসান। তড়িঘড়ির বিচারে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হলো। ১৭ জুলাই '৭৬ তার ফাঁসির রায় দেয়া হয়। ২০ জুলাই প্রেসিডেন্টের কাছে তার ক্ষমার আবেদন নাকচ হয়। ২১ জুলাই কাক ডাকা ভোরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তার ফাঁ-সির আদেশ কার্যকর করা হয়। তাড়াহুড়ার ফাঁসিতে বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি গুরুতরবভাবে লংঘন করা হলো।

এভাবেই ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী নেতা কর্নেল তাহের বীরউত্তম, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ বলি দিয়ে জিয়ার সাথে তার বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করলেন! বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনিই প্রথম অফিসার যাকে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হলো। দিনটি ছিল ২১ জুলাই ১৯৭৬ইং।

একদিন সেনাসদর থেকে জেনারেল এরশাদ ফোন করে বললেন ৩ রা নভেম্বর অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহী অফিসারদের ট্রায়াল শুরু করা হবে। লগ এরিয়া হেড কোয়ার্টারের তত্ত্বাবধানে ট্রায়াল হবে। চীফ্ বলেছেন, আপনাকে সব অভিযুক্ত অফিসারদের চার্জশীটগুলো সাইন করে বাকি ব্যবস্থা নিতে। আমি বললাম, দয়া করে এসব ট্রায়ালের ঝামেলায় আমাকে ফেলবেন না। এছাড়া আমি কেন এসব চার্জশীট সাইন করতে যাবো?

কিছুক্ষণ পরেই জিয়ার ফোন এলো, হামিদ, তোমরা কেন এরশাদের সাথে সহযোগিতা করো না? Culprit-দের চার্জশীট তোমাকেই সাইন করতে হবে। ট্রায়াল পরে দেখা যাবে। জিয়া ফোন করার পরদিনই লেঃ কর্নেল (অব:) আজিজ একগাদা 'তৈরি চার্জশীঠ' বগলদাবা করে আমার অফিসে এলেন এবং পাঁচ মিনিটেই সবগুলো সাইন করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পরবর্তীতে এ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার রউফ, শাফায়াত জামিল প্রমুখরা আমার উপর নাখোশ ছিল; তারা ভেবেছিল আমিই বুঝি তাদের চার্জশীট তৈরি করেছি। যদিও আসলে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেনাসদরে জে.এ.জি ব্রাঞ্চে এরশাদেরই তত্ত্বাবধানে।

এর ক'দিন পরই জিয়ার ফোন এলো, বললো– হামিদ, ৩ নভেম্বর চক্রান্তকারী ১১ জন অফিসারের কেন ট্রায়াল শুরু করছো না? বললাম, আমি তো তাদের চার্জশীট সই করে দিয়েছি। এখন তো এরশাদ ব্যবস্থা করবে। বলল, তাহলে তুমি ওদের গিয়ে দেখে আসো। ওদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা ঠিক নয়। গড়বড় আছে। আসলে ওরা ডি.জি.এফ.আই'র তত্ত্বাবধান ছিল শেরেবাংলা নগরে গণভবনে। তবু আমি জিয়ার কথায় তাদের দেখতে গেলাম। খারাপ লাগছিলো। সবাই চেনা মুখ। ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল মেজর হাফিজউদ্দিন, মে. জাফর ইমাম, মে. গাফ্ফার, মে. ইকবাল, মে. আমিন, মে. নাসের সহ আরও ক'জনকে তাদের সবার কথা মনে পড়ছে না। তাদের সাথে কথা হল। ট্রায়াল নিয়ে তারা চিন্তায় ছিল। কি হয়, কি না– হয়! সবাই তরুণ অফিসার। তাদের ছিল একগাদা অভিযোগ। খাট নাই। পালংক নাই, ফ্যান নাই, ভাল খানা নাই। আমরা একজন্যই কি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম? মেজর জাফর ইমামের কণ্ঠই সবাইকে ছাড়িয়ে। তাদের যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়ে ফিরে এলাম। (পৃষ্ঠাঃ ১৬৬-১৬৭)।

এই সময় ক্ষমতার আবর্তে জিয়া গভীরভাবে আটকে পড়েন। ক্ষমতায় বসেও শান্তি তে নেই জিয়া। চারিদিকে বিদ্রোহ, সৈনিকদের বিরুদ্ধাচরণ। ক্ষমতা নিরংকুশ করতে পাগল হয়ে ওঠেন জিয়া। তার অবস্থা ভাল করে বুঝতে পারে চতুর পার্শ্বচররা। তারা বুঝতে পারে জিয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। ক্ষমতার মসনদ থেকে সে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়তে পারে। তারপর কে, কে? ঐ মুহূর্তে জিয়ার পাদপার্শ্বে থেকে এরশাদ, শওকত ভয়ানক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে। এবার মঞ্জুও যোগ দেয়। প্রদীপের নীচেই চলে গোপন খেলা। জিয়া যতোই ক্ষমতার নিরকুশ করতে কঠোর হয়ে ওঠেন, তারা ততোই তাকে পরিণতির দিকে ঠেলতে থাকে। 'তিন খলিফার' মধ্যে নেপথ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে নিরবে, অতি সন্তর্পণে। জিয়া কালো চশমার আড়াল থেকে ব্যাপারটা কিছুটা অনুধান করলেও তখন তেমন পাত্তা দেননি। (পৃষ্ঠাঃ ১৭০)।

জিয়া এখন শক্ত প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। জাসদ-বিপ্লবীদের সাথে আর কোন আপোষ নয়। ধৈর্যের বাধ তার ভেঙ্গে গেছে। বিগড়ে গেলে জিয়া ভয়ংকর!

জিয়ার সাথে বিপ্লবীদের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। তাদের ভাষায়, জিয়া তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জিয়া কঠোরভাবে জাসদপন্থী বিপ্লবীদের ও বিপ্লবী সৈনিকদের দমন করতে নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো ধর-পাকড়। আমাকে জিয়া একদিন ডেকে বললেন, হামিদ, তোমার লগ এরিয়ার ইউনিটগুলোর শিক্ষিত সৈনিকেরাই সবচেয়ে বেশি গ গোল করছে। তুমি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। প্রতিটি ইউনিট থেকে নেতা গোছের সেপাই, এন.সি.ও-দের লিস্ট বানিয়ে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে বুঝালাম, এই মাত্র ক'দিন আগে সেপাই বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। এখনই এদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করলে আবার গ গোল শুরু হয়ে যাবে। আমরা দু-তিন মাস সময় নিয়ে এসব করলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। এখন শাস্তির চিন্তার বদলে কিছু 'ওয়েলফেয়ার' চিন্তাভাবনা করা উচিত। পরিস্থিতির কারণে এই মুহূর্তে soft লাইন গ্রহণ করা উচিত। কমান্ডার হিসাবে এটা আমার আন্তরিক সাজেশন। জিয়া মাথা গরম করে বলল, 'I don't take your sug-

gestion. No compromise with discipline. আমাকে অন্যান্য সিনিয়ার অফিসাররা আগেই বলেছে, তোমার দ্বারা সেপাইদের মধ্যে ডিসিপ্লিন আনা সম্ভব হবে না। তুমি 'পপুলার' হওয়ার চেষ্টা করছো। আমি ল্যাঙ্গারকে শায়েস্তা করেছি। তুমি পারো নাই। আমি বাকীদেরও সোজা করে ছাড়বো।'

আমি কিন্তু তার কথায় আমার অধীনস্ত সৈনিকদের বিরুদ্ধে গণ-চার্জশীট তৈরি করে শাস্তি প্রদানের ঘোর বিরোধী ছিলাম। জিয়া তখন অধীর অস্থির। বাছ-বিচার না করে ঢালাওভাবে সৈনিকদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। তার কাছে লগ এরিয়ার বিদ্রোহীদের লম্বা লিস্ট ছিল। তাকে শান্ত করার কেউ ছিল না। বরং চতুর পার্শ্বচররা তার মেজাজ বুঝে আরো ক্ষেপিয়ে দিল। আমি বহু অনুনয় বিনয় করেও তার উগ্র চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন করতে পারলাম না। জিয়া তখন বাঘের পিঠে ক্ষেপা সওয়ারী। (পৃষ্ঠাঃ ১৭১)।

প্রশ্ন ওঠে; জেনারেল জিয়া নিয়মতান্ত্রিক প্রফেশন্যাল আর্মির সেনাপ্রধান হয়ে কেন তাহেরের গোপন বিপ্লবী সংস্থার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন? সেনাবাহিনীর নীতিমালার দৃষ্টিতে এটা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল? তাহলে নভেম্বরের রক্তপাতের জন্য কি জিয়াই দায়ী? (পৃষ্ঠাঃ ১৭৯)।

সেপাই বিপ্লবে একমাত্র ব্যক্তি যিনি লাভবান হয়েছিলেন তিনি হলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার কিছু ধূর্ত পার্শ্বচর। সিপাহিদের তৎপরতায় একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নিরংকুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। ধূলিস্মাৎ হয়ে যায় মোশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র, খালেদ-শাফায়াত চক্র, ফারুক-রশিদ চক্র, এবং কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী গ্রুপ। জিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সৈনিকদের ব্যবহার করলেন তার নিজ স্বার্থে, নিজ ক্ষমতা সুসংহত করতে ও তার প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করতে। সফল হলো তার মিশন।

এবার একচ্ছত্র অধিপতি জিয়াউর রহমান।

ক্ষমতায় আরোহন করার পর জিয়া, সৈনিকদের প্রতি প্রদত্ত কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্ত বায়ন করলেন না। বিক্ষুব্ধ সৈনিকবৃন্দ। পরবর্তীতে তাদের উপর নৃশংসভাবে দমননীতির স্টীম রোলার চালিয়ে জিয়া হত্যা করেন দুই হাজারের অধিক সৈনিক ও বিমান সেনা। জেল জুলুম আর চাকুরিচ্যুতি ঘটে আরো হাজার সৈনিকদের।

হায়, ৭ নভেম্বর! অসংখ্য স্বজনহারা সেনা পরিবারের কান্না বিজড়িত এক ঐতিহাসিক দিবস ৭ নভেম্বর! এক আবেগময় বিপ্লবের মাধ্যমে সৈনিকরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের প্রিয় জেনারেলকে সিংহাসনে, কিন্তু প্রতিদানে তারা পেলো জেল, জুলুম, হত্যা, ফাঁসি, চাকুরিচ্যুতি, বিতাড়ন, নিপীড়ন। (পৃষ্ঠাঃ ১৮০-১৮১)।

জাসদ কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কোন লাভবান হয়নি। জিয়া তাদের ১২ দফা দাবী শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, জাসদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে নিধন চালানো হয়, তাতে হাজার হাজার জাসদ কর্মী গ্রেফতার হয়। ৭ই নভেম্বরে বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তাহেরের সাথে জেনারেল জিয়ার গোপন সমঝোতা সিপাহী বিপ্লবকে হিংসাত্মক রূপ দেয়। সেপাই বিপ্লবের একমাত্র ব্যক্তি যিনি লাভবান হয়েছিলেন

তিনি হলেন জিয়াউর রহমান এবং তার কিছু ধূর্ত পার্শ্বচর। সিপাহিদের তৎপরতায় একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। জিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সৈনিকদের ব্যবহার করলেন নিজ স্বার্থে ও তার প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করতে, সফল হলো তার মিশন। এবার একচ্ছত্র অধিপতি জিয়াউর রহমান। ক্ষমতা আরোহন করার পর জিয়া, সৈনিকদের কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করলেন না। পরবর্তীতে তাদের উপর নিশৃংসভাবে স্টিম রোলার চালিয়ে জিয়া হত্যা করেন ২০০০ অধিক সৈনিক ও বিমান সেনা। জেল, জুলুম, চলে আরো হাজার সৈনিকদের। হায়! ৭ই নভেম্বর! এক আবেগময় বিপ্লবের মাধ্যমে সৈনিকরা অধিষ্ঠিত করেছিলো তাদের প্রিয় জেনারেলকে সিংহাসনে কিন্তু প্রতিদানে তারা পেলো জুলুম, হত্যা ফাঁসি। চিফ অফ স্টাফের গদি দখল। [দ্রঃ ৬৭ পৃঃ]... ফারুক রশিদকে ধন্যবাদ তারা জিয়ার জন্য খুলে দিলো ভবিষ্যতের দ্বার। ক্যান্টমেন্টে উত্তেজনা। [দ্রঃ ৬৭ পৃঃ]..ক্যান্টনমেন্টে উত্তেজনা জিয়া মঞ্চ থেকে চিৎকার করে গর্জন করে সবাইকে জানিয়ে দিলো, আজ থেকে আমি চিফ অফ স্টাফ। সবাই হতবাক, একে অন্যের মুখ চাওয়া চায়ি করলো, আমি হাসলাম। নেপথ্যে জিয়ার ছিলো সাফায়েত জামিলের সাথে মধুর সম্পর্ক। জিয়া শাফায়েতের গোপন সম্পর্কের কারণে ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়াকে তার বাসায় শাফায়েতের ট্রুপসের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে আটকে রাখা হয়। গোপনে জিয়াকে চিফ রেখেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলো খালেদ মোশাররফ। [দ্রঃ জিয়ার শুদ্ধি অভিযান, পৃঃ ১৮৮]। বিদ্রোহী বিমান সৈনিকদের পাকড়াও করে ঢালাও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো। সংক্ষিপ্ত বিচারের সুবিধার জন্য মার্শাল আইন করে বিশেষ সামরিক আদালত করা হলো। এই সময়ে জেনারেল এরশাদ ছিলেন ডেপুটি চিফ। শুরু হলো ত্বরিত বিচারের নামে প্রহসনের পালা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে শত শত সৈনিক ও বিমান সেনাদের ফাঁসির আদেশ দেয়া হলো। সেনা বা বিমান বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠিত আইন এক্ষেত্রে মানা হয়নি। ৫টি কারাগারে একসাথে ৮/১০জন করে ফাঁসিতে ঝুলানো হতো। ফাঁসি ছাড়াও এলোপাথারি ফায়ারিং স্কোয়াডে মারা যায় শত শত। ঢালাওভাবে গ্রেফতারের পর অত্যাচারের ফলে বহু সৈনিকের মৃত্যু ঘটে অমানবিক নির্যাতনে। ৩ থেকে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিরাতে সেনা ও বিমানবাহিনী ব্যারাক থেকে সৈনিকদের ধরে নিয়ে যায় নির্যাতন ক্যাম্পে, আর ফিরে আসেনি। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে কান্নার রোল। কতো সৈনিক বিমান সেনা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুললো, গুপ্ত হত্যার শিকার হলো, হিসাব নেই সরকারি হিসাব মতে ফাঁসিতে লটকানো হয় ১১৪৩ জনকে যার মধ্যে বিমান সেনা ছিলো ৫৬১ জন। হতভাগ্য সৈনিকদের লাশ পর্যন্ত আত্মীস্বজনদের দেয়া হয়নি। অনেকের ধারণা এই হত্যা ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত এক নিধনযজ্ঞ। পাক-ভারতের ইতিহাসে এক সামরিক অভ্যূত্থানে এতো লোকের ফাঁসি আর কখনো ঘটেনি। এতো বড় মর্মান্তিক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি, কেউ দাবীও করেনি কি বিচিত্র এই দেশ! [দ্রঃ খলেদ আসলেন, পৃঃ ১৪১]। একজন ল্যাফটেনেন্ট জিয়াকে স্যালুট দিয়ে বললো, স্যার আপনাকে আমি খালেদ মোশাররফ, হুদা এবং হায়দারের মৃতদেহ উপহার দিতে এসেছি। তাকিয়ে দেখলাম, হায়দারের ভূড়িটা বের হয়ে গেছে... খালেদের আত্মীয়-

স্বজন সবাই ভীত, ফোন করে বললেন, যদি কবরটা খুড়ে দেয়া যায়, আমি তিনচারজন মালি পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। এভাবে শেষ হলো '৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধের কে ফোর্সের দুর্ধষ যোদ্ধা খালেদ মোশররফের শেষকৃত্য গোপনে সবার অগোচরে।

মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৩য় খ , স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৯৮৪। আমি মেজর জিয়া, মুক্তিযুদ্ধের সুপ্রীম কমান্ডার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। ২০০৪ সংস্করণ ৩য় খণ্ড, আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশের প্রভিনশনাল প্রেসিডেন্ট ও আর্মি চিফ হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করছি। (পৃঃ ১৭৬)।

জিয়ার শুদ্ধি অভিযান

এবার শুরু হল জিয়ার শুদ্ধি অভিযান। বিদ্রোহী বিমান ও সৈনিকেদের পাকড়াও করে তাদের নির্মমভাবে ঢালাও শাস্তি প্রদানের ববস্থা করা হলো। সংক্ষিপ্ত বিচারের সুবিধার্থে মার্শাল ল' আইন করে বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হলো। এই সময় জেনারেল এরশাদ ছিলেন ডেপুটি চীফ। তারই তত্ত্বাবধানে এসব সংক্ষিপ্ত ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। শুরু হলো তড়িৎ গতিতে বিচারের নামে প্রহসনের পালা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে কয়েক শত সৈনিক ও বিমান সেনাদের ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল। সেনা বা বিমান বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠিত আইন কানুন এ ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। পাঁচটি কারাগারেএক সাথে ৮/১০ জন করে পর্যায়ক্রমে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ফাঁসি ছাড়াও এলোপাথাড়ি ফায়ারিং-এ মারা যায় শতশত। ফায়ারিং স্কোয়াডেও বহুজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া ঢালাওভাবে গ্রেফতারের পর বহু সৈনিকের মৃত্যু ঘটে অমানবিক নির্যাতনে। ৩ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি রাতে সেনা ও বিমান বাহিনী ব্যারাক থেকে সৈনিকদের ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নির্যাতন ক্যাম্পে, তার আর ফিরে আসেনি। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে হাহাকার। কান্নার রোল। কত সৈনিক, বিমান সেনা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুললো, কতজন প্রাণ হারালো, 'গুপ্ত হত্যার' শিকার হলো, এর কোন হিসাব নেই। বিমান বাহিনীর কার্যক্রম ক্ষমতা নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। সরকারী হিসাব মতেই শুধুমাত্র দুই মাসে ফাঁসিতে লটকানো হয় ১১৪৩ জন সৈন্যকে, যার মধ্যে বিমান সেনাই ছিল ৫৬১ জন। হতভাগ্য সৈনিকদের লাশ পর্যন্ত তাদের আত্নীয়-স্বজনদের দেওয়া হয় নাই। তারা আজও খুঁজে ফিরে তাদের প্রিয়জনকে। কোথায় যে এত লাশ গুম করা হলো, তাও এক রহস্য। এটা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যাকা , না কি অভ্যুত্থান, তা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনেকেরই ধারনা, এটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিতএক নিধনযজ্ঞ। মধ্যরাতে সিগনাল লাইনস ও কুর্মিটোলা এয়ারফোর্স ব্যারাকে কে বা কারা শ্লোগান দিয়ে আহ্বান জানিয়ে শুরু করে বিদ্রোহ, তা আজও রহস্য।

পাক-ভারতের ইতিহাসে কোন সামরিক অভ্যুত্থানে এত লোকের ফাঁসি, হত্যা, প্রাণহানি, জেল আর কখও ঘটেনি। কি আশ্চর্য! এতোবড় মর্মান্তিক ঘটনার কখনও নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। কেউ দাবীও করেনি। কি বিচত্র এই দেশ! (পৃষ্ঠাঃ ১৮৮-১৮৯)।

***

মুজিব হত্যা প্রসঙ্গ : ফারুক-রশিদের সাক্ষাৎকার

এ্যান্থনী: মুজিবকে সরাবার প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে, তার স্থলাভিষিক্ত কাকে করা হবে সেই ব্যক্তিতকেও খুঁজে বের করতে হয়। তা কিভাবে করা হয়?

রশিদ: আমাদের প্রথম পছন্দ ছিলো জেনারেল জিয়া, এজন্য অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৭৫ সালের ২০শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। জেনারেল জিয়া বললেন, "আমি একজন সিনিয়ার অফিসার। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি জড়িত হতে পারি না। কিন্তু তোমরা, জুনিয়ার অফিসাররা আগ্রহী হলে, এগিয়ে যেতে পারো।' (পৃষ্ঠা: ১৯৫)।

প্রশ্ন: ১৯৭৫ সালের ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কে বেশি লাভবান হয়েছে বলে মনে করেন?

জবাব: জেনালের জিয়াউর রহমান, অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং উর্ধ্বতন সরকারি আমলারাই এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে। (পৃষ্ঠা: ২০৩)।

...অতৃপ্ত বাসনা, উচ্চাভিলাষ এবং লোভ জেনারেল জিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তিনি চাইতেন যে কোন মূল্যে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়া। যার জন্যে ৩রা নভেম্বরে বিদ্রোহের জন্য তিনি যে কেবল দায়ীই ছিলেন তাই নয়, বরং সে বিদ্রোহের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। (পৃষ্ঠা: ২০৪)।

প্রশ্ন: কর্নেল তাহেরের ভূমিকা ও পরিণতি সম্পর্কে আপনারা কি জানেন?

জবাব: জেনারেল জিয়া এবং মঞ্জুরের সাথে কর্নেল তাহেরের গভীর হৃদ্যতা ছিল। জেনারেল জিয়া কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জাসদের যোগাসাজশে তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্র করেন। জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর কর্নেল তাহেরকে নিঃশেষ করার পথ বেছে নেন। কেননা, তার মাধ্যমেই জাসদের সাথে জিয়ার যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। তিনি এতদসংক্রন্ত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ গায়েব করার সিদ্ধান্ত নেন। আর এই উদ্দেশ্যে (ক) জাসদের গণবাহিনীর হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো ও (খ) জাসদের সাথে রাজনৈতিক যোগসাজশ ধামাচাপা দেবার জন্য জেনারেল জিয়া হিংসাত্মক পথ বেছে নেন। কেননা, এই দুটো বিষয় প্রমাণ হলে জিয়ার রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠত। ১৫ই আগস্টের বিপ্লবের পর কর্নেল তাহের আমাদের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করতে আসেন। তিনি জিয়ার পক্ষ থেকে মোশতাককে অপসারিত করার প্রস্তাবও আমাদেরকে দিয়েছেন। মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করি, সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে জাসদ আমাদেরকে সকল বাকশালী চর নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। আমরা কর্নেল তাহেরকে আরো বলেছি, জাসদ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতেই চায় তাহলে জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। (পৃষ্ঠা: ২০৫)।

প্রশ্ন: ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের পরে আপনার ব্যাংকক থেকে কেন দেশে ফিরে এলেন না?

জবাব: ঐ সময় জিয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই অবহিত ছিলেন। আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে দু-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারতো। প্রথমতঃ জোর করে জিয়ার ষড়যন্ত্রের পক্ষে আমাদের সমর্থন করার চেষ্টা হতো, অথবা আমাদের সাথে জিয়ার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতো। আমরা যদি জিয়াকে সমর্থন করতাম তাহলে আমাদের মৌলিক নীতিমালাকে জলাঞ্জলি দিতে হতো। অবশ্য অন্য একটি পথও আমাদের জন্য খোলা ছিল। জিয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু ঐ সময়টিতে জাতি একটি সংকটকাল অতিক্রম করছিল। আমরা যদি জিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে অগ্রসর হতাম, তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে উঠতো। এ ধরনের সংঘাতকে এড়িয়ে চলার জন্যই আমরা সাময়িকভাবে দেশের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জিয়া এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন, নিজের ক্ষমতা সংহত করেছেন এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। (পৃষ্ঠা: ২০৬)।

***

জেল হত্যাকান্ড

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (১ম প্রকাশঃ ৩রা নভেম্বর '৯১)

জিয়ার চালে ভুল

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং ত্বরিত সরকার গঠনের সফলতা উচ্চাভিলাষী সেনা নেতৃত্বের বিশেষ করে মেজর জিয়ার নিকট ছিলো অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত। তিনি ওয়ার কাউন্সিল' গঠন করে তার প্রধানরূপে যুদ্ধ নেতৃত্বের শীর্ষস্থান দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনপ্রবাহ ভিন্ন গতিতেই প্রবাহিত হয়েছিলো। (পৃষ্ঠাঃ ৭)।

সামরিক বাহিনীর সেনাপতিরূপে তার বেতার ঘোষণা তার জন্য শুভ প্রতিক্রিয়া বয়ে অনেনি। জিয়াউর রহমান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন তার পক্ষে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অথচ আকাঙ্খিত পদটি দখল করা সম্ভব হবে না। কেননা ইতিমধ্যেই মেজর শফিউল্লাহ-খালেদ মোশাররফ সমঝোতামূলক ঐক্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মেজর শফিউল্লাহ ছিলেন খালেদ মোশাররফের কাছাকাছি লোক। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে চাকরিরত অবস্থায় জিয়াউর রহমানের বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহ সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় রাজনীতি সচেতন খালেদ মোশাররফের নিকট স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র নেতৃত্বদানে জিয়াউর রহমান ছিল অগ্রহণযোগ্য। মেজর শফিউল্লাহ-খলেদের সমঝোতায় আহত জিয়াউর রহমানের নিকট ঐ অবস্থায় কর্নেল ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক নেতৃত্ব প্রদানর বিষয়টিতে সম্মতি জ্ঞাপন ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। মেজর শফিউল্লাহর চেয়ে কর্নেল ওসমানী ছিলেন সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ফলে উপরে উপরে কর্নেল ওসমানীর প্রতি আনুগত্য দেখালেও জিয়াউর রহমানের মনে সব সময়ইএকথা জাগরুক ছিলো, উঠতি সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে তিনি সিনিয়র ও যোগ্য এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তারই প্রাপ্য। (পৃষ্ঠাঃ ৮)।

১৯৭৫এর নভেম্বরে তিনজন সুপ্রীম কোর্ট জজের সমন্বয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেই সরকার 'খালাস' পান। কিন্তু জেনারেল জিয়া, তাঁর সাড়ে পাঁচ বছর শাসনকালে ঐ তদন্ত কমিশনকে তাঁদের কাজ পরিচালনা করতে সম্মতি দেন নি। (পৃষ্ঠাঃ ৩৫)।

সায়েম সাহেব জবাব দেবেন কি?

সাবেক প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম 'এ্যাট বঙ্গভবনঃ লাস্ট ফেজ' (At Banga Bhaban: Last phase) নামক একটি বই লিখেছেন। সেই বইতে জিয়াউর রহমান কিভাবে তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় তার নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত হলেও অনুপার্বিক বর্ণনা আছে।

প্রেসিডেন্ট সায়েমের বই পড়লে প্রমাণিত হবে তিনি নন, ক্ষমতার কেন্দ্র ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং তার শীর্ষ বিন্দুতে ছিলেন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া। (পৃষ্ঠাঃ ৩৭)।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

১৯৭৭ সনের ৪ঠা এপ্রিল হতে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিবর্গ এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন ১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বর শেষ মুজিবের ঘনিষ্ঠ চারজন সহচর যাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল তাদের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশিনকে সভা বৈঠক ডাকার অনুমতি দেয়া হয়নি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট মি. সীন ম্যাকারাইড বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেল হত্যাকা সম্পর্কে জানতে চান। তাকে বলা হয়, আইন নিজস্ব গতিতে চলবে। (পৃষ্ঠাঃ ৩৮)।

কিন্তু আইন নিজস্ব গতিতে চলেননি

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে জেল হত্যাকা সম্পর্কিত বিষয়টিকে 'কোল্ড স্টোরেজে' পাঠানো হয়। যদিও বর্হিবিশ্বে মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে বলা হচ্ছিলো যে, আইন নিজস্ব গতিতে চলছে। তদন্ত হচ্ছে। কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। এবং এন্থনী মাসকার্নহাসের মতে তদন্তকার্যের বিষয়টি সি.আই.ডি-র নিকট ফাইলবন্দী। (পৃষ্ঠাঃ ৩৮)।

জিডির ফাইল গায়েব

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, লালবাগ থানায় জাতীয় চার নেতা সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহমেদ, এম. মনসুর আলী, এবং এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানের হত্যাকা সম্পর্কিত জিডি করা হয়েছিলো কারা কর্তৃপক্ষ হতেই। অনুসন্ধানে জানা গেছে, তা বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং এ কাজটি হয়েছে ৮০ সনের মধ্যেই। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লালবাগ থানায় জিডিসহ কোন প্রকার কাগজপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। জাতীয় ইতিহাসের কলংকময় এই ঘটনার কাগজপত্র বিনষ্ট বা উধাও করার হীন প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্তাব্যক্তি জড়িত তারা কেন এটা করেছেন বা করার নির্দেশ দিয়েছেন তারও ইনকোয়ারি হওয়া প্রয়োজন। (পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৩৯)।

জিয়ার রহস্য : সদর্প নিষ্ঠুরতা

জেল হত্যাকাণ্ড নিয়ে জিয়াউর রহমানের রহস্যজনক আচরণ একটি বিশেষ সময়ে সদর্প নিষ্ঠুরতায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ল নে প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার থমাস উইলিয়ামস এম,পি কুইন্স কাউন্সিল মি. সীন ম্যাক রাইড, মি.

জেফরী থমাস কুইন্স কাউন্সিল এম,পি এবং মি. আরবে রোজ সমম্বয়ে গঠিত হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যা সম্পর্কিত তদন্তকমিটি। তদন্ত কমিটির পক্ষ হতে বৃটিশ এম,পি জেফরী থমাস ৯৮১ সনের জানুয়ারীতে তদন্ত সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশে আসতে চাইলে জিয়াউর রহমান সরকার তাদের ভিসা দিতে অস্বীকার করেন।

শুধু তাই নয়, ৩রা নভেম্বর সংঘটিত জেলহত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করে ১৯৮০ সনের ৩রা নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমগ্র দেশে হরতাল আহ্বান করে। জেল হত্যাকা ের বিচারের দাবীতে আহুত হরতালকে ব্যর্থ করার জন্য জিয়াউর রহমানের সরকার ও তার দল সমগ্র বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

ঐদিন জিয়াউর রহমানের সরকারী সন্ত্রাসে দু'জন রাজনৈতিক নেতা নিহত হন। পুলিশ ও বিএনপি পেটোয়া বাহিনীর হাতে আহত হন ১৫০ জন। এবং গ্রেফতার হন ২৫০ জনের মতো।

সেদিনই মিছিলের উপর জীপ তুলে দিয়ে বিএনপি কর্মীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং হকিস্টিক তুলে দিয়ে এক বল্গাহীন সন্ত্রাস কায়েম করা হয়। জেলহত্যাকাণ্ডের মতো একটি ঘটনার বিচারের দাবীতে আহূত হরতালে জিয়াউর রহামন কেন এমনভাবে বেসামাল হয়ে পড়েছিলো?

জেলহত্যাকাণ্ডের মতো একটি নৃশংস ঘটনা যা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী, অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক তার স্বপক্ষে জিয়াউর রহমানের কার্যক্রম ইতিহাসে শুধু ঘৃণার উদ্রেকই করবে না বরং তাকেও হত্যাকারীদের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করবে। সুতরাং বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার যদি গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে নিজেদের দাবী করে তাহলে অবশ্যই বর্তমান সরকারকে স্বীয় উদ্যোগে জেলহত্যাকা ের মতো জঘন্য নজিরবিহীন হত্যাকা ের বিচার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯)।

***

একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়
(৫ম মুদ্রণ ১৯৯২)

পুনর্বাসিত শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ:

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাক সামরিক বাহিনী এদেশে বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ এতটা ভয়াবহভাবে চালাতে পারত না, যদি না তারা এদেশীয় কতিপয় দালাল ও বিশ্বাসঘাতককে দোসর হিসেবে পেতো। এই বেঈমানরা আগে থেকেই এদেশে ছিল।

পাকবাহিনী তাদের এই গণহত্যাযজ্ঞে সক্রিয় সহায়তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনবিচ্ছিন্ন, উগ্রপন্থী, ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলিকে দোসর করে নেয়। ২৫ মার্চের কালরাতের আগই এসমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পাক সামরিক জান্তার সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে। ২৫ মার্চের পর রাজধানী ঢাকায় স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রকাশ্য আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেলে এই দালালরা প্রকাশ্যে মাঠে নেমে পড়ে।

৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে,সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' সমাধা হবার পর, 'খ' অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক 'বেলুচিস্তানের কসাই' লে. জে. টিক্কা খানের সাথে পি.ডি.পি প্রধান নূরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ জন বিশিষ্ট দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী নেতা সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আজম, মৌলভী ফরিদ আহমদ, খাজা খায়েরুদ্দিন, এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম, মাওলানা নূরুজ্জামান প্রমুখ। প্রতিনিধিদল টিক্কা খানকে অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসন সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। [পূর্বদেশ, ৫/৪/৭১]।

জিয়াউর রহমানের আমলে রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন অবদুল আলীম। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জয়পুরহাট শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। নিরপরাধ বাঙালিদের সম্পর্কে সে সময় তার কি মনোভাব ছিল তা বুঝবার জন্য এখানে ১৮ জানুয়ারী ১৯৭২ সালের দৈনিক বাংলায় একটি বক্স আইটেম– 'হানাদার বাহিনীর বর্বরতা মধ্যযুগীয় নরঘাতকদেরও হার মানিয়েছে' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল:–

'জয়পুরহাট শান্তি কমিটির নেতা জয়পুরহাট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুসলিম লীগের আবদুর আলীমকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার নিশ্চয়ই আর কোন বাধা নেই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ওদের ক্ষমা নেই। ওরা দেশে ফিরলেই ওদের সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হবে। শুনে স্তম্ভিত হতে হয়েছে। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এরকম ধারণা পোষণ করে তবে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দালালদের কি রকম মনোভাব ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ ইয়াহিয়া খানের লোক দেখানো ক্ষমা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু ফিরে এসেছিল তাদের আর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে হয় নি।' (পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯)।

ঘাতকদের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে জামাতে ইসলমীর পুনর্বাসন হয়েছে দু'টি ধারায়। ১৬ ডিসেম্বরের পর জামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ধরা পড়েন, অন্যরা আত্মগোপন করে থাকেন ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সময় পর্যন্ত।

গোলাম আজম ও মাওলানা আবদুর রহিমসহ জামাতে ইসলামীর যে সমস্ত নেতা ১৬ ডিসেম্বরের আগেই দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছিলেন, তারা প্রথমতঃ পাকিস্তনে গিয়ে

মিলিত হন। সেখানে প্রথমে গোলাম আজমের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার সপ্তাহ' পালন করা হয়। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় সে সময় ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। গোলাম আজমের কার্যকলাপ তখন সেখানে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এ সময় জামাতে ইসলামী দলের মূল নেতা মাওলানা মওদুদী গোলাম আজম, আবদুর রহিম প্রমুখকে হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে সৌদি আরবে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বিমানে আরোহণ করার আগে মাওলানা কাওসার নিয়াজী, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ পাকিস্তানি নেতা গণহত্যা নয় এই সমস্ত ব্যক্তিদের পালিয়ে যাওয়ায় বাধা সাধেন। করাচী বিমান বন্দরে এদেরকে নামিয়ে আটক করা হয়। মওলানা মওদুদীর হস্তক্ষেপে এদেরকে পরে সৌদি আরব যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

গোলাম আজম কতিপয় অনুসারীকে নিয়ে সৌদি আরব যাবার পর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একটি ভূয়া প্রতিষ্ঠানের নামে বিজ্ঞাপন দেন। এ্ই বিজ্ঞাপনে 'পূর্ব পাকিস্তানে' 'মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে' 'হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে' ইত্যাদি ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করে ইসলাম রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের আবেদন জানানো হয়। এ সময় জামাতীরা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে ; আজও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে জামাতে ইসলামীর বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য জাতীয় তহবিল সংগ্রহ কমিটি রয়েছে। গোলাম আজম অর্থ সংগ্রহ এবং বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার চালানোর জন্য এসময় দুবাই, আবুধাবী, কুয়েত, বৈরুত সফল শেষে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন চলে যান।

এদিকে ১৬ ডিসেম্বরের পর জামাতের অন্যান্য নেতা ও কর্মী বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগ মিলিত হন লন্ডনে। ১৭ মে ১৯৭২ তারিখে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'জামাতীরা এখন লন্ডনে' শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি বের হয় তা থেকে এ সময়ে লন্ডনে অবস্থানরত জামাতীদের কার্যকলাপের একটি ধারনা পাওয়া যেতে পারে। প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়– 'বাংলাদেশে তাড়া কেয়ে মওদুদী জামাতীরা এবার গিয়ে উঠেছে লন্ডনে।' তারা নাকি বেশ জেঁকে বসেছে সাত সাগরের ওপারে। আর তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের দফতর খোলা হয়েছ বিচিত্র নগরী লন্ডনে। সেখান থেকেই আবার প্রকাশিত হচ্ছে 'সংগ্রাম'।

'দৈনিক সংগ্রাম' ছিল এখানকার জামাতে ইসলামীর মুখপাত্র। ইয়াহিয়ার আমলে ঢাকা থেকে বের করা হয় এই কুখ্যাত পত্রিকাটি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাতারাতি 'সংগ্রাম' বের হওয়ায় জনমনে দেখা দেয় বিরাট জিজ্ঞাসা। জামাতীরা এত টাকা পেল কোত্থেকে? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব পেতেও দেরী হলো না। পত্রিকাটির গণবিরোধী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা দেখেই জনগণ বুঝে নিলেন এদের মুরুব্বী কারা। দুনিয়া দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নসাৎ করার জন্য যে গৌরী সেনরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে, 'সংগ্রামগোষ্ঠীর' টাকা আসে সেই একই সূত্র থেকে। লন্ডনে 'সংগ্রাম' প্রকাশের এবং জামাতীদের ইসলামী দফতরের অর্থও যোগায় কি এই ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা।

'গত কিছুদিন থেকে বাংলাদেশে 'সংগ্রাম' এর কপি আসছে। বিমানযোগে অসা এসব কপিতে প্রাপকের নাম থাকে না। শুধু থাকে স্কুল, কলেজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের নাম। অবশ্য সুদূর লন্ডন থেকে আসলেও 'সংগ্রাম'এর কপিগুলো বিলি করা হত না। কর্তৃপক্ষ সেগুলো আটক রেখেছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে যাতে বিমানে এসব না আনা হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।'

গোলাম আজম লন্ডনে আসার পর থেকে শুরু করেন ফেলে যাওয়া দলের সংগঠন প্রক্রিয়া। এদিকে হজ্জ্ব পালনের পর '৭৩ সালেই মওলানা আবদুর রহিম প্রত্যাগমন ফ্লাইটে দেশে ফিরে আসেন। গোলাম আজমের অবর্তমানে তিনি বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন। গোপনে কাজ চলতে থাকে।

১৯৭৩ সালেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে মতামত আহ্বান করেন। এ উপলক্ষে জামাতে ইসলামীর মজলিশে শুরার বৈঠকে দু'জন সদস্য ছাড়া সবাই স্বীকৃতিদানের বিরোধিতা করেন।

এসময় দেশের ভেতরে জামাতীদের গোপন সাংগঠনিক কাজ জোরে শোরে চলতে থাকে। কিছু সংখ্যক নেতা মওলানা এবং আলেম সেজে বিভিন্ন ধর্মীয় জলসায় ওয়াজ করে জনসংযোগের কাজ করতে থাকেন।

১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন জানাতে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোলাম আজম লন্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার দরখাস্ত করেন। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে তিনি আবার দরখাস্ত করেন। ২০ মার্চ ১৯৭৮ সরকার তাকে নাগরিকত্ব দানে অস্বীকার করে। ১১ জুলাই ১৯৭৮ তিনি পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন; অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য 'মানবিক কারণে' তাকে তিন মাসের ভিসা দেয়া হয়।

সেই থেকে তিনি ঢাকায় মগবাজারে বাড়িতে বসবাস করছেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সরকার তাকে দেশ থেকে বের করে দিতে পারে নি।

গোলাম আজম দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে জামাতের পুনর্গঠনের কাজ ত্বরিৎ গতি লাভ করে। ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আলবদরবাহিনী হাই কমান্ডের নেতৃত্বে ইসলামী ছাত্র শিবির নামে অঘোষিত ছাত্র অঙ্গদল গঠন করা হয়।

এরপর ঘটে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে লাঞ্ছিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থান ঘটে।

২৫, ২৬, ২৭ সে ১৯৭৯ ঢাকায় তথাকথিত একটি কনভেনশনের মাধ্যমে জামাতে ইসলামীর পুনরার্বিভাব ঘটে। গোলাম আজমকে গোপনে আমীর নির্বাচিত করে আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর বানানো হয়।

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ প্রথমবারের মতো বায়তুল মোকাররমে জামাতের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে দলের পক্ষে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস

আলী খান বলেন, '১৯৭১ সলে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য যা করেছি, ঠিকই করেছি, ভারতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য।'

২৯ মার্চ '৮১ তারিখে আব্বাস আলী খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে '৭১এ আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি' এবং একাত্তরে 'বাংলাদেশ কনসেপ্ট ঠিক ছিল না' বলে মন্তব্য করেন।

অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলো স্বাধীনতার বাস্তবতাকে মেনে নিলেও জামাতে ইসলামী নিশ্চিতভাবেই আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে নি; একাত্তরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তাদের কি ধারণা তা বোঝাবার জন্য এখানে সাপ্তাহিক ১৭ এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যার 'একাত্তরে আমরা ভুল করিনি, গোলাম আজম ও জামাতের রাজনীতি' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৯৭১ সনের শেষ দিকে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ব্যাপী এক জরীপ কাজ চালায়। জরীপের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কতজন মুত্তাফিক কর্মী ও রোকন মারা গেছে তা জানা।

'রিপোর্টের একস্থানে বলা হয়:- 'আমাদের বীর সাথীরা জীবন দিয়েছে তবুও তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের (জারজ সন্তান) কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। কুষ্টিয়ার এক গ্রামে তথাকথিত এক রোকনের মৃত্যু সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়:- আমাদের দু'জন সাথীর বিশ্বাসঘাতকতার দরুন জারজ সন্তানরা হত্যা করতে পেরেছে, না হলে সেটা সম্ভব হতো না।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং একাত্তরের নিযুত শহীদদের আত্মদানকে জামাত আজও কি চোখে দেখে তা বোঝা যাবে দলের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের একটি বক্তব্যে। ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারী সংখ্যা পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, আব্বাস আলী খান করাচী সফরকালে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের কারণে অনুতপ্ত।'

১৯৭১ সালের জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পর নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়। ১৯৭৩ সালের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর পাকিস্তান জামাতে নায়েবে আমীর (সহ-সভাপতি) মওলানা আবদুর রহিম বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি মোটামুটিভাবে বাংলাদেশকে যে আর পাকিস্তানের অধীন করা যাবে না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হন। অন্যদিকে গোলাম আজম তখনও পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন 'পূর্ব পাকিস্তানে মসজিদ দখল করে হিন্দুদের দিয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসুল্লীদের হত্যা করা হচ্ছে' ইত্যাদি। পাকিস্তানে থাকাকালীন ১৯৭২ সালেই গোলাম আজম এবং মওলানা আবদুর রহিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। '৭৩এ দেশে ফিরে আবদুর রহিম গোপনে জামাত কর্মীদের সংগঠিত করতে থাকেন। তখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধ থাকায় তিনি দলকে প্রকাশ্যভবে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে পারছিলেন না। ১৯৭৬ সালে শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে

নেয়া হয়। ২৪ আগস্ট ১৯৭৭ সালে ছয়টি 'ইসলাম পছন্দ' ঘোরতর স্বাধীনতা বিরোধী নেজামে ইসলাম প্রধান ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য মওলানা সিদ্দিক আহমদ হন দলের সভাপতি, মওলানা রহিম সহ-সভাপতি। এই দলে আবদুর রহিমের নেতৃত্ব স্বীকারকারী প্রাক্তন জামাত কর্মীরা প্রবল হলেও নিষিদ্ধ ঘোষিত পি,ডি,পি, খেলাফতে রাব্বানী, ডেমোক্রেটিক পার্টি ইত্যাদির দল ত্যাগকারী কর্মীরাও একত্রিত হয়। সুতরাং একথা নিশ্চিত, অন্যান্য প্রায় সমস্ত ইসলামপছন্দ দলগুলোর মতই এই দলেরও তিরিশোর্ধ কর্মীদের বেশিরভাগই একাত্তরের শান্তি কমিটির সদস্য রাজাকার ও আলশামস; অবশ্য আলবদর নয়, কারণ মওদুদী গোলাম আজমের অন্ধ অনুগত আলবদর অর্থাৎ ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রত্যেক নেতা ও কর্মী পুরনো নাম থেকে শুধু সংঘ বাদ দিয়ে সমবেত হয় ইসলামী ছাত্র শিবিরে। (পৃষ্ঠাঃ ৬১-৬৪)।

ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তার পুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে একক পরিবার হিসেবে সবচেয়ে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে কনভেনন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর (ফকা চৌধুরী) পরিবার। তার বাড়ি ও স্বউদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলখানাটি ছিল বাঙালি নিধনের কসাইখানা। এখানে অসংখ্য নিরাপরাধ বাঙালিকে অকল্পনীয় অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। সারা চট্টগ্রামে ফকা চৌধুরী ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। স্বাধীনতার পরপরই ফকা চৌধুরী তার দুই ছেলে ও অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ৭ লক্ষ টাকা ও দেড় মনু সোনাসহ একটি ট্রলারে করে সপরিবারে বার্মা পালানোর সময় চালক কৌশলে মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে ট্রলারটি আটক করান। ফকা চৌধুরী বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে হার্টফেল করে মারা যান। ফজলুল কাদের চৌধুরী পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ার পর ৮ জানুয়ারী '৭১ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ফকা চৌধুরী দেড় মণ সোনাসহ পালাচ্ছিল' শিরোনামযুক্ত প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলঃ-

'...জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ২৫শে মার্চের পর থেকেই চাটগাঁয়ে অত্যাচারের যে স্টীমরোলার চালিয়েছিলেন, আইখ্‌ম্যান বেঁচে থাকলে এই অত্যাচার দেখে নিশ্চয়ই তাকে স্যালুট দিতেন। ২৬শে মার্চের পর থেকে আত্মসমর্পণের কয়েকদিন আগ পর্যন্ত তার বাসায় সবসময় মোতায়েন থাকত পাকবাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য। ফজলুল কাদের চৌধুরীর অনুচরেরেরা চাটগাঁর বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনত নিরাপরাধ লোকজন আর ছাত্রদের। তারপর এদের হাত পা বেঁধে গিরায় গিরায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটানো হত। তার বাসায় নির্মম অত্যাচারের এতসব কায়দা ও ব্যবস্থা ছিল যে নিরোর যুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি নিশ্চয়ই প্রভোস্ট মার্শালের পদ পেতে। তার যাসায় এনে নির্মমভাবে পিটানো হয়েছে মরহুম ডক্টর সানাউল্লার এক ছেলেসহ চাটগাঁর কয়েকশ' ছাত্রকে। জুলাই মাসের ১৭ তারিখের রাতে ফকা চৌধুরী পাকবাহিনীর সৈন্য নিয়ে ছাত্রনেতা ফারুকের বাসা ঘেরাও করে পাক সৈন্যের দ্বারা ফারুককে হত্যা করায়। ২৫শে মার্চের পর থেকে চৌধুরীর অনুচরেরা বলে বেড়াত যে ইয়াহিয়া খান চৌধুরীকে পাকিস্তান রক্ষার

জন্য লে. জেনারেল পদে ভূষিত করেছে। বর্ডারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে পাকবাহিনী সব সময় চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

'জনাব ফজলুল চৌধুরী সাহেবের গুড হিলস্থ বাসায় আজ স্থাপিত হয়েছে মুক্তিফৌজের শিবির পোল্যান্ডের লোকেরা নাৎসী বন্দী শিবির ডাচভিয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আজও যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চৌধুরীর বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাটগাঁয়ের লোকেরা অনুরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ ২৫শে মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত ওটি ছিল নির্মম অত্যাচারের কেন্দ্র।'

ফজলুল কাদের চৌধুরীর দুই ছেলে সালাউদ্দিন কাদের ও গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী আজ জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত; দুইজনেই জাতীয় সংসদ সদস্য। দলবল নিয়ে এসময় এই দুই ভাই বাঙালিদের ধরে এনে নৃশংস অত্যাচার চালাতেন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর অসংখ্য অপকর্মের দু'একটি দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করছি।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শ্রী কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় এবং কণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর বাবু রতুন চন্দ্র সিংহের হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিল সালাউদ্দিন কাদের। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন কুণ্ডেশ্বরী ভবনে। এদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখ। পাকবাহিনী চট্টগ্রাম দখলের পর এরা সবাই ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। বাবু রতুন সিংহকেও যাওয়ার কথা বলেছিলেন সবাই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যদি মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরব।' পরিবারের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে কু শ্বরী মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। পাক সেনা আসতে পারে অনুমান করে উঠোনে চেয়ার টেবিলও সাজিয়ে রেখেছিলেন।

১৯৭১ সনের ১৩ এপ্রিল চারটি ট্যাঙ্কসহ দুটি জীপে করে পাকবাহিনী কুণ্ডেশ্বরী ভবনে আসে। এর একটিতে বসেছিল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। অধ্যক্ষ মথুন চন্দ্র পাকসেনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের কাজকর্ম ব্যাখ্যা করেন। সন্তুষ্ট হয়ে পাকসেনারা জীপে চলে আসে, কিন্তু সালাউদ্দিন কাদের তাদের জানান যে তার বাবার আদেশ আছে 'মালাউন রতুন চন্দ্র ও তার ছেলেদের মরে ফেলার জন্য।'

এরপর মন্দিরের বিগ্রহের প্রার্থনায় নিমগ্ন সত্তর বছরের মহাপ্রাণ রতুন চন্দ্র সিংহকে সালাউদ্দিন টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসেন। প্রথমে ট্যাংকের গোলার আঘাতে তার বহু কষ্টের গড়া বিদ্যামন্দির উড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর পাকবাহিনীর মেজর তাতে ৩টি গুলি করে। একটি গুলি তাঁর চোখের নীচে বিদ্ধ হয়, একটি গুলি তাঁর হাতে লাগে এবং তৃতীয়টি তাঁর বুক ভেদ করে চলে যায়। তিনি চিৎকার দিয়ে তাঁর মায়ের নাম নিয়ে মাটিতে মুখ থুবরে পড়ে যান। মেজরের ৩টি গুলির পর সালাউদ্দিন চৌধুরী রিভলবারের ৩টি গুলি ছোঁড়েন তাঁর দিকে।

খুনিরা চলে যাবার পর তাঁর লোকজনেরা এসে শবের ওপর একটি নতুন আচ্ছাদন দেয়। পাকসেনারা ফিরে এসে এই কাপড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলে। পাকসেনারা চলে যাবার পর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে আত্মগোপনকারী লোকেরা মৃতদেহের উপর

শতরঞ্চি ঢাকা দেয়। পাকসেনারা আবার ফিরে এসে এই আবরণ সরিয়ে দেয়। এভাবে ৩ দিন মৃতদেহ সেখানে পড়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প প্রণীত পনের খণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থে কিভাবে দালালদের ভূমিকা চেপে যাওয়া হয়েছে তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে এ'টি। ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল রতুন চন্দ্র সিংহের মৃত্যু বার্ষিকীতে দৈনিক বাংলায় বিশেষ নিবন্ধ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ছাপায়। সেখানে হত্যাকারী হিসেবে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম ছাপ হয়েছিল। 'কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরীর বড় ছেলে সালাউদ্দিন (যে নাকি এখন লন্ডনে)' এভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে এই প্রতিবেদনটি মুদ্রিত করে সূত্র হিসেব সন তারিখসহ দৈনিক বাংলার নামোল্লেখ করা হয়; শুধু 'কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরীর বড় ছেলে সালাউদ্দিন' কথাটি তুলে দিয়ে লেখা হয় 'জনৈক সালাউদ্দিন'।[১]

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা জহিরুদ্দিন আহমদের দ্বিতীয় পুত্র নিযামুদ্দিন আহমেদকে ১৯৭১ সালের ৫ জুলাই ফকা চৌধুরীর গুণ্ডাবাহিনী অন্দারকিল্লা বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরে নিয়ে যায়। ধরা পরার পর নিযামুদ্দিনকে ফকা চৌধুরীর নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে ফকা চৌধুরীর গুণ্ডা বাহিনী তার ওপর ৮ দিন ধরে নির্মম নির্যাতন চালায়। বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলমের 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'রক্ত আগুন অশ্রুজল স্বাধীনতা' অধ্যায় থেকে নিযামুদ্দিনের জবানবন্দীর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল, ' আমি ধরা পড়ি ৫ জুলাই। আমাকে ফজলুল কাদেরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাউদ্দিন, অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড় লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। পাঁচ ঘণ্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৬ জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১ টায় আমাকে স্টেডিয়ামে চালান দেয়া হয়। এ পর্যন্ত আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি, পানি পর্যন্ত না। পানি খেতে চাইলেও বলা হয়েছে:- 'তুই শালা হিন্দু হয়ে গেছিস, তোকে পানিও দেওয়া হবে না।' ১৩ই জুলাই আমাকে জেলখানায় সোপর্দ করা হয়।[২] এরপর পর থেকে ১৮ই নভেম্বর মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত পাকবাহিনী নিযামুদ্দিনের ওপর মির্মম অত্যাচার চালায়।

এই গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে যে, ১৩ এপ্রিল তারিখেই সালাউদ্দিন কাদেরের নেতৃত্বে ফকা চৌধুরীর গুণ্ডাবাহিনী গহিরার চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে তাঁর পুত্র কলেজ ছাত্র ও ছাত্রীকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে ও তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বর্তমানে মন্ত্রী এরশাদ সভার সদস্য সালাউদ্দিন কাদেরের এই 'ধর্মরক্ষা অভিযানের' আরও বহু ঘটনা রয়েছে। তার অনুজ গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী সম্পর্কেও এধরনের নির্যাতন চালানোর অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। (পৃষ্ঠাঃ ৭৪-৭৬)।

---

[১] বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্র ঃ ৮ম খ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১ম সংস্করণ। জুন ১৯৮৩, পৃঃ ৫৬৭।

[২] বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত ঃ মাহবুব-উল-আলম, নয়ালোক প্রকাশনী আলমীন, কাজীর দেউরী সেকেন্ড লেন, চট্টগ্রাম, পৃঃ৬৯।

মওলানা আব্দুল মান্নান

...প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. আলীম চৌধুরীর হত্যায় মওলানা মান্নানের হাত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৯, পুরানা পল্টনে ডা. আলী চৌধুরীর দোতলা বাড়ির একতলায় তাঁর ক্লিনিক ছিল। প্রতিবেশী দালাল প্রাক্তন স্পীকার এ.টি.এম.এ মতিন জোর করে ক্লিনিক তুলে দিয়ে সেখানে মালানা মান্নানকে ভাড়া দিতে ডা. আলীমকে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় যখন আলবদররা একটি মাইক্রোবাসে করে ডা. আলীম চৌধুরীর বাড়িতে আসে তখন প্রথমে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন নি। তার কারণ সশস্ত্র আলবদররা সব সময় নীচ তলায় মওলানা মান্নানের কাছে আসা যাওয়া করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কলিংবেল বেজে উঠলে প্রথমে আলীম চৌধুরী বিমূঢ় হয়ে যান। ইতিপূর্বে ডা. আলীম চৌধুরী এ ধরনের একটা কিছু আচঁ করে বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা মান্নান তাঁকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধা দেন। নিরাপত্তার আশ্বাস দয়ে মওলানা মান্নান বলেন, ব্রিগেডিয়র বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এরা তার বন্ধু। আলবদরের ছেলেরা তার ছাত্র। যদি তারা আসে তাহলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

লুঙিপরা অবস্থায় আলীম চৌধুরী নীচে নেমে মওলানা মান্নানের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। এমনিতে মওলানা মান্নানের দরজা সব সময় খোলা থাকত, কিন্তু সেদিন ছিল বন্ধ। ডা. চৌধুরী ক্রমাগত অসহিষ্ণুভাবে দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে মাওলানাকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মওলানা মান্নান ভেতর থেকে বলেন, 'ভয় পাবেন না, আপনি যান, আমি আছি।'

এরপর ডা. চৌধুরী ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়ান। এ সময় জামাতী গুণ্ডারা বলে ওঠে, 'হ্যান্ডস আপ, আমাদের সাথে এবার চলুন। তারা সেই অবস্থায়ই ডা. চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যায়। পরে রায়ের বাজার বধ্যভূমি থেকে তাঁর গলিত বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়।

মওলানা মান্নানের সাথে অবশ্য বুদ্ধিজীবী হত্যার অন্যতম নায়ক ব্রিগেডিয়ার কাসেম ও ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের সম্পর্ক ছিল। আলীম চৌধুরী হত্যার মাসখানেক আগে ঈদের দিন রাত আড়াইটায় এই দুজন অফিসার 'দাওয়াত খেতে' এসেছিল বলে জানা গেছে।

ডা. আলীম চৌধুরীকে নিয়ে চলে যাবার পর তাঁর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী নীচতলায় এসে বহু অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু তখনও তাকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, ডাক্তার সাহেবকে রোগি দেখাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

'৭১এর ডিসেম্বরে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'সেই তিন শয়তান কোথায়?' শিরোনামে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের ৮ম খণ্ডে ও ঘটনা সঙ্কলিত হয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর মওলানা মান্নানকে রমনা থানায় সোপর্দ করা হয়, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তিনি আত্মগোপন করে।

দৈনিক আজাদে ৭-৫-৭২ তারিখে মওলানা মান্নানের ছবি ছেপে নীচে 'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় 'মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, ইসলামিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং আইয়ূবী আমলের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, শর্ষিনার পীরের একনিষ্ঠ ভক্ত, আই.ডি.পি'র সভাপতি এবং ইয়াহিয়ার তথাকথিত পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী, নিয়াজী-ইয়াহিয়া-ফরমান চক্রের অন্যতম দোসর, রাজাকার বদর বাহিনীর অন্যতম সংগঠক, ইয়াহিয়া জঙ্গী বাহিনীর উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের তোষামোদকারী খেদমতগার, অসংখ্য বাঙালির হত্যাযজ্ঞের পরামর্শদাতা ও বাড়িঘর ধনসম্পত্তি নষ্টের সংগঠক, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার ফদিরগঞ্জ থানার তথাকথিত মওলানা আব্দুল মান্নান আজও ধরা পড়ে নাই। সে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। তাহারই কারসাজিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার তিন মাস পর ফরিদগঞ্জ রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ফরিদগঞ্জ থানার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগার আব্দুল মজিদ এবং ২৯/১ পুরানাপল্টনস্থ ডা. আলীম চৌধুরীকে হত্যার পিছনে তার হাত ছিল। তাকে ধরিয়ে দিন।'

এককালে মুসলিম লীগের সমর্থক আজাদ পত্রিকা পর্যন্ত মওলানা মান্নানের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতাকে কতখানি ঘৃণা এবং ক্ষোভের সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার প্রমাণ উপরোক্ত সংবাদভাষ্য। (পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯)।

শাহ আজিজুর রহমান

জিয়া শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের পর শাহ আজিজুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার ভুমিকার জন্য তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমনকি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা তাকে জাতীয় সংসদ ভবনের ভেতরেই দু'দুবার দৈহিকভাবে নাজেহাল করেন। এসময় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলটির সদস্য হতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাও করতেন এবং এ কারণে পাকবাহিনী নাকি তার বাড়ি আক্রমণ করে কয়েকজনকে আহত করে। কিন্তু এটি নিছক একটি বানানো গল্প। শাহ আজিজ কিভাবে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেছিলেন, সে সময় তার দেয়া বিবৃতিগুলির যে কোন একটি পড়লেই সে সম্পর্কে আঁচ করা যাবে। এখানে নমুনা হিসেবে ১৯৭১ সালের ৪ মে তার দেয়া দীর্ঘ বিবৃতির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল–

'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক দেশে পূর্ণ এবং বাধাহীন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এই সুযোগের ভুল অর্থ করে বল প্রয়োগ আর শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে অজেয়ভাবে নিজেদের খেয়ালখুশিতে দেশ শাসন করার দাবী করে, এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য এবং ঔদ্ধ্যতের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।' (পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০)।

এক শ্রেণীর সাংবাদিকও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইত্তেফাকের খোন্দকার আবদুল হামিদের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুকিয়ে থাকা খোন্দকার আবদুল হামিদ গ্রেফতার হবার পর ১১ ফেব্রুয়ারী '৭২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'এ্যালায় কেমুন বুঝতাছেন' শিরোনামের সংবাদটিতে লেখা হয়, 'দালাল খোন্দকার আবদুল হামিদকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় নিউ এলিফেন্ট রোগ থেকে লালবাগ পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য বিদেশ গমন করেন। এছাড়া তিনি রেডিও পাকিস্তানের 'ব্রাহ্মণ, ক্ষমা কর' স্পষ্ট ভাষণের লেখক ছিলেন। (পৃষ্ঠাঃ ১৪২)।

বিএনপি'র যুদ্ধাপরাধী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে '৭১এর অন্যান্য লবিস্টরা

১। শাহ আজিজুর রহমান – সাবেক চেয়ারম্যান, বিএনপি (শাহ আজিজ গ্রুপ)
২। জুলমত আলী খান – ভাইস-চেয়ারম্যান, বিএনপি
৩। রাজিয়া ফয়েজ – চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৪। ড. ফাতিমা সিদ্দিক – বাংলাদেশে অবসর জীবন কাটাচ্ছে
৫। এ.টি. সাদী – অবসরপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

গণতদন্ত কমিশনের সারাংশ

...১৯৭২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি গোলাম আজমকে মেজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরের নির্দেশ দেয়া হয়। '৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল রাষ্ট্র তার নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। '৭৮ সালের ১১ই জুলাই সে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পরও বাংলাদেশে থেকে যায়।

১৯৯৪ সালে খালেদা জিয়া এই ঘৃণিত নরাধমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। গোলামকে জামাতের আমীর করে দেশবিদেশে ঘোরার সুযোগ করে দেয় তার লেখা বইপত্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশ করা হয়।

১৯৯৫ সালে লন্ডন থেকে বসবাসরত তিন যুদ্ধাপরাধীর যুদ্ধাপরাধ নামে বা ওয়ার ক্রাইম ফাইল নামে একটি প্রামান্য চিত্র নির্মাণ করা হয়। ব্রিটেনের জেনেভা কনভেনশন এ্যাক্ট ১৯৫৭ সনের আইন অনুযায়ী ব্রিটেন এই তিনজনেরই বিচার করতে পারে। এই তিনজনের বিরুদ্ধেই রমনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেশেও এই তিনজনের বিরুদ্ধে দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এ্যাক্ট '৭৩ বলবৎ রয়েছে। এরাই জিয়ার হাত ধরে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলো, এরাই সেই রাজাকার আলবদর, যাদেরকে ১৯৭৩ এর আইনে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহায্যকারী রাজাকার বাহিনী হিসেবে, দ্যা ইস্ট পাকিস্তান

রাজাকার অর্ডিন্যান্স '৭১, ২রা আগস্ট, যাদেরকে সরাসরি পাকিস্তানি আর্মির কমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙালি নিধনের কাজ দ্রুত করতে। দৈনিক সংগ্রাম ২৬/১০/৭১ এবং ২৮/১০/৭১: দৈনিক সংগ্রামে আলী আহসান মুজাহিদ এবং নিজামীর বিবৃতি। পাকিস্তান বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করেছে।

***

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০১)

* আমেরিকার বৈদেশিক সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের বিবরণে দেখা যায় জাতীয় পরিষদে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতা জহিরুল কাউয়ুম একটি উপদলের পক্ষে কলকাতায় আমেকিার কনস্যুলেটরের সাথে সক্ষাত করে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব দেন– প্রস্তাবের শর্ত ছিল আলোচনায় শেখ মুজিবকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং ৬ দফা গ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের নিকট সমঝোতার প্রস্তাব দিলে তিনি সাথে সাথে রাজি হয়ে যান এবং ফারল্যান্ডকে প্রবাসী সরকারের সাথে গোপন বৈঠক করতে বলেন। মধ্য সেপ্টেম্বরে আমেরিকার কনস্যুলেট জহিরুল কাউয়ুমকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনার আয়োজন করতে বলেন। জহিরুল কাউয়ুম জানালেন যে, যেহেতু ভারতের এ ব্যাপারে আপত্তি আছে সে কারণে তার পক্ষে আলোচনার আয়োজন করা সম্ভব নয়। (পৃষ্ঠা: ৪২৭)।

* ২৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার কনসালের সাথে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের এক সভা হয়। ভারত সরকার খন্দকার মোশতাকের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। সে কারণে তিনি অনেক শর্তের সাথে আলোচনায় সোভিয়েত রাশিয়ার অংশগ্রহণের শর্ত জুড়ে দেন। ১৬ অক্টোবর জহিরুল কাইয়ুম ভারতের আপত্তির কারণে ভারপ্রাপ্ত রষ্ট্রপতির পর্যায়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই বলে জানিয়ে দেন। কিসিঞ্জার বলেন, অক্টোবরের শেষে বাংলাদেশের নেতাদের সাথে আলোচনার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

লরেন্স লিপ সুজ তার গ্রন্থে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে মুজিব নগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের সাথে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মোশতাক দলের সাথে আমেরিকা কর্মকর্তাদের কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে ৮টি গোপন বৈঠক হয়েছে। এ সকল বৈঠকে কিসিঞ্জারের সাথে মোশতাকের প্রতিনিধিদের সরাসরি আলোচনা হয়েছে। খন্দকার মোশতাক এবং পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলমের সাথে আমেরিকার কর্মকর্তাদের চুক্তি হয় যে, যুদ্ধবাজ সেনাবাহিনী ব্যারাকে যাবে, বাংলাদেশ পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে এবং পাকিস্তানের অখ তা বজায় রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

লিপ সুজ অন্য এক সূত্রের উল্লেখ করে বলেন যে, অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেশ করা হবে যখন খন্দকার মোশতাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের বিষয়ে পেশ করতে যাবেন। লিপসুজ বলেন, "Had he (Mushtaque) suddenly in New York, unilaterally and without warning announced a compromised solution short of independence – a position that constitue a sell-out and but beterayal in the view of Tajuddin and the rest of the leadership – Mushtaque might at that stage have pulled off a full coup against the rst of the Awami League leadership back in Calcutta and the history of Bangladesh might have very differnt.

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে মোশতাকের গভীর ষড়যন্ত্র ভারতীয় গোয়েন্দা দল উদ্‌ঘাটন করে ফেলে। তাই তাকে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে জাতিসংঘে পাঠানো হয়নি। তিনি যদি নিউইয়র্কে যেতে পারতেন তাহলে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্যু ঘটিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করতেন। তিনি সেদিন তার ক্যু ঘটাতে না পারলেও ১৯৭৫ সালে তিনি সফল হয়েছিলেন।

জেনারেল ফরমান আলী মনে করেন যে, ইয়াহিয়া জেনারেলদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন– এ কারণে আলোচনায় বসার প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ান। ইয়াহিয়া খান সমঝোতা চেয়েছিলেন বলেই বিচারে ৩ মাস সময় লেগেছিল। তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে ইয়াহিয়া খান বিচারকালে সমঝোতার জন্য শেখ মুজিবকে বসাতে পারেননি। যদি মোশতাকের সাথে সমঝোতায় সফল হতো, তা হলে বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত। শেখ মুজিব জান্তাদের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তেন। (পৃষ্ঠা: ৪২৮-৪২৯)।

৯ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ব্রেজনেভের নিকট পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে পত্র দিয়েছিলেন। ৯ ডিসেম্বর ব্রেজনেভ উক্ত পত্রের উত্তর দেন। কিসিঞ্জার বুঝতে পারলেন পূর্ব পকিস্তান স্বাধীন হবে। এখন প্রশ্ন হলো কি করে পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা করা যায়!

১৩ দিনের যুদ্ধের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে ১০ ডিসেম্বর। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গভর্নর এ.এম. মালেক, মুখ্য সচিব মোজাফফর হোসেন এবং জেনারেল নিয়াজী– এ চারজনের ঐক্যমত্যে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি শর্তে

জনপ্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করে এবং তার অনুলিপি ঢাকায় উপস্থিত জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরির নিকট রাও ফরমান আলী নিজে প্রদান করে।

১১ ডিসেম্বর প্রাতরাশ টেবিলে ভুট্টো কিসিঞ্জারের সাথে সাক্ষাত করেন। আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূত রাজা জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেন, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, পূর্ব পাকিস্তান দখলের পর ভারতীয় সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হবে। তার পূর্বে আমাদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেতে হবে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বলেছিলেন, "ভারত সরকারের মুখে বাংলাদেশের অবস্থান, বাংলাদেশ তাদের মনে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব নেই...। তিনি চিৎকার করে বলেন– আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমাদের জনগণ সাহসী। আমরা মরতে ভয় পাই না... বিশ্বাস করুন, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র দখল করতে পারে, ডেনমার্ক জার্মানি দখল করতে পারে, ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করতে পারে– কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভারত পাকিস্তান দখল করতে পারবে না। মনে রাখবেন... আমরা যুদ্ধ করে যাব এবং এক হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ করবো; যেমন আমরা অতীতে এক হাজার বছর যুদ্ধ করেছি... আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো... পূর্ব পাকিস্তানকে ৫ বছর বা ১০ বছরের জন্য নিয়ে যাক, আমরা আবার তাকে ফিরিয়ে আনবো। সোনার বাংলা আমাদের, ভারতের নয়,... আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবো। আমরা শেষ মানুষটি পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।"

১৫ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ঢাকা শহর ঘিরে ফেলে এবং পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ সময় পাকিস্তানের জন্য পোল্যান্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভুট্টোর উচিত ছিল পোলান্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্তানকে কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করা।

নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টো তার সর্বশেষ ভাষণে বলেন, "ঢাকার পতন হলে তাতে কি আসে যায়? সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের পতন হলেই বা কি? যদি সম্পূর্ণ পশ্চিম পাকিস্তানের পতন হয় তাতে কি আসে যায়? ...আমরা নতুন পাকিস্তান গড়ে তুলবো। ...আমরা এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করবো। ...আমি ইঁদুর নই। আমি জীবনে কখনও বিপদ দেখে কেটে পড়িনি। আজও আমি কেটে পড়ছি না। কিন্তু আমি আপনাদের নিরাপত্তা পরিষদ ত্যাগ করছি।" ভুট্টো বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে প্রস্তাব সম্পর্কে তার হাতে যে কাগজ ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর তিনি বলেন, "আপনারা এটা মনে রাখুন, আমি চললাম।" (পৃষ্ঠা: ৪৫৪-৪৫৭)।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সংবিধানে অনেক মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু

জেনারেল জিয়া নাগরিকদের সংজ্ঞায় বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশী অন্তর্ভূক্ত করে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও বাঙালিদের জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায় বিচার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাতিল করে বাংলাদেশকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করেন। শাসনতন্ত্রের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য দলগুলোর শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী দলসহ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা যাবে না– এ মর্মে প্রণীত ইনডমনিটি আইন পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এভাবে ১৯৭২ সালে সংবিধানকে সামরিক সরকার পরিবর্তন করে পাকিস্তানি ভাবধারা প্রবর্তন করে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে– বাঙালি ও বাংলাদেশী। (পৃষ্ঠাঃ ৫১৪)।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আইন ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে সংবিধানের চার বার সংশোধন করা হয়। পাকস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন দেখা দেয়। সে কারণে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই জাতীয় সংসদ সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে। সংশোধনীতে বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারের ৩৫ ও ৪৪ ধারায় প্রদত্ত অধিকার যুদ্ধাপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং তারা আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে না। ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য জাতীয় সংসদে The International Crimes (Tribunals) Act 1973 পাস হয়। (পৃষ্ঠাঃ ৫১৬)।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী বিদ্রেহ ঃ

১৯৭৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর বেআইনীভাবে নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের নিরাপত্তা প্রদান করে বিশেষ গেজেট ১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। খুনিদের ক্ষমা করে দেয়া, ফারুক ও রশিদকে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত করা, ৩ অক্টোবরের তারিখে বেতারে তাদেরকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেনাবাহিনীর সূর্যসন্তান আখ্যায়িতকরণের ফলে সেনাবাহিনীর নৈতিকতা পর্যুদস্ত হয় এবং শৃংখলা ভেঙ্গে যায়। রাজনীতির পথে তারা সকল বাধা দূর

করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দ্রুত মুজিবনগর সরকারের চারজন প্রধান নেতা–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখেন। তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আস্থাশীল। কোন অবস্থাতেই তাঁরা মোশতাকের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেননি।

সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। খুনি মেজররা সেনাবাহিনীর প্রশাসন চালাতে থাকে। জেনারেল জিয়াউর রহমান উচ্ছৃংখল মেজরদের পিছনে থেকে তাদের সর্বপ্রকর সহযোগিতা করেন। ব্রিগেডিয়ার খারেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান। খালেদ মোশাররফসহ সকল সেনা কর্মকর্তা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কৌশলে সে কাজ থেকে বিরত থাকেন। খালেদ মোশাররফ দেশে আইনের শাসন ও মুক্তিযুদ্ধের চিতা পুনঃপ্রতষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার রক্তপাত চাননি। (পৃষ্ঠাঃ ৫৮৬)।

এন্থনী মাসকারেনহাস তার 'বাংলাদেশ – এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেছেন। "এ ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে, সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী জেনারেল জিয়া তার সৈন্যদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন। বস্তুত প্রকৃত জিয়ার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তেমনটি ছিলেন। প্রকৃত জিয়া ছিলেন – প্রতিহিংসাপায়ণ, অসভ্য এবং স্বৈরাচারী। তার শাসন আমলের ৬ বছরে বাংলাদেশে ২০টি সেনাবিদ্রোহ, অভ্যুত্থান, ও হত্যার প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়। গড়ে প্রত্যেক ৩ মাস বা ৪ মাসে একটি করে ক্যু সংঘটিত হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, কোন জেনারেল এত ক্যু-এর গর্বিত অধিকারী ছিলেন না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে সিপাহী বিদ্রোহকালে যে সৈনিকগণ কাঁধে করে তকে ক্ষমতাসীন করেছিল, পরবর্তীকালে সে সৈনিকেরা একাধিকবার তাকে হত্যার চেষ্টা করে। দেখা যায় পরবর্তীকালে জিয়া অবিশ্বাস্য বর্বরতার মাধ্যমে তাদের প্রতিদান দিয়েছেন। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়া যেভাবে তার নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ব্যাপক হত্যা করেছে, তেমনিভাবে উপমহাদেশের কোন জেনারেল তা করেনি। যদিও আমি প্রথমেই প্রমাণ দেখেছি, কিন্তু আমার তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন শান্ত, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং আমি তার একাধিকবার সাক্ষাত গ্রহণ করেছি। কিন্তু একদিন অন্য এক জিয়ার সন্ধান পেলাম। চট্টগ্রাম ও আগরতলায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দু'সপ্তাহে জিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন লোকের সাথে আলোচনাকালে তার (জিয়া) প্রকৃত পরিচয় পেলাম। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম জিয়া কেমন লোক ছিলেন? আমার সংবাদ প্রদানকারী আপাতত তার পরিচয় দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে প্রায় কানে কানে বলেন, 'জিয়া এমন লোক ছিলেন যে, তিনি একহাতে খুন করতে পারতেন এবং অন্য হাতে খেতে পারতেন'।" (পৃষ্ঠাঃ ৫৯৩)।

"...বিদ্রোহের সাথে জড়িত সৈন্য ও বিমান বাহিনীর লোকদের প্রতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলো প্রচ প্রতিহিংসারাপয়ণ। সরকারী হিসেবে তিনি ১১৪৩ জনকে ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর হতে দু'মাসে ফাঁসি দিয়েছেন। তিনি কয়েক শ' সেনা সদস্যকে ১০ থেকে আজীবন সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন। আইগত পদ্ধতি এবং ন্যায় বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অতি দ্রুত বাংলাদেশের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম এবং ধংসাত্মক শাস্তি প্রদানের মহড়া বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। তিন বা চার জনের এক একটি দলের বিচার করা হতো এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়; জিয়া সকল মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ফাঁসি আদেশ কার্যকর হয়। আমাকে বলা হয় যে, জিয়া একাধারে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক শাসকের দ্বৈত টুপি পরে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা নির্মমভাবে ব্যয় করতেন, নিজ হাতে লিখে এ সকল দুর্ভাগা মানুষের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতেন। তিনি ঢাকা, কুমিল্লা এবং বগুড়া জেলে একই সঙ্গে তিন-চারজনকে বিশেষভাবে বর্ধিত ফাঁসির কাষ্ঠে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার অনুমোদন দিতেন। সেনা সদস্যদের টানাহেঁচড়া করে ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে নেয়ার সময় চিৎকার করে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রতিবাদ করতেন। বেসামরিক বন্দীরা কয়েক সপ্তাহের রাতে ভয়াবহতা ও করুণ ঘটনার কথা ভুলতে পারেনি। এ ছিল জিয়া কর্তৃক খুন করে হত্যা... ।" (পৃষ্ঠাঃ ৫৯৪)।

...অধিকন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান খুনিদের পুনর্বাসন ও পুরস্কৃত করেছেন। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ও খুনিরা পূর্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। খন্দকার মোশতাক ও জেনারেল জিয়াউর রহমান খুনিদের বিচারের দরজা বন্ধ করে দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে সামরিক আইন জারি এবং সরকার পরিবর্তনের সময় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন।

...বিচারক সরাসরি দায়ী করেছেন জেনারেল মফিউল্লাহসহ উচ্চপদস্থ অফিসারদের। মৃতু াদেশপ্রাপ্ত মহিউদ্দিনের জবানবন্দী উদ্ধৃত করে বিচারক বলেছেন ১৩৬ পৃষ্ঠায় – ১৫ আগষ্টের ঘটনায় জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল। যার জন্য তিনি ফারুক ও এরশাদের কাছে খুবই দুর্বল ছিলেন। রায় থেকে মনে হয় অভিযুক্ত আসামী ব্যতীত আরো লোক হত্যায় জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে জেনারেল জিয়াউর রহমান। জিয়ার গঠিত বিএনপি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বিরোধিতা করেছে। এমনকি রায় ঘোষণার পূর্বদিন তারা ৯ তারিখ হতে দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালন করে। (পৃষ্ঠাঃ ৬১৯)।

...কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫–১৯৮১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে জেলহত্যা মামলার কোন তদন্ত হতে দেননি। শেখ হাসিনা ক্ষমতা লাভের পর তিনি হত্যার বিচারের নির্দেশ দেন। (পৃষ্ঠাঃ ৬২০)।

বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো?

জিয়াউর রহামন প্রেসিডেন্ট হয়ে শাসতন্ত্রের সংশোধন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়নীতি অন্তর্ভূক্ত করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩০ শহীদের রক্তের ফসল চারটি মূলনীতি– জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেয়া হয়। গণতন্ত্রের পরিবর্তে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস হলো। ...সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়। অথচ বঙ্গবন্ধু তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। পুনর্বাসিত করা হলো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে। ... রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে তারা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। ...১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের হত্যার রাজনীতির মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং হত্যার রাজনীতির শিকার তিনিও নিজেও হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু কোনদিন বঙ্গবন্ধুর নাম ভুলেও উচ্চারণ করেননি। অথচ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিলে কোনদিন তিনি পরিচিতি লাভ করতে পারতেন না। তিনি বঙ্গবন্ধু খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিলেন। যাতে তাঁর হত্যার বিচার না হয় সেজন্য ৫ম সংশোধনী করেন। জিয়ার আমলে বঙ্গবন্ধুর শত শত অনুসারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অথচ খুনিরা মুক্ত। জাতির পিতার আসলে তাঁকে রাখা হয়নি। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নামে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়। (পৃষ্ঠাঃ ৬২১-৬২২)।

১৫ আগষ্টের পর মোস্তাক-জিয়ার অবৈধ সরকার শেখ পরিবারের সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ২৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, আব্দুস সামাদ আজাদ, খুনি মোস্ত াকের মন্ত্রীসভায় যোগদান করতে অস্বীকার করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ২৪ আগস্ট মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে অপসারণ করে তার স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চিফ অব স্টাফ করা হয়। একই তারিখে জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৮ আগস্ট ৬১ জন জেলা গর্ভনর নিয়োগ করা হয়। ৩০ আগষ্টে রাজনৈতিক কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়। ...১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা যাবে না এই মর্মে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। (পৃষ্ঠাঃ ৬২৬)।

জেলহত্যা–সিপাহীদের উচ্ছৃঙ্খলতা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ক্যু সংঘটিত হয়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হয়। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা ৩ নভেম্বর রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে খন্দকার মোস্তাকের সহযোগিতায় প্রবেশ করে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করে। জাতীয় চার নেতাকে হত্যার করে খুনিরা ব্যাঙ্ককে পালিয়ে যায়।

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর বাকশাল শোক দিবস পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা হতে এক বৃহৎ মৌন শোক মিছিল ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন করে। শোক মিছিলে জেনারেল খালেদ মোশাররফের মা ছিলেন। মিছিলে খালেদ মোশাররফের মায়ের যোগদান নিয়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে। ...৬ নভেম্বর উচ্ছৃঙ্খল সিপাহীরা জাসদ নেতা কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং মেজর জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে। ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়ার ইঙ্গিতে মেজর জনারেল খালেদ মোশাররফ (বীরউত্তম), কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার (বীরউত্তম) এবং কে.এন. হুদা (বীরবিক্রম)-কে হত্যা করা হয়। জেনারেল জিয়া সর্বময় ক্ষমতা অধিকারী হলেন। তিনি ডেপুটি সামরিক প্রধান হলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রেসিডেন্ট। (পৃষ্ঠা: ৬২৬-৬২৭)।

১৯৭৭ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়া খুনি জেনারেলদের সেনবাহিনীতে পুনর্বহাল করেন। জেনারেল জিয়া ৩০ মে তথাকথিত গণভোটে (হ্যাঁ বা না) আস্থা অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জিয়ার বিরুদ্ধে ক্যু'র পরিকল্পনা করা হয়। জিয়ার নির্দেশে ১১৪৩ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়।

১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল জিয়া জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল) গঠনের ঘোষণা দেন।

১৯৭৮ সালের ৫ এপ্রিল জিয়াউর রহমান নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে ১৯৭১ সালের দালালদের নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ করে দেন। ফলে পরবর্তীতে অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী নির্বাচনে পরাজিত হন। জেনারেল জিয়া কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে জয় লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিএনপি নীল নক্সার ৫ম সংশোধনী গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। ...জিয়া পাকিস্তানি দালাল শাহ্ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। (পৃষ্ঠা: ৬২৮)।

***

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার (মে ২০০৭)
চৌধুরী মঈনউদ্দিন, যুদ্ধাপরাধ এবং প্রাসঙ্গিক আইন

– জাভেদ হাসান মাহমুদ।

...১৯৫৭ অনুযায়ী যে কোন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার এখতিয়ার ব্রিটিশ সরকারের আছে। পরবর্তীকালে চ্যানেল-৪সহ সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং বিশিষ্ট প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকরের স্কটল্যান্ডইয়ার্ড পুলিশ অধিদপ্তরের ওয়ার ক্রাইমস্ ইউনিটের কাছে দাবি উত্তাপন করা হয় তিনজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর বিষয়ে তদন্ত এবং বিচারকার্য শুরু করার জন্য। উল্লেখ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও এ ধরনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার বিচারকার্য শুরু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র '৯৬ এর প্রথমার্ধেই পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ব্রিটেনে প্রবাসী তিনজন যুদ্ধাপরাধীর বিষয়ে তদন্ত এবং বিচারকার্য সম্পর্কে জানতে চেয়ে একটি পত্র পাঠানো হয়। এই চিঠির উত্তরে ২২.১০.৯৬-এ পত্রের মাধ্যমে ব্রিটেনের মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিসের ওয়ার ক্রাইম ইউনিটের পক্ষে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মি. ম্যাকডারমেট জানান, ১৯৯৫-এর মে মাসে চ্যানেল-৪ এর ডেভিড লয়েসের কাছ থেকে তারা চৌধুরী মঈনুদ্দিনসহ অভিযুক্ত তিনজন যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গে বেশ কিছু সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তারপর ক্রাউন প্রশকিউশ সার্ভিসেস এবং পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের পরামর্শক্রমে তথ্যাদি তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। চিঠিটিতে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর একথাও উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১-এ তিনজন ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী সংঘটিত হলে তা বিচার করার প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। বাংলাদেশ সরকার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে এজন্য তারা প্রয়োজীয় তথ্যাদি এবং সহযোগিতা প্রদানের কথাও উল্লেখ করে।

সম্প্রতি রমনা থানায় চৌধুরী মঈনউদ্দিন, আশরাফুজ্জামানসহ সাতজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে যে সব ধারায় মামলা করা হয়েছে তার উল্লেখ প্রয়োজন। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (১২০খ), অনধিকার গৃহপ্রবেশ (৪৪৮), খুন করার উদ্দেশ্যে হরণ কিংবা অপহরণ (৩৬৪), খুন (৩২০), অপরাধীকে গোপন করার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করে দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা (২০১), অপরাধ অনুষ্ঠানকালে মঈনুদ্দিনসহ রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো অজ্ঞাত কারণে বিশেষ আইনটিতে মামলা করা হলো না। বিশেষ আইনটি হচ্ছে 'দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনাল) এ্যাক্ট ১৯৭৩'।

১৯৭৩-এ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধান এ সংক্রান্ত ৪৭৯৩) অনুচ্ছেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান সংযোজন করা হয়েছিল। সংবিধানের এই সংশোধনীর পর মুহূর্তে ১৯৭৩-এর দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনাল) এ্যাক্ট করা হয়।

১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় এই আইন। বিল আকারে আইনটি উত্থাপনকালে তৎকালীন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর মুখবন্ধে বলেছিলেন, 'জনাব স্পীকার সাহেব, গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের আটক করার, ফৌজদারীতে সোপর্দ করার এবং দ দানের উদ্দেশ্যে বিধিবিধান প্রণয়নকল্পে একটি বিল [The International Crimes (Tribunals) Bill, 1973] আমি উত্থাপন করছি।' বস্তুত ১৯৭৩-এর এই আইনটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কারার ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন। এমনকি এই আইনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদেরও বিচার করা সম্ভব।

* রাজাকাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশ

রাজাকার বাহিনী auxiliary force ছিল কি না, আমি একজন তার সাক্ষী। তার কারণ হচ্ছে, ১৯৭১ সনে, আমার মা, আমার বোন, আমার ভাইয়েরা, আমার স্বামী, আমার চাচা-চাচী, আমরা সবাই পাকিস্তানি আর্মির হাতে দীর্ঘদিন বন্দী ছিলাম। এই বন্দী অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আমার সন্তান হয়। ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে আমরা যখন বন্দী ছিলাম, তখন পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে তাদের মিলিশিয়া বাহিনী আমাদের ঐ বাড়িটি পাহারা দিত। ছাদের উপর কয়েকটি মেশিনগান পাতা ছিল, বাঙ্কার করা ছিল এবং যুদ্ধ যখন চলছিল, তার একটি পর্যায়ে দেখা গেল পাকিস্তানের সেই মিলিশিয়া বাহিনী, যারা বেলুচ রেজিমেন্টে ছিল, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের কিছু রাজাকারকে অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদে সঙ্গে সেই বাড়ি পাহারা দেবার কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। রেশনে যে খাবার আসতো, তা রাজাকারদের জন্যই আসতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে তারাও বাড়ি পাহারা দিত। আমার মনে হয়, এর থেকে জলন্ত প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। [দ্রঃ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার (শাহরিয়ার কবির), পৃষ্ঠাঃ ৭৩।]

* ...১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ জনগণের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক ক্রাইম এ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে বিচারের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালকে গোলাম আযম ও তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা দায়ের ও বিচারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখছি। (পৃষ্ঠাঃ ৮৩)।

* সরকার মুক্তিযুদ্ধের উপর কলঙ্কজনক অধ্যায় লেপন করেছেন

আমি আগে আপনাদের কাছে নাম বলেছি, এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনা আছে। জাহানরা ইমাম একজন মুক্তিযোদ্ধার মা, যিনি নিজের সন্তানকে বলেছিলেন– 'যাও তোমাকে কোরবানী করে দিলাম, মুক্তিযুদ্ধের জন্য' – এই কথা বলে তিনি নিজের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্বামী হারিয়েছেন। তিনি অসুস্থ,

ক্যান্সার তার শরীর আজ কুরে কুরে খাচ্ছে। তার পরেও সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন– শত শহীদের শত লাঞ্ছিত মা বোনের কান্না যেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ...আমি মনে করি, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে বর্তমান সরকার স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের উপর একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় লেপন করেছেন।

***

জীবনে যা দেখলাম থেকে
(গোলাম আজমের জীবনী)

গোলাম আজমের জীবনী, ৪র্থ খ , পৃষ্ঠাঃ ৫৫ – শুধু বাঙালি হওয়ার মনোভাব নিয়ে আমরা হিন্দুর নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাবো না। হিন্দু থেকে মুসলমান সত্তাকে পৃথক সত্তা ছাড়া ভারতের গোলামী থেকে মুক্তি অসম্ভব। পাকিস্তানের জন্ম অপরিহার্য ছিলো।

পৃঃ ১৩৬– ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র রচনা করে, তারা রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ভারত থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাশিয়া থেকে সমাজতন্ত্র আমদানী করেছে। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন অবস্থায় ইসলাম বিরোধী এই দুটো মতবাদকে শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ করে। এই সংশোধনীর আগে শাসনতন্ত্রে কোথাও আল্লাহ নাম লেখা ছিলো না। এই সংশোধনীতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন বৈধ করা হলে জামায়েতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

পৃঃ-১৭১ঃ বাদশা ফয়সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুই বছর আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি যে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তিনি মনে আছে বলে জানালেন। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র উৎখাত না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না বলে যে কথা আমাকে জানিয়েছিলোন, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলে বললেন, তিনি এব্যাপারে মজবুত আছেন।

পৃঃ-৬৬ঃ ১৯৭২ঃ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়েতে ইসলামী পুনর্গঠন শুরু। ১৯৭৫ সালের মে মাসে মোহাম্মদ আব্দুর রহিম আমীর নির্বাচিত হয়। ১৯৭৯ সনের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়েতে ইসলামী নামে প্রকাশে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে, মে মাসে জামায়েতের কার্যক্রম শুরু হয়।

পৃঃ ৩০ঃ '৭২এর ফেব্রুয়ারি দুই কিস্তিতে কিছু টাকা ঢাকায় সংগঠনের ভাইদের কাছে পৌছাতে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তানে থাকাকালে, আমি তীব্রভাবে অনুভব করেছি যে, নতুন করে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন টাকা। লন্ডনের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ১মাস লেগে যেতো। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েই পাকিস্তান থেকে বের হয়েছি, লন্ডনে পৌছে ঢাকার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবো এবং সাধ্যমতো টাকা পাঠাবো।

পৃ: ৪৫: লন্ডন বিমানবন্দর থেকে বের হতেই, জনাব আব্দুল সামাদ হাত উঁচিয়ে তার দিকে যাবার জন্য ইশারা করলেন। তিনি সেই আবদুস সালাম যার মাধ্যমে ইসলামবাবাদ এবং ঢাকার সঙ্গে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতো। আউয়ুব খানের আমলে যিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই লন্ডন থেকে ঢাকায় রওনা দেই। ৫ বছরের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনের দাওয়াতে সৌদি আরব, আমেরিকা, তুরস্ক ও লিবিয়ায় গিয়েছি। প্রত্যেকে বছর হজের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত জামায়েতে ইসলামী নেতা ও ছাত্রশিবিরের নেতাদের সাথে মিলিত হবার জন্য মক্কায় যেতে হয়েছে।

পৃ: ৪৮: আমি পাকিস্তানে থাকতে পারি, ইচ্ছা করলে সৌদি আরবেও থাকতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের সাথে সহজ যোগাযোগের জন্য লন্ডনে থাকতে বাধ্য হয়েছি।

পৃ: ৪৯: '৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজিদের নিকট জানতে পারি। '৭৩এর জুন মাসেই 'বাঙালি মুসলমান কোন পথে' নামে একটি পত্রিকা রচনা করলাম, পত্রিকাটি ইংল্যান্ডে মুসলমাদের মাঝে বিতরণ করলাম। পরবর্তীতে ডিসেম্বর মাসে হজের সময় বাংলাদেশ থেকে আসা হাজিদের নিকট পৌছে দেয়া হয়। বইটি মুসলিম চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি মুসলাম কোন পথে বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৪ সনে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালের মে মাসে প্রখ্যাত কলামিস্ট ও জাতীয়তার পক্ষে বলিষ্ঠ লেখক খন্দকার আবদুল হামিদ লন্ডন গিয়ে আমার খোজ করে আমার বাসায় দেখা করতে গেলেন। দৈনিক আজাদে মর্দে মোমিন ছদ্মবেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে যেসব বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করছেন, তা আলোড়ন সৃষ্টি করে। জিয়াউর রহমান তখন রাষ্ট্রপ্রধান। খন্দকার আব্দুল হামিদ জিয়ার নৈকট্য লাভ করে। ১৯৭৯ সনের নির্বাচনে তিনি শেরপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে জিয়ার মন্ত্রীসভায় যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। তিনি গোলামের লেখা ১৬ পাতার পুস্তিকা পড়ে মন্তব্য করলেন, আমরা '৭৫এর নভেম্বরে সিপাহী জনতার সংহতির যে মুসলিম চেতনা পেলাম, আপনার অন্তর জুড়েই সেই চেতনা বোধ সক্ষম হয়েছে দেখে বিস্মিত হলাম। আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের চমৎকার মূল্যায়ন করছেন এবং রাজাকারদের দেশপ্রেমকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই উদার মনোভাব আমার অন্তর স্পর্শ করেছে আপনাকে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম। জনাব আব্দুল হামিদ দৈনিক আজাদে এক উপসম্পাদকীয়তে আমার বইটি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসাসুলভ মন্তব্য লেখেন। গোলামের ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকা থেকে... 'কি মারাত্মক পরিস্থিতি তখন? একদল মুসলমান ভারতের গোলামীর ভয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করলো আরেকদল সেনাবাহিনী থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ভারতের মতো দুশমনের সাহায্য করতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করলো। একদল ভারতের বোমা দিয়ে নিজের দেশেরই পুল পোড়ায় আরেকদল পুল রক্ষার জন্য প্রাণ হারায়।' [জীবনে যা দেখলাম, পৃষ্ঠা-৫২] পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের ফলে বাংলাদেশ আপাততঃ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে এসেছে বটে কিন্তু এ কলঙ্ক কি বাঙলি মুসলমাদের সামগ্রিক জীবনে কালিমা লাগায়নি? ইতিহাস জোর গলায়

বলতেছে, একদল বলবে ১ লাখ মুসলিম সন্ত্রশ হিন্দুদের সেনাবাহীন নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এই কালিমা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে।

[দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , পৃঃ ১৮ বাদশা ফয়সালের সাথে গোলামের সাক্ষাতকার}। ১৯৭২ সন, গোলাম আজম বললো, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সঙ্গে দুশমনি করে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে এর আসল উদ্দেশ্য দুশমনী। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫জন মুসলমান আফতি হারামাইন শরীফাইনের মহান খালিফ। ভারত কাশ্মীরের মতো বাংলাদেশকে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে আপনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। বাদশা ফয়সালের উত্তরঃ ...পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র ছিলো। আমি বিবিসির মাধ্যমে জানতে পারি যে বাংলাদেশে যে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে, তাতে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছি। ভারত যদি কাশ্মিরের মতো দখল করতে চায়, তাহলে মুসলিম বিশ্ব চুপ থাকবে না।

পৃষ্ঠা-৩০: পাকিস্তান থাকাকালে আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, নতুন সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করতে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন টাকা, কিন্তু পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠানো অসম্ভব। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েই পাকিস্তান থেকে কোনরকমে বের হয়েছি, লন্ডনে পৌছে ঢাকার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবো এবং সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাবো।

পৃষ্ঠা-৩৮... আমার জন্মভূমিতে যারা চরম বিরোধী পরিবেশে আমার প্রিয় সংগঠন জামাত নিয়ে গোপনে পুনর্জীবিতি করতেছেন তাদের সাথে সহযোগিতার জন্যই আল্লাপাক আমাকে আপনাদের মতো লোকদের কাছে পৌছানোর তৌফিক দিয়েছেন।

পৃষ্ঠা-৪২: বাংলাদেশকে কখনো সৌদি আরব স্বীকৃতি দেয়নি, আমার আসল উদ্দেশ্য ছিলো যতদূর সম্ভব ইসলামী সম্মেলনের নেতাদেরকে জানানো যে, দেশের ৯০ জনই মুসলিম, পাকিস্তানের চির দুশমন ভারত এই মহাশক্রকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। দ্রঃ '৭১এর ঘাতকদালালুরা কে কোথায় আব্বাস আলী খান, ১১ই অক্টোবর '৭১"পাকিস্তানের হেফাজত করবে এবং কিছুতেই তার ক্ষতি হতে দেবে না, ২রা অক্টোবর '৭১ পাকিস্তানের মাটি থেকে দুস্কৃতকারীদেরকে উৎখাতের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি আহ্বান জানাই। ১১ই সেপ্টেম্বর '৭১ গোলাম আজম বলেন, "পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ের মতো আজকে আবার পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য নতুন বাহিনী প্রয়োজন। ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী বাহিনী কায়দে আজমের মহাদান।

পৃষ্ঠা-৫৫: মুক্তির একমাত্র পথ

মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানসিক মুক্তি চেতনার উপর। মন যদি গোলাম না হয় তা হলে সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এবং অন্য সকল প্রকার গোলামি থেকে মুক্তি সম্ভব। বাঙালি মুসলমানদেরকে আজ মনের গভীরে নেমে খুঁজতে হবে মুক্তির উৎস কোথায়।

শুধু বাঙালি হওয়ার মনোভাব নিয়ে আমরা কোনক্রমেই হিন্দুর প্রভাব থেকে মুক্তি পাবো না আর হিন্দু থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে চিন্তা করা ছাড়া ভারতে গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। বাঙালি মুসলমান হিসেবে আমাদের পৃথক সত্তাকে জাগ্রত না করে আমরা মুক্তির পথে পা-ই দিতে পারবো না।

ভারত আমাদের মনে এ চিন্তা ঢুকাবার চেষ্টা করছে যে, পাকিস্তান হওয়াটাই ভুল হয়েছে। কারণ এ চিন্তা না ঢুকালে গোলামির জিঞ্জির মযবুত হতে পারে না এবং 'হিন্দু মুসলমান এক জাতি' একথা মুসলমানরা স্বীকার না করলে ভারতের প্রভাব স্থায়ীও হতে পারে না। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা এ কথা ভালো করে জানে যে, পাকিস্তান না হলে অবিভক্ত বাংলা ভারতের একটি প্রদেশ হতো মাত্র। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথক দুটো জাতি তা পাক-ভারতের ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য। পৌত্তলিক ও তাওহীদবাদী কোন দিন এক হতে পারে না।

পৃষ্ঠা-১৩৬: বাংলাদেশে ইসলামের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমান মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসূল (স)-এর জন্য মহব্বত ও কুরআনের উপর ভক্তি মুসলমানদের মধ্যে মযবুত রয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর যারা ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ভারত থেকে সেকুলারিজম ও রাশিয়া থেকে সোশালিজমকে আমদানি করে শাসনতন্ত্রে শামিল করেন। বাংলাদেশের জমিন ইসলামের চরম বিরোধী এ দুটো মতবাদ কবুল করতে রাজি হয়নি। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন অবস্থায় ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদকে শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ করে এর পক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য গণভোটের ব্যাবস্থা করেন। জনগণ বিপুল সংখ্যায় অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে শাসনতন্ত্রের এ সংশোধনী সমর্থন করে। এ সংশোধনীর আগে শাসনতন্ত্রের কোথাও আল্লাহর নাম ছিল না। সংশোধনীতে শাসনতন্ত্রের শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বদলে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শাসনতন্ত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ছিলো। এ সংশোধনীতে এ দফাটি উচ্ছেদ করা হলে জামায়েতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগ এখনো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে তাদের আদর্শ বলে দাবী করে। তাদের গঠনতন্ত্রে সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসেব উল্লেখ ছিলো। রাশিয়া সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যার বেশ কয়েক বছর পর তারা এ মতবাদকে ত্যাগ করেছে বলে ঘোষণা করে। ...পাকিস্তানে ইসলামী দলগুলোর ঐক্য ও নির্বাচনী সাফল্যে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর মধ্যে অনুরূপ ঐক্যের পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে। ঐক্য প্রচেষ্টা চালু রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি এ প্রচেষ্টাকে সফল করেন তাহলে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হাবার আশা করা যায়।

আমরা পাকিস্তানকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো। দ্রঃ '৭১ এর যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধপরাধিদের বিচার। পৃষ্ঠা-৬৫ঃ ১৯৭২ সালে গোলাম আজম লন্ডনে পূর্ব পাকিস্তান উদ্ধারে পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে। ১৯৭৩এ ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত ফেডারেশেন অব স্টুডেন্ট ইসলামিক সোসাইটির সম্মেলনে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তৃতা দেয়। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানে বসে, গোলাম আজম, খাজা খায়েরউদ্দিনের সাথে মিলিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে। ১৯৭৪ সালে মাহমুদ আলীসহ কয়েকজন পাকিস্তানিকে নিয়ে লন্ডনে পুনরুদ্ধার কমিটির বৈঠক করে। ১৯৭৭ লন্ডনের হলি ত্রিনিটি চার্চ কলেজে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের আশা ব্যক্ত করে। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানি পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশী ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। ১৯৭৩ থেকে '৭৬ পর্যন্ত সাতবার বাদশা ফয়সালের সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার আহ্বান জানায়। [দ্রঃ জীবনে যা দেখলাম।

স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়েতের পুনর্গঠন

(জীবনে যা দেখলাম, ৪র্থ খ , পৃঃ ১৬৬-১৬৭):

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক দল নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়।

জামায়েতে ইসলামী ইকামাতে দীনের সংগঠন। কোন অবস্থায়ই এ কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ এ কাজ করা ফরয। যাদের এ চেতনা আছে, তারা সব অবস্থায় পরিবেশ অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করতে বাধ্য। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়েতে ইসলামী বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। জুন মাসে রুকনদের ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। মাওলানা আবদুল জব্বার আমীর নির্বাচিত হন। '৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মাস্টার শফীকুল্লাহ আমীর হন এবং এ বছর তিনিই জামায়েতের প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জে যান। '৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে হজ্জ থেকে দেশে ফিরে মাস্টার সাহেব জানতে পারলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেই জনাব আবদুল খালেক আমীর নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি পদত্যাগ করলে মজলিসে শূরা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীকে অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নির্বাচিত করে।

১৯৭৫ সালের মে মাসে উপনির্বাচনে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম আমীর নির্বাচিত হন। [illegible] সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মাওলানা আবদুর রহীম তিন বছরের জন্য আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার দেশে ফিরে আসার পর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঐ বছর সেপ্টেম্বর আমাকে আমীর পদে উপনির্বাচন হয় এবং আমার উপর আমীরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়েতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে

ইডেন হোটেলের রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়েতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে জনাব আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে জামায়েতের রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করেন। আর নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমি অভ্যন্তরীণ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকি।

১৯৮০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত একুশ বছরে জামায়েতের আমীর পদে সাত বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারই আমাকে নির্বাচিত করা হয়। আমি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি, পাওয়ার পর ২০০১ সালে মাওলানা মতিউর নিজামী আমীর র্বাচিত হন। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মেয়াদেরজন্য নিজামী সাহেব পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৭৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের বোঝা বহন করতে হয়। একটানা ১৫ বছর জামায়েতে ইসলামীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিরাট দায়িত্ব খান সাহেব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন। ১৯৯৪-এর জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতিগণ সর্বসম্মতভাবে আমাকে বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দেবার পর জনাব আব্বাস আলী খান ভারমুক্ত হন এবং রাজনৈতিক ময়দানে আমার দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়। ঐ সময় থেকে ১৯৯৯ সালে খান সহেবের ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন কনে।

বর্তমানে আমীরে জামায়েতকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের কঠিন দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য দান করুন।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার পর

আরাফার ময়দানে ও নিনায় আমরা সমবেতভাবে বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাতরভাবে দোয়া করে তৃপ্তিবোধ করেছি। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর আমি মাস্টার শফীকুল্লাহ ও মাওলানা আবদুস সুবহান মক্কা শরীফে বেশ কয়েকদিন একাধানের বৈঠক করেছি। মাস্টার হসাহেব থেকে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছি। আন্দোলনও সংগঠনের বিস্তারিত খবর জানতে পেরে উৎসাহবোধ করেছি। যে কঠিন পরিবেশে সংগঠনকে চালু করতে হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিদেশে থেকে যা কিছু করতে চেষ্টা করেছি তা সংগঠনের জন্য খুবই সহায়ক বলে জেনে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানালাম।

***

ল্যাগেসি অব ব্লাড থেকে

(জিয়াকে চিনতে হলে এই বইয়ের প্রতিটি শব্দ বাংলার মানুষের জন্য অনিবার্য)

... বিদ্রোহের সাথে জড়িত সৈন্য ও বিমানবাহিনীর লোকদের প্রতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ। সরকারী হিসাবে যিনি ১১৪৩ জনকে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের ৯ তারিখ হতে ক্রমান্বয়ে ফাঁসি দিয়েছেন। আইনগত প্রস্তুতি এবং ন্যায় বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে অতি দ্রুত বাংলাদেশের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম এবং ধ্বংসাত্ম কার্য বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো। তিন বা চার জনের একেকটি দলের বিচার করা হতো এবং যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জিয়া নিজ হাতে সকল মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতো। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হতো। আমাকে বলা হয় যে, জিয়া একাধারে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক শাসকের দ্বৈত টুপি পরে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা সময় নির্জনভাবে ব্যয় করতেন নিজ হাতে এসকল মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে। কুমিল্লা এবং বগুড়া জেলে একই সঙ্গে ৩/৪জনকে বিশেষভাবে গঠিত ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে অনুমোদন দিতেন। সেনাসদ্যদের টানাহেচড়া করে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার সময়, চিৎকার করে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রতিবাদ করতো। এই ছিলো জিয়া কর্তৃক নির্মমভাবে হত্যা...। এক জনের বক্তব্য জিয়া এক হাতে খেতে পারতো আরেকে হাতে খুন করতো। ওদেরকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখো যে পর্যন্ত ওরা মারা না যায়। (ল্যাগেসি অব ব্লাড, চ্যাপ্টার–১২)।

***

'৭১ এর পত্রিকা থেকে

দুনিয়ার কোন শক্তিই পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না

– মতিউর রহমান নিজামী (সংগ্রাম, ৪ আগস্ট ১৯৭১):

চট্টগ্রাম, ৩রা আগস্ট। –বিশ্ব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সদস্য সংগঠন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের নিখিল পাকিস্তান সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী দলীয় ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যবার জন্য সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ ছাত্র-সুধী সমাবেশে ভাষণদানকালে জনাব নিজামী এই আহ্বা জানান। তিনি আরও বলেন, এখন ব্যক্তিগত মর্যাদা বা দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন নয়, এখন প্রশ্ন পাকিস্তান টিকে থাকার। পাকিস্তান টিকে থাকলেই কেবলমাত্র এখানকার মুসলমানরা টিকে থাকতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

"পাকিস্তানের বর্তমান জাতীয় সংকট এবং নাগরিকদের দায়িত্ব" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনাকালে ছাত্রনেতা নিজামী বলেন, ১লা মার্চ থেকে দুস্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুচররা যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে কোন মানুষই আশা করতে পারেনি যে, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানরা স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকে থাকবে। দুস্কৃতিকারীরা দেশের বুকে যে রক্তের প্রবাহ বইয়েছে তার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব নিজামী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানি ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও দলসূহের অনৈক্যের কারণেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল এবং দেশে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

জনাব নিজামী বলেন, দেশপ্রেমিক জনগণ যদি ১লা মার্চ থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতো তাহলে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারতো না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আল্লাহ তার প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য জন্য ইমানদার মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা রাজনৈতিক পন্থায় করতে ব্যর্থ হল, তখন আল্লাহ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় ভুমির হেফাজন করেছেন।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছাত্র নোত জনাব নিজামী পাক সেনাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের সকল আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী হামলার মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাহস ও ত্যাগের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন।

পাকিস্তানের বর্তমান সংকটের কথা বলতে গিয়ে নিজামী বলেন, অনেকেই এর জন্য দেশের ছাত্র সমাজকে দায়ী করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ছাত্রদের কিছু অংশ এর জন্যে দায়ী হলেও সমগ্র ছাত্রসাজ এর জন্যে দায়ী নয়। বরং বিগত ২৩ বছরে যারা ছাত্র সমাজকে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস, পাকিস্তানপূর্ব ভারতের মুসলমানদের দূরাবস্থার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে তারাই এর জন্য দায়ী বলে নিজামী মন্তব্য করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, বিগত আমলে ছাত্রদেরকে একদিকে ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান দেয়া হয়নি অন্যদিকে শাসকদের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কর্মপন্থার ফলে ছাত্রদের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান অর্জনের পর বহুদিন আমরা আমাদের পরিচয় ভুলে ছিলাম। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারত যখন আমাদের ভূ-খণ্ডে আক্রমণ চালাল তখন আমরা আত্মসচেতনতার পরিচয় দিলাম। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আবার আমরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার আমাদের ওপর গজব আসল। এবার আমরা আবার আত্মসচেতন হলাম। যদি এই আত্মসচেতনতার পর আবার আমরা ভুল করি তাহলে হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে আর সুযোগ নাও দিতে পারেন। জনাব নিজামী অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পাকিস্তানের যুবকদের জাতীয় আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরিশেষে জনাব নিজামী বলেন, "পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। আল্লাহ একে বার বার রক্ষা করেছেন ভবিষতও রক্ষা করবেন। দুনিয়ার কোন শক্তি পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।"

সভায় বক্তৃতাকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আবু নাছের পাকিস্তানপূর্ব ভারতে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচারের এক বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যেই হিন্দুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি সেই হিন্দুদের সাথে আমরা কোনদিন এক হতে পারি না। ভারতের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানান।

আর সময় নষ্ট না করে আসাম দখল করে নেয়া উচিত : লাহোরে অধ্যাপক গোলাম আজম

(দৈনিক সংগ্রাম; ১৯ আগস্ট ১৯৭১)

লাহোর, ১৭ই আগস্ট (এপিপি)। – পূর্ব পাকিস্তান জামায়েতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল এখানে বলেন, ভারত প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই পাকিস্তানকে তার জবাব দিতে হবে।

ঢাকা থেকে এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের দুস্কৃতকারীদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে এবং পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা দানের জন্য সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছে। পাকিস্তানের জন্য একটি মাত্র পথই খোলা আছে, তা হচ্ছে অস্ত্রের মাধ্যমেই এর জবাব দেয়া। আর সময় নষ্ট না করে ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আসাম দখল করে নেয়া উচিত বলে তিনি জানান।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ভারত-সোভিয়েটের সাম্প্রতিক সামরিক চুক্তি থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ভারত ঘৃণ্য আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারত তার অভিভাবক পরিবর্তন করেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য প্রদান করতো আর এখন সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে সাহায্য জোগাচ্ছে। চীন এ সংকটের সময়ে পাকিস্তানকে যে সাহায্য দিয়েছে তা উল্লেখ করে জামায়াত নেতা বলেন, চীন পাকিস্তানের প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু, এ কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। এ জন্য পাকিস্তানের জনগণ চীনের জনগণের প্রতি অভিনন্দন জানান।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৮৮জন নির্বচিত সদস্যের আসন বহাল থাকায় অধ্যাপক গোলাম আযম উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। যারা এখনও ভারতে অবস্থান করছেন তাদের নামও এ তালিকায় দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিশেষত কুমিল্লার ক্যাপ্টেন সুজাত আলী ও নোয়াখালীর আবদুল মালেক উকিলের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ক্যাপ্টন সুজা আলী পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের জন্য কোলকাতায় গেরিলা ট্রেনিং দান করছেন।

যে সমস্ত সদস্য কোনরকম রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেননি, অবাঙ্গালী হত্যা, লুটতরাজে সাহায্য প্রদান করেননি, কেবল মাত্র তাদের আসনসমূহ বহাল ঘোষণা করা উচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বানঃ (দৈনিক পাকিস্তান; ২৭ আগস্ট ১৯৭১)

লাহোর ২০শে আগস্ট, (এপিপি)। – জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পরিষদ গতকাল ভারতের অব্যাহত উস্কানি ও শত্রুতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জেহাদের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বান জানায়।

গতকাল পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি আলোচিত হয়।

অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালিক বক্তৃতা করেন। বৈঠকে জামাতের আমীর মাওলানা আবুল আলা মওদুদীও উপস্থিত ছিলেন।

আজ পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশের অখ তা বজায় রাখার জন্য মুসলমানদের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য জেহাদের প্রেরণা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

প্রস্তাবে পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার ভারতীয় চেষ্টার তীব্র নিন্দা করা হয়।

এতে বলা হয় যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনী যেভাবে ভারতীয় হামলার মোকাবিলা করেছিল, ভারত পুনরায় হামলা চালালে সেভাবেই তার মোকাবিলা করা হবে।

থান্ট তার আওতাবহির্ভূত বিবৃতি দিয়েছেনঃ (দৈনিক পাকিস্তান; ২৭ আগস্ট ১৯৭১)

লাহোর থেকে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পরিষদ আজ জানায় যে দেশদ্রোহীতার দায়ে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সম্পর্কে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের বিবৃতিকে পরিষদ তার আওতাবহির্ভূত বলে মনে করে।

সশস্ত্রবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেঃ গোলাম আজমঃ (দৈনিক পাকিস্তান; ২৭ আগস্ট ১৯৭১)

পেশোয়ার, ২৬শে আগস্ট (এপিপি)। – পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এখানে বলেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হীন উদ্দেশ্য বিদ্রোহীদের বিশ্বাসঘাতকতা হতে সশস্ত্রবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।

এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক আজম বলেন যে অনুপ্রবেশকারী ও দুস্কৃতকারীদের নির্মূল করার কাজে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করছে। কারণ, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট নোত ও কর্মীরাই বিদ্রোহ করে– জনসাধারণ নয়।

গোলাম আজমের বিবৃতি – দেশের আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের আহ্বান :
(দৈনিক পাকিস্তান; ২৭ আগস্ট ১৯৭১)

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম পাকিস্তানের আদর্শ ও লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপদান এবং বিশ্বাস ও আস্থার ভাব সুনিশ্চিত করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জণগণের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে সবাইকে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

২৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমাদের এমন একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা বিশ্বের নিকট উদাহরণ স্বরূপ বলে পরিগণিত হবে এবং শান্তি পিপাসু মানুষকে উৎসাহিত করবে।

তিনি বলেন, জাতি যে চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের স্বাধীনতা দিবস পালন আমাদের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিবৃতিতে তিনি দেশের আদর্শ ও ঐক্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। তনি বলেন, আমাদের আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাই জাতীয় সংকটের মূল কারণ।

মতিউর রহমান নিজামী : আলবদর থেকে মন্ত্রী
১৯৭১-এ নিজামীর বক্তৃতা থেকে
(কোটেশনগুলো সংগ্রাম পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)

...'১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমরা কোন জাতি। কিন্তু '৬৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত যেদিন পাকিস্তানের পাক ভূ-খণ্ডে হামলা চালিয়েছিল সেদিন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে রেডিও, টেলিভিশন ও জনগণ সরকারিভাবে কালেমা পড়ে মুসলমানিত্বের স্বকীয় ঐতিহ্য স্বীকার করলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ৬ বৎসরের মধ্যে এতবড় দুর্ঘটনা ভুলে গিয়ে ১৯৭১ সালে ডেকে আনলাম নিজেদের সর্বনাশ। এদেশের মুসলমানরা হিন্দু দাদাদের ধোঁকায় পড়ে গেল। এতে শুধু দেশ নয় বিদেশেও তারা খ্যাতি হারিয়েছে।[২৯]

...যশোহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভায় ভাষণদানকালে নিজামী আবারও খুনি পাক সামরিক জান্তার কাছে অস্ত্র চেয়ে বলেন– 'দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছি তেমনি সরকারের (পাকিস্তান সামরিক জান্তা–লেখক) উচিত হবে আমাদের খাঁটি সৈনিকরূপে গড়ে তোলা।[৩০]

"পাকিস্তান আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্ একে রক্ষা করছেন, ভবিষ্যতেও রক্ষা করবেন, দুনিয়ার কোনো শক্তিই পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।"[৩২]

---

২৯ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।
৩০ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।
৩২ দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।

মিনহাজের পিতার নিকট ছাত্রসংঘ প্রধানের তারবার্তা
(দৈনিক সংগ্রাম ৮/৯/৭১):

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী শহীদ রশিদ মিনহাজের পিতার নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করেছেন বলে সংগঠনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

তারবার্তায় জনাব নিজামী বলেন যে, পাকিস্তানি ছাত্র সমাজ তার পুত্রের মহান আত্মত্যাগে গর্বিত। ভারতীয় হানাদার ও এজেন্টদের মোকাবেলায় মহান শহীদ মিনহাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখতে তারা বদ্ধপরিকর।

***

রক্তাক্ত অধ্যায় বই থেকে

(ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, ৩য় প্রকাশ ২০০৭)

তিন অধ্যায়

...কর্নেল সাফায়াত জামিল তখন অন্য করাও সাথে টেলিফোনে আলাপ করছিলেন।

...কিছুক্ষণ পরে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আসলেন কমান্ডারের অফিসে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আর কিছু Instruction দিলেন। ...কিছু করণীয় আছে কিনা এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বললেন না। একটু পরেই মেজর ফারুক রহমান (পরে কর্নেল ও অব:) উপস্থিত হল। ...সিজিএসকে সে তার ট্যাংক কোন Ammunition সেই, রাজেন্দ্রপুর থেকে আনতে হবে এবং সে অন্য সিজিএস এর অনুমতি লাগবে বলে জানাল। ...ফারুকের কোন ট্যাংকেরই মেইন গানের কোন গোলাবারুদ রাতের অভিযানের সময় এবং প্রায় সকাল ১০ পর্যন্ত ছিল না। ফারুক বলতে লাগল তার কত বড় ঝুঁকি নিয়ে গোলাবারুদ ছাড়াই এ অভিযানে বের হয়েছিল। এমনকি তাদের ট্যাংকের মেশিনগানগুলোর গোলাবারুদ না থাকাতে ১৫ তারিখ ভোরে COD এর গেট ভেঙ্গে কিছু গোলা বারুদ নিয়ে আসে তাও শুধু মেশিনগানের। ...তারা খালি ট্যাংক নিয়ে সকলকে, এমনকি রক্ষী বাহিনীকেও ফাঁকি দিতে পেরেছে। ...সিজিএস সব শুনে তক্ষুণি রাজেন্দ্রপুরে ট্যাংকের গোলাবাররুদ দেয়ার কথা বলে দিলেন। ...অভ্যুত্থানের আগে কি ভেবেছিল যে ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? তার উত্তরে ফারুক বলেছিল এ বিষয়ে তারা অনেক ভেবেই পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

...অল্প সময়ের মধ্যে তিন বাহিনী প্রধানদের নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা শুনলাম। তার অল্প কিছুক্ষণ পরই স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ, সাথে উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আর তাদের পেছনে ডিজিএফআই ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রউফ। ...সেনাপ্রধান ব্রিগেড় কমান্ডারের চেয়ারে বসে পড়লেন। ...আমি এই প্রথম কোন সেনাবাহিনীতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অধীনস্ত কর্মকর্তার চেয়ারে বসতে দেখলাম। আমার কাছে মনে হলো সাফায়াত জামিল

সে মুহূর্তে আর ব্রিগেড় কমান্ডার রইলেন না বরং সেনাপ্রধানই কার্যত ব্রিগেড কমান্ডার হয়ে গেলেন। ...কেউই ব্রিগেড কমান্ডারকে পরবর্তী কার্যক্রমের কোন নির্দেশ দিলেন না। ...হঠাৎ সিজিএস বললেন রক্ষীবাহিনীর কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে এনে একইভাবে রেডিওতে পাঠাতে।

...প্রায় ১২টার দিকে সেনাপ্রধান উপ-সেনাপ্রধানকে নিয়ে সেনাসদরের দিকে চলে যান। খালেদ আরও কিছু সময় পরে সাফায়াত জামিলকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যান। যাওয়ার সময় ট্যাংকের এমুনেমন পাওয়া গেলো কিনা সে সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কথা বলে গেলেন।

...আর্মিতে কোন চেইন অব কমান্ড না থাকায় কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি সেদিন এবং তারপরেও অনেকদিন কোন সরকারও ছিল না যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ...বাংলাদেশ বেতার বুলেটিন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা শুরু করল যার কোন অনুমোদন সরকারের তো নয়ই, সশস্ত্র বাহিনীরও কোন সংশ্রব ছিল না। ...যেমন রেডিও থেকে অনবরত পাকিস্তানি উর্দুগান প্রচারের কারণটি আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। ...মনে হচ্ছিল সমগ্র দেশ কয়েকজন মেজরের হাতে জিম্মি আর সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা বেমালুম সহাস্যে সহ্য করে যাচ্ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারিতা যার প্রতিবাদও করার সাহস কেউ করেনি।

...১৭ই আগস্ট সাফায়াত জামিল সেনাসদর থেকে ফিরে এসে জানালেন সেখানে এক কনফারেন্সে ঢাকায় কর্মরত সব উর্ধ্বতন কমান্ডারই ছিলেন যেটা সেনাপ্রধানের সভাপতিত্বে হওয়ার কথা থাকলেও কার্যত রশিদ আর ফারুকই সবাইকে এ অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা আর এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনার সর্বশেষ বিবৃতি দেয়ার চেষ্টা করে। ...কেউ সেদিন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মত ছিল না।

...আমার কথার জবাবে ডালিম... জানালো, এ অভ্যুত্থান বহুদিনের ফসল...। সে জানালো কিভাবে সমস্ত সিনিয়র অফিসারদের সমর্থন তারা আদায় করেছিল। সে আরও বলল, 'How do you know this was not planned and discussed with others.

চার অধ্যায়

...সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সুপ্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার পর থেকেই বিদ্যমান ছিল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয় যা মেজর জেনালের জিয়াউর রহমান সহজভাবে নিতে পারেন নি। ...স্বভাবতই স্বাধীনতার পর প্রত্যেহে নিজ বলয়ে থেকে প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ও সুযোগ সৃষ্টি করতে থাকেন।

...দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ...সিনিয়র লেভেলের অফিসারদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ সংগঠন নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। উল্লেখ্য, তাহের ও জিয়াউদ্দিনের আদর্শ ও ধ্যান ধারণা ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের, বিশেষ করে চীনের Peoples liberation Army-এর মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সামন্ততান্ত্রিক

সংগঠনকে বর্জন করে একটি গণবাহিনীতে পরিণত করা। আর এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্যে বক্তব্য পত্রিকান্তরে তুলে ধরতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। আর কর্নেল তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (জাসদ) দলের অন্তরালে ধীরে ধীরে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায়। ১৫ই আগষ্টের পর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তার কারণেই শুরু হয় ত্রিমুখী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

পাঁচ অধ্যায়

...সেনানিবাসে চলতে লাগল কর্নেল (অব:) তাহেরের গোপন সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র সাংগঠনিক কার্যক্রম। ...আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাতে কমান্ড চ্যানেলের দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেনানিবাসগুলোতে বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থানরত ইউনিটগুলোতে গোপন সংগঠনের কার্যক্রম আরে ত্বরিতগতিতে সম্পন্ন হতে লাগল সবারই অজ্ঞাতে। সৈনিকদের মধ্যে সহজেই তাহেরের আদর্শ ও কার্যক্রম ব্যাপ্তি পেতে লাগল কারণ সৈনিকদের উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করার মত ওয়াদা তাহেরের প্রচারপত্রে ছিল। একদিকে যেমন সেনাপ্রধান wait and see policy তে বিশ্বাসী ছিলেন আর এরমধ্যে ৩রা নভেম্বরের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল, খালেদ মোশাররফ আর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে আর অন্যদিকে ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল তাহেরের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। জন্ম নিলো ত্রিমুখী শক্তির আর গোচরে অগোচরে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব।

...ওদিকে বঙ্গভবনে অবস্থানরত ফারুক, রশিদ, ডালিম ও অন্যান্য অফিসাররাও একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ছিল সজাগ।

...এ ধরনের কোন পাল্টা অভ্যুত্থান সফল হয় তবে ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত অফিসারদের পাল্টা ব্যবস্থা কি হতে পারে। প্রথমত: তাদের প্রয়োজন ছিল একটি আইনের যে আইনে তাদের অভ্যুত্থানকে যে কেন আদালতের বাইরে রাখা। আর যদি আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোন অভ্যুত্থান ঘটে তাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়ার মত সিনিয়র নেতার অভাব ঘটানো। দু'টিই অত্যন্ত পরিপক্ক ও সুক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবস্থা তা স্বীকার করতেই হবে। ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থানকে legalised করার জন্য জারি করা হলো বিতর্কিত, The Indemnity Ordinance 1975 duly promulgated and signed by the President of the Republic on 6 September 1975. তবে এ আইনে বিচার রদ হলেও পরবর্তী কোন মার্শাল ল কোর্টে বিচার হতে পারত কিনা সে ব্যাপারে আইন বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সক্রিয় পরিকল্পনা করা হয়। তার ফলে সংগঠিত হয় বাংলাদেশের তথা সভ্যজগতের নারকীয় ঘটনা, ৩রা নভেম্বরের জঘন্যতম জেল হত্যা।

একজন জিয়া চাটুকার যুদ্ধাপরাধী স্পষ্টভাষীর কলাম
(লেখকঃ খন্দকার আব্দুল হামিদ, ১ম খ , ২০০৫ সংস্করণ)

বেঈমানদের ভোট দেবেন না (পৃঃ ২২৯-২৩১) ঃ

প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের চেয়ারম্যান জিয়াও বটে। ...জিয়ার সফর উপলক্ষ্যে প্রতিটি সভায় আগের মতই বিপুল জনসমাবেশ হয়েছে। পথিপার্শ্বে অনির্ধারিত সভাগুলোতেও যে জনসমাবেশ হয়েছে, যে কোন নেতা তার পূর্ব-ঘোষিত বহুল প্রচারিত সভায় অতগুলো শ্রোতা পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। গত মে মাসে প্রেসিডেন্টের সাথে মোমেনশাহীতে ব্যাপক সফর করার আমার সুযোগ হয়েছিল। আমি তখন তাঁর যে জনপ্রিয়তা দেখেছিলাম তা ছিল তুঙ্গে। ইতিমধ্যে সেই জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে বলে যেসব বিরোধী নেতা প্রচার করে থাকেন তাঁরা প্রেসিডেন্টের এই সফরগুলো থেকে পরিস্থিতি আচ করতে পারেন।

...আমার কয়েকজন পুরানো বন্ধু... আমাকে বললেন, জিয়ার জনপ্রিয়তা ঠিকই আছে। তাঁদের মতে, আলীম সাহেব যদি কাপড়ের দরটা বাড়তে না দেন, মোমেন সাহেব যদি ধানচালের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করতে পারেন, জামালউদ্দিন সাহেব সেক্টর কর্পোরেশনের উৎপাদিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেভাবে বৎসরকাল ধরে সাফল্যজনকভাবে ঠেকিয়ে রেখেছেন সেভাবেই যদি বন্ধ রাখেন তাহলে শহর এলাকায় মাছ-গোশত ও এটাসেটার মূল্যবৃদ্ধিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হবে না। গ্রামের গরীব মানুষ সস্তাদরে চাল পাচ্ছে, খেটে খাবার মতো কাজ পাচ্ছে, রোজ টাকা দশেক করে মজুরি পাচ্ছে... এতেই তারা সন্তুষ্ট।

এটা সত্য যে চেয়ারম্যান জিয়া তাঁর পার্টি গঠন করতে দেরী করে ফেলেছেন। ডিসেম্বরে ইলেকশন হলে... আমার এ বিশ্বাস আছে যে, অধুনালুপ্ত জগদ্দলের যে কাঠামো রয়ে গেছে মোটামোটি তার মাধ্যমেই কাজ অনেকটা চলে যাবে। তাছাড়া আমাদের চেয়াম্যান জিয়া যেভাবে ঝটিকা সফর শুরু করেছেন তাতে তিনশটি নির্বাচনীএলকা কভার করতে তাঁর দু'মাসের বেশি সময় লাগবে না। তিনি দু'এক মাস কাজ করলেই গত মে-জুনের নির্বাচনী ঢেউ আবার উঠবে। বস্তুতঃ সেই ঢেউ উঠা শুরু হয়ে গেছে।

আমি চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টে ছিলাম। ...আমি ফ্রন্ট রাজনীতির গোঁজামিল ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক অরাজকতায় বিশ্বাস করি না। অবশ্য আমি আবার প্রেসিডেন্সিয়াল পিডক্টেটরশীপ, ও পার্লামেন্টারি ডিক্টেটরশীপ এই দুটোরও বিরোধী।

...চেয়ারম্যান জিয়া ফ্রন্টের পরিবর্তে ফ্রন্টের অঙ্গদলগুলো নিয়ে একদল গঠন করে বাস্তবাদিতারই পরিচয় দিয়েছেন। তা না হঠেল সরকার চালাতে নির্বাচন চালাতে এমনকি নির্বাচনের নমিনেশন দিতেও তাকে অনেক বেগ পেতে হতো। নিজ নিজ অঙ্গদল গুটিয়ে ...যারা জাতীয়তাবাদী দলে এসেছেন তাদের মধ্যে পূর্বকার অঙ্গদলীয় স্পিরিট অল্পবিস্তর আছেই এবং কিছুকাল থাকবেই। ...৭৬ জনের যে কেন্দ্রীয় কমিটি

কাগজে বেরিয়েছে তাতে কিছু কিছু নাম সম্পর্কে নাকি জিজ্ঞাসা রয়েছে। ল্যাম্প পোস্ট বা কলাগাছকেও লোকে একসময় ভোট দিয়েছে। সেটা ছিল ভিন্ন যুগ। ল্যাম্প পোস্ট বা কলাগাছের দিন চলে গেছে।

চেয়ারম্যান জিয়া মোমেনশাহীতে বিভিন্ন জনসভায় বলেছেন, কেবল ভাল ও সৎ লোকদেরই দল নেয়া হবে। ...এটা তার শুধু মুখের কথা নয় মনের কথা। দুর্নীতি ও অসাধুতার সঙ্গে তিনি আপোষ করবেন না, দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরেও না। প্রেসিডেন্টকে ভূয়া তথ্য দিয়ে ভুল বোঝাবার চেষ্টাও বিশেষ মহল থেকে যে না হবে তা নয়। গ্রুপ নেতারা 'পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার, আমি তারে ত্যাজিতে না পারি' মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে কমিটিতে 'স্বজনদের' ঢোকাতে বা নির্বাচনে মনোনীত করতে চেষ্টা করতে পারেন। ...আমরা কেউ পার্টি জানশিপের উর্ধ্বে নই– উর্ধ্বে শুধুই চেয়ারম্যান জিয়া।

...জীবনে পার্টি পলিটিক্স পার্লামেন্ট অনেকই দেখলাম। কিন্তু পরিচ্ছন্ন রাজনীতি দেখলাম না। চেয়ারম্যান জিয়া যদি তার নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী দলের মাধ্যমে দেশকে পরিচ্ছন্ন রাজনীতি দিতে পারেন তবে সেটাই হবে এই জাতির জন্য তার সবচেয়ে বড় দান। আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি, কোন রাজনৈতিক এগ্‌জিজেন্সি বা নির্বাচনী কৌশলের খাতিরেও তিনি কোন ক্লেদ বা পলিদ কে গ্রহণ করবেন না। তিনি কোন প্রেসার গ্রুপকেও আমল দেবেন না। গভর্নমেন্ট-উইদিন-গভর্ণমেন্ট যেমন মারাত্মক জিনিস, পার্টি-উইদিন-পার্টিও তেমনি সাংঘাতিক জিনিস।

...মোমেনশাহীর জনসভাগুলোতে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, অতীতে যারা বেঈমানী করে নিজ সম্পদ বৃদ্ধি করছে, অবাধ হত্যা ও লুটতরাজ চালিয়েছে যারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নির্বাচনের পর যারা আপনাদের ছেড়ে গেছে আপনাদের স্বার্থের প্রত বেঈমানী করেছে... তাদের ভোট দেবেন না। ...দেশপ্রেমিক, ত্যাগি, কর্মী, নিঃস্বার্থ, ও জনদরীদোর জয়যুক্ত করবেন। ...প্রেসিডেন্ট জাতীয়তাবাদী দল গঠনের পূর্বেও বহু জনসভায় সর্বসাধারণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, বেঈমান, খুনি, লুটেরা, গণদুশমন, স্বার্থশিকারী আধিপত্যবাদের দালাল ও জাতীয় মীরজাফরদের ভোট দেবেন না। ...যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দশের কল্যাণে ব্রতী না হতে পারি তবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে, ভবিষ্যৎ বংশধররা সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পারবে না।

প্রেসিডেন্ট যথার্থ কথাই বলেছেন। ...দুর্নীতিবাজ, লুটেরা, লাইসেন্স ও পার্মিট বিক্রেতা, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী, বস্ত্রহরণকারী, পাচারকারী, মুনাফাশিকারী, গমচোর, সুতা চোর, রিলিফ চোরা, যারা হাইজ্যাকার, ব্যাংক লুটকারী, যারা গণতন্ত্র হত্যাকারী, একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী, যারা দিল্লী-মস্কোর দালাল, যারা রাষ্ট্রবর্হিভূত আনুগত্যসম্পন্ন মীরজাফর এবং যারা... রাজনীতি থেকে নির্মূল করা হউক, সেই গণদাবী পূরণের কতদূর হল? ...সমাজ দেহকে এবং রাজনীতিকে এই গ্যাংগ্রীনমুক্ত করতে হলে র‍্যামপুশন করতে হবে, পট্টি প্রলেপে চলবে না। (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮, দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

৩০ মে ঃ গণভোট ঃ সিরাতুল মুস্তাকিমের ডাক (পৃঃ ২২১-২২৪)

আজ ৩০ মে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯-দফা নীতি ও কর্মসচীর উপর আস্থা যাচাইয়ের জন্য আজ গণভোট। গত মাস খানেকের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সারা দেশে ঝটিকা-সফর করেছন। প্রায় সমস্ত জেলায়... আজকের দিনের শ্রম দিয়ে আগামী দিনের বংশধরদের জন্য সুখ শান্তির বুনিয়া রচনা করতে বলেছেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও তিনি ভোটের ক্যানভাস করেননি। ...প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ...৩০শে মে-র গণভোটের কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবু প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বপ্রণেদিত হয়ে নিজেকে এবং নিজ নীতি ও কর্মসূচীকে জনগণের রায় বা গণভোটের সামনে পেশ করছেন। দু'একটি ক্ষুদ্র মহল বলেছেন যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি, কোন কোন 'পলিটিশিয়ানের' দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন না থাকলেও দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন আছে। ...শুধু ক্ষমতায় যাবার জন্য ভোট নেওয়াই গণতন্ত্র নয়। কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জনমত যাচাই করাও গণতন্ত্র এবং আমার মতে সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র, ...জেনারেল জিয়া আটাত্তরের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের ডেট-লাইন দিয়েছেন। ...আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের কণ্ঠ দিয়ে আট কোটি নর-নারীই কথা বলেছেন এবং তার শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী সমূহও তার কর্মসূচীর প্রতি জনগণের সর্বাত্মক বা বিপুল মেজরিটির সমর্থন রয়েছে, এটা বর্হির্বিশ্বকে দেখাবার কি প্রয়োজন নেই? আমি মনে করি আছে। ...দেশব্যাপী ২১৬৮৫টি ভোটকেন্দ্রে প্রায় তিন কোটি ৮৪ লক্ষ ভোটারের প্রত্যাশিত যোগদানে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই গণভোট এক সব ঝাঁকুনি দিয়ে সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তুলেছে, সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল করে তুলেছে। এরই মধ্যে দেশে যে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে তেমন সাড়া এদেশে গত ত্রিশ বছরে আর মাত্র তিনবার দেখেছি, ছেচল্লিশে, চুয়ান্নয় ও একাত্তরে। এই যে সর্বব্যাপক উৎসাহতউদ্দীপনা, জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব যে কতখানি, তা বলে শেষ করা যায় না।

জেঃ জিয়া পলিটিশিয়ান নন। তিনি সৈনিক। তিনিই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা করেছেন। ...সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন। ...তিনিই আলমে ইসলামকে বাংলাদেশের দোসর প্রতিম করে তুলেছেন। ...স্বৈরাচারী ইন্দিরার পতনের পর জিয়া সরকারের দূরদর্শিতায় নিকটমত প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কোন্নয়ন হয়েছে...।

...রবার্ট ম্যাকনামারা, ভিক্টর উমব্রাইখট, আই.টি. গ্রিশিন, স্পাস জার্জিয়েত, চো হো কিম এবং বিশ্বের আরও বহু বিশিষ্ট পদাধিকরী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির এসব উক্তি বাস্তবেরই স্বীকৃতি। কে না জানে যে, বিপর্যয়, অবক্ষয়, অধঃপতন ও হতাশার অতল গহ্বর থেকে ধ্বংসোম্মুখ বাংলাদেশকে দেড় বছরে জেঃ জিয়া ইনকোরাপটিবল জিয়া, অদ্ভুত কর্মী পুরুষ জিয়া টেনে তুলেছেন।

...প্রেসিডেন্ট জিয়া বৈদেশিক আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ করেছেন। ...অনাহার ও বস্ত্রহীনতা থেকে দীনাতিদীকেও মুক্ত করেছেন। ...প্রশাসনিক অরাজকতা দূর করে রীতি-নীতি, আদল-ইনসাফ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। বাকশালী ধর্মনিরপেক্ষতার ডাকিনীর হাতছানিতে যে জাতি দিশেহারা হয়ে পয়েন্ট-অব-নো-রিটার্নে ছুটে চলেছিল সেই জাতিকে দিয়েছেন মনজিলে মকসুদে চলার পথনির্দেশ। সে পথ হচ্ছে সিরাতুল মুসতাকিম, যার আহ্বান এদেশে জেঃ জিয়ারই কণ্ঠে সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়েছে। ফজলে খোদা, প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশী কওমকে একটা ন্যাশনাল মরিং দিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা মনজিল নির্দেশ করেছেন, এ-জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন এবং সর্বক্ষেত্রে কর্মচঞ্চল ও প্রাণপ্রাচুর্যময় করেছেন। এভাবে এত অল্প সময়ে এতখানি সাফল্যের কোন নজীর সম-সাময়িক কালে কোন প্রাচ্যদেশে আমি দেখি না। আর দেখিনা বলেই জিয়ার জন্য, ইনশাআল্লাহ আমাদের সমর্থন। জিয়ার জয় জনগণেরই জয় ইসলামের জয় সিরাতুল মুসতাকিমের জয়। আজাদীর জয়। ...সারা দেশে কোটি কোটি কণ্ঠের আওয়াজ প্রেসিডেন্ট জিয়া জিন্দাবাদ। মর্দে মুজাহিদ জিয়া জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ!!! নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়াফাতহুন ক্বারীব। (৩০ মে, ১৯৭৭, দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচী

ও ৩০ মে'র গণভোট (পৃঃ ২১৫-২২০)

প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার ৩০শে এপ্রিলের ভাষণে ১৯-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। এই ১৯-দফার মধ্যে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য-আদর্শ, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এব সেগুলো পরিপূরণের জন্য সরকারের কার্যক্রম বিধৃত হয়েছে। জেনারেল জিয়ার গত ১লা ডিসেম্বরের ভাষণের কতকগুলো বলিষ্ঠ উক্তি প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, "সমস্যা ভারাক্রান্ত দেশ ও জীবন। কিন্তু আমাদের কাজ করে যেতে হবে, যাতে সত্তর এমন দিন আসে যখন আমরা ঘোষণা করতে পারিঃ এ দেশে কোন লোক ভুখা মরবে না, এ দেশে কোনো লোক গৃহহীন থাকবে না, এদেশে কোনো লোক নিরক্ষর থাকবে না, এদেশের মানুষের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকবে।"

এগুলো হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন। ১৯-দফা কর্মসূচীতে মানুষের এসব মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে। ...পৌনে চার বছরের আওয়ামী-বাকশালী বর্গীদের দুঃশাসন বাংলাদেশকে ছারখার করে দিয়ে গেছে। ...জেনারেল জিয়া দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যকে আওয়ামী ভূঁইফোঁড় ও লটেরাদের করাল কবলমুক্ত করে বর্তমানে একটা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন। ...হাইজ্যাক, ব্যাংক লুট, খুন-খারাবী, ডাকাতি-রাহাজানি, সে আমলে এতটা সর্বব্যাপক সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল যে, দেশের মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা ও রাত্রির নিদ্রা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ...জেনারেল জিয়া সেই শ্বাসরুদ্ধকর নৈরাজ্য থেকে, শ্বেত-সন্ত্রাস থেকে, বেপরোয়া খুন–খারাবি, হাইজ্যাকিং, ব্যাংক লুট, ডাকাতি-রাহাজানি, পাইকারী ছাত্র হত্যা, শিক্ষক

হত্যা, নারী নির্যাতনের বিভীষিকভা থেকে দেশকে মুক্তি দিয়েছেন। ...জিয়ার হাত দিয়ে আল্লাহপাক এ যে কত বড় আযাব থেকে বাংলাদেশের মানুষকে নাযাত দিয়েছেন, তা বলে শেষ করা যায় না, এবং এর শোকরগুজারি করেও শেষ করা যায় না।

আওয়ামী শাসনে দেশে প্রশাসনযন্ত্রও খতম হয়ে গিয়েছিল। ...ফলে প্রশাসনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। রক্ষক হয়ে দাঁড়ায় ভক্ষক। জাতির ফুফা, চাচা, মামারা শাসনযন্ত্রের উচ্চাসনে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে। ...এই বীভৎসতার আর কি কোন নজীর আছে পৃথিবীতে। জেনারেল জিয়া সেই ব্যক্তি পূজার বীভৎসতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন বাংলাদেশকে...।

ইন্দিরা-স্বৈরতন্ত্র ও আধিপত্যবাদের কুড়ি মাস ছিল বাংলাদেশের জন্য এক চরম সংকট সময়। একটি পরাশক্তি সমর্থনপুষ্ট আধিপত্যবাদী ইন্দিরা-স্বৈরতন্ত্র অবিরাম সীমান্ত-উপদ্রব ও এজেন্টদের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত চালিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এর মুখে দুর্বলচিত্ত যে কোন শাসক ভেঙ্গে পড়তেন। কিন্তু জেঃ জিয়া ভেঙ্গে পড়েননি, মচকানও নি। বরং সাচ্চা ঈমানের বলে বলীয়ান, মর্দে মুজাহিদ জেঃ জিয়া আধিপাত্যবাদী দুশমনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, অকুতোভয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ...মর্দে মুজাহিদ জেঃ জিয়ার সবল নেতৃত্ব এই কওমের জন্য আল্লাহর খাস রহমত। ... প্রেসিডেন্ট জিয়া এক্ষেত্রে যে কুটনীতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা আমি বড় একটা দেখি না। ডেভিড, আল্লাহর রহমতে, অতিকায় দৈত্য গলিয়াথকে কুপোকাৎ করে দিয়েছিলেন, সেই কাহিনী মনে পড়ে। সকল শক্তি আল্লাহরই দান এবং সকল প্রশংসাও সেই মহান আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদের নব্যস্বাধীন দেশকে এমন একজন মর্দে মুজাহিদ, এমন একজন নিরঙ্কুশরূপে সৎ, সজ্জন, ঈমানদার, অক্লান্ত কর্মী, দূরদর্শী সিপাহসালার ও রাষ্ট্রীয় কান্ডারী এনায়েৎ করেছেন। অথচ তিনি ক্ষমতার জন্য লালায়িত নন।

...ধর্মীয় শিক্ষা যা আওয়ামী আমলে নির্বাসিত হয়েছিল শিক্ষায়তনে তা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে এবং আল-আজহার দারুল উলুমের ধাঁচে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (যা মরহুম মাওলানা ভাসানীর ছিল জীবন স্বপন) স্থাপনের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষের প্রাণের ধর্ম ইসলাম যা আওয়ামী-বাকশালীদের ধর্মনিরপেক্ষতর দৌরাত্ম্যে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল, সেই পবিত্র ইসলামকে প্রেসিডেন্ট জিয়া শাসতন্ত্রের সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন, আল্লাহর পর নিরঙ্কুশ ঈমানকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রথম মূলনীতি করে সর্বনাশা 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে' ছাঁটাই করেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ঈমানকে সংবিধানে সকল জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মের দিশারী করেছেন এবং ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে সমগ্র আলমে ইসলামের সঙ্গে সৌভ্রাত্রীয় সম্পর্ক সুসংহত, শক্তিশালী ও সংরক্ষণের নীতি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। ধর্মপ্রাণ এই কওমের পক্ষ থেকে মর্দে মুজাহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হাজারো মোবারকবাদ।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বৈদেশিক আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ করেছেন। ...চরম নৈরাজ্য থেকে জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন, নিদারুণ হতাশা থেকে কওমকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আত্মবিশ্বাস, প্রশাসনিক অরাজকতা দূর করে রীতিনীতি-আদল-ইনসাফ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতার ডাকিনীর হাতছানিতে যে জাতি দিশেহারা হয়ে পয়েন্ট-অব-নো-রিটার্ন ছুটে চলেছিল সেই জাতিকে দিয়েছে মঞ্জিলে-মকসুদে চলার সত্যিকার পথ নির্দেশ। সে পথ হচ্ছে সিরাতুল মুসতাকিম।' আর সেই পথেই চলে বাংলাদেশী নরনারীগণ ৩০শে মে বিপুল সংখ্যায় ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করবে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও তার কর্মসূচীর উপর সর্বাত্মক আস্থা ও বিশ্বাস। নারীপুরুষকে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কারণ, প্রেসিডেন্ট জিয়ার জয় জনগণের জয়। ইসলামের জয়। আজাদীর জয়। সার্বভৌমত্বো জয়। আর তাই কোটি কোটি কণ্ঠের আজকের আওয়াজ হচ্ছে: প্রেসিডেন্ট জিয়া জিন্দাবাদ! মর্দে মুজাহিদ জিয়া জিন্দাবাদ!! বাংলাদেশ জিন্দাবাদ!!! (৯ মে, ১৯৭৭ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত)।

১৯৭৫-এর নভেম্বরে জিয়ার তিনটি ভাষণ

(ছোটদের প্রিয় মানুষ জিয়াউর রহমান, পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৩৭ ও ১৭১-১৭৪)

জিয়াউর রহমানের ভাষণ

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ প্রত্যুষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

প্রিয় দেশবাসী

আস্সালামু আলাইকুম,

আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের **চীফ মার্শাল 'ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান** হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এই দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বত্র অফিস, আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, মিলকারখানাগুলি পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অপরাহ্নে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

প্রিয় দেশবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানে অংশগ্রহণকারী সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ভাইদের এবং মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনীর ভাইদের স্ব-স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের জন্যও আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে সর্বান্তকরণ সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য এবং আল্লাহতা'লার উপর অবিচল আস্থা স্থাপনের জন্য আমি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

২৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

গত ৭ ও ১১ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন থেকে আমি গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জনসাধারণ কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাথেতাদের সংহতি প্রকাশ করছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক আইন প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করছে।

এই ঘটনা সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিছু লোক বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় নিয়োজিত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখনো সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের নাম ব্যবহার করে চলেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করছি। আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রশাসনকে দৃঢ় ও কার্যকরী রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ তা যে কোন মহল থেকেই আসুন না কেন আমরা তা বরদাস্ত করব না।আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা বদ্ধপরিকর এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মৌলিক প্রয়োজন দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা। বেআইনী অস্ত্রধারীরাই এই শান্তি ও শৃংখলার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রতিটি শান্তিকামী নাগরিকের কাছে আমাদের আবেদন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আপনারা সহযোগিতা করুন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক জোটনিরপেক্ষ নীতির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষয় উল্লেখ করেছেন, আমরা আমাদের সকল বন্ধুদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয় – এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব।

গত কয়েক মাস আমাদের জনগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক বাহিনী ও সামরিক আইন প্রশাসনের প্রতি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ ভাল করেই জানেন, কারা দেশের বন্ধু ও কারা দেশের শত্রু। কারা দেশের স্বার্থে ও কারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত। এ সম্পর্কেও আমাদের জনগণ সজাগ রয়েছেন। জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, যারা হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত এবং যে সমস্ত বহিঃশক্তি আমাদে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

আমাদের অঙ্গীকার পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা অনেক রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছি এবং আরও অনেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন কোন মহল আমাদের এই সদিচ্ছাকে দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছেন এবং আমাদের সদিচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন মহল তাদের অতীত হীনকার্যকলাপের কথা ভুলে গিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত। বহিঃশক্তির সহায়তায় এই মহল পুনরায় তৎপর হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী! এরা কারা আমাদের তা বলে দিতে হবে না। আপনারা তা জানেন। আপনার জানেন তারা কি করতে চায় এবং তাদের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আসে। জণগণের জানমাল ক্ষতিসাধনের জন্যই তারা তৎপর। আমরা দেশে আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেব না, আর রক্তপাত সহ্য করব না। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী চক্র। এদের পেছনে

জনসমর্থন কতটুকু তা সবার জানা আছে। আপনারা জানেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামরিক বাহিনীর নাম পর্যন্ত ব্যবহার করছে। আমরা তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণের ইচ্ছার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সামরিক বাহিনী রাজনীতির উর্ধ্বে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। যারা দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধেও সামরিক বাহিনী সজাগ। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা জড়িত তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, আপনারা নির্ভয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। কোন মহলের হস্তক্ষেপ আপনারা বরদাস্ত করবেন না। জনগণ আপনাদের সঙ্গে। দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনারা জনগণের সাথে সহায়তা করুন। এইসব ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করুন। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সহায়তায় বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আপনাদের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উদ্দেশমূলকভাবে গুজব রটিয়ে এবং প্রচারপত্র ছড়িয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আমাদে প্রচেষ্টাকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জনগণ এদের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। অপনারভা একতাবদ্ধ থাকুন। ইন্‌শাআল্লাহ স্বার্থন্বেষী মহলের অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পরিশেষে, আমি আপনাদের জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনী ও জনগণ এবং প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা বজায় আছে। আমরা যদি এরূপভাবে একতাবদ্ধ থাকি, তাহলে কোন বিদেশী শক্তি বা প্রভাব আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি এবং আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বর স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকই একটি সৈনিক। আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত বিদেশী চরদের হুশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে– তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বাংলাদেশের বীর জনগণ নাস্যাৎ করে দেবে। আমাদের মাটিতে মীরজাফরের কোন স্থান নেই। সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং মুক্তিযোদ্ধাস সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আমাদের আহ্বান, মীরজাফর এবং বিদেশী দালালদের খুঁজে বের করুন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সক্রিয় সহায়তা করুন।

আল্লাহ আমাদের সহায়।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার দুই রকম ভার্সন
(মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ১৯৮৪ সংস্করণ)

(1)

DECELARATION OF INDEPENDENCE

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheik Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pleadges to function as per law and the constitution. The new democratic Governemtn is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilge public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

***

(2)
(মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ২০০৪ সংস্করণ)

"...আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশন্যাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে।"

লেখকের নোটঃ খালেদা জিয়ার হাতে ইতিহাস বিকৃতিকরণের জঘন্য নমুনা এর চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।

***